ছেলেমেয়েদের সর্বপুরাতন সচিত্র মাসিকপত্র

৪৯শ বর্ষ, ১৩৭৫

ইং ১৯৬৮-৬৯

সুধীরচন্দ্র সরকার
প্রতিষ্ঠিত

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট ; কলিকাতা-১২

মৌচাকের নিয়মাবলী

১। **মৌচাকের** বার্ষিক চাঁদা ৭·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩·৫০ টাকা এবং প্রতি সংখ্যা মূল্য ০·৬০ পয়সা। বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ। তবে যে কোনও মাস হতে গ্রাহক হওয়া যায়।

২। কোন সংখ্যা না পেলে সেই মাসের **২০ তারিখের** মধ্যে জানাতে হবে, নচেৎ সংখ্যা পরে পাওয়া যাবে না। ঠিকানা পরিবর্তন করতে হ'লে পূর্বমাসের **২৫ তারিখের** মধ্যে জানাতে হবে। চিঠি-পত্র ও মানিঅর্ডার কুপনে সবসময়েই **গ্রাহক নম্বরের** উল্লেখ থাকা চাই। গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ না থাকলে চাঁদা জমা করা সম্ভবপর হয় না। নতুন গ্রাহক হলে **'নতুন'** কথাটির অবশ্যই উল্লেখ থাকা দরকার।

৩। লেখা সকল সময়েই নকল রেখে পাঠাতে হবে। **'অমনোনীত'** রচনা ফেরত পাঠাবার জন্য সঙ্গে ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না দেওয়া থাকলে সে লেখা গ্রাহ্য হয় না।

৪। **এজেন্সীর জন্য ১০ টাকা** অগ্রিম জমা রাখতে হয় এবং কম পক্ষে প্রতি সংখ্যার **১০ কপি** করে পত্রিকা নিতে হয়। প্রতি ৬ মাস অন্তর বিক্রিত কপির হিসাব ও অবিক্রিত কপি ফেরৎ পাঠাতে হয়। কমিশনের হার শতকরা ২৫ টাকা।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

বিষয় — পৃষ্ঠা

নববর্ষের সুপ্রভাত

মৌচাক
বৈশাখ ১৩৭৫

॥ আলোকচিত্র ॥
শ্রীঅরুণ সেনগুপ্ত

❋ ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র ❋

৪৯শ বর্ষ] বৈশাখ : ১৩৭৫ [১ম সংখ্যা

সুধী সুধীরচন্দ্র

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বহু গুণমান—তবুও ছিল না জাঁক,—
জীবন ধরিয়া গড়িয়াছ মৌচাক।

মধু বিলায়েছ দরদী সাহিত্যিক—
কোথা ভালবাসা এমন আন্তরিক ?

সদয় মধুর উদার তোমার মন
গুণী জ্ঞানী ধনী করিত আকর্ষণ।

শিশুদের প্রতি মমতা সোহাগ কত ?
শুচি কল্যাণ চিন্তাই অবিরত।

যাহারা দেশের আশা ও ভবিষ্যৎ।
তাহারা হউক উন্নত সাধু সৎ।

তোমার মতন সরল সাহসী বীর
সম্পদ মানি গোটা এ ধরিত্রীর।

রহিবে তোমার এই যে বিয়োগ-ব্যথা,
অযুত কোমল কমল-হৃদয়ে গাঁথা।

চমৎকার

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

ভিণ্টেজ কার কেমন মজা !
ভিণ্টেজ কার ক্যা বাহার !
নানান ছাঁদের গড়ন তাদের
সেকালের সেই মোটরকার।
দু'হাত তুলে দিচ্ছি তালি
চমৎকার ও চমৎকার !

ওদিকে যে পকেট খালি
হাত সাফাই কখন কার !
ভিণ্টেজ ব্যাগ নিয়ে হাওয়া
গড়ের মাঠের পকেটমার।
টিউবিঙ্গেন থেকে আনা
কত সাধের ব্যাগ আমার !

অন্ধকার ও অন্ধকার
দিনের আলো অন্ধকার !

এক ভূত

অসিতকুমার হালদার

একদিন এক ভূত, নাম তার কিম্ভুত
গেল যেই লাফাতে ;
মাথা গেল ঠুকে তার, চাঁদ তারা একাকার
লাগল সে হাঁফাতে।

নাম নাম নেবে যারে, দেবতারা বলে তারে
যা রে তোর আবাসে ;
ভাঁটাপানা চোখ তার, পুড়ে যায় দুড়দাড়
ভেঙে দিয়ে আকাশে

নিমু বলে রোস রোস, রাগে তোর ফোঁস ফোঁস
বাড়ী যদি ভাঙে মোর ;
ডেকে দেব কোতোয়াল, মেরে দিয়ে তরোয়াল
নিয়ে যাবে বেঁধে চোর।

রুটি ও মেডেল

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'কী পেলি? কই দেখি।' গাঁয়ের মুখে পথের উপর রুখল সুখলাল।

মানগোবিন্দ লাজুক-লাজুক মুখ করল। ডান হাতের লাঠিটা বগলের নিচে চালান দিয়ে ডান পকেট থেকে একটা রঙিন বাক্স বার করল। তারপর বাক্স খুলে দেখাল মেডেলটা।

'বা, বা, খুব সুন্দর তো! দিব্যি ফিতে-বাঁধা।' সুখলাল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। 'তা—গলায় ঝোলাসনি কেন?'

'মিটিঙে পরিয়ে দিয়েছিল। সে কী হাততালি! তারপর সাহেবসুবোদের কী বক্তৃতা!' মানগোবিন্দের চোখে-মুখে আনন্দ উপচে পড়ল। 'এখন গাঁয়ে-ঘরে ফিরে এসে গলায় আর ঝুলিয়ে কী হবে? চেনা বামুনের কি পৈতের দরকার আছে?'

'দেখি—দেখি—' হাতে করে মেডেলটা দেখতে লাগল সুখলাল। ওজনটাও অনুভব করল। বললে, 'খাঁটি রুপো। দাম মন্দ হবে না।'

'সেই দামটাই নগদ ধরে দিলে ভালো হত।'

'কী যে বলিস তার ঠিক নেই। টাকায় কখনো মেডেলের দাম হয়?' জ্ঞানীর মত মুখ করল সুখলাল। 'টাকা তো ধুলো, উড়ে যাবে। কিন্তু মেডেলটা চিরকাল থাকবে।' হঠাৎ মানগোবিন্দের বাঁ হাতের পোঁটলাটার দিকে সুখলালের নজর পড়ল। জিজ্ঞেস করলে, 'প্রাইজ পেয়ে বাড়ির জন্যে কী আনলি?'

'কী আবার আনব!' মানগোবিন্দ ঝাঁজিয়ে উঠল। 'নগদ টাকা তো দেয়নি যে ছেলেদের জন্যে এক হাঁড়ি রসগোল্লা আনব!'

'তবে ওটা কী?'

'একটা পাঁউরুটি।' লাজুক-লাজুক মুখ করল মানগোবিন্দ। 'ছেলেরা কোনোদিন খায়নি। একটা নতুন জিনিসের স্বাদ পাবে।'

যেন মানগোবিন্দই কত খেয়েছে! তবু প্রাইজ-পাওয়া ঝলমলে নতুন দিনে সস্তায় একটা নতুন খাবার আনতে গেলে পাঁউরুটির বেশি আর সে কী ভাবতে পারে?

আর ভাবলেই বা দোষ কী। সাহেব-সুবো ভদ্দরলোকদের সঙ্গে সেও তো এক লাইনে বসেই মেডেল পেয়েছে। পাঁউরুটি তো সাহেব-সুবোদেরই খাদ্য।

মন্দ কী, ছেলে দুটো পাঁউরুটি খেতে শিখুক। নতুন দিন-কাল আসছে, বড়লোক আর গরিবের মধ্যে আর তফাত থাকছে না, চাইকি ওরাই ভবিষ্যতে সাহেব-সুবো হয়ে উঠবে। পাঁউরুটিটা তাই বেমানান হবে না।

'চোরটার কী হল ?'

'জেল হল। এক বচ্ছর। ছোরা নিয়ে মারতে এসেছিল বলেই জেলটা বেশি হল।'

'তা তোর বাহাদুরি আছে বটে, ছোরা হাতে চোরটাকে ধরে ফেললি।'

'আমি গাঁয়ের চৌকিদার, চোর আমি ধরব না তো কে ধরবে!' মানগোবিন্দ গর্বের হাসি হাসল: 'আমার লম্বা লাঠির কাছে ছোরা-ছুরি করবে কী।'

তারই জন্যে সদর-দরবারে মানগোবিন্দকে মেডেল দেওয়া। লাঠির ঘায়ে সে সশস্ত্র চোরকে ঘায়েল করেছে, চোরাই মালও উদ্ধার করেছে—এ এক বিরাট সাহসের নিদর্শন। তা ছাড়া মধ্যরাত্রির চুরি—মানগোবিন্দ সজাগ ছিল, টহল দিচ্ছিল, কর্তব্যকাযে শৈথিল্য করেনি—এও কম কৃতিত্ব নয়। তাকে পুরস্কৃত করবে না তো কাকে করবে ?

'তবু, মনে হয়, মেডেল না দিয়ে নগদ টাকা প্রাইজ দিলেই ভালো হত।'

'মেডেল মেডেল! তার কাছে টাকা কী।' মানগোবিন্দ মানীর মত ভঙ্গী করল। 'টাকা তো হাতের ময়লা, তার কি কোনো মান আছে ? মেডেলের মান কত!'

'তবু—' সুখলালের অস্বস্তি যেতে চায় না।

'তোকে বললাম তো, টাকা থাকবার নয়, মেডেলটা থাকবার। তা ছাড়া আরো কত অফিসর প্রাইজ পেল—কনস্টেবল দারোগা—সবাই ঐ মেডেল, কেউ-কেউ বা শুধু কাগজ—সার্টিফিকেট।'

'নগদ টাকা কেউ পায়নি ?'

'একজন শুধু পেয়েছে—রামপ্রতাপ কনস্টেবল। সে ঠিক পায়নি, তার বউ-ছেলে পেয়েছে।'

'তার মানে ?'

'রামপ্রতাপ ডাকাত ধরতে গিয়ে খুন হয়েছিল বলে নগদ টাকার ব্যবস্থা হল। তা রামপ্রতাপ নিজে পেল না, তার পরিবার পেল। তেমনি আমি যদি চোরের ছোরার ঘায়ে মারা যেতাম, আমার বউ-ছেলেকেও বোধ হয় নগদ টাকা পাইয়ে দিত। কিন্তু তুই বল সেটা কি প্রাইজের মত দেখাত ? তার চেয়ে এই মেডেল কত ভালো!' বলে মানগোবিন্দ নিজেই মেডেলটা গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে হাসতে লাগল।

কিন্তু বাড়িতে এসে মানগোবিন্দ সেই যে জ্বরে পড়ল তিন দিনেও ছাড়ল না ঘোরের মধ্যেই স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলে, 'ছেলেরা পাউরুটিটা খেয়েছিল ?'

'খেয়েছিল।'

'কী দিয়ে খেল ?'

'শুধু শুধু। ছু ভাই ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ভাগ করে খেল।'

একটা নিশ্বাস ফেলল মানগোবিন্দ। 'তুমি খেলে না?'

স্ত্রী একটু হাসল। বললে, 'না। তুমি জ্বরে প'ড়ে, তুমি খেলে না, আমি খাব কোন সুখে?'

মানগোবিন্দ চোখ বুজে বললে, জ্বরটা ছাড়ুক, এবার পাঁউরুটি দিয়ে পথ্য করব।'

কিন্তু সেই যে চোখ বুজল, মানগোবিন্দ আর তা খুলল না। তিন দিনের দিন কথা বন্ধ হল—চার দিনের দিন নাড়ী। স্ত্রী আর বাচ্চা ছুটো ছেলেকে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেল মানগোবিন্দ। রেখে গেল এক-গলা দারিদ্র্য আর ঐ রুপোর মেডেল।

যখন মানগোবিন্দকে শ্মশানে নিয়ে যাবে সুখলাল বললে, ওর মেডেলটা দিন, গলায় পরিয়ে দিই। বীর-সাজে সাজিয়ে দিই ওকে।

মানগোবিন্দের স্ত্রী কিছুতেই রাজি হল না। ঝংকার দিয়ে উঠল: 'এবার কি চোরকে ও ঘায়েল করতে পেরেছে যে ওকে মেডেল দেব?'

'চোর? চোর এল কোত্থেকে?' সবাই হতবাক হয়ে গেল। ভাবল মানগোবিন্দের স্ত্রী বুঝি শোকে পাগল হয়ে গিয়েছে।

'যম চোর নয়?' মানগোবিন্দের স্ত্রী আবার আর্তনাদ করে উঠল: 'যম ওর প্রাণটুকু চুরি করে নিয়ে গেল না? কই ওর লাঠি কই? যদি এবার চোরকে ঘায়েল করে চোরাই মাল উদ্ধার করে আনতে পারত, ওর গলায় মেডেল পরিয়ে দিতাম। চোরকে তো ও এবার ধরতে পারল না, প্রাণ তো আনতে পারল না ছিনিয়ে। কেন, কেন ওকে আর মেডেল দেব?'

বিনা মেডেলেই মানগোবিন্দ শ্মশানযাত্রা করল।

সরকার থেকে তদন্ত হল মানগোবিন্দের কোনো ছেলেকে বাপের কাজে নিযুক্ত করা যায় কিনা। তদন্ত করে হতাশ হল। মানগোবিন্দের বড় ছেলে নন্দকিশোরের বয়স দশ-এগারো আর ছোট ছেলে নবীনকিশোরের আট-নয়।

অতএব ওদের মাকেই নিতে হল জীবিকার্জনের ভার। একটা ধান-কলে সামান্য মজুরনির কাজের বেশি আর কিছু সে যোগাড় করতে পারল না। কষ্টেসৃষ্টে-র চেয়েও অধিকতর ক্লেশে দিন কাটানোর জন্যে তৈরি করল নিজেকে।

ছেলে ছুটোর জন্যেও ছোটখাট চাকরি খুঁজতে লাগল।

যখনই চারদিক আঁধার হয়ে আসে তখন বাক্স খুলে মেডেলটা দেখে। চোখের সামনে মেডেলটা চকচক করে ওঠে। মনে হয় মেডেলটাই রক্ষাকবচ। সে-ই আশার আলো বাঁচিয়ে রাখবে, বাঁচিয়ে রাখবে বাড়ি-ঘর, মান-ইজ্জত।

কিন্তু মানগোবিন্দের কিছু একটা শ্রাদ্ধশান্তি করতে হয় তো।

গরিবের আবার শ্রাদ্ধ! কুঁজোর আবার চিৎ হয়ে শোয়া!

একটা পুরুত ডেকে এনে নমো-নমো করে কিছু মন্ত্র বলিয়ে নাও। আর তাকে কিছু ভুজ্যি ধরিয়ে দাও। যা যা মানগোবিন্দ খেতে ভালোবাসত তাই দিয়ে থালা সাজাও।

মানগোবিন্দের স্ত্রীর ইচ্ছে হল মেডেলটাকে বেচে দিয়ে সেই টাকায় কাজটাকে একটু বড় ক'রে করে। অন্তত আত্মীয়-বন্ধু কজনকে খাওয়ায় তৃপ্তি করে।

'না, খবরদার!' কে যেন বুকের ভিতর থেকে গর্জে উঠল। 'কিছুতে বেচতে পারবে না মেডেল। ওটা নিটুট থাকলেই আমি বেশি তৃপ্ত।'

নন্দকিশোর আর নবীনকিশোর দু ভাইকেই বাজারে পাঠিয়েছে মা। ওদের বাপের বিশেষ প্রিয় কোন তরকারি বা ফল আনতে হবে তা ভালো করে বলে দিয়েছে। তবু নন্দ যদি ভোলে নবীন মনে করিয়ে দেবে আর নবীন যদি মনে করতে না পারে তাহলে তার দাদা নন্দই তো আছে।

বাজারের দিকে যেতে যেতে নন্দর মনে হল বাবার আসল প্রিয় খাদ্যবস্তুটাই মা বলতে ভুলে গেছে।

'কী সেটা?' নবীন জিজ্ঞেস করল।

'পাউরুটি।'

'ঠিক বলেছিস।' নবীনের চোখ ছলছল করে উঠল। 'সেই রুটিটা বাবা খেতে পারেনি। বলেছিল ভালো হয়ে উঠে রুটি দিয়ে পথ্য করবে। তোর মনে নেই?'

'মনে আছে বলেই তো বলছি।' বড় ভাই নন্দ মুরুব্বিয়ানার সুরে বললে, 'মনে হচ্ছে থালায় একটা রুটি দিলেই বাবা বেশি খুশি হবেন। যে করে হোক একটা রুটি যোগাড় করতে হবে।'

'কিনবি?'

'পয়সা কোথায়?' নন্দ হতশমুখে বললে, 'মা যা দিয়েছেন তার বাইরে একটা কানাকড়িও বাঁচবে না।'

'তা হলে?'

'দেখি—'

বাজারে যাবার পথেই অতীন সা-র রুটির দোকান। সামনের দিকেই খোলা একটা তক্তার উপর রুটি সাজানো। একটা তুলে নিয়ে ছুট দিলে কে কী করতে পারে? অতীন সা-র মুখটা উলটো দিকে একটু ঘোরানো থাকলে টেরও পাবে না।

কথায় কথায় অতীন সা-র মুখটা বিপরীত দিকেই ঘুরেছিল আর সেই সুযোগে একটা বড় পাঁউরুটি তুলেও নিয়েছিল নন্দ। কিন্তু যেমন সহজ ভেবেছিল তেমনি সহজ হল না।

মুহূর্ত মধ্যে অতীন সা-র মুখটা ঘুরে গেল আর সঙ্গে-সঙ্গেই চেঁচিয়ে উঠল—চোর, চোর!

নন্দ চেয়েছিল রুটিটা নবীনের হাতে চালান করে দিয়ে অতীন সা-র মনোযোগটাকে ঢেকে দেবে, কিন্তু নবীনের দিকে রুটিটা বাড়িয়ে দিলেও নবীন সে ইঙ্গিত বুঝল না। সুতরাং রুটি হাতে নিয়ে নন্দই ছুটল উর্ধ্বশ্বাসে।

কিন্তু কতদূর ছুটবে? অতীন-সা পিছু নিয়ে তাকে বমাল-সহ ধরে ফেলল। ধরেই মার সুরু করল। হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল দোকানে। পরে ভিতর দিকের একটা ঘরে তাকে বন্ধ করলে।

পথের পাশে জনতার একজন হয়ে বোকার মত সব দেখল নবীন। কিছুই করতে পারল না। কিছুই তার করবার মত নেই।

'কী বিচ্ছু ছেলে রে বাবা। এইটুকু বয়েস থেকেই চুরি?'

'তাও দিনের আলোয়! দোকানে খদ্দের সেজে এসে!'

'পুলিশে দিয়ে দেওয়া উচিত।'

'এর জন্যে পুলিশ কী!' কেউ বুঝি বা একটু লঘু করে দেখতে চাইল। 'কিঞ্চিৎ উত্তম-মধ্যম দিয়ে ছেড়ে দাও।'

'মারবারই বা কী হয়েছে!' কেউ আবার স্পষ্ট সহানুভূতির স্বর আনল। 'রুটির দামটা দিয়ে দিলেই তো হয়—তার উপর কিছু না হয় খেসারত।'

অতীন সা কারু কথা শুনল না। যেমন বন্ধ করে রেখেছিল তেমনি বন্ধ করেই রাখল নন্দকে।

কৌতূহলী জনতার আগ্রহ আর কতক্ষণ টিঁকে থাকবে? যে যার মনে ধীরে ধীরে সরে পড়ল। শুধু একজন চিন্তিত স্বরে বললে, 'ছেলেটাকে খালাস করে নেবার মত কেউ নেই? ওর বাড়ি কোথায়? ওর বাপ কে?'

বাড়ি ফিরে গিয়ে নবীন তার মাকে সব বলতেই মা একেবারে ঘৃণায় লজ্জায় হাহাকার করে উঠল: 'ছি ছি ছি, চৌকিদারের ছেলে চোর! যে চোর ধরে মেডেল পায় তার ছেলে কিনা চুরি করে জেলে যাচ্ছে! তাই যাক—যেখানে খুশি সেখানে যাক। আমি কিছু করতে পারব না, কাউকে কিছু বলতে পারব না। চোরের মা'র মুখ নিয়ে কার সামনে গিয়ে আমি দাঁড়াব? ছি ছি ছি—'

চুপি চুপি বাক্স খুলে নবীন তার বাবার মেডেলটা বার করল। গায়ে গেঞ্জি, পরনে

হাফ-প্যাণ্ট—হাফ-প্যাণ্টের পকেটে মেডেলটা তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলল। মা তো পড়ে পড়ে কাঁদছে, নবীনকে দেখতেও পেল না। নবীন লুকিয়ে বেরিয়ে গেল বাড়ির থেকে। অতীন সার দোকানের দিকে।

দেখতে গেলে নবীনেরও অপরাধ আছে। নন্দ যখন রুটিটাকে তার হাতে চালান দিতে চেয়েছিল তখন সেটাকে সে কেন লুফে নিতে পারেনি? তার বোকামির জন্যেই তো নন্দ ধরা পড়েছে। নন্দের জন্যে নবীনের কি কিছুই কর্তব্য নেই? বাবা নেই বলে কি নন্দের ভাইও নেই?

অতীন সা'র সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করল নবীন। বললে, 'আপনি এই মেডেলটা নিয়ে আমার দাদাকে ছেড়ে দিন।'

'মেডেল!' অতীন সা অবাক চোখে তাকাল।

'আপনি চোর ধরেছেন, চোরাই মালও ফেরত পেয়েছেন, আপনারই তো মেডেলটা পাওয়া উচিত।' নবীন স্বচ্ছন্দ স্বরে বললে, 'শুধু আমার দাদাকে ছেড়ে দিন।'

অতীন সা আর কিছু বুঝুক না-বুঝুক, এটা বুঝল মেডেলটার দাম আছে। রুটির দামের চেয়ে কত-কত গুণ বেশি সহসা যেন হিসেবে থা করতে পারল না।

'ঠিক আছে, ছেড়ে দিচ্ছি। তুই বাড়ি যা। কাউকে কিন্তু বলিসনে কিছু।'

নন্দ ছাড়া পেল। শুধু জানতে পেল না কী মূল্যে কেনা হল তার স্বাধীনতা!

সন্ধেসন্ধি বাড়ি ফিরল নন্দ। মা ছুটে এসে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। বললে, 'তুই যে ছাড়া পেয়ে বাড়ি আসতে পেরেছিস এই শান্তিই তোর বাবার সবচেয়ে বড় শ্রাদ্ধশান্তি।'

নবীন দেখল নন্দর গায়ে কিছু কাটা-ছেঁড়ার চিহ্ন। সে সব মেরামতি করে পাঠাতেই অতীন সা দেরি করেছে। সঙ্গে, দয়া করে, দিয়েছে পাঁউরুটিটা।

মা নিশ্চিত ভাবল এ সমস্তই সেই রক্ষাকবচ মেডেলের গুণ। মানগোবিন্দের সেই মেডেলই ছেলেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, ফিরিয়ে দিয়েছে, পাইয়ে দিয়েছে তার প্রিয় খাদ্য। ভাবল, মেডেলের কাছে মনের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

ভেবে বাক্স খুলল। সে কী, মেডেল কই? মেডেল কোথায় গেল? ওরে দ্যাখ, মেডেল কে চুরি করে নিয়েছে—

বুকফাটা আর্তনাদে মা বিদীর্ণ হতে লাগল। ওরে আমার রুটি দিয়ে কী হবে, শ্রাদ্ধশান্তি দিয়ে কী হবে, আমার মেডেল কই?

নন্দও কাঁদতে লাগল। আর, মাকে আর দাদাকে কাঁদতে দেখে নবীনও চুপ করে থাকতে পারল না।

কিন্তু যাই বলুন, মা মেডেল পেতে পারেন না কেন না তিনি তো চোরকে ধরতে পারেন নি।

সম্পাদকের রক্ষে নেই

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী

গল্প হলেও মিথ্যে নয়, বলে যে সব কীর্তিকাহিনী কীর্তিত হয়, আমার এই লেখাটা সেই পর্যায়ের ভেতরে পড়ে যায় কিনা আমি জানি নে; যদিও এই বৃত্তান্তের আগাগোড়াই এক নামকরা লিখিয়ের মুখে শোনা আমার; কিন্তু তাহলেও, ঘটনা হিসেবে হয়ত বা সত্য হলেও, গল্প বলেই এটাকে ধরতে বলব আমি তোমাদের। কেন না, দু'জনা বেশ নামজাদা সম্পাদক এই কাহিনীর মুখ্য নায়করূপে উল্লিখিত—সেই কারণেই আমার এই বারণ।

প্রবাসীর বিশ্ববিশ্রুত সম্পাদক স্বর্গত রামানন্দবাবুর নাম তোমাদের অজানা নয়। কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে নাইতে নেমে একবার তাঁর প্রায় কাশীপ্রাপ্তি হবার মতন হয়েছিল। গঙ্গার অন্তরে কোন্ বিক্ষোভের দরুণ কে জানে, মাঝে মাঝে তার গর্ভে স্রোতের ঘূর্ণীর মতই এক-একটা জায়গায় দেখা দেয় অকস্মাৎ, তার তোড়ের মুখে পড়লে আর রক্ষে নেই। প্রায় অন্তর্জলি হবার মতই হয়ে যায়। স্রোতের টানে তলিয়ে যেতে হয় কিংবা ভেসে যেতে হয় তৎক্ষণাৎ।

দশাশ্বমেধ ঘাটে রামানন্দবাবুরও সেদিন বুঝি প্রায় সেই দশাই ঘটেছিল, ভেসে যাচ্ছিলেন তিনি, এমন সময় অচেনা এক যুবক জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাড়ে টেনে তুলে এনে তাঁকে বাঁচায়।

সকৃতজ্ঞ সম্পাদকমশাই ছেলেটির পরিচয় জানতে চাইলেন। ছেলেটি তাঁর জবাবে বলল—'পরিচয় কী দেব, আমার পরিচয় দেবার মতন কিছু নেই। সাধারণ বাঙালী ঘরের ছেলে আমি, এই আমার পরিচয়।'

'সাধারণ হলেও তুমি সামান্য নও ভাই। পরের প্রাণরক্ষার জন্য যে নিজের জীবন বিপন্ন করে এগোয় সে নিতান্ত সাধারণ নয়, অসাধারণ কিছু একটা করবেই সে একদিন না একদিন। এই যেমন, আজকেই একটা করে বসলে।'

বলে তারপর তিনি নিজের পরিচয় দিলেন—'যদি কখনো কলকাতায় যাও আর আমাকে দিয়ে তোমার কোনো কাজ হয়···আমি তোমার কোনো প্রয়োজনে লাগি যদি তো অসঙ্কোচে আমায় জানিয়ো। এই আমার ঠিকানা।'

রামানন্দবাবুর কথা মিথ্যে হয়নি। তারপরেই, মানে, প্রবাসী সম্পাদকের পরিচয় পাবার পরেই বোধহয়—(প্রবাসী তখন ভারত-বিখ্যাত পত্রিকা—সেই পত্রিকায় কারো লেখা বেরুলেই তখনকার দিনে রাতারাতি নাম হয়ে যেত তার—নজরুল, প্রেমেন, অচিন্ত্য এবং

আরো অনেকে তাঁদের প্রথম লেখা ঐ পত্রিকায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দেশবিখ্যাত হয়েছিলেন) ছেলেটি সত্যিই এক অসাধারণ কীর্তি করে বসল। লম্বা-চওড়া দশাসই এক কবিতা লিখে বসল অকস্মাৎ।

তারপরই সেই কবিতা বগলে করে সে দৌড় দিল কলকাতায়।

সোজা উঠল গিয়ে প্রবাসী কার্যালয়ে।

সম্পাদক মশাই তখন আপিস-ঘরেই বসেছিলেন। চোখ তুলে চাইলেন আগন্তুকের দিকে—'কী চাই আপনার?'

'আজ্ঞে, চিনতে পারছেন না আমাকে? আমি কাশীর সেই যুবক যে আপনাকে সেদিন দশাশ্বমেধ ঘাটে…'

'ওহো! চিনতে পেরেছি। বিলক্ষণ, বোসো বোসো। কী করতে হবে বলো আমায় এবার?'

'আজ্ঞে, আমার এই কবিতাটা আপনি পড়ে দেখুন একবার।'

কবিতাটা হাতে নিয়ে আদ্যোপান্ত মন দিয়ে তিনি পড়লেন, তারপর শুধোলেন—'এটা কি আমার কাগজে ছাপতে হবে নাকি আমাকে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই জন্যেই তো আমি কাশীর থেকে এলাম! ডাকে না পাঠিয়ে এত খরচা করে নিজেই নিয়ে এলাম এটা সটান।'

রামানন্দবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন বেশ। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—'কাশীর ফিরতি গাড়ি ফের কটায়?'

'সন্ধ্যেয় একটা গাড়ি আছে। সেটা মেলট্রেন।··আবার রাত এগারোটাতেও আর একটা প্যাসেঞ্জার··'

'সন্ধ্যেরটাই ভালো। এই নাও টাকা। যাও, দু'খানা ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনে নিয়ে এসো গে।'

'দু'খানা টিকিট?' ছেলেটা একটু অবাক হয় এবার—'দু'খানা কিনে আনব? কেন বলুন তো? দু'খানা টিকিটে কী হবে?'

'আজ সন্ধ্যেয় গাড়িতেই আমরা কাশী পাড়ি দেব কিনা। যাব আবার কাশীতে।'

'কাশীতে যাবো কেন? আমরা দু'জনে একসঙ্গে আবার? আজকেই ফের? এত তাড়াতাড়ি···কেন বলুন তো?' কিছুই বুঝতে না পেরে ছেলেটি বেশ হকচকিয়ে যায়—'আর আমার এই কবিতাটা···? এটার কী হবে? এটা আপনার পছন্দ হয়েছে তো? ছাপচেন তো আপনার প্রবাসীতে?'

'আমার এ কবিতাটা··· ? এটার কি হবে ?'

'না। কাশীতে ফিরে আবার আমি সেই দশাশ্বমেধ ঘাটের কিনারাটায় গিয়ে দাঁড়াব। আর তুমি আমায় ধরে তার পাড় থেকে ধাক্কা মেরে জলে ফেলে দেবে আবার। আমি গঙ্গার স্রোতে ভেসে যেতে চাই। সলিল সমাধিই আমার একমাত্র কাম্য।'

'গঙ্গার স্রোতে ভেসে যাবেন আপনি ? কিন্তু কেন, বলুন তো ?'

'তোমার এই কবিতা' আমার কাগজের জন্য গ্রহণের চেয়ে মৃত্যুবরণ করাই আমি শ্রেয়ঃ বোধ করছি।'

এই ঘটনার অনেক···অনেক দিন পরে, আবার সেই দশাশ্বমেধ ঘাট। এবং আবার আরেক ভারত-বিশ্রুত সম্পাদক ! এবং আবার···আবার সেই হাবুডুবু খাবার পালা !

লেখকরা যেমন অথৈ জলের রেখার ভেতর লেখার দেখা পেয়ে থাকেন, সম্পাদকদেরও তেমনি টেবিলের উপর পুঞ্জীভূত স্তূপীকৃত লেখার সামনে অথৈ জল দেখতে হয়। কিন্তু লেখার সেই জলাঞ্জলি নয়, সত্যিকারের স্রোতের ধারেই জলাঞ্জলি যেতে বসেছিলেন এই ভদ্রলোক। প্রবীণ রামানন্দবাবুর মতই আমাদের এই নবীন সম্পাদক।

হাবুডুবু খাবার পালার থেকে সেই তরুণ সম্পাদককে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁচালেন আবার এক তরুণতর যুবক।

প্রায় সলিল-সমাধির থেকে উঠে সম্পাদক সেই যুবককে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন—'আমার নাম শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক, মাসিক বসুমতীর সম্পাদক আমি।'

'জানি জানি! আর বলতে হবে না।' বলে ওঠে যুবকটি। 'আপনার নাম প্রায় মুখস্ত হয়ে আছে আমার।'

নিজের সম্পাদক-খ্যাতিতে প্রাণতোষ পুলকিত হলেন কিনা কে জানে। কিন্তু একটু অবাক হলেন বোধ হয়, কিন্তু তাহলেও তিনি তাকে বললেন—'যদি আমি আপনার কোনো কাজে লাগি···আপনি আমাকে সলিল-সমাধির থেকে বাঁচিয়েছেন···'

'আপনি! আপনি আমার কী কাজে লাগবেন! না, আপনি আর কী করবেন! আমার যা করবার তা ভালোই করেছেন!'

'মানে যদি কখনো আপনি কলকাতায় যান···' প্রাণতোষ বুঝি রামানন্দবাবুর পুনরুক্তি করতে চান।

'যাব ভেবেছিলাম! কিন্তু তার আর দরকার হবে না। এখানেই তো পেয়ে গেলাম আপনাকে···দেখা পেয়ে গেলাম আপনার···'

'আমার সঙ্গে দেখা করতে কি কলকাতায় যাবার ইচ্ছে ছিল নাকি আপনার?' আবার বুঝি সম্পাদকের প্রাণে একটু পুলক জাগে।

'দেখা করতে? না না···আপনাকে একচোট দেখে নিতেই··যেতে চেয়েছিলাম আমি একবার···'

দেখে নিতেই? কথাটা যেন কেমন বেসুরো লাগে প্রাণতোষের কানে। প্রবাসী বাঙালী বাংলা ভুলে যায় বলে শোনা যায় বটে, কিন্তু তাই বলে কি তা এতখানিই হবে! দেখতে আর দেখে নিতে-র মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য তার পরিমাপ হারিয়ে এমন তালগোল পাকিয়ে বসবে। ধাতু প্রত্যয়ে এমন গোলমাল বাধাবে সে?

'কেন বলুন তো?' জানার কৌতূহল হয় সম্পাদকের।

'কেন শুনবেন? তিন বছরের বেশীই হবে, আপনার পত্রিকায় আমি লেখা পাঠাচ্ছি। নানা ধরনের লেখা···গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, ক্রীড়াকৌতুক, হাস্যরস, নাট্যগুচ্ছ, কালজয়ী উপন্যাস···কী না পাঠিয়েছি! কিন্তু তার একটাও আপনি ছাপালেন না একবারও। পড়ে দেখেছেন কিনা, পড়বার ফুরসৎ পেয়েছেন কিনা তাই বা কে জানে! তা যাই হোক, আর আমি এখন আপনার হাতে নেই, এবার আমিই আপনাকে আমার হাতে পেয়েছি।'

'তার মানে?' ওর কথায় প্রাণতোষের কেমন যেন খটকা লাগে। কথাটা তেমন সুবিধের বলে বোধ হয় না।

'তার মানে···আপনি জানতে চান? মানে, আমি ভেবেছিলাম কোনোদিন আপনার আর ধার ঘেঁষব না। বড় বড় ধারই, কথায় বলে, তিন বছরে তামাদি হয়ে যায়।

আর তিন বছরের বেশি দিন ধরে আপনাকে আমার লেখা পাঠাচ্ছি আমি। আপনার ধার ঘেঁষা আর উচিত হ'ত না আমার। কিন্তু ভগবান যখন দৈবাৎ পাইয়েই দিলেন, আমার ধারে-কাছেই পেয়েছি আপনাকে যখন, তখন আজ আর আপনার রক্ষে নেই···সব ধার আপনার শোধ করব এবার!'

'আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করে এসব কী কথা বলছেন আপনি?'

'এক্ষুনি সেই উদ্ধারের শোধ তুলব—বলছি তো! এই দণ্ডেই! চলুন, যেখান থেকে তুলে এনেছি সেইখানেই ফের ফেলে দিয়ে আসি আবার আপনাকে!'

'অ্যাঁ?' ষণ্ডামার্ক সেই যুবকের কথায় হতভম্ব হতে হয় সম্পাদককে।

'হ্যাঁ। ওই গঙ্গাগর্ভেই বিসর্জন দিয়ে আসব আপনাকে আবার।'

যুবকটি প্রাণতোষকে আত্মবিসর্জনে নিতান্ত পরাঙ্মুখ দেখে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে যাবার জন্যে উন্মুখ। প্রাণতোষ, কোনোরকমে তার হাত পিছলে, ফস্‌কে, ভোঁ করে লম্বা এক দৌড় মারে। 'রক্ষে করুন মশাই! খুব হয়েছে! আর না।'

প্রাণতোষ ঘটকের তরুণ বয়সে কেবল লেখাই নয়, নানান্ স্পোর্টস নিয়েও চেষ্টা চর্চা ছিল বোধ করি, দৌড়ের বাজিও মেরে থাকবেন হয়ত একাধিক বার। তাই, এ বারের বাজিতেও সেই ভগ্নমনোরথ লেখককে হারিয়ে দিয়ে তার পাল্লার থেকে সুদূরপরাহত হয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাতে পেরেছিলেন কোনো গতিকে—সেযাত্রায়!

তোতার ওজর

বিশ্বপ্রিয়

ছোট মেয়ে তোতা :

বাবা বলেন—দেখতে ভালই
নাকটা শুধু ভোঁতা।
তাই তোতা ভোর থেকে—
আয়নাতে মুখ দেখে
সাঁঝের বেলা শুধায় মাকে—
খুঁতটা আমার কোথা?

বরং দিদি মোনা :

কথার ধরন কেমন তার,
সুরটা খোনা খোনা।
মা শুনে কন—তাইতো
তোমার সেরা নাইতো,
গুণের নিধি তুমিই আমার,
যেন নিখাদ সোনা!

এক

অনেক রাতে বাজনার মতন মিষ্টি একটা শব্দ উঠল। প্রথমে আস্তে, পরে জোরে, তারপর আরও জোরে। সেই শব্দে পাপিয়ার ঘুম ভেঙে গেল।

পায়ের দিকের জানালা এখনো খোলা। শোবার সময় মা বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন—

পাপিয়া আর কোয়েলী তখন একসঙ্গে কেঁদে উঠেছিল, "না না না, জানলা বন্ধ করলে গরম লাগে, পাখা চললেও ঘাম হয়—" এমন চিৎকার করে ওরা দু'জন মা-কে জানলা বন্ধ করতে দেয়নি।

মা রেগে গিয়ে বলেছিলেন, "খালি জেদ আর জেদ! ভূত এসে যখন জানলা দিয়ে লম্বা হাত বাড়াবে—কী করবি তখন?"

কোয়েলী বলেছিল, "আমরা দুষ্টুমি করিনি তো মা, ভূত কেন আসবে? ভূত এলে আমি খুব জোরে তার হাতে চিমটি কেটে দেব—"

মা হেসে ফেলেছিলেন, "খুব সাহস হয়েছে যে তোর!"

অনেক রাতে মিষ্টি বাজনার শব্দে হঠাৎ জেগে উঠে এই সব কথা পাপিয়ার মনে পড়ল। ও একবার ভাবল, খুব আস্তে, খসখস করে মশারী সরিয়ে সকাল কিংবা দুপুরের মতন খাট থেকে পা বাড়িয়ে জানালায় গিয়ে দাঁড়ায়। তখনো টুংটাং শব্দ হচ্ছে আর কে যেন গান গাইছে। পাপিয়া ঘুঙুরের মতন ঝুমুর ঝুমুর আওয়াজও শুনতে পাচ্ছিল।

এত রাতে পাপিয়ার একা-একা জানলায় গিয়ে দাঁড়াতে সাহস হ'ল না। মা যেমন বলেছিলেন ঘুমবার আগে—যদি ভূত এসে লম্বা হাত বাড়ায়—পাপিয়া তো আর কোয়েলীর মতন অমন চিমটি কাটতে পারে না। সে কিছু সময় চুপচাপ বসে বাজনার মিষ্টি শব্দ শুনতে থাকল।

এখন বাইরে খুব জোরে হাওয়া বইছে। মা জেগে থাকলে ঠিক পাখা বন্ধ করে দিতেন। পাপিয়া আপন মনেই হাসল। মার সব সময় ভয়, ঠাণ্ডা লাগবে, সর্দি হবে, জ্বর হবে। আর পাখা না চললে যে গরম লাগে—কষ্ট হয়! মা সে সব শোনেন না।

হাওয়ায় জানালার পর্দা এক-একবার সরে যাচ্ছিল। পুলিস মাঠের সব চেয়ে লম্বা ঝাউ গাছের অনেক ওপরে খুব বড় চাঁদ ঝলমল করছে। চিকচিক করছে চারপাশ। রাস্তায় একটা মানুষ নেই, কোন গাড়ির শব্দ নেই। কী চুপচাপ! ভূত না, এমন সময় পরীরা আসে।

খাটে বসে থাকতে আর ভাল লাগল না পাপিয়ার। বাইরের ঘর থেকেই নাচ আর গানের শব্দ আসছে যেন। চাঁদের রুপোলী আলোয় পুলিস মাঠে লম্বা ঝাউ গাছের দিকে তাকিয়ে পাপিয়া ভাবল, ওই গাছ থেকেই হঠাৎ এক সময় পরীরা নেমে এসেছে চুপে চুপে। ওরা রোজই হয়তো এমন করেই পাপিয়া আর কোয়েলী ঘুমিয়ে পড়বার পর আকাশ থেকে নামে গাছের মাথায়, তারপর লুকিয়ে-লুকিয়ে এখানে আসে। সকলে ঘুমিয়ে থাকে বলে কেউ তাদের দেখতে পায় না—ধরতে পারে না।

আজ পাপিয়া জেগে উঠেছে—সে এক্ষুনি পাশের ঘরে গিয়ে পরীদের দেখবে, তারপর সব দরজা-জানালা বন্ধ করে তাদের ধরবে। পরে মা জেগে উঠলে পুতুলের আলমারীর চাবি চেয়ে নিয়ে সাদা লাল নীল সবুজ হলদে—সব পরীদের সাজিয়ে রাখবে এক-একটি পুতুলের পাশে।

"কোয়েলী?" পাপিয়া খুব আস্তে ডাকল।

বুড়ো আঙুল মুখে দিয়ে ঘুমিয়ে আছে কোয়েলী। মার একটা হাত তার গায়ের ওপর। মা জেগে উঠলেই মুশকিল। এত রাতে ওদের কিছুতেই ঘর থেকে বার হতে দেবেন না। খুব বকবেন।

পাপিয়া খুব সাবধানে মা-র হাত কোয়েলীর গায়ের ওপর থেকে সরিয়ে দিল, তার কানের কাছে মুখ এনে আবার ডাকল, "কোয়েলী, এই কোয়েলী—"

শব্দ করে আঙুল চুষতে চুষতে কোয়েলী এবার চোখ পিটপিট করে পাপিয়াকে দেখে বলল, "উ?"

"শীগগির ওঠ, আমরা বাইরে যাব এক্ষুনি—"

"কোথায়, কোথায় ?" মুখ থেকে আঙুল বের করে নিল কোয়েলী, গোল-গোল চোখ মেলে অবাক হয়ে পাপিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকল।

"শুনতে পাচ্ছিস না ?"

"হুঁ।"

"বাইরের ঘরে পরীরা এসেছে, ধরব—"

পরীদের নাম শুনেই উঠে বসল কোয়েলী। মা-র গায়ের ওপর দিয়ে গড়িয়ে মশারীর কাছে চলে এসে বলল, "আমি পরীদের চিমটি কাটব—"

"এই না, কখখনো না, ওদের ধরব।"

কোয়েলী খাট থেকে নেমে খিল খোলবার জন্যে ততক্ষণে বেতের ছোট চেয়ার দরজার কাছে টেনে এনেছে। ও ছোট্ট মানুষ, চেয়ারের ওপর উঠে না দাঁড়ালে দরজা খুলতে পারে না। কিন্তু কী বোকা কোয়েলীটা! এত শব্দ করে কেউ চেয়ার টানে। পাপিয়ার বড় রাগ হল ওর ওপর। একটু শব্দ হলেই বাবার ঘুম ভেঙে যায়।

বাবা ঘুমচ্ছেন জড়োসড়ো হয়ে পাপিয়ার পাশেই। বাবার গালের ওপর হাত রাখল পাপিয়া—ঝুঁকে পড়ে তার মুখ দেখল। বাবার ঘুম ভাঙিয়ে তাকেও সঙ্গে নিয়ে গেলে কেমন হয়। পাপিয়ার সব কথা শোনেন বাবা। সে ডাকলে মা-কে না জানিয়ে তিনি ঠিক যাবেন।

"পুপু দিদি," দরজা খুলে পাপিয়াকে ডাকল কোয়েলী, "আয়।" তরতর করে মশারীর বাইরে এল পাপিয়া, কোয়েলীর পাশে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, "বাবাকে ডাকব ?"

ঘরের বাইরে অন্ধকার বারান্দা। বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। তার রেখা এসে পড়েছে ভিতরের দিকের সরু বারান্দায়। পাপিয়ার কথা কোয়েলী শুনতে পেল না। তখন খুব জোরে-জোরে বাজনা বাজছে সার্কাসের মতন। কোয়েলী আস্তে আস্তে বাবার ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, পাপিয়া ভয় পেয়ে তার হাত টেনে রাখল।

"পুপু দিদি, ছেড়ে দে—"

"যাস না কোয়েলী।"

"আমি যাবই।"

"যদি পরী না হয়ে ওরা ভূত হয় ?"

"কোয়েলী মাটিতে পা ঠুকল, তারপর পাপিয়াকে বাবার ঘরের দিকে জোর করে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, "ভূত হলে এমন চিমটি কাটব—"

(ক্রমশঃ)
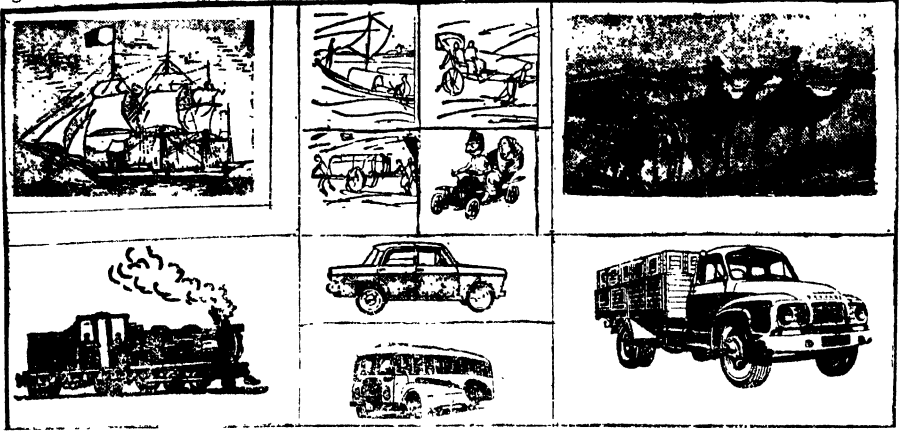
নানা ধরনের যানবাহন

যানবাহনের কথা

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত

'চল যাই', 'চল দিন কতক কোথাও বেড়িয়ে আসি'—এ কথা আমরা হামেশাই বলে থাকি। বলি, চল আগ্রার তাজমহল দেখে আসি, চল ভূস্বর্গ কাশ্মীর ঘুরে আসি, কিংবা পুরীর সমুদ্র বা দার্জিলিং-এ গিয়ে কাঞ্চনজংঘা দেখে আসি।

কথাটা নতুন না, এবং এতে আশ্চর্য হবারও কিছু নেই। বাস্তবিক চুপচাপ কেবল বাড়ি বসে থাকা তো আর চলে না? নিদেনপক্ষে হাট-বাজার, অফিস-কাছারি, স্কুল-কলেজ কাজে-কর্মে রোজ কোথাও না কোথাও আমাদের প্রত্যেককেই যাতায়াত করতে হয়। দূর দেশে ভ্রমণের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

কিন্তু আমাদের এই চলে-ফিরে বেড়াবার, দেশ ভ্রমণের উপায়টা কি? যানবাহনের কী ব্যবস্থা?

আমরা ধারে-কাছে চলে বেড়াই পায়ে হেঁটে হেঁটে। কিন্তু দূর পাল্লার পথ যেতে হলে?

স্থলপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা হ'ল সাইকেল, মোটর গাড়ি, বাস এবং রেল গাড়ি; জলপথে যাই নৌকো, স্টিমার জাহাজে করে। আর আকাশ-পথের বাহন হ'ল এরোপ্লেন। এ তোমাদের জানা কথা। আগেকার দিনে এত যানবাহনের কথা লোকে স্বপ্নেও ভাবতে পারত না। এ সব তো হাল আমলের আবিষ্কার।

অতীতে ভ্রমণ করাটা ছিল বড় কঠিন ব্যাপার। লোকে পায়ে চলত—পায়ে হেঁটে

হেঁটে—দূরেই হোক, কাছেই হোক। এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। পুরাকালের কথা ছেড়ে দাও। এই শ'দেড়েক বছর আগেও বিদ্যাসাগর মশায় মেদিনীপুরের ঐ বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছিলেন হেঁটে হেঁটে। তখনও আমাদের দেশে রেলগাড়ির চলন হয়নি।

সে কালে মালপত্র বয়ে নিতে হ'ত কাঁধে করে।

ছেলেবেলায় পাড়াগাঁয়ে দেখেছি পালকি, ডুলির ব্যবহার। বেহারারা কাঁধে করে বয়ে নিত ঐ ডুলি-পালকি। হাসি-খুশী বইয়ে পড়েছ নিশ্চয়—ডুলি কাঁধে বেহারা যায়। বিয়ের বর-কনে নিয়ে যাওয়া হ'ত ডুলি বা পালকি করে। আমাদের দেশের জমিদারবাবুর পালকি বয়ে নিত আটজন বেহারায়। দূর থেকে শব্দ ভেসে আসত হুম্ হুম্, হুম্ হুম্। ঐ আওয়াজটা বের হ'ত বেহারাদের মুখ থেকে। শব্দ শুনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সব ছুটে যেত বড় রাস্তার মোড়ে পালকি ও তার আরোহীকে দেখতে। সেকালে কলকাতা শহরেও পালকির চলন ছিল। ১৮৯০ সালে এই কলকাতা শহরে পালকি ছিল ৬০৬ খানা আর বেহারর সংখ্যা ছিল ১৬১৪।

গ্রাম্য-পথে যাতায়াতের ব্যবস্থা হিসাবে ঘোড়র ব্যবহার চলতি ছিল এককালে। আমাদের গ্রামের ডাক্তারবাবু গ্রামে গ্রামে রোগী দেখতে যেতেন ঘোড়ার পিঠে চড়ে। আবার হাতির পিঠে চড়েও লোকে চলাফেরা করত। হাতির পিঠে থাকত হাওদা। মালপত্রও চাপান হ'ত হাতি বা ঘোড়ার পিঠে। কিন্তু সকলেরই তো আর হাতি ঘোড়া ছিল না? বেশীর ভাগ লোককেই চলতে হ'ত পায়ে হেঁটে।

আর ছিল গরুর গাড়ি। উপরে ছাউনি দেওয়া। গরুর গাড়ির গতি বড় মন্থর, ধীর। অবশ্য গ্রামাঞ্চলে গরুর গাড়িতে করে এখনও লোকে যাতায়াত করে থাকে।

আসল কথা তখন ভ্রমণ ব্যাপারটা মোটেই সহজ ছিল না। যাতায়াত, মালপত্র বয়ে নেওয়া বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। এভাবে কেটেছে বহুযুগ।

তারপর সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার হতে লাগল—লোকের উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ হতে লাগল। সৃষ্টি হ'ল নতুন নতুন নানা ধরনের যানবাহন। এল রেল গাড়ি আর ষ্টিমারে, এল সাইকেল, মোটর গাড়ি, ট্রাম, এল এরোপ্লেন। একে একে এসে গেল সব কিছু। সেই সংগে এল ভ্রমণের আনন্দ আর আরাম। খুব সহজসাধ্য হয়ে গেল ভ্রমণ করা।

তাই দেখ, আজকাল আমাদের জীবন-যাত্রা প্রণালীর কত পরিবর্তন হয়েছে। যাতায়াতের ব্যবস্থাদি বদলে গেছে, আর সেই সংগে মালপত্র বয়ে নেবার ব্যবস্থাও।
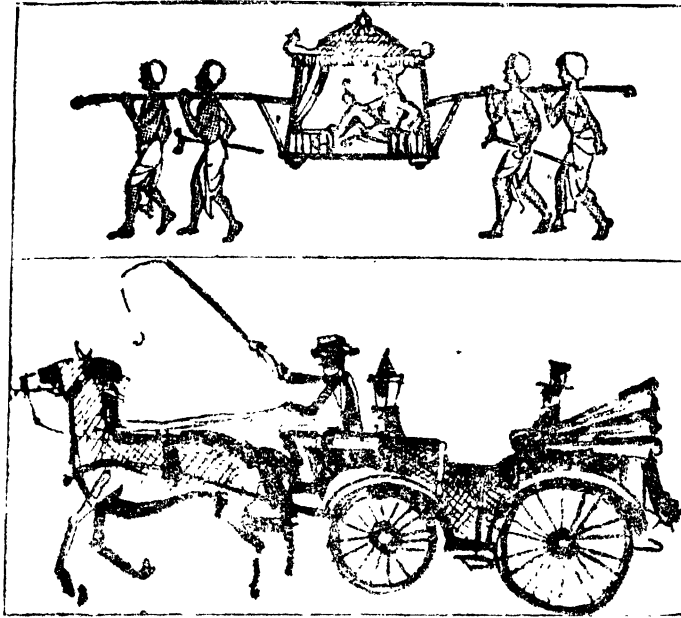
প্রাচীন ধরনের দুটি যানবাহন—পালকি আর ঘোড়ায়-টানা ল্যাণ্ডো গাড়ি

সাইকেল তো যেন অহরহই দেখছ পথে-ঘাটে। তোমরা নিজেরাই তো যখন-তখন সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ছ।

তা ছাড়া হচ্ছে রিক্সা—মানুষ টানা রিক্সা। আজকাল আবার সাইকেল-রিক্সারও খুব চল। আমি যে অঞ্চলে বাস করি সেখানে সাইকেল রিক্সাই প্রধান বাহন।

এককালে কলকাতা শহরে ঘোড়ার গাড়ির চলন ছিল প্রচুর। হরেক রকমের গাড়ি—ছ্যাকড়া, ফিটন, ল্যাণ্ডো, ব্রুহাম। ল্যাণ্ডো ইত্যাদি সব ঘোড়ায়-টানা গাড়ি। ছ্যাকড়া গাড়ির ভেতরে বসত যাত্রীরা ঠাসাঠাসি করে, আর ছাতে মালপত্র। আজকাল এ শহরে ঘোড়ার গাড়ি বড় একটা দেখাই যায় না। তবে অন্য রাজ্যে এখনও এক ধরনের ঘোড়ায় টানা গাড়ি দেখা যায়, তাকে বলা হয় টাঙা।

ট্রাম, মোটর গাড়ি, বাস, লরি—এ সবে তো তোমরা দেখতে অভ্যস্ত। রুশ দেশে অথবা বরফের দেশে আছে কুকুরে টানা গাড়ি; তাকে বলে স্লেজ। মরুভূমির দেশে লোক চলে উটের পিঠে চড়ে!

জলপথে ভ্রমণ করতে চাও! তবে রয়েছে নৌকো, স্টিমার, জাহাজ ইত্যাদি। নৌকো চলে খালে, বিলে, ছোট নদীতে। পাড়াগাঁয়ে বর্ষাকালে নৌকা ছাড়া চলাফেরা কষ্টসাধ্য। গ্রামে পথ-ঘাটের অবস্থা তো ভাল নয়? হাটে গঞ্জে যেতে হয় নৌকো করে, সালতি চড়ে। আর দূর পাল্লার পথে বা বিদেশে জলপথে যেতে হলে জাহাজ ছাড়া গতি নেই। জাহাজ ভাসে সাগরজলে।

কেবল ভ্রমণ করাই নয়, আমরা মালপত্রও এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে থাকি এইসব যানে করে। পুরাকালে ভারী জিনিসপত্র লোকে বয়ে নিত মাথায় বা কাঁধে করে, কিংবা ঠেলে ঠেলে। এমনকি আজও পৃথিবীর কোন কোন স্থানে এই ব্যবস্থা রয়েছে। পরবর্তীকালে একাজে ব্যবহৃত হয়েছে বলদ, গাধা, ঘোড়া প্রভৃতি প্রাণী। ধোবা কাপড়ের বোঝা গাধার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এ দৃশ্য এখনো চোখে পড়ে। আর অশ্বতর? প্রথম মহাযুদ্ধের কালে এই জীব সৈন্যদের রসদ বয়ে নেবার কাছে লেগেছিল।

কিন্তু যেদিন থেকে চাকার প্রচলন হ'ল, সেদিন আগেকার সব ব্যবস্থা গেল পাল্টে। চলন হ'ল ঠেলা-গাড়ির, সহজ হয়ে গেল মালপত্র বয়ে নেবার ব্যবস্থা।

প্রথমে চাকাটা ছিল ভারী, চেহারা বা গড়নটাও তার ভাল ছিল না। চলন ছিল গড়িমসি। অনেক মাথা-খাটানো ও কসরতের পরে লোকে উন্নত ধরনের চাকা তৈরী করতে শিখল; তার চেহারা যেমন ভাল হ'ল, গড়নও তেমনি হাল্কা। ক্রমে ক্রমে মোটর গাড়ির চাকা তৈরীর কৌশলটাও লোকে আয়ত্ত করে ফেলল এবং সেই সংগে এসে গেল নিরাপত্তা, দ্রুতগতি, আরাম।

আচ্ছা, মিশরীরা কি করে অত উঁচু উঁচু পিরামিডগুলি তৈরী করেছিল? চাকার ব্যবহার তারা জানত। তাই চাকাওলা ক্রেনও ছিল। সে যুগের চাকা ছিল চামড়া দিয়ে মোড়া। ক্রেন চালানোর উপযোগী শক্তিশালী ইঞ্জিন নিশ্চয়ই তাদের ছিল, নতুবা ও কাজ সম্ভব হয়েছিল কিরূপে? বুদ্ধি আর বাহুবল ছিল তাদের সম্বল।

অনেককাল পরে আরো উন্নত ধরনের চাকা তৈরী করল গ্রীক ও রোমানরা। গাড়ীর চাকায় তারা নানা সাজসজ্জা ব্যবহার করত।

আকাশ-পথে ভ্রমণ এরোপ্লেনে। এটা এরোপ্লেনের যুগ।

তোমরা শুনে থাকবে যে, পৃথিবীটা আজকাল ছোট হয়ে গেছে। তার অর্থ এই যে, এখন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে সময় লাগে কম। আগে যেখানে লাগত একমাস, এরোপ্লেনের দৌলতে সেখানে এখন লাগে একদিন। কোন দূর দেশই আজকাল আর দূর বলে মনে হয় না। তাছাড়া ভ্রমণের হাঙ্গামাও ঢের কম।

যানবাহনে যখন আনবিক শক্তি ব্যবহৃত হবে, তখন ভ্রমণের ব্যাপারটা আরো সহজ হয়ে যাবে।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বল্‌ল, "ক্যা মাঙ্গটা ? (কি চাও ?)।"

সেনাপতি সেলাম করে বলল, "দেখ্‌তে মাঙ্গতা।"

তখন তাদের সঙ্গে করে দেখাবার লোক নেই। কাপ্তান বল্‌ল, "কম্‌ অন্‌ ঠার্‌স্‌ ডে। (বেস্পতিবার এসো)।"

মোটা সাহেব, তার মুখে চুরুট। কোলা ব্যাঙের মত গলার আওয়াজ। ওরা শুন্‌ল সাহেব বল্‌ল, কামান ঠাস্‌ছে!

আর ঘাবড়ে গেল। বাস্‌ রে—কামান ঠাস্‌ছে! হয়ত এক্ষুনি গুড়ম করে গুলি ছাড়বে। কামানের মুখ কোন্‌ দিকে ঘোরান কে জানে? যদি এদিকে হয়, ওরা উড়ে যাবে! এক্ষুনি না পালালে রক্ষা নাই!—

চোখে চোখে তাদের কথা হয়ে গেল। তারপর দে ছুট।

ক'দিন ঘুরে-ফিরে তাদের সাহস বেড়েছে। তাই আর দিনের বেলা তারা গাঁট-ছড়া বাঁধেনি।

তারা ছোটে। আর সাহেব বলে, "ক্যা হোটা,—হোয়াট ? (কি হচ্ছে ?) বয়, বয়, হ্যালো (বালক, শোন)।"

আর ওরা শোনে, সাহেব বল্‌ছে,—ফুট ফাট। ভয়, ভয়, পালাও!

"ওরে বাবা রে, গেলাম রে—" বলে, ছুটে ওরা ঝুপ ঝুপ্ করে পড়ল জলে। ভাগ্যি সাঁতার জানে। হাবুডুবু খেয়ে ডাঙায় ওঠে, তারপর উল্টো দিকে ছোটে।

হঠাৎ সামনে একটা লরির চাকা ফেটে যায়। ঠাস্ করে শব্দ হয়,—আর বিষম ত্রাসে তারা উর্ধ্বশ্বাসে ছোটে। লুটোপুটি খেয়ে গা কেটে ছড়ে যায়।

বাড়ী ফিরে তারা অনেকখানি নুন খায়, আর ভাবে খালি কপাল-গুণে বেঁচে গেছে।

পরের দিন বাড়ীর সবাই মিলে চিড়িয়াখানা দেখতে যায়।

এ নাম শুনে রাজা প্রথম ভেবেছিল, চিড়েখানা। সেখানে চিড়ে আছে। যারা যায় সস্তায় কিনে আনে, আর মোয়া, নাড়ু বানিয়ে খায়। কিন্তু গিয়ে দেখে কিছু না। আসলে তা হ'ল গিয়ে—চিড়িয়াখানা, অর্থাৎ পাখীর আস্তানা। সবাই তাদের খাবার জন্য কিছু কিনে নেয়। তারাও কিন্‌ল। ভেতরে ঢুকে দেখে মিছে কথা নয়। বিস্তর পাখী আছে, আর জানোয়ারও আছে।

রাজা খুসী হয়। পাখী দেখতে এসে জানোয়ার দেখা যায়। অথচ তার জন্য আলাদা টিকেট কিনতে হয় না!

তারা ঘুরে ঘুরে নানা পাখী, পশু দেখে। তারপর একটা প্রকাণ্ড খাঁচার কাছে দাঁড়ায়। ডুরাই কম্বল গায়ে দিয়ে ভেতরে কে শুয়েছিল।

রাজা বলে, "কি দাদু, গরমে কম্বল গায়ে শুয়ে কেন? ম্যালেরিয়া জ্বর? কুইনিন খাও। কি খেয়েছ? ভাজা-ভুজি খাবে?"

সে খাঁচার মধ্যে হাত বাড়িয়ে খাবার ঠোঙা ধরে। ভাবে, জ্বরের মুখে ভাল লাগবে। সে উঠে এসে খাবে।

সে সত্যই উঠল। পিট পিট করে দেখল। তারপর না-বলা না-কওয়া এক লাফ! ভাগ্যি "বাপ" বলে রাজা হাত সরাতে পেরেছিল। নৈলে দফারফা হ'ত। সেনাপতি বলে, ওটা বাঘ। ঠাট্টা শুনে রেগে গাঁট্টা দিত।

তখন মহারাজা অন্য খাঁচার কাছে যায়। জানোয়ারটা একমুখ চুল দাড়ি নিয়ে বসেছিল। গেরুয়া রং।

রাজা বলে, "তোমার নাম কি দাদু? একমুখ চুল দাড়ি। কামাও না। নাপিত পাও না?"

জানোয়ারটা গ্রাহ্যই করে না। উত্তর দেয় না।

রাজা বলে, "গামছা হারিয়েছ? সে দাম তোলার জন্য নাপিতের পয়সা বাঁচাচ্ছ?"

তবু উত্তর নেই। তখন রাজা বলে, "সাধু হয়েছ?

তবু সে কথা কয় না। কেশরের গরবে কেশরী গম্ভীর!

সেনাপতি বলে, "এ হ'ল গিয়ে সিংহ,—পশুর রাজা।"

রাজা বলে, "তুমি না হয় পশুর রাজা সিংহ! আমিও রাজা। আমার বাপ মহারাজ মা মহারানী।"

সিংহ কান-ই দেয় না। তখন রাজা বলে, "ইশ ভারী ফুটানী তো!" সে বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের কনুই রাখে। তারপর আঙুলগুলো সাপের ফনার মত দুলিয়ে বলে, "বক দেখেছ?"

সিংহ গ্রাহ্যই করে না। বনে থাকতে সে নানা পশু মেরে মাংস খেত। তখন তার পাতের মাংস আর হাড় খেতে অনেক শকুন আস্‌ত। কাজেই সে বক কেন, শকুনও দেখেছে। রাজার কথা শুনে অবাক হবার কিছু নেই। সিংহ মুখ ফেরাল।

তখন রাজা ও সেনাপতি তাকে ছেড়ে চলল। বেলা পড়ে এসেছিল। আর সবাই ধীরে-সুস্থে গেটের দিকে চলেছে। রাজা সেনাপতিকে নিয়ে এক মুখপোড়া বাঁদরের সঙ্গে খানিক বাঁদরামী করল। তারপর হেসে গলে হেঁটে চল্‌ল।

কিন্তু হঠাৎ মস্ত বড় শকুনের মত একটা কালো কুচ্ছিৎ চেহারার জানোয়ার তাদের পথ আগলে দাঁড়াল। ছোট্ট মাথা, সরু লম্বা ঘাড়, কুৎকুতে চোখ, আর বাঁকা নাক। পাখা ছড়ান। জানোয়ারটা মানুষের মত অট্টহাসি হেসে বল্‌ল,—

"—শকুনি আমার নাম। আসলে রাক্কোস,
লঙ্কা থেকে আসিলাম, কুটুম খোক্কোস।
হাতি খাই, ঘোড়া খাই, সিংহ ও গণ্ডার,
রাজা খাই, মন্ত্রী খাই, সেনাপতি ছার!
পেলুম, হালুম করে ধরে আজ খাই,
লঙ্কার রাক্কোস আমি, আর রক্ষা নাই!—"

সত্যি রক্ষা নাই! রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি খায়! চিড়িয়াখানায় ওরা রাক্ষসও পোষে! তার একটা বেরিয়ে এসেছে, না ছেলেধরা ঐ সাজে এসেছে কে জানে? কিন্তু রক্ষা নাই তা জানা কথা। তাদের কান্না পায়। দুনিয়া ভুলে গিয়ে ছোটে। পেছনে চায় না।

খানিক পরে টের পায় সেটা দূরে হি হি করে হাসছে। দস্তুরমত মানুষের হাসি।

তখন রাজা হাঁফ ছাড়ে। সবার সঙ্গে দেখা হতে তাদের মাঝে গিয়ে দাঁড়ায়। মনে মনে চিড়িয়াখানার দোরে গড় করে। ভাবে, রাবনরাজা খালি স্বর্গের সিঁড়িই পাঠায় নি।

রামের হাতে মরে তার ইষ্টিগোষ্ঠীর যারা যারা স্বর্গে গিয়েছিল, তাদেরও পাঠিয়েছে! খালি গঙ্গাচানের-পুণ্যে সে এ যাত্রা বেঁচে গিয়েছে! বোঝে না, আসলে ওটা পাগল,— জানোয়ার বা রাক্ষস নয়। কি করে চিড়িয়াখানায় ঢুকে তালগোল লাগিয়েছে!

দেশে ফেরার আগে তারা কালীঘাট, পরেশনাথের মন্দির ও দক্ষিণেশ্বর দেখল। তারপর দেখল জাদুঘর। আহ্লাদী জল্লাদী মুখ কুঁচকে বল্লে, "জাদু নেই, ভোজবাজি নেই, অথচ নাম জাদুঘর। আহারে!"

তারপর থিয়েটার, সিনেমা দেখার প্রোগ্রাম হয়। দেশে-গাঁয়ে তো সেই তরজা, কবি আর যাত্রাগান। শহরে এসে তা না দেখলে মান রইল কৈ!

তারা গাঁটছড়া বেঁধে ঠিকিট কেটে এক সারিতে বসতে চায়। কিন্তু মেয়েদের স্থান ওপরে শুনে মহারাজা আপত্তি করে, "পুরুষ নিচে আর মেয়েরা ওপরে। এ যে একেবারে উল্টো পুরাণ। দেশে-গাঁয়ে তো এমনটি নেই। সহরে এসে টিকিট কেটে মান খোয়াব!"

থিয়েটারের লোকেরা জানায়, "শহরে এই নিয়ম।" বিদেশ বিভূঁয়ে কি আর করা? অগত্যা গাঁটছড়া খুলে মেয়েদের ওপরে পাঠায়। মহারাজা আর রাজা পাশাপাশি বসে।

মেঘনাদ বধ পালা। কনসার্ট বেজে ওঠে। মহারাজা ওপরের দিকে চেয়ে বলে, "মহারাণী, মেঘনাদ বধ পালাগান হবে। স্বগ্‌গের সিড়ির রাবণ রাজার কথা—তার পুত্র ইন্দ্রজিৎ,—যে দেবতার রাজা ইন্দ্রকে চিৎ করেছিল,—তার আরেক নাম হ'ল গিয়ে মেঘনাদ। বুঝলে?"

(ক্রমশঃ)

বৈশাখ

শ্রীআশীষকুমার গুপ্ত

বৈশাখ দিলো ডাক চিত্তে আজি
দিলো তার উপহার বিত্তরাজি।
প্রচণ্ড খরতায় দগ্ধ মরু
নিষ্ঠুর রৌদ্রে যে শুষ্ক তরু।
ওরে তোরা জল আন ঢাল রে বারি
একবার দেখা যাক্ জিতি কি হারি।

জীবন শুকায়ে যদি হয় রে মরু
আমরা ফোটাবো ফুল বাঁচাবো তরু।
মেঘের আড়ালে যদি রৌদ্র হাসে
আমরা দাঁড়াবো গিয়ে তাহার পাশে।
বৈশাখ দেয় ডাক চিত্তে আজি
লব তার উপহার বিত্তরাজি।

উরাসিমো টারো

(জাপানী উপকথা)

শ্রীপ্রমোদ মুখোপাধ্যায়

অনেককাল আগে জাপানে সমুদ্রের ধারে উরাসিমো টারো নামে এক জেলে বাস করতো। একদিন সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেড়াতে সে একটা ঘটনার সম্মুখীন হলো। সে দেখলো যে একটা কচ্ছপ ধরে ছেলেরা তাকে লাঠিপেটা করছে।

উরাসিমো টারোর মনটা ছিল খুব নরম। কাউকে অত্যাচারিত হতে দেখলে তার বুকের ভেতরটা কেমন করতো। যারা অত্যাচার করতো তাদের প্রতি তার জন্মাতো ঘৃণা আর অত্যাচারিতের প্রতি অসীম সহানুভূতি তাই এ ঘটনা দেখে সে বললো, "খোকারা, কচ্ছপটাকে ছেড়ে দাও। এই প্রাণী কারো ক্ষতি কখনো করে না, তাই প্রতি নিষ্ঠুর হওয়ার মানে হয় না। সমুদ্রের জলে একে তোমরা ছেড়ে দাও।"

ছেলেরা তার কথা শুনে লজ্জা পেলো। তারা সমুদ্রের জলে কচ্ছপটাকে ছেড়ে দিয়ে দেখলো, সুখে সাঁতরাতে সাঁতরাতে সেটা দূরে চলে গেল।

অনেক দিন পরে সমুদ্রের ধারে সে একা একা বেড়াচ্ছে এমন সময় শুনতে পেলে, "টারো টারো" বলে কে যেন ডাকছে। চারদিকে তাকিয়ে দেখেও সে কাউকে দেখতে পেলে না।

"কে আমায় ডাকছো"—টারো চীৎকার করে বললো। সমুদ্দুরের অতল থেকে আওয়াজ এলো, "এই যে আমি।" টারো তাকিয়ে দেখলো একটা কচ্ছপ আস্তে আস্তে তীরের বালির উপরে উঠে আসছে। কচ্ছপ বললো, বন্ধু, মনে নেই, আমাকে সেদিন তুমি বাঁচিয়েছিলে। তোমার জন্যেই আমি সমুদ্রের তলায় প্রাসাদে নিরাপদে ফিরতে পেরেছিলুম। তারপর আমি সাগর-রাজকুমারীর কাছে আমার জীবনদাতার গল্প করেছি। কি ভাবে তুমি আমায় বাঁচিয়েছিলে সব ঘটনা খুলে বলেছি। তোমার কাহিনী শুনে সাগর রাজকুমারী খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন। তিনি আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাঁর কাছে তোমায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে।"

টারো খুশি হয়ে বললো, "সব সময়েই আমার মনে সমুদ্রের তলদেশ দেখার কৌতূহল ছিল।" তাই সে কচ্ছপের পিঠে একলাফে উঠে বসলো আর কচ্ছপ তাকে খুব দ্রুতগতিতে নিয়ে চললো সমুদ্রের অতলে সাগর-রাজকুমারীর বিরাট রাজপ্রাসাদে।

রাজপ্রাসাদ এত সুন্দর দেখতে টারো তা আগে কল্পনাও করতে পারেনি। এই রাজপ্রাসাদের রাজকুমারীকে দেখতে তার চেয়েও ঢের সুন্দর। সাগর-রাজকুমারী বললো, "টারো, আমার প্রজাদের প্রতি তুমি খুব সদয়। তোমাকে আমি কি ভাবে কৃতজ্ঞতা

জানাবো ভেবে পাইনি, তাই তোমাকে এখানে নিমন্ত্রণ করে আনলুম। আমার বন্ধু হয়ে চিরকাল তুমি এখানে বসবাস করো এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। তোমাকে পেয়ে আমরা সকলেই খুব খুশি। তোমার যা ইচ্ছে, আমার প্রজারা তোমার হুকুম মতো এনে হাজির করবে।”

টারো তাই সেই প্রাসাদে সাগর রাজকুমারীর কাছে থেকে গেল। তার খিদে পেলে রাশি রাশি সুখাদ্য টেবিলে এনে হাজির করে পরিচারকেরা। চতুর্দিকের ঐশ্বর্য আড়ম্বর দেখে প্রথম প্রথম সে খুব খোশমেজাজে দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু দিন কয়েক পরে তার মনের অদ্ভুত পরিবর্তন হতে লাগলো। নিজের বাড়ী, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত পরিবেশের কথা ভেবে তার মন খারাপ হলো। বাবা-মার কথা ভেবে মস্ত দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার বুকের ভিতর থেকে।

অনেক ভেবে-চিন্তে অবশেষে একদিন টারো সাগর-রাজকুমারীর কাছে বাড়ী ফেরার কথা পাড়লে। সে বললো, “রাজকুমারী, এখানে অনেক দিন আদর-যত্নে তো বেশ সুখেই কাটলো, কিন্তু এবার কয়েক দিনের জন্যে বাড়ী ফিরতে ইচ্ছে করছে। বাবা-মা, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করার জন্যে প্রাণ আনচান করছে। তাদের সঙ্গে দেখা করেই আমি কয়েক দিনের মধ্যে ফিরে আসবো। আমায় দিনকয়েকের জন্যে বাড়ী যাওয়ার অনুমতি দাও।”

“ঠিক আছে, তাই হবে টারো”—সাগর-রাজকুমারী বললো, “তোমার যাওয়ার ইচ্ছে হয়ে থাকলে আমি বাধা দেব না, কিন্তু তোমায় ছাড়তে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমরা দু'জনে এখানে বেশ সুখে ছিলাম। যাচ্ছ যদি, এখানকার এই স্মৃতিচিহ্ন সঙ্গে নিয়ে যাও”—এই বলে সাগর-রাজকুমারী তার হাতে সুন্দর একটা বাক্স তুলে দিলেন আর বলে দিলেন, “দেখো টারো, যতদিন এই বাক্স তোমার হাতে থাকবে, তুমি এর জোরেই সমুদ্রের তলায় ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু খবরদার, এটা কক্ষনো খুলো না, তাহলে আর আমার কাছে ফিরতে পারবে না। কথা দাও! কক্ষনো এই বাক্স খুলবে না?”

সাগর-রাজকুমারীকে কথা দিয়ে টারো বাক্স বগলে করে তাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে কচ্ছপের পিঠে উঠে বসলো। তীরে পৌঁছেই টারো এক ছুটে বাড়ী রওনা হলো। টারো দেখলো তাদের পাড়ার চেহারা কেমন বদলে গেছে, বাড়ী ঘর-দোর সব অচেনা লাগছে, চারদিকে নতুন নতুন মুখ, কোন্‌টা নিজের বাড়ী তা সে চিনতেই পারলো না। সকলকে ডেকে ডেকে সে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, “উরাসিমা টারো-র বাড়ী কেউ চেনো? ওর বাবা-মা সবাই কোথায়?” তারা সবাই বললো, “ওহে বাপু, তুমি আদ্যিকালের কথা

'কথা দাও ! কক্ষনো এই বাক্স খুলবে না ?' পৃঃ ২৬

জিজ্ঞেস করছো। আমরা শুনেছি উরাসিমা টারো সমুদ্রে ডুবে মরেছে। আচ্ছা, অদ্ভুত লোক তুমি! এ কাহিনী কখনো শোনোনি ?"

টারো ভীষণ ঘাবড়ে গেল। কী করে তা সম্ভব ? এই তো, এই সেদিনের কথা—হাত দিয়ে এখনো ছোঁয়া যায় —এই সেদিন সে এখানে বাস করতো! বাড়ী-ঘর, বাবা-মা সব ছিল তার। আর এরা বলে কি-না তা হচ্ছে আদ্যিকালের কথা! মনে হচ্ছে সাগর-রাজকুমারীর এই জাদু-বাক্সের জন্যেই এমন অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে। এই সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সে বাক্সটা খুলে ফেললো। তখন আর তার মনেই রইলো না, যে এটা না খুলবার জন্যে সে রাজকুমারীকে কথা দিয়েছে।

বাক্সের ডালাটা খুলতেই অদ্ভুত সাদাটে ধোঁয়া তাকে ঘিরে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে লাগলো। টারো নিজের মুখে হাত দিয়ে দেখলো তার মুখের চামড়া কুঁচকেছে, বুক অবধি সাদা লম্বা দাড়ি গজিয়ে গেছে। হাজার বছর সে সাগর-তলার রাজপ্রাসাদে কাটিয়েছে, কিন্তু সময়ের চেতনা তার মনে আসেনি। তার মনে হয়েছে, এই দু'পাঁচদিন পরেই সে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। জাদু-বাক্স তার বয়েস বাড়তে দেয়নি। কিন্তু বাক্সের ধোঁয়ার স্পর্শ তাকে আবার বুড়ো করে দিয়েছে, তার আসল স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়েছে। তার বন্ধুরা সব ধরাধাম থেকে বিদায় নিয়েছে। এখানে তার জায়গা নেই আর ওদিকে সমুদ্রের তলার রাজপ্রাসাদেও সে আর ফিরতে পারবে না—প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে বাক্স খুলেছে বলে। টারো এসব কথা ভাবতে ভাবতে সমুদ্রতীরের বালির উপরে বসে পড়ে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলো।

টাকার ম্যাজিক

যাদুকর এ. সি. সরকার

*

শীতের দেশে একটা খেলা আমি প্রায়ই দেখাই ছোটখাট মজলিশে। খেলাটা হচ্ছে টাকার ম্যাজিক। সেবার লণ্ডনে থাকাকালে প্রথম একটা চা-পার্টিতে বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে যখন একটা ছোট ম্যাজিকের মজা দেখাতে বাধ্য হই, তখন প্রথমেই আমার মাথায় আসে এই টাকার খেলার কথা। কথাটা মাথায় আসতেই আমি উৎসাহী বন্ধুদের বললাম, "বেশ তো যদি ম্যাজিক দেখতে চাও তবে চটপট পকেট থেকে তিনটে 'হাফ ক্রাউন' মুদ্রা (বিলাতী টাকা) বের করে এই টেবিলের উপরে রাখো।" আমার কথার সঙ্গে সঙ্গে তিনজন পকেট থেকে তিনটে 'হাফ ক্রাউন' বের করে রাখলো সামনের টেবিলের উপরে। এর পর আমি বললাম, "এই টাকা তিনটের উপরে পেন্সিল দিয়ে তিন রকমের চিহ্ন করো।" ওদের একজন এগিয়ে এসে ১-২-৩ করে চিহ্নিত করলো টাকা তিনটেকে। এর পরে আমি ঘরের অন্য কোণে গিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে বললাম, "ঐ টাকা তিনটের ভেতর থেকে যে কোন একটা তুলে নিয়ে হাতের মুঠোয় চেপে ধরে পঁচিশ বার 'ম্যাজিক ইণ্ডিয়া' কথাটা বল, আর তার পরে টাকাটা টেবিলের উপরে নামিয়ে অন্য টাকা দুটোর সঙ্গে মিশিয়ে দাও।"

বন্ধুরা আমার কথা মতন কাজ করলে। তারা আমাকে ডাকতে আমি টেবিলের কাছে ফিরে এসে মন্ত্র বলতে বলতে টাকা তিনটের উপর দিয়ে হাত বুলোতে থাকলাম।

মন্ত্রটা হ'ল :

"বাবুরাম সাহা রায়
চলে গিয়ে সাহারায়
থাকে বসে গাহারায়
যাতে বালু না হারায়
অবশেষে পা-হারায়।"

হঠাৎ একটা টাকা হাতে তুলে নিয়ে বললাম, "তোমরা এই টাকা, মানে এই দু-নম্বর টাকা তুলে নিয়েছিলে।"

মুগ্ধ বিস্ময়ে সবাই এক সঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠে আমাকে অভিনন্দন জানালো।

এ খেলাটা শীতের দেশে বা শীতকালেই করা সহজ। কেন জান? টাকার গায়ের তাপের হেরফের দেখেই ঠিক করতে হয়, কোন টাকাটা তুলে নেয়া হয়েছিল। যে টাকাটা তুলে নিয়ে মুঠোতে রাখা হয় সেটা শরীরের তাপে বেশ কিছুটা উষ্ণ হয়। বাকী টাকা দুটো থাকে ঠাণ্ডা। হাত বুলোবার সময়ে অনুভব শক্তি প্রয়োগ করতে পারলেই কেল্লা ফতে। মন্ত্রপাঠ সে তো লোক দেখানো ভড়ং। আজকেই এ খেলাটা করে দেখ তিনটে আধুলি টেবিলে রেখে।

জিল ব্রালটার

(জুল ভের্ন)

শ্রীমানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্ততঃ সাত-আটশো জন হবে তারা সংখ্যায়। মাঝারি গড়ন, কিন্তু সবল, ক্ষিপ্র নমনীয়; অদ্ভুত একেকটা লাফ দেবার ক্ষমতা আছে হাঁটুতে। সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিতে তারা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। রাজপত্রের পশ্চিমে প্রাচীরের মতো উঠে গেছে পাহাড়, তার ওপাশে সূর্য ডুবে যাচ্ছে। তার জ্বলন্ত লাল বর্তুল থালাটি এক্ষুনি মিলিয়ে যাবে। এর মধ্যেই উপত্যকায় অন্ধকার নেমে এসেছে। উপত্যকার একপাশে দূর ছুঁয়ে চ'লে গেছে সানোরে আর রোনডা গিরিমালা, অন্য দিকে উষর রুক্ষ ও বিষম কুয়েরভো।

এতক্ষণ তারা এগিয়ে আসছিলো একসঙ্গে, দলে-দলে; আচম্বিতে তারা থেমে পড়েছে, নিশ্চল। পাহাড়ের চূড়াটাকে দেখায় হাড়-জিরজিরে একটা অশ্বতরের পিঠের মতো —এইমাত্র তার উপরে দেখা দিয়েছে তাদের দলের নেতা। দূরের পাহাড় গ্রেটরকের চূড়ায় সমর-বাহিনীর একটা ঘাঁটি আছে—সেখান থেকে এই পাহাড়ে গাছের তলায় কী হচ্ছে না-হচ্ছে কিছুই দেখা যায় না।

'খ্রিস···খ্রিস,' নেতার গলা শুনেই তারা মুরগির মতো ঠোঁট বাড়িয়ে তীব্র স্বরে শিস দিয়ে উঠেছে।

'খ্রিস···খ্রিস,' এই আশ্চর্য বাহিনী একযোগে আবার দিগন্ত জুড়ে তাদের ডাক পাঠিয়ে দিলে।

নেতাটি আশ্চর্য মানুষ। লম্বা, গায়ে বানরের চামড়ার পোশাক—লোমগুলো বেরিয়ে আছে, উশকোখুশকো মাথায় চুলগুলো অবিন্যস্ত, মুখে খাটো দাড়ি গজিয়েছে; খালি পা, গোড়ালিটা ঘোড়ার খুরের মতো শক্ত।

হাত বাড়িয়ে সে তার বাহিনীকে পাহাড়ের নিচে খাঁজটা দেখালে। সঙ্গে-সঙ্গে পলটনের লোকের মতো—নাকি কলের পুতুলের মতো—একযোগে নিখুঁতভাবে হাত বাড়িয়ে তার ভঙ্গির নকল ক'রে দেখালে। নেতা তার হাতটা নামিয়ে নিলে, তারাও হাত নামিয়ে নিলে। নেতা মাটির দিকে ঝুঁকে পড়লো, তারাও হুবহু একভাবেই ঝুঁকে পড়লো মাটিতে। একটা লাঠি তুলে-নিয়ে নেতা শূন্যে কেবল নাড়ালে। তারাও হাওয়া-কলের মতো নিজেদের হাতের লাঠি নাড়লে শূন্যে।

তারপরেই নেতাটি ফিরে দাঁড়ালো, ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়লো লাফ দিয়ে, গাছের তলা দিয়ে এগুতে লাগলো বুকে হেঁটে। বাহিনীও তার পিছন-পিছন বুকে-হেঁটে এগুতে লাগলো।

দশ মিনিটও কাটলো না, তারা বৃষ্টি-ভেজা পাহাড়ী রাস্তায় নেমে এলো, কিন্তু, আশ্চর্য, অত বড়ো বাহিনীটা কুচকাওয়াজ ক'রে সমানতালে পা ফেলে এগিয়ে এলো, অথচ তবু একটা পাথরও খসলো না রাস্তার।

প্রায় মিনিট পনেরো পরে নেতা হঠাৎ থেমে গেলো : তারাও তক্ষুনি থমকে গেলো ; যেন মাটিতে হঠাৎ জ'মে গিয়েছে।

দুশো গজ নিচে শহরটা, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। রাস্তা জুড়ে লোকালয়, অগুনতি আলোই চিনিয়ে দিচ্ছে এলোমেলো বাড়ি ঘর, বাংলো, ব্যারাকগুলোকে। তারও ওপাশে আরো আলো দেখা যাচ্ছে : সমর-বাহিনীর পোত, সদাগরি জাহাজ, পনটুন—সব নোঙর বাঁধা ; আর স্থির জলে পোতগুলোর আলো পড়ে চকচক করছে। আরো দূরে, অয়রোপা অন্তরীপের শেষ মাথায় অন্ধকারের মধ্যে তেকোণা আলো ছড়িয়ে দিয়েছে বাতিঘর।

এমন সময় শোনা গেলো কামানের নিনাদ, 'প্রথম তোপ দাগলো'—লুকোনো গোলন্দাজ বাহিনীর একটা কামান আগুন উগরে দিলে। তারপরেই শোনা গেলো ঢাকের শব্দ গুমগুমে, আর তীক্ষ্ণ ধাতব মস্ত ঝাঁঝোরের আওয়াজ।

কাজ শেষ করার প্রহর পড়লো, এখন বাড়ি ফিরে যেতে হবে। কোনো বিদেশী বা কোনো আগন্তুকেরই তারপরে আর বাইরে থাকার হুকুম নেই। কোনো দরকারে বেরুতে হ'লে কেল্লার পলটনকে জানাতে হয়, তারা সঙ্গে লোক দিয়ে দেয়। নাবিকদের জাহাজে ফিরে যাবার সময়ও এটাই। প্রায় সিকি ঘণ্টা পরে-পরেই রোঁদে বেরুনো সেপাইরা গারদে নিয়ে হাজির করে মাতাল আর ভবঘুরেদের। তারপর আস্তে আস্তে সব চুপ ক'রে যায়।

দুই চোখের পাতা বুজিয়েই সুখে নিদ্রা যেতে পারেন জেনারেল ম্যাকক্যাকমেইল।

সে-রাত্রে ইংল্যাণ্ডের ভয় পাবার কিছুই ছিলো না বলে মনে হচ্ছিলো। জিব্রালটারের পাহাড় নিরাপদই ঠেকছিলো তখন।

জিব্রালটারের দুর্ধর্ষ পাহাড়ের কথা কে না শুনেছে ? যেন কোনো অতিকায় সিংহ গুঁড়ি মেরে ব'সে আছে লাফ মারবার আগে—মুণ্ডুটা তার স্পেনের দিকে ফেরানো, ল্যাজটা আছড়ে পড়েছে সমুদ্রের জলে। দাঁত বেরিয়ে আছে মুখের—সার বেঁধে দাঁড় করানো আছে সাতশো কামান, নলগুলো উদ্যত—লোকে বলে 'ডাইনি বুড়ির বত্রিশ পাটি' —কিন্তু কেউ আক্রমণ করলে এই বুড়ির দাঁতও কামড় বসাতে জানে!

ইংল্যাণ্ড এখানে দৃঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠিত—যেমন সে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে এডেনে, মালটায়, হঙকঙে, সমুদ্রের দিকে মুখ ফেরানো সবগুলো পাহাড়েই—যান্ত্রিক অগ্রগতির সুযোগ নিয়ে একদিন সে এগুলোকে ঘূর্ণ্যমান দুর্গে পরিণত করে ফেলবে।

হারকিউলিসের মুগুর যেখানে অ্যাবিলা আর কালপের মাঝখানে ছেড়ে ফাটিয়ে দিয়ে ভূমধ্যসাগর বানিয়েছিলো, সেই পনেরো মাইল জোড়া প্রণালীতে ইংল্যাণ্ডের যে প্রবল প্রতাপ, তা এই জিব্রালটারের জন্যেই।

স্পেনের বাসিন্দারা কি এই উপদ্বীপ ফিরে পাবার আশা ছেড়েই দিয়েছে তাহলে? নিশ্চয়ই। ডাঙা, কিংবা সমুদ্র—দু-দিক দিয়েই জিব্রালটার দুর্ভেদ্য!

কিন্তু ছিলো একজন, যে এই আত্মরক্ষা ও আক্রমণের দুর্ভেদ্য দুর্গটি আবার দখল ক'রে নেবার আশা পোষণ করতো। যে হ'লো এই অদ্ভুত বাহিনীটির নেতা—অদ্ভুত মানুষ—নাকি অদ্ভুত খ্যাপা? তার নাম জিল ব্রালটার। আর এই নাম বলেই তার মনে হয়েছে জিব্রালটারকে পুনর্দখল করে নেবার জন্য সে দেশমাতৃকা কর্তৃক আদিষ্ট। তার মাথায় ততটা যুক্তি ছিলো না, যা তাকে ঠেকাতে পারতো। তার উপযুক্ত জায়গা হয়তো ছিলো পাগলা গারদ। নামজাদা ছিলো সে—কিন্তু দশ বছরে কেউ তার কোনো হদিস পায়নি—কোথায় যে সে গেছে, কেউ পাত্তাই পায়নি। চ'লে গেছে তল্লাট ছেড়ে দূরে বিদেশে? আসলে সে কিন্তু তার পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়েই বেরোয় নি। আদিম মানুষ যেমন ক'রে বনে-পাহাড়ে গুহায়-গহ্বরে দিন কাটাতো, তেমনি ভাবেই সে কাটিয়েছে এই দশ বছর। সান মিজেল-এর গুহার গভীরেই তার দিন কেটেছে বেশি। শোনা যায় গুহাটা নাকি একেবারে সমুদ্রের তলায় গিয়ে শেষ হয়েছে। লোকে ভেবেছিলো সে বুঝি মরেই গেছে। কিন্তু বেঁচে আছে সে এখনও, জ্যান্ত ও উদ্দীপ্ত—কিন্তু কেমন যেন বর্বরের মতো বেঁচে আছে, মনুষ্য ধর্ম লোপ পেয়েছে তার, শুধু জীবের ধর্মই তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

দুই চোখের পাতা বুজেই সুখনিদ্রায় ডুবে ছিলেন জেনারেল ম্যাকক্যাকমেইল—যতটুকু তাঁর ঘুমোবার কথা, তার চেয়েও বেশি ঘুমোন তিনি রোজ। লম্বা হাত, ঝোপের মতো ভুরুর তলায় গোল দুটো কুৎকুতে চোখ, চিবুকে ছুঁচলো দাড়ি, অদ্ভুত সব মুখভঙ্গি, হাত পা নাড়ার উদ্ধত অভ্যাস, চোয়ালের বহু বিস্তৃত ব্যবহার—সব মিলিয়ে অদ্ভুত কুৎসিত তিনি দেখতে, এমনকি কোনো ইংরেজ জেনারেলের পক্ষেও বড্ড মাত্রাতিরিক্ত কদাকার। বানরেরই কোনো অধস্তন পুরুষ, কিন্তু ওই বানর-মার্কা চেহারা সত্ত্বেও চমৎকার যোদ্ধা।

হ্যাঁ, ওয়াটারপোর্ট স্ট্রীটের সেই মস্ত ও আরামে ভরা বাড়িতে খুশিতেই কাটান তিনি। আলামেদা তোরণ থেকে ওয়াটারপোর্ট তোরণ পর্যন্ত বাড়ির সামনে দিয়ে বড়ো রাস্তাটা গেছে পৌঁছিয়ে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কিসের স্বপ্ন ছাখেন তিনি? ইংল্যাণ্ড মিশর দখল ক'রে নিয়েছে? তুর্কিমুলুক, হল্যাণ্ড, আফগানিস্থান, সুদান, বুয়র প্রজাতন্ত্র—এক কথায় ভূমণ্ডলের সব অংশই ইংল্যাণ্ডের পায়ের তলায় হাতজোড় ক'রে ব'সে আছে, এটাই কি

তাঁর স্বপ্নের বিষয়? অথচ এখন যখন তিনি সুখনিদ্রায় স্বপ্নভারাতুর, তখন তাঁর সাধের জিব্রালটার বুঝি বেহাত হয়ে যায়!

মস্ত আওয়াজ করে তাঁর শোবার ঘরের দরজা সপাটে খুলে গেলো।

'কী হয়েছে?' চীৎকার করে উঠলেন জেনারেল। শব্দ শুনে তিনি বিছানার উপর খাড়া হয়ে বসেছেন।

'সার,' তাঁর খাস বেয়ারা ওরফে এডিকং প্রায় বোমার মতো ফেটে পড়েছিলো ঘরের মধ্যে, 'শহর আক্রান্ত হয়েছে।'

'স্পেনের লোক?'

'সম্ভবত।'

'তাদের কী দুঃসাহস যে—'

জেনারেল কথাটা আর শেষ করলেন না, উঠে দাঁড়িয়ে রাতের টুপিটা একটানে খুলে ফেললেন মাথা থেকে, লাফিয়ে গিয়ে গ'লে পড়লেন পাৎলুনের মধ্যে, টেনে পরলেন উর্দি, পা গলালেন ভারী বুট জুতোয়, মাথায় শিরস্ত্রাণ চাপিয়ে, কোমরে তলোয়ার বাঁধতে-বাঁধতে বললেন, 'এই শোরগোল কিসের?'

'পাথর পড়ছে, সার, শহরে। আভালাঁশ-এর মতো হুড়মুড় ক'রে একটার পর একটা পাথর নেমে আসছে কেবল।'

'তাহলে অনেক হবে তারা সংখ্যায়।"

'হ্যাঁ, সার, তা-ই তো বোধ হচ্ছে।'

'তাহ'লে তীরের সবগুলো ডাকাত আমাদের অজান্তেই গিয়ে ওদের সঙ্গে জুটেছে নিশ্চয়ই, তাক লাগিয়ে দিতে চায় আমাদের—রোণ্ডার সব ফেরারী জোচ্চোর, সান রোথীব সব জেলে, গাঁয়ের সব উদ্বাস্তু—সব্বাই নিশ্চয়ই একজোট হয়েছে!'

'হ্যাঁ, সার। সেই ভয়ই হচ্ছে।'

'রাজ্যপালকে কেউ খবর দিয়েছে?'

'না, সার। এ-রাস্তা পেরিয়ে অয়রোপা অন্তরীপে যাওয়াই যাচ্ছে না, ফটকগুলো সব দখল করে নিয়েছে শত্রুরা, রাস্তাগুলো শত্রুসৈন্যে ভর্তি;'

'ওয়াটারপোর্ট তোরণের শিবিরে? সেখানে খবর গেছে?'

'সেখানেও যাওয়া যাচ্ছে না। গোলন্দাজরা সব্বাই নিশ্চয়ই শিবিরে বন্দী হয়ে আছে।'

'তোমার সঙ্গে ক-জন লোক আছে?'

'জনা বিশেক হবে, সার—থার্ড রেজিমেণ্টের যে ক'জন লোক আসতে পেরেছে।

'সোজা গিয়ে জেনারেলের কাঁধে পড়লো সে।'

'সানডুনস্তান রক্ষে করুন', জেনারেল ম্যাকক্যাকমেইল চীৎকার ক'রে উঠলেন, 'ইংল্যাণ্ডের হাত থেকে ইংল্যাণ্ড ছিনিয়ে নিলে কি না—নিলে কি না কতগুলো কমলা ফেরি ক'রে বেড়ানো লোক! না, কিছুতেই তা হবে না! কিছুতেই না!'

ঠিক সেই মুহূর্তে শোবার ঘরের দরজা আবার খুলে গেলো সশব্দে। ঘরে লাফিয়ে ঢুকলো এক অদ্ভুত জীব—সোজা গিয়ে জেনারেলের কাঁধে পড়লো সে।

'আত্মসমর্পণ করো!' গর্জন ক'রে উঠলো সে। এমন একটা ক্রুদ্ধ কান-ফাটানো গর্জন, যেটা মানুষের গলা বলে মনে হলো না—বরং শোনালো কোনো ক্রুদ্ধ পশুর গর্জনের মতো।

এডিকং-এর সঙ্গে যে-ক'জন লোক ঢুকেছিলো, তারা এই জীবটির গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েই বাতির আলোয় তাকে দেখতে পেয়ে আতঙ্কে তিন পা পেছিয়ে এলো।

'জিল ব্রালটার!' চেঁচিয়ে উঠলো তারা।

জিল ব্রালটারই; সেই বন্য মানুষ, সান মিজেলের গুহার সেই আশ্চর্য অদৃষ্ট বর্বরটি, যাকে এই দীর্ঘকাল কেউ চক্ষে ত্যাখেনি।

জিল ব্রালটার আবার বন্যপশুর মতো গর্জে উঠলো, 'করবে আত্মসমর্পণ?'

'ককখনো না!' উত্তর দিলেন জেনারেল ম্যাকক্যাকমেইল।

সৈন্যরা যেই তাকে ঘিরে ফেলেছে, তক্ষুনি হঠাৎ একটা তীব্র বিলম্বিত শিস দিয়ে উঠলো জিল ব্রালটা—'শ্রিস্।' তক্ষুনি পুরো বাড়িটা সেই দুরন্ত বাহিনীতে ভরে গেলো।

বিশ্বাস হয়? বানর এরা, মানুষেরই পূর্বপুরুষ—শ-য়ে শ-য়ে বানর এসে ঢুকেছে

এখানে! ইংরেজদের কাছ থেকে জিব্রালটারের পাহাড় এরাই কেড়ে নিতে এসেছে? এরা? যারা এই পাহাড়ের সত্যিকার অধীশ্বর—স্পেনের লোকেরা আসবার আগেও যারা এর পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতো? যখন ক্রমওয়েল ইংল্যাণ্ডের হয়ে এটাকে দখল ক'রে নেবার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি নি, তখন যারা ছিলো এখানকার আদি বাসিন্দা!

হ্যাঁ, তারাই! আর তাদের সংখ্যাই তাদের দুর্ধর্ষ ক'রে তুলেছে—এই ল্যাজহীন বানরগুলোর উৎপাত সহ্য করেই এখানে মানুষকে থাকতে হয়, না হলে রক্ষা থাকে না। এই ধূর্ত, উদ্ধত, ক্ষিপ্র জন্তুগুলোই জিল ব্রালটারের বাহিনী, যাদের কেউ স্পর্শ করতেও সাহস পায় না, কারণ একবার কারুর গায়ে চোট লাগলে লোকে দেখেছে একের পর এক মস্ত পাথর গড়িয়ে ফেলে যারা নিষ্ঠুরভাবে প্রতিশোধ নেয়!

আর যখন এরাই এসেছে দল বেঁধে, ঝাঁকে ঝাঁকে, আর এদের চালিয়ে নিয়ে এসেছে এক ভীষণ উন্মাদ, যে এদের মতোই হিংস্র, ভীষণ আর খ্যাপা—এই জিল ব্রালটার, যাকে তারা চিনতো, যে এই বানরদের মতোই স্বাধীনভাবে বিচরণ করতো এখানে, এই চারপায়ে হিলস্লেপ্ল টেল, যে সারা জীবন ধরে কেবল এই কথাই ভেবেছে, কী করে স্পেনের মাটিতে বিদেশী আক্রমণকারীদের হটিয়ে দেওয়া যায়।

চেষ্টা যদি সফল হয়, তবে কী লজ্জা! কী লজ্জা! ইংল্যাণ্ডের কোথাও মুখ দেখাবার জায়গা থাকবে না! হিন্দুদের তারা জয় করেছে, জয় করেছে হাবশিদের, হারিয়ে দিয়েছে তাসমানিয়ার মানুষদের, অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের, হটেনটটদের, আরো, আরো কত কাউকে—আর শেষকালে তাদের উপর টেক্কা দিয়ে জিতে যাবে কিনা কতগুলো বানর!

এ রকম বিপত্তি যদি কখনও হয়, তাহলে জেনারেল ম্যাকক্যাকমেইল রিভলভারের গুলিতে নিজের মাথার খুলিই উড়িয়ে দেবেন। এই লজ্জা তিনি সইবেন কী ক'রে?

নেতার শিস শুনে বানররা ঘরে ঢোকবার আগেই কয়েকটি সৈন্য জিল ব্রালটারের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো। উন্মাদ জিল ব্রালটার—তার গায়ে তখন অমানুষিক শক্তি—ঝটাপট করতে লাগলো। তবু সব্বাই মিলে অনেক কষ্টে তাকে কাবু ক'রে ফেললে, বানরের চামড়ার পোশাকটা টেনে ছিঁড়ে ফেলা হলো তার গা থেকে, প্রায় উলঙ্গ ক'রে তাকে একটা কোণায় ঠেসে রাখা হলো,—নগ্ন, মুখে কাপড় পোরা, হাত পা বাঁধা—নড়বার শক্তি নেই, আওয়াজ করার ক্ষমতা অন্তর্হিত। তার একটু পরেই জেনারেল ম্যাকক্যাক-মেইল বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে—হয় জিতবেন, নয় তো হারবেন, সেরা যোদ্ধার মতো এই তার ভীষণ পণ।

বাইরেও বিপদ মোটেই কম নেই। সৈন্যদের কয়েক জনে শেষটায় পালটা আঘাত হানতে পেরেছে, বোধহয় ওয়াটারপোর্ট তোরণের কাছেই ফিরে দাঁড়িয়েছিলো প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে—এখন তারা জেনারেলের বাড়ির দিকে ছুটে আসছে। বাজারে আর ওয়াটারপোর্ট স্ট্রিটে কয়েকটা বন্দুকের শব্দ শোনা গেল। তবু বানররা সংখ্যায় এতই বেশি যে, জিব্রালটারের দুর্গ প্রায় বেহাত হয়েই যায় আর কি—সৈন্যরা পিছোবার যোগাড় করছে। এখন যদি স্পেনীয়রাও বানরদের সঙ্গে হাত মেলায়, সব ছেড়েছুড়ে সরে পড়তে হবে—কেল্লা, শিবির, ছাউনি—কোথাও কোনো সৈন্যই থাকবে না, সব পড়ে থাকবে ফাঁকা ও প্রতিরোধহীন।

হঠাৎ অবস্থাটা সম্পূর্ণ পালটে গেল।

মশালের আলোয় দেখা গেল বানরসেনা কেবলই পিছিয়ে যাচ্ছে। তারা যে পিছোচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যান্ত্রিকভাবে কুচকাওয়াজ ক'রে তারা ফিরে যাচ্ছে, সবচেয়ে আগে রয়েছে তাদের নেতা, লাঠি উঁচিয়ে। আর বাকি বানররাও হুবহু নকল করছে তাকে—তেমনি ছুটে ছুটে শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

তাহলে কি বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়েছে জিল ব্রালটার? যে ঘরে তাকে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছিল, সেখান থেকে তাহলে সে পালিয়ে এসেছে? সন্দেহ কী! কিন্তু কোথায় যাচ্ছে সে এখন? যাচ্ছে কি অয়রোপা অন্তরীপের দিকে? রাজ্যপালের বাড়িতে গিয়েই চড়াও হবে তাহলে? বলবে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে?

না! সেই উন্মাদ তার বাহিনী নিয়ে ওয়াটারপোর্ট স্ট্রিট ছেড়ে চলে যাচ্ছে। অ্যালামিদা তোরণ পেরিয়ে তারা এঁকে বেঁকে পার্কটা পেরিয়ে গিয়ে পাহাড়ের ঢালে পড়লো।

এক ঘণ্টা পরে আর একটি আক্রমণকারীও রইলো না জিব্রালটারে।

হয়েছে কী, তাহ'লে?

পরে সেটা খোলাখুলি বোঝা গেল, যখন জেনারেল ম্যাকক্যাকমেইল এসে দেখা দিলেন পার্কে।

তিনি—তিনিই সেই উন্মাদের ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনিই তাদের চালিয়ে নিয়ে গেছেন শহর ছেড়ে পাহাড়ের কোলে। সেই বানরের চামড়াটা গায়ে জড়িয়ে নিয়েছিলেন তিনি। দেখতে একেই তো বানরের মতো—কাজেই বানরসেনাকে ঠকাতে তাঁর বেগ পেতে হয়নি। কেবল গিয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি রাস্তায়, ইংল্যাণ্ডের নরবানর, আর বানরসেনা তাঁর অনুসরণ করেছে।…

প্রতিভার বিদ্যুৎবিকাশ, যাকে বলে। সেই জন্যেই সেণ্ট জর্জের ক্রুশ পাবেন তিনি।

আর জিব্রালটার? ইংল্যাণ্ড তাকে নগদ দামে বেচে দিলে এক সার্কাসের দলকে—তারা তাকে ইয়োরোপ আর আমেরিকায় দেখিয়ে টাকা লুঠে নিলে। সার্কাসওলা এমনকি এ-কথাও রটিয়েছিলো যে, সে সান মিজেলের বন্য মানুষকে দেখাচ্ছে না, দেখাচ্ছে স্বয়ং জেনারেল ম্যাকক্যাকমেইলকে।

কিন্তু ইংরেজ সরকারের টনক নড়বার পক্ষে একরাতের এই আক্রমণই যথেষ্ট হ'ল। সরকার বুঝতে পারলে যে মানুষ আর এটাকে দখল করতে পারবে না, বানরের দয়ার উপর নির্ভর ক'রে আছে জায়গাটা। আর তাই ইংল্যাণ্ড—তার ব্যবহারিক বুদ্ধি তো জগৎ বিখ্যাত—ঠিক করলে যে, ভবিষ্যতে সেখানে সবসময়েই সবচেয়ে কুৎসিত দেখতে লোককে জেনারেল ক'রে পাঠাবে—যাতে বানররা আরেকবারও ঠকে যায়। কেবল এই সাবধানতার উপরেই জিব্রালটারের কর্তৃত্ব তারা বজায় রেখে দেবে।

ভাই-বোন

শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত

এক দিকে ওই ছড়িয়ে আছে
আকাশ ভরা চাঁদের ভূষা,
অন্যদিকে ভোরের আলোয়
এই বুঝি হয় উদয় ঊষা।

চাঁদ সে যে আমার বোনটি আপন
ঊষা আমার ছোট্ট ভাই
বাম দিকেতে চাঁদ উঠেছে
ঊষার শোভন ডাইনে তাই

আদর জানাই ঊষা তোমায়
চন্দ্র শুভ-রাত্রি নিও.
তোমরা দু'জন আমার আপন
প্রাণের স্বজন, পরম-প্রিয়।

সেই সেকালের সুধীরবাবু

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

বালক জীবনে সুধীরবাবুকে দেখেছিলুম। আমার সেই তখনকার দিনের চোখে তিনি ছিলেন এক আশ্চর্য দেশের মানুষ। আর তারপর থেকে সুধীরবাবু সম্পর্কে সে চিত্র আর বদলালো না। তিনি সেই আশ্চর্য দেশের মানুষই রয়ে গেলেন।

সেদিন আমাদের উপযুক্ত মন-মাতানো পড়বার বইয়ের সাময়িক পত্রের বড় অভাব ছিল। 'সন্দেশ' অবশ্য ছিল, কিন্তু সে আর কতটুকু? পড়তে পড়তে এক নিঃশ্বাসেই শেষ হয়ে যেত। আমাদের বুভুক্ষা যে অসীম! ভালো গল্প, মনের মত কবিতা, পঠনীয় প্রবন্ধের অভাবে মনের খিদে মিটত না। সেই ফাঁকা মরুভূমির মধ্যে কোথা থেকে ঝড়ের মত এসে পড়ল 'মৌচাক' আর তার পিছনে সুধীরচন্দ্র সরকার। শিশু-পড়ুয়াদের মন দখল হয়ে গেল। তারা বাঁধা পড়ল। মৌচাক যেমনভাবে শিশু-পাঠকদের পাগল করে তুলেছিল, তেমন বোধ হয় আর কিছুতে করেনি।

মৌচাকের পাঠকেরা মৌচাককে চিনতেন বটে, কিন্তু তাঁদের মধ্যে বেশীরভাগই জানতেন না মৌচাককে ধরাধামে অবতীর্ণ করিয়েছেন কোন ভাগীরথ। কিন্তু আমি জানতুম। কারণ মৌচাক বেরুবার আগেই সুধীরবাবুর স্নেহ লাভ করে পরিপূর্ণ হয়েছি আমি। আমি জানতুম, মৌচাক মানেই সুধীরবাবু। মৌচাকের যে পলে পলে বিচিত্র গতি, শিশুমনের উপর তার যে অখণ্ড অধিকার, মৌচাকের পথ চেয়ে শিশু-জগতের যে অধীর অসংযত প্রতীক্ষা, তার পিছনে সদা জাগ্রত দণ্ডায়মান সুধীরচন্দ্র সরকার।

আগেই বলেছি আমাদের মনের মত পড়ার বইয়ের বড় অভাব ছিল। সে সময় শিশু-মনকে আনন্দ এবং নাড়া দেবার জন্যে মৌচাকের মত সাময়িকীর বিশেষ প্রয়োজন ছিল। মৌচাকের বিশেষত্ব ছিল তাতে তখনকার দিনের নাম করা যে-সব বড়দের লেখকরা ছোটদের জন্যে লিখতে শুরু করেছিলেন, তাঁরা ছোটদের জন্যে স্নেহ ঢেলে দিয়ে এত বেশী এবং এত ঘন-ঘন কখনও লেখেন নি। তখনকার দিনে সন্দেশের মত উৎকৃষ্ট কাগজও অবশ্য ছিল। কিন্তু সন্দেশের প্রধান লেখক ছিলেন উপেন্দ্রকিশোরের পরিবারবর্গ। এই আশ্চর্য পরিবারে শক্তিশালী অতুলনীয় লেখক ছিলেন অনেকগুলি—তাঁরা মুখ্যতঃ ছোটদের জন্যেই লিখতেন। সেদিক থেকে সন্দেশও ছিল অনন্য। সুধীরবাবুর মৌচাক আনল নতুন এক সুর। বাংলা-সাহিত্যের সেরা পূজারীরা ছোটদের প্রতি নজর দিতে শুরু করলেন। যে কর্তব্যে তাঁরা এতদিন অবহেলা করে এসেছেন, সুধীরচন্দ্রের কোন্ চৌম্বক-শক্তিতে জানি না, তাঁরা সেই কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হলেন। বাংলার শিশু-সাহিত্যে এক নতুন ঘটনা ঘটল। নতুন যুগের সূত্রপাত হ'ল।

সে সময় কান্তিক প্রেস-এ সাহিত্যিকদের আড্ডা বসত। প্রায় সব সাহিত্যিকই আসতেন। প্রতি রবিবারই কারুর না কারুর রচনা পাঠ হ'ত। বারোজন সাহিত্যিকের লেখা বারোয়ারি উপন্যাস এখান থেকে জন্ম নেয়। এখানে আসতেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহিতলাল মজুমদার, জলধর সেন, যতীন্দ্রনাথ বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শিল্পী চারু রায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, গিরিজাকুমার বসু এবং আরও অনেকে। আর আসতেন সুধীরচন্দ্র সরকার। এই দলের বড়দের চেয়ে সুধীরবাবু বয়সে ছিলেন কিছুটা কম। খানিকটা সেই কারণেও বটে এবং প্রধানতঃ তাঁর নিজের চরিত্রগুণে তিনি ছিলেন সকলের চেয়ে বেশী উৎসাহী, বেশী প্রাণবন্ত। কান্তিক প্রেসের এই সাহিত্যিক দল বড়দের জন্যই সাহিত্যসেবা করে আসছিলেন। এঁদের মাঝে সুধীরবাবু নিয়ে এলেন চমকপ্রদ প্রস্তাব। তিনি বললেন, এইসব দিগ্‌গজ সাহিত্যিকেরা যদি তাঁদের রচনার ছিটেফোঁটা শিশুদের দিতে রাজী থাকেন, তাহলে তিনি ছোটদের জন্যে এক মাসিক পত্রিকা বার করতে রাজি আছেন।

সকলেরই চোখে সহানুভূতি ফুটে উঠল। সুধীরবাবুর উৎসাহের ছোঁওয়া লাগল সবার মনে। বোঝা গেল সবাই সাহায্য করবেন লেখা দিয়ে।

হেমেন্দ্রকুমার বোধ করি স্নেহাধিক্যবশতঃ বললেন—কিন্তু সুধীর, এতে তো তোমার লোকসানই হবে। ছোটদের মাসিক পত্রের খরচের টাকা তুমি কোনোদিন উসুল করতে পারবে না।

সুধীরবাবুর অন্তর তখন স্বপ্নময়। তিনি বললেন—তা হোক।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সেই বৈঠকেই পত্রিকার নামকরণ:করে দিলেন—মৌচাক। বললেন, প্রথম কবিতা আমিই লিখে দেব।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন—আমি দেব তোমায় একটা উপন্যাস।

ছোটদের উপন্যাস তখনকার দিনে ছিল বড়ই বিরল। সুধীরবাবু ভারী খুশী হলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ লিখলেন—

ঝরছেরে মৌচাকের মধু,
গন্ধ পাওয়া যায় হাওয়ায়!

সে মধু আজও ঝরছে আমাদের অন্তরে; তার গন্ধ আজও থেকে-থেকে বাতাসের শিহরণের মধ্যে পাই।

অবনীন্দ্রনাথ দিলেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস, 'বুড়ো আংলা'।

কান্তিক প্রেস ছিল আমার বাবার। সেখানকার সাহিত্যিকদের আড্ডায় বসে সাহিত্যিকদের উচ্চশ্রেণীর সরস আলোচনা শোনায় আমার নিষেধ ছিল না। সেখানে সুধীরবাবু আমাকেও ধরলেন। বললেন—মোহনলাল, তোমাকেও মৌচাকে লিখতে হবে।

শুনে আমি নিরতিশয় আনন্দিত হলুম। সন্দেশে এর আগে গল্প লিখেছি: মৌচাকেও লিখতে পারবো বালকোচিত সে সাহস ছিল। কিন্তু তারপর সুধীরবাবু যখন বললেন—তোমার লেখাটা রবিবারে সাহিত্যসভায় একবার পড়ে দিও। সকলে শুনলে খুব ভাল হবে।—আমার তো মাথায় বজ্রাঘাত!

শেষে বিদ্বজ্জনসমাজের সম্মুখে এক লাজুক নগণ্য বালকের ধরা-ধরা কাঁপা গলায় 'বাদশাজাদী' গল্প পাঠ সুধীরবাবুই করিয়ে ছাড়লেন। পরের মাসে ছেপে দিলেন সেটা মৌচাকে।

মৌচাকে লিখতে সুরু করলেন প্রখ্যাত সব সাহিত্যিকেরা। এঁদের আশীর্বাদে এবং এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স-এর প্রকাশনায় শিশু মৌচাক দাঁড়িয়ে গেল।

কিন্তু সুধীরবাবুর প্রাণের প্রাচুর্য অসীম। তিনি কি ওইখানেই থেমে থাকেন? মোটেই না।

ছ-মাসের মধ্যেই আবার এক বিস্ময়। পরম বিস্ময়। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী আর চারু রায়কে নামালেন ছোটদের এক পূজা-বার্ষিকীর সম্পাদনার কাজে। এবারে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় নাম দিলেন, 'রংমশাল'।

১৩২৭ সালে আমাদের পুজোর ছুটি ওই রংমশালের রঙে রঙিন হয়ে গেল। সে বই আর কাছ ছাড়া করা যায় না। রাত্রে পর্যন্ত রংমশাল আমাদের বালিশের তলায়। উল্টেপাল্টে ঘুরিয়ে একই লেখা বার বার চেখে চেখে পড়ি, তবুও দেখি আশা মেটে না। এমন ঘটনা আমাদের জীবনে কখনও ঘটেনি।

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের কমলালেবুর দেশে—

আঙুর বেদানা পেস্তা বাদাম 'কমলালেবুর দেশে',
আমরা দু-জনে যাবো মা এবার মিহিজাম থেকে এসে।
বাংলাটি খুঁজে নেব ঠিক সেথা
তলা দিয়ে নদী বহে যায় যেথা
সন্ধ্যে বেলায় হেনার গন্ধ হাওয়ার সঙ্গে মেশে
এবার আমরা যাব মা দু'জনে কমলালেবুর দেশে।

তারপর তাঁর 'নাম-কাটা সেপাই'—

এখন আমি ঘুরে বেড়াই যেন সেপাই নাম-কাটা
সঙ্গে নিয়ে চওড়া বুক আর শক্ত আমার হাত পা-টা।
অঙ্ক কসিস্ ভালো ছেলে গাঁট্টা কস্‌বি আয় দেখি
অত বোঝাই করলে মাথা হাত-পা তোদের খেলবে কি?
আকাশ বাতাস ডাক দিয়েছে বুকের ভিতর বইছে ঝড়
আমার বুকে বুক মিলিয়ে বই ছেড়ে আয় বেরিয়ে পড়।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেজীর বাহাদুরি'; হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'ডাক পেয়াদা'—এ সব কি ভোলা যায়?

রংমশালে যাঁরা লিখেছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের নামে দু-লাইন করে কবিতা ছিল। পড়ে পড়ে মুখস্থ হয়ে গেল। সুধীরবাবুর নামে সম্পাদকেরা লিখেছিলেন—

বন্ধু সুধীর ধীর অতিশয় বয়স্তে কয় মোট্‌কু বেঁটে
দরকারে সেই সরকারই আজ চরকার প্রায় ঘুরছে খেটে।

আর ছিল প্রথম কবিতা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের—

কে আমারে বলতে পারে
রংমশালের মশলা কি?
ঠুঙির ভিতর লুকিয়ে থাকে
চাঁদের আলোর পশলা কি?
কাগজের ওই চুঙির মাঝে
দিনে দেখি বারুদ আছে
রাতে দেখি পড়ছে গলে
কলম হীরে দশ-লাখী!

পাগল করা কবিতা!

শুধু কি সত্যেন দত্ত? রবীন্দ্রনাথও রঙিন করে দিলেন পরবর্তী রংমশালের পাতা—

ভিড় করেছে রঙমশালীর দলে
কেউ বা জলে কেউ বা তারা স্থলে।
অজানা দেশ রাত্রি দিনে
পায়ের কাছে পথটি চিনে
দুঃসাহসে এগিয়ে তারা চলে॥

সুধীরবাবুর কথা ভাবতে বসলে তাঁর এই ছবিটাই সবচেয়ে মনে পড়ে। তাঁর তরুণ জীবনের ছবিটা। যখন তিনি, কিসের টানে জানি না, নব-প্রজ্জ্বলিত বর্তিকা হাতে শিশুমনকে আলোকিত করার কাজে নেমে পড়েছেন। এই কাজ করতে গিয়ে কোন এক অদৃষ্টপূর্ব চৌম্বকশক্তির প্রয়োগে—এবং নিজে বোধ হয় তাঁর এই আকর্ষণগুণ সম্বন্ধে মোটেই সচেতন ছিলেন না—সাহিত্যস্রষ্টাদের তাঁর প্রিয় পত্রিকাখানির চারিপাশের মধুকরের মতো আকৃষ্ট করে এনেছিলেন। কতবার দেখেছি। স্বল্পভাষী সুধীরবাবু একটু শুধু বলেছেন। অনুরোধ নয়, উপরোধ নয়, পেড়াপীড়ি নয়—সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যরথী লেখা এনে তুলে দিয়েছেন সুধীরবাবুর হাতে।

আমার বয়েস বাড়ার পর সুধীরবাবুকে আমি আরও অনেক রূপে দেখেছি। তাঁর নানা গুণ দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তাঁর স্নেহ পেয়ে ধন্য হয়েছি। কিন্তু আমার সেই বালক বয়সের চোখে তাঁর তরুণ বয়সের যে রূপ দেখে অবাক লেগেছিল, সেটাই ঘুরে-ফিরে সব সময় মনের পটে ফিরে আসে।

মার্টিন লুথার কিং

শ্রীসরল দে

যে পথ ধরে খ্রীষ্ট এল গান্ধী এল যে পথ ধরে
এলে মার্টিন লুথার তুমি সে পথ ধরে নতুন করে।

মানে আলোর শিখা গান্ধী মানে আলোর শিখা—
তোমার হাতে জ্বললো জানি অন্ধকারে সে বর্তিকা।

সত্য-পথের পথিক তুমি গান্ধীমহারাজের মতো,
তোমার কাছে আলোর দেখা পেল কালো মানুষ যতো।

ক্রুশের কাঠে নতুন করে রক্ত ঝরে যখন পড়ে,
তখন চিনি তাদের যারা এই পৃথিবী আলোয় ভরে।

গান্ধী-যীশুর মতন তুমি জীবন দিলে বিশ্ব-হিতে
ভালোবাসার আলোর শিখা কেউ কি পারে নিবিয়ে দিতে?

বৈশাখী

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

তোরা দুল্‌বি কে আজ আয় রে,—
বোশেখের এই ভর-দুপুরে
বট-পাকুড়ের ছায় রে।

এখন ভোম্‌রাগুলো গুন্‌গুনিয়ে
যায় না মধুর গান শুনিয়ে,
বক্‌বকিয়ে পায়রাগুলো
ঝিমিয়ে গেছে হায় রে।

কোথা কেউ যেন আর নাই রে,—
এই ঘোর গরমে গ্রামখানি আজ
ঝিমিয়ে আছে ভাই রে।

আজ ফুরফুরে এই মিহিন্‌ হাওয়ায়
পড় না শুয়ে মাটির দাওয়ায় ;
বিছিয়ে দে তোর পরিপাটি
শীতলপাটি বাই রে !

মিঠে আমের বোলের গন্ধে—
কোকিলগুলো উঠল মেতে
কোন্‌ মহা আনন্দে
হোথা শিমূল-ডালে দোয়েল পাখী
একাই শুধু মরছে ডাকি' ;
এখন আকাশ-বাতাস উঠছে ভ'রে
নিদালি কোন্‌ ছন্দে।

আয় আমার সাথে চল্‌ না,—
নেবুর ফুলের সুবাস ছোটে
কোন্‌ বনে ভাই, বল্‌ না
ভাখ্‌ প্রজাপতি কাঁপায় পাখা,
সবুজ ঘাসের বুকে ফড়িং আঁকা ;
পানকৌড়ির ডাকে উতল
তালপুকুরের জল না ?

ছদ্মবেশ

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভারত।

অনুর্বর পাথুরে প্রান্তরে পর্যাপ্ত ফসল ফলানো কষ্টকর, তবু কিষানেরা চাষবাস করে, কিন্তু সারা বছরের অভাব যখন মেটে না, তখন তারা হয় দস্যু। ক্ষেতের কাজ যখন থাকে না, তখন এই কিষানের দল ডাকাতি করতে বেরোয়, ছোট ছোট দলে ঘোড়ায় চড়ে চলে যায় বহু দূরে, পাঁচদিন সাতদিনের পথ অতিক্রম করে সুবিধামত পল্লীতে কয়েক দিন ডাকাতি করে দ্রুত ফিরে আসে। যারা তেমন বড় দল গড়তে পারে না, তারা হয় ঠগী। অন্য পথিক দলের সঙ্গে মিশে সুযোগমত তাদের গলায় রেশমী রুমাল জড়িয়ে খুন করে ও সর্বস্ব লুট করে, তারপর মৃতদেহগুলিকে কবর দিয়ে আবার ভাল মানুষ সেজে পথ চলে।

সে যুগের মধ্যভারতে এই দু'দল মানুষই প্রবল হয়ে উঠেছিল।

খণ্ড খণ্ড অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ছোট ছোট রাজা, সব রাজাই প্রজাদের এই অপকীর্তি জানতেন, অনেকেই এই সব দলের সর্দারদের চিনতেন, এই সর্দাররা লুটের একটা ভাগ রাজার কাছে পৌছে দিত। রাজা পরোক্ষে এদের উৎসাহ দিতেন প্রতিবেশী রাজ্যে লুট-তরাজ চালাতে। প্রত্যেক রাজ্যের লুটেরা প্রতিবেশী রাজ্যে লুটতরাজ চালানোর ফলে কোন রাজ্যেই শান্তি ছিল না। তা না থাক, সমস্ত রাজাদের ভেট বৃদ্ধি পাচ্ছিল, বিত্ত বাড়ছিল, তাতেই তাঁরা সুখী।

সে যুগের মধ্যভারতে শান্তিপ্রিয় মানুষের তখন শান্তি ছিল না।

এই অশান্তি আরো ব্যাপক হতো যখন রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধতো। তখন আক্রান্ত রাজ্যের প্রজাদের সর্বনাশ।

এই সময় সৎনাম রাজ্যের রাজা ছিলেন সামন্ত জয়রাম সিং জেঠিয়া।

মধ্যভারতের রাজন্যদের মধ্যে জেঠিয়ার বিশেষত্ব ছিল। মাথায় সবাইকার চেয়ে উঁচু, অত্যন্ত সুপুরুষ গৌরকান্তি, দেহে শক্তিও ছিল যথেষ্ট। কুস্তির আখড়ায় যে কোন সাধারণ পালোয়ানকে তিনি দু'হাতে তুলে ছুড়ে ফেলে দিতেন। সকলেই তাঁকে সমীহ করতো, বিশেষ করে প্রজারা তাঁর ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতো। খেয়াল-খুশি মতো তিনি কখন যে কি হুকুম জারি করেন তার কোন ঠিক-ঠিকানা ছিল না। আর সেই হুকুমের একটু উনিশ-বিশ হলে আর রক্ষা নেই।

ঠগী সর্দার চিতু মহারাজের সঙ্গে জয়রামের ঘনিষ্ঠতা ছিল এ কথা সে অঞ্চলে সবাই

জানতো। আর সেইজন্যই জয়রাম প্রতিবেশী রাজা-মহারাজাদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতো না। প্রজাদের মধ্যে কারও হাতে পয়সা জমেছে জানলে, জয়রাম তার কাছ থেকে খুশিমত ধার চাইত, না দিতে পারলে রক্ষা নেই, দিলে ফেরত পাবারও আশা নেই।

অমন দুর্দান্ত মানুষের রাজ্যেও কিন্তু ডাকাতি হতো, ঠগীদের দস্যুবৃত্তিও ঘটতো। দু'দিন আগে দু'জন ডাকাত সর্দারকে ধরা হয়েছে, সীমান্তের একটি গাঁয়ে তারা ডাকাতি করতে এসেছিল। সভার মাঝে তাদের ধরে আনা হয়েছে। জয়রাম সংক্ষেপে তাদের বিচার শেষ করেছেন, —হাটের মাঝে দু'দিন পরে দু'জনকে ফাঁসীতে লটকে দেওয়া হবে। দু'দিন কয়েদখানায় থাক্!

তারপর জয়রাম বসে তামাকু খাচ্ছেন, এমন সময় দরোয়ান এসে জানালো—দিল্লী থেকে বাদশার লোক এসেছে।

বাদশার লোক? জয়রাম সচকিত হয়ে উঠলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—ক'জন?

—একা। সঙ্গে দু'জন বরকন্দাজ আছে!

—তিনজন? নিয়ে এসো।

এক দিল্লীওয়ালা মুসলমান ভিতরে এসে কুর্নিশ করলো। বিনীতভাবে বললো—শাহান শা দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় আকবরের দরবার থেকে আমি আসছি।

—আপনার পরিচয়?

কামিজের ভিতরের জেব থেকে সযত্নে রক্ষিত একটি পুলিন্দা বের করে, তার ভিতর থেকে একখানি কাগজ দূত জয়রামের হাতে দিলে। বললে—বাদশাহী পাঞ্জা। আমার নাম দুনিয়া খাঁ। দো-হাজারী মনসবদার!

জয়রাম পাঞ্জা দেখে ফেরত দিলেন। বললেন—বসুন।

তলোয়ার সামলে নিয়ে সামনে গদীর উপর দুনিয়া খাঁ বসলো। বললো—আরো ক'দিন আগে আপনার এখানে আসতাম। কিন্তু পান্নার দরবারে দেরি হয়ে গেল! বাদশা পঞ্চাশখানি ছোট হীরা চেয়েছেন, সেইগুলো দেখে পছন্দ করে আসতে দেরি হয়ে গেল।

জয়রাম বললো—ছোট হীরার জন্য পান্নার নাম আছে।

দুনিয়া খাঁ বললো—বাদশা ওখান থেকেই হীরা কেনেন, এবার নিয়ে আমি তো তিনবার এলাম।

ইতিমধ্যে হুঁকাবরদার রূপার গড়গড়ায় তামাকু নিয়ে এলো। সোনা-বাঁধানো গড়গড়ার নলটা এগিয়ে ধরলো দুনিয়া খাঁর সামনে। জয়রাম বললো—একটু তামাকু ইচ্ছা করুন।

ছুনিয়া খাঁ গড়গড়ার নল তুলে নিলে।

ধূমপানে কয়েক মিনিট কেটে গেল। তারপর জয়রাম জিজ্ঞাসা করলেন—বাদশাহের কি আদেশ হয়েছে?

ছুনিয়া খাঁ বললো—শাহান শা দ্বিতীয় আকবর আপনাকে ফরমান পাঠিয়েছেন।

তলোয়ারের হাতলের নীচেই একটা চামড়ার গোল পেটিকা ঝুলছিল, ছুনিয়া খাঁ সেই পেটিকাটি খুলে নিয়ে তার ভিতর থেকে গোল করে গুটানো একখানি কাগজ বের করলো, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সসম্মানে কুনিশ করে সেই কাগজখানি জয়রামের হাতে দিল, জয়রাম তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে সসম্মানে দু'হাত দিয়ে কাগজখানি নিলেন। তারপর খুলে দেখলেন—দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় আকবরের মোহর অঙ্কিত উর্দুতে লেখা এক ফরমান। এক নজরে জয়রাম ফরমানটি পড়ে দেখলেন। তাঁর মুখে হাসি ফুটলো। আশেপাশে যারা বসেছিল তারা উৎসুক হয়ে উঠলো। জয়রাম বললেন—শাহান শা বাদশা আমাকে পাঁচহাজারী মনসবদার করেছেন।

ছুনিয়া খাঁ বললো—বাদশা আপনার উপর খুবই প্রসন্ন, আপনি এই অঞ্চলের একমাত্র রাজা যিনি ডাকাত ও ঠগীদের অনাচার দমন করে প্রজাদের শান্তিতে রেখেছেন। বাদশাহের ইচ্ছা আপনি এই অঞ্চলের যত ডাকাত ও ঠগী আছে সবাইকে ধরে কতোল করুন। বাদশাহ আপনাকে আরো ইনাম দেবেন।

—এখানকার যত রাজা মহারাজাই তো ডাকাত ও ঠগীদের সর্দার।

—বাদশা সে কথা জানেন। জানেন বলেই আপনাকে এই ফরমান দিয়েছেন। এই ফরমানের জোরেই আপনি যে কোন রাজ্যে ডাকাত ও ঠগীদের ধরতে পারবেন। আর বাদশা জানেন, আপনিই এই কাজের যোগ্য বক্তি।

জয়রাম খুশি হলেন। বললেন—বাদশা যখন ফরমান দিয়েছেন তখন চেষ্টা আমি করবই, তবে কতটা সফল হবো জানিনে।

ছুনিয়া খাঁ বললো—আপনি চেষ্টা করলেই হবে।

জয়রাম সিং আবার হাসলেন। তিনি নিজেও যে একজন ডাকাতের সর্দার সে কথা তাহলে অজানা আছে, এ তো কম মন্ত্রগুপ্তির কথা নয়! তাঁর সহকারী ও কর্মচারীরা তাহলে বিশ্বস্ত বলতে হবে। লোক নির্বাচনে তাহলে তাঁর কৃতিত্ব আছে।

জয়রাম অবার তামাক খেতে সুরু করলেন।

ছুনিয়া খাঁও তামাকু সেবা করছিল।

দু'জনেরই কল্কে শেষ হলো। তামাকের সুগন্ধে ঘর ভরে গেল। হুঁকাবরদার

এগিয়ে এসে কলকে তুলে নিয়ে বললো—কলকে বদলে দিই হুজুর!

তুনিয়া খাঁ বললো—না বেশী তামাক খাওয়া আমার অভ্যাস নেই।

জয়রামের এবার খেয়াল হলো, বললেন—আপনি অনেক পথ এসেছেন, ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। এখন বিশ্রাম করুন, সন্ধ্যাবেলা আবার দেখা হবে।

তুনিয়া খাঁ উঠে কুর্নিশ করলেন। জয়রাম একজন চোপদারকে নির্দেশ দিলেন—এঁদের নিয়ে যাও অতিথ্‌শালায়, জমাদারকে বলবে—এঁরা বাদশাহের লোক, দরবারী ভারী আদমী।

তুনিয়া খাঁ চোপদারের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যায় জয়রাম সিং-এর সভা বসলো বাগানের সামনের বারান্দায়। প্রতিদিনের সিদ্ধির আসর। এই সময় রাজাসাহেব পার্ষদদের নিয়ে এক এক গেলাস সিদ্ধির সরবৎ খান, সেই সঙ্গে চলে তামাকু ও গল্প। জয়রামের যেদিন যেমন মেজাজ থাকে সেদিন তেমন মজলিস চলে, দু'তিন ঘণ্টা থেকে রাত-দুপুর অবধি।

আজকের মজলিসের মুখ্য কথা বাদশাহী ফরমান। তুনিয়া খাঁও এখানে উপস্থিত ছিল।

তুনিয়া বললো—শাহানশার ইচ্ছা ছিল আপনাকে একটা খেতাব দেবার, কিন্তু উজির-এ-আজম বললেন—আগে কিছু দিন দেখুন উনি কি করেন, খেতাবের কথা তারপর। নাহলে বাদশাহী খেতাবের কোন দাম থাকবে না। আপনি যা কিছু করবেন সব কিছু বাদশাকে খবর পাঠাবেন।

—সে তো পাঠাতেই হবে, নাহলে বাদশা জানবেন কি করে। মুন্সী এদ্দিন ফাঁকি দিচ্ছিল এবার তাকে কাজ করতে হবে। তবে পয়লা নম্বর কাজ আপনি চোখে দেখেই যেতে পারবেন। কালই দু'বেটা ডাকাতের ফাঁসী হবে হাটের মাঝে। আপনি মেহেরবাণী করে বাদশাকে বলবেন সে কথা!

—ওঃ, তাহলে তো আপনি কাজ করেছেন। বাদশা তাহলে তো ঠিক লোককে নির্বাচন করেছেন। আপনার খেতাব ঠিক এসে পড়বে। এভাবে কাজ করলে ছ'মাসের আপনি ছ'শো ডাকাতকে শেষ করবেন।

—ছ'মাসে ছ'শো? না অতো সহজ হবে না।

—এ অঞ্চলে তো হাজার হাজার ঠগী আর ডাকাত আছে বলে শুনেছি।

—তা আছে, কিন্তু সব তো সাধারণ লোক সেজে বসে আছে। ঠিক ঠিক সময় খবর পেয়ে হাতে-নাতে ধরতে হবে তো। সেই খবর রাখাই কঠিন।

—সে তো সত্যি, সেদিকে আপনার কতোয়ালী ব্যবস্থাকে জোরদার করতে হবে।

—তাতেও ছ'মাসে ছ'শো হবে না।

—কিন্তু পাঁচ-ছ'শো ডাকাত না ধরতে পারলে, বাদশা কি খেতাব দিতে রাজী হবেন? তার উপর উজির-এ-আজম রয়েছেন।

ডুনিয়া খাঁয়ের বরকন্দাজ দু'জন বন্দুক তুলে ধরলো জয়রামের সিপাহী দু'জনের দিকে।

তখন ইংরেজদের প্রতিপত্তি বাড়তে সুরু করেছে, দিল্লীর বাদশাহী জলুশ অস্তগামী। তবু সমস্ত রাজা-মহারাজের কাছে বাদশাহী খেতাবের জমক তখনও কম ছিল না। জয়রাম সিং-এর কাছেও তা লোভনীয়। ডুনিয়া খাঁ জয়রামের মুখের পানে তাকিয়ে তার মনের ভাবটা বুঝে নিয়েছিল। বললো—তবে আরেকটা কথা আমার মাথায় এসেছে, তাতেও আপনার কাজ হতে পারে।

—কী? জয়রাম সিং উৎসুক হয়ে উঠলেন।

—বাদশাহের ফরমান পেয়েছেন, আপনি ওর জবাব লিখে দিন আপনি কাজ সুরু করে দিয়েছেন। সম্প্রতি আপনি দু'জন ডাকাত ধরেছেন, তাদেরকে বাদশাহের কাছে পাঠাচ্ছেন, তিনিই বিচার করবেন। তারপর দফায় দফায় যত ডাকাত ধরবেন, সবই

বাদশাহের দরবারে পাঠাবেন। এইভাবে দু'চারজন করে যদি বিশ-পঁচিশ বার পাঠান, তাহলে তখন আর সংখ্যার কথা বাদশাহের মনে উঠবে না, তখন আপনার কাজটাই বাদশার মনে উঠবে, তখন আপনার ইনাম মিলে যাবে। মুন্সীর লেখায় তো শুধু সংখ্যা থাকবে, তাতে একাজ হবে না।

কথাটা জয়রামের মনে লাগলো। তিনি মাথা দোলালেন। পার্ষদ যারা ছিল তারা বললো—এটা তো খুব যুক্তির কথা! হাতে যখন বস্তু রয়েছে তখন বাদশাকে নজরাণা পাঠানো তো খুবই ভাল। তিনিই দেখুন।

দুনিয়া খাঁ বললো—তাড়াতাড়ি খেতাব পাবার এইটেই সহজ পথ। আর বাদশাহী খেতাব মিললে তো আপনি তখন এই তল্লাটে একজন কেউকেটা হয়ে পড়বেন। এই অঞ্চলে তখন আপনার সমকক্ষ রাজা আর কেউ থাকবে না। ঈদের সময় নওরোজের মেলায় আপনি নিমন্ত্রণ পাবেন। একবার দিল্লীতে যাতায়াত সুরু হলে আপনি আরো বড় হবার সুযোগ পাবেন। আপনার চেহারা আছে, বুদ্ধি আছে, শক্তি আছে, শুধু যোগাযোগের অপেক্ষা। দেখবেন, তখন যেন আমাকে ভুলে যাবেন না।

এমন মিষ্টি কথা শুনলে সবাইকারই মেজাজ খুশি হয়। তার উপর সিদ্ধির সরবতের গুণ তখন মনের উপর ক্রিয়া করছে। রাজা জয়রাম সিং জেঠানী খোশ মেজাজে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

তখনই জয়রাম কতোয়ালীতে হুকুম পাঠালেন—কাল ডাকাত দু'জনের ফাঁসী হবে না, ওদের'কে বাদশাহের দরবারে নজরানা পাঠানো হবে।

প্রত্যূষে যাবার আয়োজন সম্পূর্ণ হলো।

বন্দী ডাকাত দু'জনকে দুটি ঘোড়ার পিঠে বেঁধে দেওয়া হলো। সেই ঘোড়া দু'টিকে নিয়ে চললো দু'জন ঘোড়সোয়ার। দুনিয়া খাঁ বললো—বেশী লোকজন আমি নোব না। তার দুটো কারণ: বাদশাহের দরবারে আপনি ওদের পাঠাচ্ছেন, বাদশার সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে, এই কথা আমি বাইরে গোপন রাখতে চাই। আর দ্বিতীয় কারণ: বেশী লোকজনের ঝামেলা বেশী, দু'চারজন লোক ত্বরিতে এলাহাবাদ পৌঁছে যাবো, তারপর আর কোন ভাবনা নেই। আমার দু'জন বন্দুকধারী সোয়ার রয়েছে আর আপনার দু'জন বন্দুকধারী সোয়ার হবে, এই চারজনই যথেষ্ট; দুপুরের আগেই আমরা এলাহাবাদ পৌঁছে যাবো।

জয়রাম সিং বাদশাহী খেতাবের স্বপ্ন দেখছিলেন, আর সেই খেতাবের মধ্যস্থ হচ্ছে এই দুনিয়া খাঁ। কাজেই সে যা বলে তাই শিরোধার্য। মাত্র দু'জন সোয়ারই তিনি দুনিয়া খাঁর সঙ্গে দিলেন।

পুরো দু'ঘণ্টা দুনিয়া খাঁ ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে এলেন সতনাম রাজ্যের সীমানায়। একটি অগভীর নদী পার হয়েই জঙ্গল। পাথুরে প্রান্তরের জঙ্গল। গাছগুলি বেশী উঁচু নয়, নীচে ঝোপঝাড় বিশেষ নেই, শীর্ণ ছোট ছোট গাছ ক্রোশের পর ক্রোশ বিস্তৃত। সেই জঙ্গলের ভিতর দিয়েই পথ।

সেই জঙ্গলের ভিতরে কিছুদূর গিয়েই দুনিয়া খাঁ থামলো। বললো—রোখ্‌খো!

সবাই থামলো।

পরক্ষণেই দুনিয়া খাঁয়ের বরকন্দাজ দু'জন বন্দুক তুলে ধরলো জয়রামের সিপাহী দু'জনের দিকে। বললো—তোমাদের বন্দুক দুটো আমাদের দিয়ে দাও, নয়তো জান যাবে।

সিপাহী দু'জন তো হতভম্ব। দুনিয়া খাঁ তখন এগিয়ে এসে তাদের বন্দুক দুটি কেড়ে নিলে। বললো—সোজা চলে যাও, তোমাদের রাজা জয়রামের কাছে, উজবুক সিং জেঠিয়াকে বলবে, দুনিয়া খাঁ বাদশার দরবার থেকে যায়নি, এলাহাবাদের দুনীচাঁদ গিয়েছিল, তার দু'জন সর্দারকে রক্ষে করতে।

এলাহাবাদের দস্যুসর্দার দুনীচাঁদের নাম তারা সবাই জানতো। সিপাহী দু'জন কাঁপতে কাঁপতে ঘোড়ার মুখ ফেরালো।

দুনিয়া খাঁ বন্দী দু'জনের বাঁধন কেটে দিলে। তারা ঘোড়ার পিঠে সোজা হয়ে বসলো। দুনিয়া খাঁ কেড়ে নেওয়া বন্দুক দুটি তাদের দু'জনের হাতে দিলে। তারা হাসতে হাসতে বললে—এসব না হলে ওস্তাদ হওয়া যায় না। বহুৎ বহুৎ সেলাম!

দুনিয়া হেসে বললো—চল ধীরে ধীরে, একেবারে আড্ডায় গিয়ে জিরুবে।

দুনিয়া খাঁ ও চারজন সঙ্গী বনপথে অগ্রসর হলো।

সিপাহী দু'জনের মুখে দুনীচাঁদের খবর শুনে জয়রাম খাঁ কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারলো না। সিপাহী দু'জন তবু 'উজবুক' কথাটা বাদ দিয়েই বলেছিল।

সকাল-দুপুর সাঁঝ-দুপুর

শ্রীঅনিলেন্দু চক্রবর্তী

ফুকুর ফুকুর
এই সকাল
হাসছে।

ঝুম ঝুমুর
সাঁঝ ঘুঙুর
বাজছে।

চুকুর চুকুর
এই দুপুর
খাচ্ছে।

টুপ টুপুর
রাত দুপুর
আসছে।
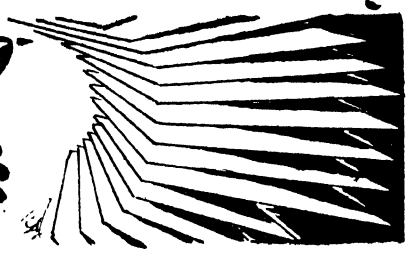
ছুটির আমোদ

আমরা ভাই-বোনেরা সব ঠিক করলুম কোলকাতা যাব। এখন বাবাকে রাজী করাতে হবে। দেখলুম বাবাকে বলবা মাত্রই তিনি রাজী হয়ে গেলেন। বললেন, "বেশ তো। পাঁচ বছর কোলকাতায় যাইনি, এই গরমে ভালই হবে।"

আমাদের গরমের ছুটি পড়ে গেছে, বাবাও ছুটি নিয়ে নিলেন।

গোয়ালিয়ার থেকে প্রথমই আমরা এলুম ঝাঁসিতে। কানপুরের গাড়ীর অনেক দেরি ছিল। বাবা বললেন, "চলো, ইতিমধ্যে মহারাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের কেল্লা দেখিয়ে আনি।"

আমরা সব টাঙ্গায় করে কেল্লা দেখতে গেলাম। মস্ত বড় কেল্লা, কিন্তু গোয়ালিয়ারের মহারাজা মানসিংহের কেল্লার মত নয়। কেল্লাটি জায়গায় জায়গায় ভাঙ্গা এবং ধ্বসে পড়েছে। ঐ কেল্লার মধ্যে একটি শিব মন্দির আছে। মহারাণী এই মন্দিরে নিত্য পূজা করতেন। আজও এখানে শিবরাত্রিতে মস্ত মেলা বসে। যেখানে মহারাণীর মহল ছিল এখন সেখানে দেখলুম কোতোয়ালী। শহরটা কিন্তু ভাল লাগল না।

এরপর আমরা এলাম এলাহাবাদ। মানিকপুর দিয়ে এলাহাবাদ পৌছুতে বেলা এগারোটা বেজে গেল। আমরা স্টিশনের কাছে একটি ধর্মশালায় গিয়ে উঠলাম। ডাক্তার কাটজু রোডের উপরে এই ধর্মশালাটি বেশ সুন্দর। এখানে তিন-চারদিন খুব হইচই কোরলাম। ত্রিবেণীতে স্নান কোরলাম। নৌকায় বসলাম। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর তিনটি ধারা একসঙ্গে দেখে খুবই আশ্চর্য লাগল। ওখানে নেহেরুজীর "আনন্দ ভবন" দেখতেও আমরা বাদ দিইনি।

এলাহাবাদ থেকে এলাম বারাণসী। এখানে স্বর্গীয় বীরেশ্বর পাঁড়ের ধর্মশালাতে আমরা উঠলুম। আমার ভয়ানক ভাল লাগল এই ধর্মশালাটি। কোলকাতার গোয়াবাগানে একদিন আমরা হেদুয়াতে বেড়াতে গিয়ে পাঁড়েজীর বাড়িটি দেখেছিলাম। পাঁড়েজীর সুযোগ্য পুত্র মনমোহন পাঁড়ে এই ধর্মশালাটি প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন। বাবার মুখে শুনলাম, "মনমোহন থিয়েটার" নামে কোলকাতায় একটি বিখ্যাত থিয়েটার ছিল তাঁর নামে বিডন ষ্ট্রীটে। এখন সে থিয়েটার নেই। ওখান দিয়ে নাকি এখন মস্ত রাস্তা বেরিয়ে গেছে। সারনাথে বুদ্ধদেবের একটি চমৎকার মন্দির দেখলাম। বুদ্ধ পুরহিতদের সুর করে মধুর মন্ত্রপাঠ এখনও আমার কানে বাজছে।

এরপর কোলকাতার পথে আসতে সারাক্ষণ ট্রেনে বসে বসে ঐ মধুর সুর আমার কানের মধ্যে গুঞ্জন করতে লাগল: বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। ধর্মং শরণং গচ্ছামি। সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

এরপর আমরা কলকাতায় এসে পৌছে গেলাম।

শ্রীনূপুর ঘোষাল (গোয়ালিয়ার)

খেলাধুলা

মেঠুড়ে

ক্রিকেট ঃ ভারত বনাম নিউজিল্যাণ্ড

অকল্যাণ্ডের শেষ টেস্টে ২৭২ রানে নিউজিল্যাণ্ডকে পরাজিত করে ভারতীয় ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের দ্বৈত সফর শেষ করে ভারতের মাটিতে আবার ফিরে এসেছে। বিদেশের মাটিতে প্রথম টেস্ট এবং 'রাবার' জয়ের কৃতিত্ব স্মরণীয় হয়ে রইলো।

একই সঙ্গে দুটো সফরের দু'রকমের ফলাফল। অস্ট্রেলিয়ার চারটে টেস্টেই পরাজয়। নিউজিল্যাণ্ডে চারটে টেস্টের মধ্যে তিনটেতে জয়, একটাতে পরাজয়। কিন্তু ভারতীয় দলের অস্ট্রেলিয়া সফরকেও আমরা ব্যর্থ সফর বলব না, কারণ পরাজিত হলেও ওখানকার সাহসী মনোভাব এবং চিত্তাকর্ষক ও প্রাণবন্ত ক্রিকেটের ফলেই খেলোয়াড়দের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এনে দেয় আর নিউজিল্যাণ্ডে তার পুরস্কার মেলে।

অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় নিউজিল্যাণ্ড অনেক শক্তিহীন। নিউজিল্যাণ্ডে ভারত ২-১ টেস্টে এগিয়ে থাকার পর 'রাবার' একরকম হাতের মধ্যেই এসে গিয়েছিল। অপর দিকে নিউজিল্যাণ্ডের খেলোয়াড়দের মধ্যে এসেছিল পরাজয় ভীতির প্রতিক্রিয়া। অকল্যাণ্ডে চতুর্থ টেস্টে তারই পরিচয় আমরা পাই।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ এবং অল্প অল্প বৃষ্টি দেখে নিউজিল্যাণ্ডের অধিনায়ক গ্রাহাম ডাউলিং টসে জিতে ভারতকে প্রথম ব্যাট করতে দেন। প্রথম দিন বৃষ্টির জন্যে ভারত মাত্র দেড় ঘণ্টার মতন সময় ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে আবিদ আলি ও ওয়াদেকারের উইকেট হারিয়ে ৬১ রান সংগ্রহ করে। দ্বিতীয় দিনেও বৃষ্টির জন্যে মাত্র কিছুক্ষণ খেলা চলা সম্ভব হয়। ভারত আরো দুটো উইকেট হারিয়ে ৪ উইকেটে ১৫০ রান সংগ্রহ করে। তৃতীয় দিন ২৫২ রানে ভারতের ইনিংস শেষ হবার পর নিউজিল্যাণ্ড ১০১ রানের মধ্যে ছ-টা উইকেট হারায়। প্রসন্নর প্রশংসনীয় বলের ফলে চতুর্থ দিনে ১৪০ রানে নিউজিল্যাণ্ডের ইনিংস শেষ হয়। ভারত বেপরোয়া মেরে খেলে চতুর্থ দিনের শেষে ৪ উইকেটে ২১৬ রান তুলে ৩২৮ রানে এগিয়ে থাকে। সুর্তি ৮১ রান করে নট আউট থাকেন। সম্ভবত সুর্তিকে সেঞ্চুরী করার সুযোগ দেবার জন্যেই পতৌদি ওই দিন ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন নি, কিন্তু সুর্তির দুর্ভাগ্য পঞ্চম দিনের সকালে ৯৯ রানের মাথায় তিনি আউট হয়ে যান। ভারত ৫ উইকেটে ২৬১ রান তুলে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। পরে ১০১ রানের মধ্যে নিউজিল্যাণ্ডের সকলে আউট হয়ে যান।

পতৌদি সফল অধিনায়ক। তিনি বিদেশের মাটি থেকে প্রথম 'রাবার' নিয়ে এসেছেন। তাঁর সাহসী মনোভাবই ভারতের সাফল্যের সোপান। সুর্তি, ইঞ্জিনিয়ার, ওয়াদেকার, প্রসন্ন, বোরদে সাহসী সংগ্রামে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

ক্রিকেটঃ ইংলণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

ইংলণ্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম দুটো টেস্ট অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার পর বারবাডোজে দু'দেশের তৃতীয় টেস্টেও জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি।

প্রথম দুটো টেস্টের মতন তৃতীয় টেস্টেও ইংলণ্ডের খেলোয়াড়রা চিত্তাকর্ষক ও প্রাণবন্ত খেলা খেলেন। তাদের নেতৃত্বে ছিল সংগ্রামী মনোভাব, ব্যাটিংয়ে আক্রমণাত্মক ভঙ্গি। টসে জিতে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ পেয়েও সোবার্সের দল প্রথম দিনে লাঞ্চের সময় পর্যন্ত ২ উইকেটে ৩৭ রান তোলে। দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চ পর্যন্ত তিনজনকে হারিয়ে ১৬৩। তৃতীয় দিনে লাঞ্চের সময় ৩৪৯ রানে তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। খেলোয়াড়দের ভেতর বুচারের ৮৬, সোবার্সের ৬৮ এবং ক্যামাচোর ৫৭ রানের মধ্যে শিল্পী-সুলভ মারের দৃষ্টান্ত ছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের স্নো-র বলের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিকাংশ খেলোয়াড়ই ভয়ে ভয়ে খেলে ছিলেন। যার ফলে স্নো ৮৬ রানে পাঁচটা উইকেট লাভ করেন।

তৃতীয় দিন লাঞ্চের পর ব্যাটিং আরম্ভ করে দিনের শেষে কোনো উইকেট না হারিয়ে ইংলণ্ড দল ১৬৯ রান তোলে। চতুর্থ দিনের শেষে ৮ উইকেটে ৪১২ এবং পঞ্চম দিনের সকালে ৪৪৯ রানে ইংলণ্ডের ইনিংস শেষ হয়। অর্থাৎ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ব্যাট করার সুযোগে প্রথম আড়াই দিনে যে রান করে, ইংলণ্ড দু'দিনেরও কম সময়ে তার চেয়ে ১০০ রান বেশী করে ইনিংস শেষ করে। শুধু তাই নয়, শেষ দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে বিপদেও ফেলে, মাত্র ৭৯ রানের মধ্যে তিনটে উইকেট ফেলে দিয়ে। গ্রেভনি ও ডলিভেরা যদি ঠিকভাবে ক্যাচ ধরতে পারতেন তবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপদ আরও বাড়ত। অবশ্য ওয়েস্ট ইণ্ডিজের লয়েড শেষ দিনে সেঞ্চুরী করেছেন। কিন্তু খেলার সব বিভাগে ইংলণ্ড দিয়েছে পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয়।

ব্যাডমিণ্টন

এবার অল ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা অনুষ্ঠিত হয় লণ্ডনের ওয়েমব্লীতে। এই প্রতিযোগিতায় উল্লেখ করার মতন ঘটনা ইন্দোনেশিয়ার আঠারো বছরের স্কুল ছাত্র রুডি হটোনোর চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ। হটোনোর আগে এত কম বয়সে আর কেউ বিশ্বের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান পাননি। সাতবারের অল ইংলণ্ড চ্যাম্পিয়ন এবং পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় ডেনমার্কের আর্ল্যাণ্ড কপসের পরাজয়ও কম উল্লেখযোগ্য নয়। কপস অবশ্য হটোনোর কাছে হারেন নি, হেরেছেন সেমি-ফাইন্যালে মালয়েশিয়ান তান আইক হুয়াংয়ের কাছে। ফাইন্যালে হটোনো হারিয়েছেন হুয়াংকে। হটোনো এবং তান আইক হুয়াং এশিয়ার দুই সুনিপুণ ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়। তাই এশিয়াবাসী হিসেবে রুডি হটোনোর জয় আমাদেরও গৌরবের বিষয়।

বাজিকর

বিভেদ বার করো

১। পাশের দুটি ছবিকে প্রায়ই এক রকম দেখতে। কিন্তু দুটির মধ্যে অনেক তফাত আছে। আঁকার দোষে কিংবা ইচ্ছা করে শিল্পী কোন কোন জায়গায় তফাত সৃষ্টি করেছেন তোমরা বার করতে পারো কিনা দেখ।
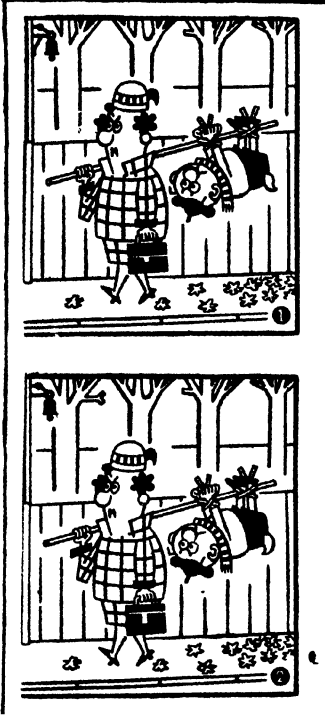
২। রাখিলে কি বস্তু বল চৌকির উপরে,
ঢালিবে সংগীত-সুধা শ্রবণ বিবরে।

শ্রীপদ্মি সরকার

৩। এমন কি বর্ণ যাহা করিলে হরণ
মুখরুচি খাদ্য এক করে উৎপাদন।

শ্রীসুদর্শন মুখোপাধ্যায়

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

সাধক থাকেন বনে নেইক সাধিকা,
পাচক ও ভৃত্য আছে নেই তো পাচিকা।
কবিপত্নী এসেছেন সাথে তাঁর কবি,
বৈষ্ণব এলেন সেথা সাথেতে বৈষ্ণবী,
চারণ এলেন এক এলেন চারণী,
তরুণ নহেন কেউ, নহেন তরুণী।

যুবক নহেন কেউ নহেন যুবতী,
গুণবান বটে তাঁরা আর গুণবতী।
অশ্ব চড়ে এল কেবা সাথে এক অশ্বা,
শিষ্য সে যে সাধকের, আসেনি তো শিষ্যা
বৃদ্ধ সব দেখে তাহা আর যত বৃদ্ধা,
ক্ষুব্ধ হন কেউ কেউ, কেউ হন ক্ষুব্ধা।
ছাগী ছিল সাধকের আর ছিল ছাগ,
বাঘিনী একটা নিল অপরটা বাঘ।
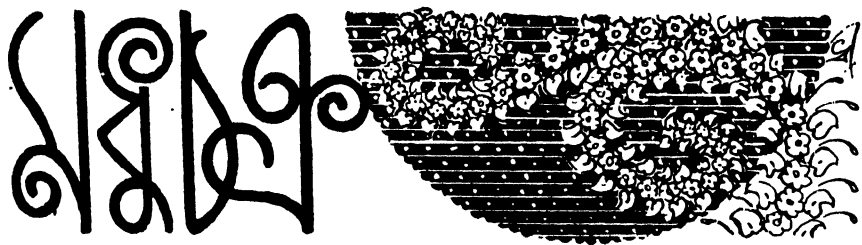
কাল কে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সমুদ্রের বুকে সদা-সর্বদা জেগে উঠছে অগুনতি ঢেউ-এর পর ঢেউ—আমরাও তেমনি ভেসে চলেছি কাল-সমুদ্রের বুকে। সেখানে চলছে অগুনতি বছরের পর বছরের আনাগোনা। একটি বছরকে আর একটি বছরে চিহ্নিত করার উপায় আমরা জেনেছি। তাই আমাদের হিসেব বারো মাসের শেষে পুরোনো বছরের অবসানে আবির্ভাব ঘটে নতুন বছরের।

বছরের হিসাব অঙ্কের খাতায় আর পঞ্জিকার পাতায় আঁচড় কাটতে থাকে, কিন্তু নতুন বছরের আগমন-বার্তা আমাদের কাছে পৌঁছে দেন প্রকৃতিদেবী। পাতা ঝরার দিনের শেষে কচি সবুজ কিশলয় উঁকি দেয় গাছের ডালে-ডালে, পাতার ফাঁকে। কানে ভেসে আসে নতুনের পদধ্বনি, জীবনের জয়গান। সমস্ত অন্তর দিয়ে তাকে জানাই স্বাগতম! সুস্বাগতম!!

নতুন বছরে তোমাদের জন্য ব'য়ে এনেছি নতুন উপহার। কাগজের বুকে কালির আঁচড় প্রথম কবে পড়লো তার নির্ভুল হিসেব সন তারিখ দিয়ে কেউ বলতে পারবে না। লেখার পর লেখা জমা হয়ে উঠেছে—বিরাট লেখার পাহাড়। সন্ধানী চোখ নিয়ে যদি কেউ খোঁজে তাহলে সেই পাহাড়ের গুহায় দেখতে পাবে অক্ষয় রত্নের ভাণ্ডার। সেই ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করে এনেছি তোমাদের জন্য সোনার লেখা, তারই প্রথম পরিচয় তুলে ধরেছি মন দিয়ে পড়বে, ভাববে। মনের পর্দায় চিরকালের জন্য আঁকা হয়ে থাকবে।

আরো একটু বড় হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'আনন্দমঠ' পড়বে—এখন তার উপক্রমণিকাটুকু দেখো—

অতি বিস্তৃত অরণ্য। অরণ্যমধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল, কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও অনেক জাতীয় গাছ আছে। গাছের মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্তশ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদশূন্য, ছিদ্রশূন্য, আলোকপ্রবেশের পথমাত্রশূন্য; এইরূপ পল্লবের অনন্ত সমুদ্র, ক্রোশের পর ক্রোশ, ক্রোশের পর ক্রোশ, পবন তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে। নীচে ঘনান্ধকার, মধ্যাহ্নেও আলোক অস্ফুট, ভয়ানক! তাহার ভিতরে কখন মনুষ্য যায় না। পাতার অনন্ত মর্মর এবং বন্য পশুপক্ষীর রব ভিন্ন অন্য শব্দ তাহার ভিতর শোনা যায় না।

একে এই বিস্তৃত অতি নিবিড় অন্ধতমোময় অরণ্য, তাহাতে রাত্রিকাল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। রাত্রি অতিশয় অন্ধকার; কাননের বাহিরেও অন্ধকার; কিছু দেখা যায় না। কাননের ভিতরে তমোরাশি ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের ন্যায়।

পশুপক্ষী একেবারে নিস্তব্ধ। কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সেই অরণ্যমধ্যে বাস করে। কেহ কোনো শব্দ করিতেছে না। বরং সে অন্ধকার অনুভব করা যায়—শব্দময়ী পৃথিবীর সে নিস্তব্ধভাব অনুভব করা যাইতে পারে না। সেই অতিশূন্য অরণ্যমধ্যে, সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধতামধ্যে শব্দ হইল, "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?"

শব্দ হইয়া আবার সে অরণ্যানী নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল; তখন কে বলিবে যে এ অরণ্যমধ্যে মনুষ্যশব্দ শুনা গিয়াছিল? কিছুকাল পরে আবার শব্দ হইল, আবার সেই নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া মনুষ্যকণ্ঠ ধ্বনিত হইল, "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?"

এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকার সমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল, "তোমার পণ কি?"

প্রত্যুত্তরে বলিল, "পণ আমার জীবনসর্বস্ব।"

প্রতিশব্দ হইল, জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"

"আর কি আছে? আর কি দিব?"

তখন উত্তর হইল, "ভক্তি।"

সাত বছর আগে এমনি একদিনে যিনি মহাকাশ অভিযানে প্রথম সাফল্যলাভ করলেন, তাঁকে আমরা এই সাফল্যলাভের কিছুদিনের মধ্যেই কোলকাতায় দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। রাশিয়ার এই আকাশচারী বীর যুবকটিকে মনে হয়েছিল কত আপনার—। তাঁর গর্বে সেদিন গর্ব বোধ করেছিল সারা পৃথিবীর মানুষ। দূরের আকাশ মানুষকে কতকাল হাতছানি দিয়েছে, কত কবির মনে জুগিয়েছে প্রেরণা, কত মনুষ দেখেছে দুঃসাহসের স্বপ্ন, তারপর একদিন বিজ্ঞানীরা ঘুচিয়ে দিলেন আকাশের দূরত্ব, রহস্য—কিন্তু এখানেই থেমে গেল না বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। এবার মহাকাশের পালা! অবাক বিস্ময়ে পৃথিবীর মানুষ শুনলো এই অসম সাহসী তরুণ রুশ বৈমানিক যুরি গ্যাগারিন সাফল্যের সঙ্গে পাড়ি দিয়ে এলেন মহাকালের বুকে। গ্যাগারিনই প্রথন মর্ত্যের মানুষ যিনি পৃথিবীর সঙ্গে দূর মহাকাশের সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব করে গেলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় নভোচারী এই মানুষটি

পৃথিবী থেকে মিলিয়ে গেলেন। তাঁর মৃত্যু-সংবাদ সারা পৃথিবীর মানুষের মনে সঞ্চার এক পরম আত্মীয়বিয়োগ ব্যথা। মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে যাঁর জীবনান্ত ঘটলে স্মৃতি অনন্তকাল ধরে জমা হয়ে রইল মানুষের অন্তরে।

চিঠির উত্তর

চিত্ত মাইতি, হলদিয়া বন্দর—তোমার কবিতাটি ছাপা হবে।

কামারুজ্জামান, মোহনপুর—এই তোমার চিঠি পেলাম। আগের চিঠি তো পাই শিশু-উপন্যাসের নাম জানতে চেয়েছ যাঁর, তিনি ছোটদের জন্য অজস্র লিখেছেন, ি উপন্যাস কই পাইনি।

সন্তোষকৃষ্ণ গুপ্ত, রাঁচী—হ্যাঁ, আমরা দেবদেবীকে নানাভাবে কল্পনা করতে অভ্য তাঁদের স্তুতির জন্য কত স্তব রচনা হয়েছে, মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে, তাঁদের বেশভূষার বি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করলে এই সব বিবরণের মধ্যে কোথাও না কোথাও পার্থ চোখে পড়বে—তুমি যে দু'টি লিখেছ, দু'টিই ঠিক।

অভিজিত, ঝুমঝুম, কুমকুম বাগচি, বর্ধমান—তোমাদের প্রশ্ন পরিষ্কার নয়। তো কি প্রথম ছাপা বই-এর কথা লেখেছ? ভাল করে জানিও।

মালবিকা চক্রবর্তী, কোলকাতা; হীরা ও মোহর, যাদবপুর; কোলকাতা; নন্দিনী ঘ বৈঠকখানা রোড; শ্রাবণী পত্রনবীশ, রাধারাণী দত্ত, কোলকাতা; কৌশিক, কুণাল, শা নিকেতন; অনির্বাণ, অনুষ্টুপ চক্রবর্তী, নন্দিনী ঘটক, অনীতা ও মালবিকা চক্রব কোলকাতা,—চিঠি পেলাম। সকলের জন্য শুভেচ্ছা রইল।

তোমাদের

মধুদি'

শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক :: শ্রীসুপ্রিয় সরকার
মূল্য : ০·৫০ পয়সা
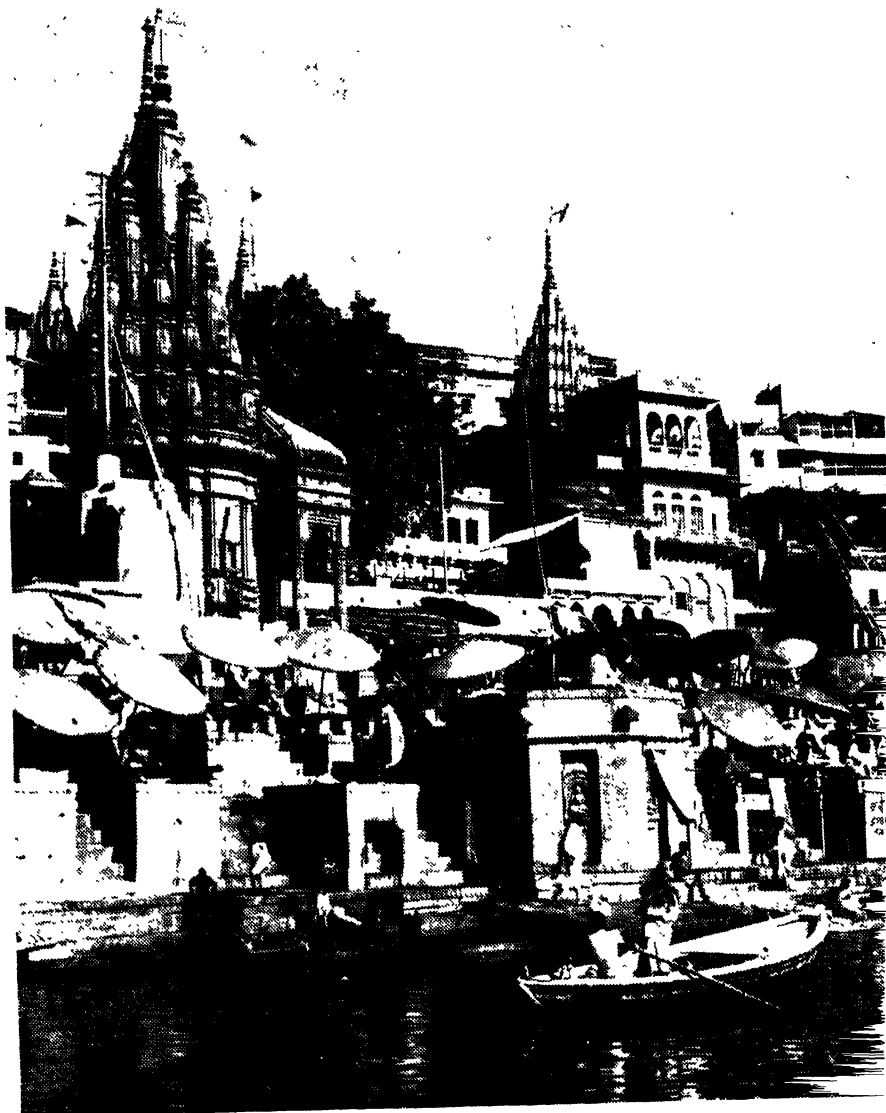
কাশীর ঘাট

আলোকচিত্র : শ্রীঅরুণ সেনগুপ্ত

❋ ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র ❋
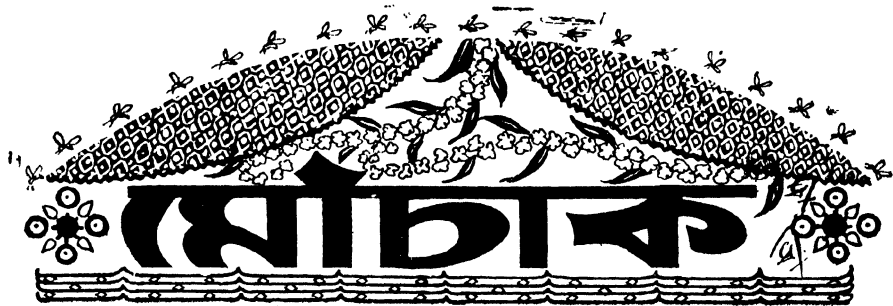
৪৯শ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ : ১৩৭৫ [২য় সংখ্যা

এক যে ছিল শেয়াল

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু

এক যে ছিল শেয়াল,
সে দাঁতে কাট্‌ত দেয়াল।
রান্নাঘরে ঢুকে রোজ,
পান্তা ভাতে লাগায় ভোজ।
মাখবে ভাতে তেঁতুল-নুন্;
মাছ পেল তো হেসেই খুন।
কল্‌সি ভাঙে জল খেতে।
শোয় বনে সে চট্ পেতে।
নাক ডাকে তার বেজায় জোরে।
ল্যাজটি নড়ে ঘুমের ঘোরে।

চোর-শেয়ালের জ্বালাতনে

কাতু বাবু পাত্‌ল ফাঁদ।
পড়্‌ল ধরা সোনার চাঁদ।
কাতু তখন বলে হেসে—
'ওরে শেয়াল সব্বনেশে,
রোজ খেয়ে যাও হাঁড়িটা,
দেখাই যমের বাড়িটা।'
এই-না ব'লে পিটোয় লাঠি।
শেয়াল কেঁদে ভেজায় মাটি।
কাতুর দু'পা জড়িয়ে ধ'রে,
বলল কেঁদে বিনয় ক'রে—
'আর মেরো না, ক্ষমা করো।
প্যাস্তা হ'তে প্রাণটা বড়ো।
এবার ছাড়ো পালাই বনে।
শিক্ষা তোমার থাক্‌বে মনে।'

মার্‌ল কাতু লাথি পেটে,
ল্যাজটা দিল পুঁচিয়ে কেটে।
লাফায় শেয়াল যন্ত্রণাতে।
বেজায় জব্দ কাতুর হাতে।
কাটার জ্বালা কম্‌লে কিছু,
বল্‌ল মাথা ক'রে নীচু—
'ল্যাজের সঙ্গে গেল মানটা
বেঁচে যেতুম গেলে প্রাণটা।
জাত-ভায়েদের সাম্‌নে গিয়ে
দাঁড়াব না এ মুখ নিয়ে।

হয় আমাকে প্রাণে মারো,
নয় ক'রে দাও চাকর কারো।'

কাতুর হ'ল দুঃখু ভারী,
রাখল তাকে নিজের বাড়ি।
পরদিন থেকে লাগল খাট্‌তে।
শিখ্‌তে লাগল দু'পায় হাঁটতে।
শেয়াল হ'ল বেজায় ভদ্দর।
গায়ে চড়ায় খাঁটি খদ্দর।
গড় করে রোজ গিন্নি-মাকে।
'চুয়া' ব'লে সবাই ডাকে।
দু'বেলা সে বাসন মাজে;
দু'কুড়ি পান যত্নে সাজে।
ছেলে-পিলের সঙ্গে খেলে;
কাপড় কেচে রোদে মেলে।
কুকুর-বেরাল দেখ্‌লে তাড়ায়;
চোর আসে না ভয়ে পাড়ায়।
খুঁৎ থাকে না চলা-বলায়;
আধুনিক সুর ভাঁজে গলায়।
বল্লে তামাক সেজে আনে;
জ্বালায় টিকে পাঁচটি টানে।
কত্তা হাঁকেন, 'তামাক, চুয়া।'
জবাব সে দেয়, 'হুক্কা হুঁয়া,
কল্কে হিঁয়া, বেরোয় ধুঁয়া।
দেখ্‌ছি ফুঁকে দুনিয়া ভুয়া।

ক্যা-হুয়া, ক্যা-হুয়া, মৌজ হুয়া;

খাড়ী ছাগলের গলায় হাঁড়ি

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

সেবার গরমের ছুটিতে মেজবৌদি তাঁদের পাড়াগাঁয়ের বাড়ীতে গিয়ে আম খাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি লিখলেন। তাঁর বাগানের রাশি রাশি রসালের বিশদ বর্ণনা সরস করে তুলল রসনাকে। যেদিন ছুটি হল তার পর দিনই বাসে চড়ে রওনা হওয়া গেল।

সখের বাজারে নেমে চাপলাম একটা রিক্সায়। মাইল দুই যাবার পর রিক্সা এসে থামল একটা মোড়ের মাথায়। এখান থেকে মাইল খানেক পায়ে হেঁটে তারপর গিয়ে পৌছনো যাবে মেজবৌদির পল্লীভবনে।

কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে চলতে লাগলাম। দু'ধারে কোথাও বন-ঝোপ, কোথাও বা খোলা মাঠ, মাঝে মাঝে দু'চারটি মাটির ঘর, বাড়ীর লাগাও পানাপুকুরে পাতিহাঁসেরা সাঁতার কাটছে আর প্যাঁক প্যাঁক করছে। ছায়া-ছায়া রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে মনটা যেন স্নিগ্ধতায় ভরে উঠেছে।

বাড়ীটা বের করতে খুব বেগ পেতে হল না। রাস্তার একজন লোকের কাছে মেজদা'র নাম করতেই সে খুশীমনে যথাস্থানে আমাকে পৌছে দিয়ে গেল।

বাড়ীর ভেতরে ঢুকেই তো একেবারে চক্ষুস্থির! সেই অবেলায় রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে বঁটি দিয়ে মহা উৎসাহে আম কাটছেন মেজবৌদি, বঁটির দু'পাশে রাশ-করা পাকা আম। রসে টসটস করছে। আমার ক্ষুদে ক্ষুদে ভাইপো এবং ভাইঝিরা বসেছে গোল হয়ে। অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বৌদি এক-একটা আম কেটে ছেলেমেয়েদের হাতে দিচ্ছেন আর সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলোর গতি হচ্ছে যথাস্থানে।

আমাকে দেখেই একগাল হেসে বৌদি বললেন—"আরে ঠাকুরপো যে, কি ভাগ্যি, ঠিক সময়েই এসে পড়েছ। নাও বসে পড় ভাই।"

আমার বছর পাঁচেকের ভাইঝিটি একমনে একটা আমের আঁটি চুষতে চুষতে হাতীর দাঁতের মতো সাদা করে ফেলেছিল, সেটাতে রসবস্তু বলে আর কিছু ছিল না বলেই বোধকরি মাটিতে ফেলে দিয়ে বলে উঠল—"খাও বড় কাকু, ভারী মিষ্টি আম।"

মাতা-পুত্রীর সাদর আমন্ত্রণকে তো উপেক্ষা করা যায় না, বসে পড়লাম মাটিতেই।

আমাদের আম খাওয়ার পালা শেষ হলে পর বৌদি আমের খোসা এবং আঁটিগুলো সরু মুখওয়ালা উনুনের ধোঁয়ায় মিশকালো একটা পুরনো মাটির হাঁড়িতে ভরতি করে ঘরের বাইরে চলে গেলেন। আর আমি বৌদির আম দরবার থেকে উঠে ভাইপো-ভাইঝিদের নিয়ে চলে এলাম আমার জন্যে নির্দিষ্ট খাস কামরায়। বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম।

প্রথমে উল্লম্ফন, তার পরেই দ্রুত ধাবন, দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে গোটা মাঠটা চক্কর দিতে লাগল কালী। হাঁড়িটাও গলায় এমন ভাবে লেপটে রয়েছে যে, পড়ে যাওয়া তো দূরের কথা, একটু নড়ছে না পর্যন্ত। মনে হচ্ছে যেন ক্রমশঃ আরো আরো জোরে চেপে ধরছে ছুটে-চলা কালীর গলা। আর কুকুরগুলোও তার পেছনে পেছনে সমান বেগে ছুটছে তো ছুটছেই। মুহূর্তকালের জন্যেও থামছে না তাদের কানে-তালি-লাগানো একঘেয়ে ঘেউ ঘেউ শব্দ। ওদিকে অন্য পশুগুলো বনঝোপের কিনারায় সরে গিয়ে সভয়ে তাকিয়ে আছে মাঠের দিকে পাড়ার ছেলে-বুড়ো অনেকেই মাঠে এসে জড়ো হয়েছে নিখরচায় মজা উপভোগ করবার জন্যে। মজাই বটে! ছেলেমেয়েরা উল্লাসে ফেটে পড়ছে, জোরে জোরে হাততালি দিচ্ছে, আর ওদিকে কালা মহাকালী হয়ে মাঠের বুকে তাণ্ডব নৃত্য জুড়ে দিয়েছে।

সার্কাসে বাঘ সিংহের খেলা দেখে বহুবার রোমাঞ্চিত হয়েছি, সালংকারা বানরীর মন হরণের জন্যে রঙিন জামা পরা বাঁদরের নৃত্য-লীলা উপভোগ করেছি ফুটপাতে দাঁড়িয়ে। কিন্তু এই অজ পাড়াগাঁয়ের খোলা মাঠে কালী নাম্নী অজা যে খেল দেখাচ্ছে তার কাছে কোথায় লাগে ওসব কেরামতি। রূপসজ্জাও নিতান্তই সাদামাঠা। একটি মাত্র কালো হাঁড়ি গলায় পরে, এক ধাড়ী ছাগল যে এমন কিম্ভূতকিমাকার বিকট মূর্তি ধরতে পারে, নিজের চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা সম্ভবপর ছিল না।

খানিকটা সময় কেটে গেছে। আমি মেজবৌদির আণ্ডা-বাচ্চাদের নিয়ে যেখানে বসেছি তার অনতিদূরেই একটা বটগাছের চারপাশে এবার কেন জানি না ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে কালী। হঠাৎ গাছের শক্ত কাণ্ডের সঙ্গে লাগল প্রচণ্ড ধাক্কা, আচমকা জোর আওয়াজ করে হাঁড়ি ভাঙল হাটে নয়, মাঠে। আর তখখুনি হাঁড়ির ভাঙা টুকরোর সঙ্গে ঘাসের ওপর গড়িয়ে পড়ল, চোষা আম আঁটি, আমের খোসা আর খানিকটা থেঁতলে যাওয়া শাঁস। দু'একটা আমের খোসা কালো পাথরের উপর সবুজ শেওলার মতো লেপ্টে রয়েছে কালীর কপালে। গোটা মুখটা রসে ভিজে সপসপ করছে, দাঁড়ি বেয়ে টসটস করে ঝরছে আমের রস। মুখের কালো ঢাকাটা ভেঙে যাওয়াতে নিরীহ, স্বাভাবিক এবং রসময়ী মূর্তিতে আমাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করল কালী। কিন্তু হাঁড়িটা খানখান হয়ে ভেঙে গেলেও, তার কানাটা মালার মতো শোভা পাচ্ছে তার গলায়।

খানিকক্ষণ হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে রইল কালী। তার রকম-সকম দেখে মনে হচ্ছিল, কি যে সব অঘটন ঘটে যাচ্ছে তা সে ঠিক ঠাহর করতে পারছে না, মাঠে মানুষের মেলা দেখে আরো যেন অবাক হয়ে গেছে সে। ওদিকে মুখাবরণ চুরমার হয়ে তার ছাগলত্ব প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সবগুলো জন্তু জানোয়ার একযোগে তাড়া করল তাকে। কুকুরগুলো বৃথাই এতক্ষণ ভয়ে ভয়ে বেশ খানিকটা ব্যবধান বজায় রেখে তার পেছনে পেছনে ছুটে মরেছে। তাদের রাগ এবং আক্রোশই সব চেয়ে বেশী। এবার যেন ক্ষেপে উঠল তারা—সব কয়টা বুঝি একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে কালীর উপরে।

হঠাৎ পড়ি-তো-মরি করে মাঠের লাগাও বনের ভেতর দিয়ে ছুট দিল কালী, কোনো ছাগলকে এত জোরে ছুটতে কখখনো যে কেউ দেখেনি, একথা আমি হলপ করে বলতে পারি।

আসামী হলো বিচারক

শ্রীসমর মজুমদার

বিচার সভা বসেছে। চারদিকে অনেক অনেক লোক বিচার শোনার জন্যে এসে জমেছে। মিলিটারী ফৌজও অনেক। পাহারা দিচ্ছে। কখন কি হয় বলা তো যায় না! দ্বিতীয় দিনের বিচার সভায় সরকার পক্ষ এমন জব্দ হয়েছেন, তৃতীয় দিনের অধিবেশনে কিছুতেই তাঁরা আসামীকে আনতে নারাজ। 'নারাজ' ব্যাপারটা প্রকাশ্যে তো প্রকাশ করা যায় না! জনসাধারণ এতে ক্ষেপে যাবে—সেই ভয়ও আছে সরকার পক্ষের।

তৃতীয় দিনের বিচার সভা বসলো। বিচার সুরু হওয়ার আগে সৈন্যাধ্যক্ষের হাত থেকে একটা কাগজ নিয়ে প্রধান বিচারপতি সেটা পড়লেন। সেই কাগজের বক্তব্য—আসামী খুব অসুস্থ।

বিচারপতি দেখলেন, তাঁকে আসামীর অনুপস্থিতিতেই বিচারের কাজ সারতে হবে। তাছাড়া উপায় কী! ডাক্তাররাও রিপোর্ট দিয়েছেন—আসামী অসুস্থ।

বিচারপতি বিচারের কাজ সুরু করতে যাবেন এমনি সময় একটি মেয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'মাননীয় বিচারপতি মশাই, আসামী মোটেই অসুস্থ নন।' ওর কথা শুনে সারা বিচারসভাতো থ! এরই মধ্যে আবার মেয়েটি সুরু করলো—'আসামী নিজে আমার হাতে এই চিঠি আপনাকে দিয়েছেন।'

বিচারপতি আসামীর হাতের লেখার সঙ্গে চিঠির মিল করে নিলেন। দেখলেন, ঠিক আছে।

আসামী লিখেছেন—'মাননীয় বিচারপতি, আমি যাতে বিচারকালে বিচার সভায় উপস্থিত না থাকতে পারি, তার জন্য জঘন্য ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছে। এর কারণ কী? এর কারণ হলো, বর্তমান সরকারের কুৎসিৎ চেহারাটা খুলে দেবার জন্যে আমরা যে চেষ্টা করছি, তা বন্ধ করা; যেভাবে আমার বন্ধুদের হত্যা করা হয়েছে, সেই কথা প্রকাশ করতে আমার চেষ্টাকে বন্ধ করা। আমি বিচার সভায় উপস্থিত হলে আমাদের নামে সরকারের মিথ্যা কাহিনী মিথ্যা বলে প্রমাণ করতে পারবো—একথা সরকার জানেন। আমি যাতে বিচার সভায় উপস্থিত না হই সেই কারণে প্রচার করা হয়েছে, আমি অসুস্থ। আমি মোটেই অসুস্থ নই। সম্পূর্ণ সুস্থ। আমি আপনাদের কাছে উপস্থিত হতে চাই। সত্যি কথা বলে মৃত্যু বরণ করাকে আমি শ্রেয় মনে করি। আপনাদের কাছে আমার কথা পৌঁছে দেবার জন্যে আমার তরুণী সাথীর উপর দায়িত্ব দিয়েছি।'

এই কথা মুহূর্তে দেশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো—হাজার হাজার সৈন্য যেখানে পাহারা দিচ্ছে তার ভেতর দিয়ে কিভাবে সামান্যা একটি মেয়ে দেশসেবক আসামীর চিঠি

গেলো। সাধারণ মানুষরা দেশসেবক আসামীর দিকে ঝুঁকে পড়লো। তাঁকে শ্রদ্ধা জানালো মনে মনে।

অপরদিকে সরকার পক্ষও খেপে আগুন। এত সৈন্য-সামান্ত, এত ব্যবস্থা! সব ফু! একটা সামান্যা মেয়ে সব ভেস্তে দিলে!

আসামীকে এবার নির্জন কারাগারে রাখা হলো। জনসাধারণ যাতে সরকারের ওপর খাপ্পা না হয়, সেইজন্যে শেষ পর্যন্ত আসামীকে বিচার সভায়ও কিন্তু কথা বলার সুযোগ দেওয়া হলো। তবে বিচারের সময় যাতে বাইরের লোক ঢুকতে না পারে তারও ব্যবস্থা করা হলো।

আসামী জঘন্য সরকারের সমস্ত কথা ফাঁস করে দিলেন। তিনি বললেন—এদেশে সাধারণ মানুষের কোন স্বাধীনতা নেই। এদেশের বড়লোক অনেক অনেক বড়; আর এদেশের বেশির ভাগ মানুষ গরীব। দিনের পর দিন গরীব আরও গরীব হতে চলেছে। এদেশে যাঁরা সাধারণ মানুষের মুক্তির কিছু কথা বলেন, তাদেরকে বলা হয়—দেশদ্রোহী।...'

আরো অনেক কথা তিনি বললেন। সরকারের ছদ্মবেশী মুখোশ খুলে দিয়ে আসল চেহারাটা প্রকাশ করলেন। সংবিধানের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করে তিনি দেখালেন—সরকারের গড়া সংবিধান পর্যন্ত সরকার ভেঙেছেন।

বিচারপতিরা রেহাই দিলেন না ওঁকে। পনেরো বছরের জন্য জেল হলো। ওঁর বন্ধুদেরও জেল হলো—কারো বা তেরো, কারো বা আরো কিছু কম।

পনেরো বছরের জেল—রায় দিয়ে খালাস হলেন বিচারপতিরা, কিন্তু জনসাধারণের রায় হলো অন্যরকম। ওরা বিভিন্ন দিক থেকে আওয়াজ তুললো—মুক্তি চাই, মুক্তি চাই, আমাদের বন্ধুর মুক্তি চাই।

দেশের মানুষ ক্রমে ক্রমে এমনই ক্ষেপে উঠলো যে, সরকার ভয় পেয়ে গেলেন। ভয়ে ভয়ে সরকার ছেড়ে দিলেন ওঁকে আর ওঁর বন্ধুদের। আসামী বেরিয়ে দেখলেন, দেশের সমস্ত গরীব মানুষ ওঁদের বন্ধু। জনসাধারণের কাঠগড়ায় তিনিই বিচারক আর সরকারপক্ষ হলেন আসামী।

আসামীর বিচার করলেন মানবদরদী বিচারক! বিপ্লবের স্রোতে ভাসিয়ে দিলেন আসামীকে। বিচারের রায় হলো বিপ্লব; আর বিপ্লবের ফল হলো—নতুন পৃথিবীর সৃষ্টি।

খেটে খাওয়া গরীব মানুষের সরকার হলো প্রতিষ্ঠিত। মুক্তির আনন্দে হেসে উঠলো সমস্ত দেশ।

আর—চারদিকে ধ্বনিত হলো—'ফিডেল কাস্ট্রো জিন্দাবাদ; কিউবার বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।'

হিংসুটে কাকের গল্প

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

সুপু ও অপু দুই ভাই-বোন।

সুপু মন দিয়ে পড়াশোনা করত, ফলে সে পরীক্ষায় ভালভাবে পাশ করল। অপু পড়াশোনা করত না মোটেই, ঘুরে ঘুরে কেবল খেলে বেড়াত। পরীক্ষাতে তাই ভাল ফল দেখাতে পারল না সে, টেনেটুনে কোন রকমে পাশ করল। বাবা, মা—বাড়ির সকলে সুপুকে ভাল বলল। কিন্তু অপুকে কেউ ভাল বলল না, বরং বাবা বকলো, মা বকলো।

সুপুর উপর বড় রাগ হল অপুর। হিংসেও হল—সবাই দিদিকে ভালবাসে, ভাল বলে, আর তাকে শুধু বকে। নেহাৎ সুপু বয়সে বড়, দিদি হয়, নইলে—নইলে কি করত অপু—টান মেরে দিদির খাতা নিয়ে ছিঁড়ে ফেলল, বলল—পড়ি না তাই, নইলে তোর চেয়ে ভালভাবে পাশ করতাম।

সুপু রাগ করল না। ভাই-এর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল—অত রাগ করছিস কেন? হিংসে হচ্ছে বুঝি? বেশ তো, তুই মন দিয়ে পড়াশোনা কর, সামনের বছর আমার থেকে পরীক্ষায় অনেক ভালভাবে পাশ করবি। বাড়ির সকলে তখন তোকে কত ভাল বলবে কত ভালবাসবে, দেখিস। শুনে আমার একটুও রাগ হবে না, বরং খুব আনন্দ হবে। তুই মিথ্যে শুধু আমাকে হিংসে করছিস।

ওদের দাদু একটু তফাতে বসে ওদের কাণ্ড দেখছিলেন। সুপুর কথা শুনে উঠে এলেন। অপুকে বললেন—ছিঃ! দাদুভাই, দিদির খাতা ছেঁড়া তোমার উচিত হয়নি। দিদিকে হিংসে করলে লোকে তোমাকে আরো খারাপ বলবে। বাবা, মা বই ছেঁড়ার কথা জানতে পারলে, তোমাকে মারধর করবেন। সেটা কি ভাল? না, তোমার দিদি যা বলল—তাই ভাল, মন দিয়ে পড়াশোনা কর, সবাই ভালবাসবে। হিংসে করলে তোমার দিদির কিছু যায়-আসে না, কোন ক্ষতি হবে না তার। হিংসের ফল তোমাকেই ভুগতে হবে শেষে। জেনে রেখো—হিংসের ফল কখনও ভাল হয় না।

একটা গল্প বলছি, শোন—বলে দাদু শুরু করলেন—

রাজা নয়, মন্ত্রী নয়, সওদাগরও নয়,—এমন কি বাঘ-সিংহ হাতী ঘোড়াও নয়—এক ছিল পুরানো বটগাছ। সেই গাছে এক কাক থাকত। কাকের মনটা ছিল হিংসেতে ভরা। কারো ভাল সে দেখতে পারত না, কারো প্রশংসা সে সইতে পারত না। সকল বিষয়ে সে নিজেকে বড় বলে ভাবত।

একবার এক টিয়ে পাখি ঘুরতে ঘুরতে এসে ঐ গাছে বাসা বাঁধল। টিয়ে পাখিটি

দেখতে খুব সুন্দর ছিল। গায়ে সবুজ কচি পাতার মতো রঙ, লাল গোলাপের মতো ঠোঁটখানি টুকটুকে। পথে যেতে যেতে লোকে তাকিয়ে তাকিয়ে তাকে দেখতো,—দেখে বলত —আহা! কি সুন্দর পাখি! রূপ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়! ভগবান হয়তো সুন্দর কিছু একটা চিন্তা করে ছবি আঁকতে ব'সে, তাকে তুলির পরশে জীবন্ত করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। কোন শিল্পীর চোখে পড়লে সে নিশ্চয় তার ছবি আঁকবে, কবির চোখে পড়লে তাকে নিয়ে কবিতা লিখবে।

শুনে কাকের বড় হিংসে হল। ভাবল—এখানে টিয়ে আসাতে, কেউ আর তার দিকে ফিরেও দেখে না। সকলে টিয়েকে নিয়ে ব্যস্ত, তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ভুলে কেউ তার নামও একবার মুখে আনে না। হিংসেতে ফেটে পড়ল কাকের মন। টিয়েকে ডেকে বলল—ওহে, তুমি নিজেকে কি খুব সুন্দর বলে মনে করো? যদি তাই মনে করে থাক, তবে জেনো—ভুল করেছ। মানুষের কথা তুমি বোঝ না, তারা কি বলে—তুমি তা জানো না। আমি অনেক দিন হল এখানে আছি, রোজই দু'বেলা সামনের পথ দিয়ে কত লোককে যেতে-আসতে দেখছি, তাদের কথা বলতে শুনছি। কাজেই মানুষের কথা আমি কিছু কিছু বুঝি। তারা তোমার চেহারা দেখে নাক সিঁটকিয়ে বলে--আহা, কি রূপের ছিরি! ভগবানের হাতে আর কাজ ছিল না, তাই এমন এক বিটকেল পাখি গড়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন! যেমন তার শুঁয়াপোকার মতো গায়ের রঙ, তেমন বলি-দেওয়া পাঁঠার শুকনো জমাট রক্তের মতো তার ঠোঁটখানির রঙ! আরে ছিঃ! এটা একটা পাখি নাকি! তোমার নিন্দে শুনতে আমার মোটেই ভালো লাগে না। মনে বড় দুঃখ হয়। তাই বলছি, তুমি বরং অন্য কোথাও উড়ে যাও।

টিয়ের মনে মনে বড় হাসি পেল। লোকে তার রূপের প্রশংসা করে দেখে কাকের হিংসে হচ্ছে। ছলে-বলে-কৌশলে তাই তাকে এখান থেকে তাড়াতে চাচ্ছে। টিয়ে বোঝে সবই, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলল না কাককে। হিংসুটে কাকের সংগে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ঝগড়া হতে পারে তাতে। হয়তো বা কাক রেগে-মেগে তার চোখ মুখ ঠুকরে দেবে। হিংসুটেদের বিশ্বাস করা যায় না, তারা সব কিছু করতে পারে। টিয়ে শান্তি চায়, ঝগড়া চায় না। সুতরাং সে সেই বটগাছ ছেড়ে উড়ে গেল।

কিছুদিন বাদে এক কোকিল সেই বটগাছে এসে বাসা বাঁধল। বড় মিষ্টি গলা কোকিলের। চমৎকার গান করত সে! তার গানে চারিদিক মেতে উঠত। দূর থেকে বাতাস নাচতে নাচতে ছুটে আসত, ডালে ডালে শাখায় শাখায় গাছের পাতা দোদুল দোলায় দুলে উঠত। মন-ভোলানো পাগল-করা তার গানের সুর! লোকে তার গান শুনে মোহিত

হয়ে যেত। বলত—আহা! কি মিষ্টি গলা কোকিলের! ভগবান হয়তো কোনদিন পুতুল গড়তে বসে তার মনের যত আনন্দ, যত খুশি সব যেন এই পুতুল-রূপী কোকিলের কণ্ঠে ঢেলে দিয়েছেন। আমাদের গান শুনিয়ে আনন্দ দিতে, খুশি করতে, যেন কোকিল এই পৃথিবীতে নেমে এসেছে!

হিংসেতে আবার কাকের গা জ্বলে উঠল। সে যে 'কা-কা' রবে গান করে, সেটা কি শুনতে খুব খারাপ লাগে? ক'জন অমন চেঁচিয়ে গান করতে পারে? কই লোকে তো তার প্রশংসা করে না। না, এই কোকিল এখানে থাকলে কেউ তার গান শুনবে না—জোর করে শুনালেও শুনবে না। লোকে তাকে ভুলে যাবে। কোকিলকে ডেকে কাক বলল—ওহে, তুমি কি ভাব, তুমি খুব ভাল গান কর? যদি তাই ভেবে থাক, তবে যেনো—ভুল করছ। মানুষের ভাষা তুমি বোঝ না, তারা কি বলে—জানো না। আমি অনেকদিন হল এখানে আছি, রোজই দু'বেলা সামনের পথ দিয়ে কত লোককে যেতে-আসতে দেখছি, তাদের কথা বলতে শুনছি। কাজেই মানুষের কথা আমি কিছু কিছু বুঝি। তারা তোমার গানের নিন্দা করে। আমি গান গাইলে কানে আঙুল চাপা দিতে বলে—হতচ্ছাড়া পাখির চীৎকারে কান দুটো ঝালাপালা হয়ে গেল, ওর গুঁতোয় এ-পথে আর হাঁটা যাবে না দেখছি! তোমার নিয়ে এই সব কথা শুনতে আমার একটুও ভালো লাগে না, মনে বড় দুঃখ হয়; তার চেয়ে তুমি বরং অন্য কোথাও উড়ে যাও, ভাই।

শুনে কোকিলের হাসি পেল। লোকে তার গান শুনে প্রশংসা করে ব'লে কাক হিংসাতে জ্বলে যাচ্ছে। এটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধি কোকিলের আছে। কাক কি তাকে এতই বোকা মনে করেছে। মিটিমিটি হেসে কোকিল বলল—আমার জন্য তুমি দুঃখ করো না, দাদা। আমার গান যদি তাদের ভালো না লাগে, গাইব না আর। গণ্ডগোল মিটে গেল। এতে তোমাকে আর আমার নামে নিন্দে শুনতে হবে না, আমাকেও এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে না। তুমি তো বড় গাইয়ে, দাদা—যাকে বলে ওস্তাদ! তোমার কাছে থাকলে দু'একটা গান কি আর চেষ্টা করে শিখতে পারব না? খুব পারব, তোমার মতো ওস্তাদকে গুরু পেলে ঠিকই পারব!

কাক নিজের প্রশংসা শুনে খুশি হয়ে বলল—ভাল গায়তে না পারলেও গান কিছু কিছু বোঝ, দেখছি। লোকেও আমার গান শুনে বাহবা দেয়, ওস্তাদ বলে ডাকে। কি মিষ্টি আমার গলা—'আহা মরি মরি' সুর! তুমিই বলো—আর কোন্ পাখি আমার মতো গলা ছেড়ে গাইতে পারে? এমন সুরের খেল দেখাতে পারে? তুমি থাকতে চাও, থাক এখানে। আমার গান শোন রোজ। দেখ, আমি কি করে গান করি। দেখতে দেখতে,

শুনতে শুনতে একদিন তুমিও কিছু-না-কিছু গান শিখে যাবে। যেদিন তুমি 'কুহু কুহু' সুর একেবারে ভুলে যাবে, আমার মতো 'কা-কা' সুরে গাইতে পারবে, সেদিন লোকে তোমার গান শুনতে ছুটে আসবে। আমার মতো বড় ওস্তাদ না হতে পারলেও গাইয়ে হিসাবে নাম করবে!

কোকিল কাকের সংগে থেকে গেল। চান নেই, খাওয়া নেই, কাক বসে বসে তাকে গান শুনাতো। শুনতে শুনতে কোকিলের কান ঝালাপালা হত, মাথা ঘুরে যেত। কিন্তু ভয়ে তাকে কিছু বলত না। বরং তাল দিয়ে বলত—আহা! আহা!···মরি! মরি!··· কি মধুর গান!

একদিন এক পথিক পথ চলতে-চলতে ক্লান্ত হয়ে সেই বটগাছের তলায় এসে বসল। কোকিল কাককে বলল—দাদা, এতদিন বসে বসে কেবল তোমার গান শুনলাম—শুনে কি শিখলাম, না-শিখলাম তা একবার তোমাকে দেখাতে ইচ্ছে করছে। দেখবে আমি গান গেয়ে ঐ পথিককে ঘুম পাড়িয়ে দেব।

কাক বলল—হাসালে দেখছি! গাইবে, গাও। জাঁক কোরো না, লোকে শুনতে পেলে হাসবে। তবে, হ্যাঁ আমিও ওকে গান গেয়ে ঘুম পাড়াতে পারি।

কোকিল একটু হাসলো, কাকের কথায় কান না দিয়ে গান ধরল। আহা! কি মিষ্টি গলা! কি মধুর সুর! শুনতে শুনতে পথিকের চোখের দু'পাতা এক হয়ে এল, শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে। কাকও তার সুর ভুলে গিয়েছিল, তার চোখের কোণেও যেন ঘুম নেমে আসছিল। কোকিলের গান শেষ হলে, কাক আবার নিজের রূপ ধরল। বলল—এতে বড়াই করার কি আছে! পথিকের ঘুম পেয়েছিল, ঘুমিয়ে পড়েছে। তোমার গান শুনে ঘুময় নি। এবার আমার কেরামতি দেখ,—আমি গান গেয়ে এখুনি পথিককে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলব।

কাক গান ধরল—গান মানে তার চেঁচানি! কিন্তু তার চেঁচানিতেও পথিকের ঘুম ভাঙলো না। হিংসেয় কাকের মাথার কোন ঠিক ছিল না। গাছ হতে উড়ে সে নীচে নেমে এসে, পথিকের কানের কাছে মুখ নিয়ে 'কা-কা' করে ডাকতে লাগল। এবারে পথিকের ঘুম ভেঙে গেল, তার ডাকে বিরক্ত হয়ে সে তাকে পাথর ছুড়ে মারল। কাক উড়ে পালাতে গেল, কিন্তু পাথর লেগে তার ডানা খুলে পড়ল। আর সে উড়তে পারল না। মনের দুঃখে দু'পায়ে লাফাতে লাফাতে সে জায়গা ছেড়ে অনেক, অনেক দূরে, চোখের বাইরে মিলিয়ে গেল।

কোথায় গেল? কি হল?—তা তোমাদের বলতে পারছি না।—বলে দাদু থামলেন। তারপর হেসে বললেন—তবে হিংসের ফল যে কাক হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছিল, সে কথা শুনলে তো?

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

থিয়েটার শুরু হয়। রাম আসে, লক্ষ্মণ আসে, হনুমান আসে। মহারাজা আবার দাঁড়িয়ে বলে, "কে কে এল দেখ মহারাণী। রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান। দণ্ডবৎ কর। সাক্ষাৎ দ্যাবতা।"

মহারাণী, অহ্লাদী, জল্লাদী দণ্ডবৎ করে, উলু দেয়। নাটক চলতে থাকে। লক্ষ্মণ আর মেঘনাদ দু'জনে মুখোমুখি হয়। প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর পরিপাটি তীর-ধনুকের লড়াই। রাজা চোখ পাকিয়ে দেখে। মস্ত বড় ধনুক। একজনের লাল রঙের, একজনের সবুজ রঙের। তীরের ফলা ঝক্‌ঝক্ করে। তাক্ করে তারা এ ওকে মারে। কিন্তু ওপরে আহ্লাদী আর জল্লাদী খুসী হয় না। দেশ-গাঁয়ের যাত্রাগানের সঙ্গে মিল নেই। সেখানে যে আসে সেই নাচে, গায়। রাম নাচে, লক্ষ্মণ নাচে, হনুমান নাচে, রাবণ নাচে, গায়। এমন কি সূর্পণখা কাটা নাক নিয়ে নাচে, গান করে। তাই তো যাত্রাগান শুনে প্রাণ আনচান করে। কিন্তু তা দূরে যাক, এমা ওরা কি যে বলে ছাই বোঝাই যায় না!

তারা মুখের ঝামটা মেরে বলে, "দূর্, দূর! এর নাম হল গিয়ে—থেটার,—না-টক। টক না, মিঠে না,—তেঁতো! রাম তেঁতো!"

নিচে রাজাও বেজার হয়। লক্ষ্মণ হেরে যাচ্ছে। রামের ভাই লক্ষ্মণ, আর সে কিনা হারছে! রাজা ক্রমে রেগে যায়। কিন্তু রাগলে কি হবে? মেঘনাদের শক্তিশেল বাণে

লক্ষ্মণ পড়ে যায়। রাম কাঁদতে থাকে। আর ওপরে কেঁদে ওঠে—মহারাণী, আহ্লাদী আর জল্লাদী। বিলাপ করে কান্না, "অত লোক বসে আছে। কেউ আট্‌কাল না গা? একটাও মনিষ্যি নেই, সব দস্যি!" বিলাপ শুনে রাজার মাথা চন্‌ করে ওঠে। সে দাঁড়িয়ে উঠে বলে, "আমি আছি। আমি ইন্দ্রজিতকে মেরে ঢিট্‌ করে দোব। জান্‌লে মা, আমি তোমার দিগ্বিজয়ী ছেলে!" লক্ষ্মণের তীর-ধনুক ষ্টেজে পড়েছিল। তা দিয়ে মেঘনাদকে মারার জন্য রাজা লাফিয়ে নাবে আর কি!

ভাল ভাল আর্টিষ্ট নেবেছে। প্লে জমে উঠেছে। এ সময় উপরে আর নিচে কান্না ও হইহল্লাতে দর্শকরা বিরক্ত হয়ে উঠেছে। তারা রাজাকে ঘাড় ধরে বসিয়ে দিল। ধমক দিয়ে বলল, "ফাজিল ছেলে, চুপ করে বস। ইয়ার্কী করো তো চোখে চর্কী-বাজি দেখিয়ে দোব।"

কেউ কেউ বলে, "বেরিয়ে যাও।"

এত বড় কথা! রাজা কেন মহারাজও ক্ষেপে যায়। মহারাজা উপর দিকে চেয়ে বলে, "মহারাণী নেবে এসো। এখানে মনিষ্যি থাকে? পয়সা দিয়ে এসেছি, তায় এত বড় কথা!" দর্শকরা মুখ ভেংচে বলে, "পয়সা দিয়ে সবাই এসেছে মশাই। ঘসামাজা চালচলন শিখে আসবেন।"

মহারাজা ও রাজা গোমড়া মুখে বেরিয়ে যায়। তারা মহারাণী, আহ্লাদী, জল্লাদীর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে থিয়েটার ঘরে দণ্ডবৎ করে। তারপর বাড়ী যায়।

তারাপরের দিন যায় সিনেমায়। খুব জম্‌কাল ছবি। আফ্রিকার জঙ্গলের নানান্‌ জানোয়ারের কাণ্ডকারখানা। চিড়িয়াখানায় তারা যা দেখেছে, তার চেয়ে অনেক মজাদার। সিনেমার লোকেরা ভাল মানুষ। তাদের সবাইকে এক সারিতে বসতে দিল, লাল চশমা পরিয়ে দিল। তার দাম নিল না! হুঁকো সঙ্গে থাকলে মহারাজা তাদের ধোঁয়া পুরস্কার দিত। চশমার নাকি অনেক গুণ। চোখে দিয়ে ছবি শুধু রঙিন নয়, একেবারে সামনে দেখা যায়।

রাজা ভাবে কাঠবেড়াল, বানর, টিয়া, ময়না যদি নাগালের মধ্যে আসে, ক'টা ধরে নিয়ে যাবে। খাঁচায় পুরে পুষবে।

যেই খালি হাত বাড়িয়েছে,—ওরে বাবা! ক'টা বাঘ, সিংহ, হাতি মারামারি করে তাদের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি! আবার তার পেছনে গণ্ডার, গরিলা, আর অজগর সাপ!

একটুখানি আগে মহারাজা চশমা চোখে দিয়ে মহারাণীকে বলেছিল, "লাট সাহেব হয়েছি।"

মহারাণী বলেছিল, "তাই লাল দেখাচ্ছে।"

আহ্লাদী জল্লাদীকে বলছিল, "চশমা চোখে গুরুমশাই হয়েছি। পেন্নাম কর।"

তাদের আর জবাব দেওয়া হয় না। একা রাজা নয়, তারা সবাই এক সঙ্গে দেখে, সাংঘাতিক জানোয়ারগুলো আক্রমণ শুরু করেছে। আর রক্ষা নেই! পালে পালে আসছে! তারা এক সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে, "গেলুম রে, মলুম রে।" আর বেঞ্চি ডিঙিয়ে, লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে পেছনের লোকের ঘাড়ে পড়ে!

মহা হট্টগোল শুরু হয়। তারপর দর্শকরা তার কারণ টের পেয়ে তাদের শাসিয়ে বল্‌ল, "গেঁয়ো ভূত! বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও!"

তখনো ছবিতে বড় বড় জোঁক-পোকের কাণ্ডকেত্তন চলেছে। তারা ভূতের নাচ নেচে বেরিয়ে এল। এখানে থেকে মরবে নাকি? মহারাজ সবাইকে নিয়ে আছাড়-পিছাড় খেয়ে রাস্তায় যায়,—তারপর হাঁফ ছাড়ে। বাপস্, এর নাম হল টিকিট কেটে দাঁত-কপাটি! তারা বাড়ীর দিকে ছোটে! গাঁটছড়া বাঁধার কথা ভুলে যায়।

বাড়ী গিয়ে তারা বলাবলি করে, আর নয়। এমন জায়গায় মনিষ্যি থাকে? এ হল গিয়ে দত্তি-দস্যির স্থান। এখন প্রাণ নিয়ে মানে মানে দেশে ফিরলে বাঁচোয়া।" তারা যা যা দরকার কেনাকাটা করে, গোছগাছ করে।

নাটকের ইন্দ্রজিতকে রাজার পছন্দ নয়। কিন্তু তার রাজার পোষাক আর ধনুক-বান ভারী পছন্দ হয়েছে। অমন না হলে আর রাজা কি? অমন সাজ দেশে নিয়ে যেতে হবে।

সেনাপতির সময় নেই। সে বাপের দোকানে গাহেকের সঙ্গে কি বাতচিত করে কে জানে? অগত্যা রাজা সকালবেলা একা বেরোয়। মায়ের কাছ থেকে টাকা চেয়ে নেয়।

তারপর দোকান খোঁজে কাছে-পিঠে তা না পেয়ে খোঁজে মন্দির, মস্‌জিদ, স্কুল, পোষ্টাপিস। সেখানে বুড্‌ডো খেয়ে বড্ড জিদ বেড়ে যায়। যেদিকে চোখে চলে সে চল্‌তে থাকে। তারপর আন্দাজে বড়বাজারে ঠেলে ওঠে।—

বড়বাজার নাম যখন বড় বড় সওদা সেখানেই থাকে। হাতির হাওদা থেকে তীর-ধনুক। হাজার হাজার দোকান আর রাজরাজড়ার ভিড়। হাট-বাজারের স্থান বটে! সে ঠিক দোকানে ঢোকে। দোকানদার চতুর লোক। বুঝে নেয়।

বলে, "কি নাম তোমার খোকা?"

রাজা বলে, "আমি হলেম গিয়ে রাজা। খোকা নই।"

দোকানী বলে "বাঃ, সত্যিকার রাজা তো, তাই ঠিক দোকান খুঁজে এসেছ।"

দোকানীর তীর-ধনুক নেই। না থাক, ধারাল বুদ্ধি আছে। বলে, "রাজামশাই, তীর-ধনুকের দিন আর নেই। এখন হল, শুধু বন্দুক, পিস্তলের দিন। স্রেফ আওয়াজের দিন। দেখচ না, ট্রেন, বাস, ট্রাম, থিয়েটার, সিনেমা সবখানে শব্দের রেওয়াজ। বল দেখি, খোলে যদি বোল না থাকে, পাখোয়াজে যদি আওয়াজ না থাকে, ঢাকে যদি জাঁকাল শব্দের ঝাঁক না থাকে, তাহলে কেমন হয়?" রাজা বলে, "ভাল হয় না। হাঁস্ প্যাক্ প্যাক্ না করলে হাসি পায়।" দোকানী বলে, "তাই বন্দুক পিস্তল নিয়ে যাও। দুম্ করে ফোটাও, আর কান ফেটে সবার আক্কেল হবে গুড়ুম।"

রাজা ভাবে তাই তো! দোকানী একটা টয়গান (খেলার বন্দুক) বার করে। তাতে বারুদ দিয়ে শব্দ করে। তারপর বলে, "তুমি অমন বীর, তবু শব্দ শুনে অস্থির হয়ে চোখ বুজলে! এখন বুঝলে তো, তীর-ধনুকের চেয়ে বন্দুক কত চমৎকার! আর তুমি রাজা কিনা, এই সঙ্গে রাজার পোষাক নিয়ে যাও। নৈলে রাজা বলে লোকে জানবে কি করে? জানলে তো মানবে।"

সে রাজার পোষাক বার করে রাজাকে পরায়। আয়নার সামনে নিয়ে গিয়ে দেখায়। বলে, "দেখ, এখন নিজকে নিজের সেলাম দিতে ইচ্ছা করে কিনা?"

রাজার সত্যিই ইচ্ছা করে। দোকানী তার হাত ভ'রে চকলেট, লজেঞ্চ দিয়ে বশ করে। তারপর জিনিসের অনেক বেশী দাম নিয়ে নেয়।

রাজা যাবার সময় দোকানী সেলাম করে বলে, "রাজামশাই, পেন্নাম।" পেন্নামের দাম চায় না! রাজার মন আনন্দে আনচান করে। সে তার সখের জিনিস নিয়ে বেরোয়। চকলেট মুখে দেয়। তারপর আনন্দে পথ-ঘাট হারিয়ে ফেলে। চকলেট আর লজেঞ্চ ফুরবার পর তা টের পায়। তখন হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে।

তাকে কেউ ভাবে বহুরূপী, কেউ ভাবে সঙ,—রাজা সেজে বুঝি ঢঙ দেখাচ্ছে! কিন্তু তার কান্নায় আসল রঙ ধরা পড়ে। দু'একজন তার নাম, বাপের নাম, ঠিকানা জিজ্ঞেস করে। নাম রাজা, বাপের নাম মহারাজা, মায়ের নাম মহারাণী আর দেশ বুরবক রাজ্যে,—এটুকু সে বলতে পারে। তাতে শহরে বাড়ীর হদিশ মেলে না। বেলা বেড়ে যায়। হেঁটে হেঁটে পায়ে ফোস্কা পড়ে। রাজা নেংচাতে থাকে। দুষ্টু ছেলেরা তাকে ভেংচায়। রাজা নেংচায় আর চেঁচিয়ে কাঁদে।

হঠাৎ সেনাপতির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। দোকানের কাছে সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করে, "কি হয়েছে রাজা?"

রাজা বলে, "আমি হারিয়ে গেছি।"

সেনাপতি বলে, "বাঃ রে, ঐ তো বাড়ী! ধাড়ী ছেলে হারায়?" সত্যি তো! রাজা ঘুরে ঘুরে এখানে এসে পড়েছে। এই দোকান থেকে সেদিন সওদা করেছিল, এই রাস্তায় মোটর চাপা পড়েছিল! আর এতক্ষণ সে খামোখা কাঁদছিল! কত চোখের জল মিছেই জলে গেল। থাকলে তা দিয়ে মাথা ধোয়া যেত। এবার সে ফিক্ করে হেসে ফেলল। একটা চকলেট খেতে বাকি ছিল। সেনাপতিকে বখশিশ দিয়ে বলল, "খাও।"

বাড়ী ফিরে শুনল, পরের দিন সকালে তারা দেশে যাবে। গোছগাছ করা হচ্ছে। মহাসেনাপতি এক ফাঁকে রেলের টিকিট কেটে এনেছে। বড় দেখে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে রেখেছে। এবার রাজা পোষাক পরে, বন্দুক হাতে দেশে ফিরে সবাইকে তাক লাগাবে। সে ভারী খুসী। হঠাৎ মনে হয়, শহুরে চুলের ছাঁট দেওয়া বাকি থাকে কেন? পোষাক ছেড়ে সে নাপিতের দোকানে যায়। ফিরে এসে স্নান করে আবার পোষাক ও মুকুট পরে। দুপুরে ও রাত্রে পোষাক পরে খায়। শহরের শেষ খাওয়া। খেয়ে পেট ঢোল হয়। মুখ ধুয়ে, আহ্লাদ করে পেট বাজায়।

কিন্তু শহুরে কাণ্ড! রেতে মশা, আর দিনে মাছি। আজ আবার রেতে কোত্থেকে মাছি এল। বেশী নয়,—একটা। কিন্তু সেই একটাই একশো। সব লণ্ডভণ্ড করল। কাছাকাছি কোথাও আস্তানা। আর একটা মাছির সঙ্গে কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল। সে মাছিটা ছিল ষণ্ডাগুণ্ডা। অ্যায়সা তাড়া দিল যে, তাড়া খাওয়া মাছিটা পালাবার পথ পায় না। মাছি আবার রেতে চোখে দেখে না। যা থাকে কপালে বলে আন্দাজে ছুটল। একটা গর্ত বা খোঁড়ল পেলে লুকোবে। সে চেষ্টায় ঢুকে পড়ল রাজার প্রকাণ্ড নাকের ছেঁদায়। রাজা তখন বিছানায় বসে আইঢাই করছিল। দুষ্টু দোকানী তাকে টাইট জামা গছিয়েছে। টেনে টেনে বোতাম আটকেছে। কিন্তু তখনকার পেট আর এখনকার পেটে অনেক তফাত। মিটমাট করার উপায় নেই। পেট ফুলে বাইরে আসতে চায়, আর টাইট জামা চায় ভেতরে ঠাস্‌তে। কুস্তি চলছে। তা যেমন-তেমন। এর মধ্যে মাছিটা নাকের ছেঁদায় ঢুকে পালাবার পথ খুঁজছিল। তার ভয় ষণ্ডা মাছিটাও যদি ঢুকে পড়ে। তার আগে পালান চাই। কিন্তু নাকের ছেঁদায় পালাবার পথ নেই। মাছিটা ফরর্ ফরর্ করতে লাগল। উঁচুদরের সুড়্‌সুড়ি। তা সামলান গেল না।

রাজা জোরসে হেঁচে ফেলল, "হ্যাঁচচো, হ্যাঁচচো!" আর তার পেট ফুলে দুলে উঠল। তখন বোতাম আর পেটকে আটকাতে পারল না। পেটের গোঁত্তা খেয়ে বোতাম পট পট করে ছিঁড়ে গেল! ছিঁড়ে জোর হাওয়ায় সুতো ছেঁড়া ঘুড়ির মত উড়ে চলল। ঠিক এম্নি সময় আহ্লাদী আর জল্লাদী এ ঘরে ঢুকেছিল। জিনিস গোছাবে। জোর দাপটের হাঁচি। বোতাম বুলেটের মত এদিক-ওদিক ছুটছিল। তার একটা লাগল আহ্লাদীর নাকে, একটা জল্লাদীর কানে। শক্ত নাকমলা আর কানমলার সামিল।

তারা চেঁচিয়ে উঠল, "রাজা মারলে। কিচ্ছু করিনি রাণীমা। মিছামিছি কানমলা, নাকমলা দিলে!"

(ক্রমশঃ)

সেয়ানে—শয়তানে

শ্রীসৌরেন্দ্রকুমার পাল

বাঢ়ো মাহাতো বড় দুশ্চিন্তায় পড়ল। সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত নেমেছে আঁধারের তমিস্রা নিয়ে। তার ওপর আকাশে মেঘ থাকার জন্য তারার ক্ষীণ-প্রভ আলোর রশ্মিটুকুর অভাবে অন্ধকার সূচিভেদ্য হয়ে উঠেছে।

গ্রামের চারিপাশে জঙ্গল। নিবিড় জঙ্গল। তার মাঝে এই অসময়ে হারানো মহিষ খুঁজবে কি করে! মোট আটটা গরু মহিষের মধ্যে ওই একটাই সন্ধ্যের আগে ঘরে ফেরেনি জঙ্গল থেকে।

তার বৌ অভিযোগ করল, ওটা তার বাবা বিয়েব পর গহনার সময় যৌতুক দিয়েছিল। খুব দুধেল মহিষ, এই প্রথম বিয়ান। মা বলেছিল—তোর বেটা-বেটি হলে ওর দুধ খাওয়াস।

বৌ জিদ্ ধরেছে সেই রাত্রেই মহিষটাকে খুঁজে আনতেই হবে। না, সে কোন আপত্তি শুনবে না।

মাত্র একুশ বছরের যুবক বাঢ়ো মাহাতোর ষোল বছরের মিষ্টি বউয়ের কথা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল তার পক্ষে! এই অন্ধকার রাতে জঙ্গলে তার স্বামীকে বিপদের মাঝে না পাঠলে তার ভাবি সন্তানরা অমন দুধেল মহিষের দুধ খাওয়া থেকে বঞ্চিত হবে—এটাই হোল মাহাতো বৌ-এর বড় দুশ্চিন্তা।

অথচ বৌ-এর মন রাখার কোন পথ খুঁজে পায় না বাঢ়ো মাহাতো। সকালে খুঁজতে গেলেই তো হয়। কিন্তু না, তা হয় না! বাঘ যদি ইতিমধ্যে রাত্রে মহিষটাকে মেরে খেয়ে নেয়।

বাইরে জোরো ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে। বর্ষার মেঘ আকাশে ইতিমধ্যে আরও ঘন হয়েছে। দু'ফোঁটা চার ফোঁটা করে বৃষ্টি নামল।

যাক্, সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। এই বৃষ্টি মাথায় নিয়ে মাহাতোর আর এখন বেরুন সম্ভব নয়।

পরদিন ভোর হতেই বাঢ়ো মাহাতো খাটালে গিয়ে দেখল মহিষটা ফেরেনি। জংলা হাটে অমন দুধেল মহিষ সাতশ' টাকার কমে পাওয়া যাবে না। খুঁজতেই হবে। ঘরে গিয়ে তার তেল মাখান মোটা ভারী লাঠিটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল হারানো মহিষের সন্ধানে।

আকাশে তেমন মেঘ নেই। ভোরের আলো ফুটে উঠেছে বটে, কিন্তু প্রভাত-রবির কিরণ পূব আকাশে জমে থাকা হাল্কা মেঘের পর্দা ভেদ করে তখনও বেরুতে পারেনি। বন-

মোরগদের ডাকের মহড়া চলেছে জঙ্গলের মাঝে। ময়ূরের ডাকও দূর থেকে ভেসে আসছে। রোদ্দুর উঠলে তিতির পাখীরা এই ডাকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঐক্যতান জুড়ে বন মুখরিত করে তুলবে। ভোরের স্নিগ্ধ পরিবেশে বাঢ়ো মাহাতোর এসব কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই। ও চলেছে ওর শ্বশুরের দেওয়া দুধেল মহিষটার সন্ধানে। ওর তিন মাসের বাচ্চাটা সারারাত মাকে ডেকেছে। খুঁজতেই হবে, তারউপর আবার বৌ-এর তাগাদা।

গ্রাম ছেড়ে সে খানিকটা পথ চলে এসেছে। বর্ষায় জঙ্গলের গাছ-গাছড়া পাতায় ভরে গিয়ে জঙ্গলের নিবিড়তা বাড়িয়ে দিয়েছে, সেই কারণে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে মহিষের কালো চেহারার হদিস্ পাওয়া একটু কষ্টসাধ্য।

মাহাতোর দুশ্চিন্তা, বাঘ যদি রাত্রে তার মহিষকে পেয়ে মেরে অন্য কোথাও দুর্গম পথে নিয়ে গিয়ে থাকে, তবে সে খবর পাওয়া মুস্কিল। তবুও উপায় নেই, খুঁজতেই হবে সেই মহিষ, যার দুধ তার ভাবি সন্তান খাবে।

এই সব ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বাঢ়ো মাহাতো। হঠাৎ তার সামনে প্রায় বিশ হাত তফাতে একটা ঘন ঝোপ যেন নড়ে উঠল। আর কয়েক পা মাত্র সে এগিয়েছে, সম্পূর্ণ আচম্বিতে বেরিয়ে এলো এক বিরাট বাঘ। তার পথের সামনে এমন সময়ে বাঘের আবির্ভাব সে কল্পনা করতে পারেনি।

'বাঘ এক হুংকার দিয়ে ওর উপর লাফিয়ে পড়ল'।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল বাঢ়ো মাহাতো! কি করবে সে চিন্তা করার পূর্বে বাঘ এক হুংকার দিয়ে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রচণ্ড ধাক্কায় মাহাতোর দেহ ছিট্‌কে পড়ল মাটির ওপর। সৌভাগ্যবশতঃ বাঘও ওর সঙ্গে অন্য দিকে পড়ে গিয়েছিল এবং তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয়বার আক্রমণ না করে বাঘ পিছিয়ে গেল, যে ঝোপের পাশ থেকে এসেছিল সেই দিকে।

বাঢ়ো মাহাতো এই আকস্মিক আক্রমণে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল। এ ধরণের পরিস্থিতি ও কল্পনাও করতে পারেনি। কিন্তু, এমন অঘটন জীবনের অভিজ্ঞতায় না থাকলেও মাহাতো জ্ঞানহারা হয়নি। জঙ্গল পরিবেশে সে জন্মেছে এবং বড় হয়েছে, জানোয়ারকে মাহাতো ভয় পায় না।

পড়ে যাওয়ার পর মুহূর্তে বাঘ যখন পিছনে সরে গেল, যুবক বলিষ্ঠ মাহাতো সাহস করে লাঠি নিয়ে উঠে দাঁড়াল। ডান কাঁধে বাঘ কামড়ে ধরেছিল, রক্তে মাহাতোর সাদা জামা প্রায় লাল হয়ে উঠেছে। বাঁ পায়ের উরুতেও বাঘের থাবার ধারাল নখ বসে গিয়েছিল। রক্ত ঝরছিল পা বেয়ে। সেদিকে তখন তার নজর ছিল না। সে দেখছিল সামনে এক ভয়ংকর বাঘিনী! সাক্ষাৎ মৃত্যু-দূত!

বাঘিনীর দুটো বাচ্চা ইতিমধ্যে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। মা তার শাবকের বিপদ আশঙ্কায় পুনরায় আক্রমণে উদ্যত হোল। ভীষণ গর্জন করে তেড়ে এলো মাহাতোর দিকে। বাঢ়ো মাহাতো ইতিমধ্যে মরিয়া হয়ে তার একমাত্র সম্বল লাঠিটা দু'হাতে শক্ত করে ধরেছে আক্রমণ প্রতিহত করতে।

বাঘিনী দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তার শিকারকে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করতে বিদ্যুৎ বেগে এগিয়ে আসা মাত্র মাহাতোর উদ্যত লাঠি সবেগে গিয়ে পড়ল বাঘিনীর মাথার পিছনে, ঠিক কানের পাশে। মানুষের শক্তির সঙ্গে সম্মুখ-পরীক্ষায় বাঘিনীর বোধ হয় এই প্রথম অভিজ্ঞতা। লাঠির প্রচণ্ড এক ঘায়ে সে মুখ রগড়াতে লাগল মাটিতে, আর যন্ত্রণায় দারুণ গোঙাতে লাগল। সুযোগ বুঝে সঙ্গে সঙ্গে আর এক ঘা বসিয়ে দিল মাহাতো বাঘিনীর ঘাড়ে। আর সহ্য করতে পারল না সে। লাঠির প্রচণ্ড আঘাতে দু-একবার মাতালের মত ঘুরপাক্ খেয়ে জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে গেল বাঘিনীটা। তার বাচ্চা দুটো মার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সেইপথেই মার পিছু নিল।

উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে বাঢ়ো মাহাতোর দুটো পা, সমস্ত শরীর। সে যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না বাঘিনীর এই পলায়ন।

নাঃ, আর সে এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। এখুনি তাকে বাড়ী ফিরতে হবে। তার জখম হওয়া কাঁধে এবং উরুতে তখন দারুণ যন্ত্রণা সুরু হয়েছে। লাঠিতে ভর দিয়ে জখমী দেহ নিয়ে বাড়ীর পথ ধরল মাহাতো।

দুধেল মহিষ খোঁজার কথা সে তখন ভুলে গেছে। কিন্তু তার জীবনে যে ঘটনা একটু আগে ঘটল, তাকে সে কোনদিন ভুলতে পারবে না।

আমি বাঢ়ো মাহাতোকে বলেছিলাম—ক্যামেরা থাকলে তোমার একটা ছবি তুলে নিতাম। সে জানতে চেয়েছিল, কেন?

বলেছিলাম—তোমার এই সাহসিকতার কাহিনী লোককে শুনিয়ে ছবি দেখাতাম।

সে সরল মনে বলেছিল—বাবুজী, শহরের লোকেরা কি এই ঘটনা বিশ্বাস করবে?

হল্‌দে পাখি

শ্রীবিজয়গোপাল বসু

হল্‌দে পাখি বসন্তকালে বাঙলা দেশের বাগানে দেখা যায়। এ পাখি দেখতে চমৎকার। আকার শালিকের মত, তবে তার ঠোঁট লাল টুক্‌টুকে। মাথাটা কুচকুচে কালো, আর সমস্ত গা-টা গাঢ় হলুদবর্ণের। তবে পা দু'খানা পালক শূন্য ব'লে শালিকের পায়ের মত। চোখ পাখির চোখের মত সাধারণ, কোন বিশেষত্ব তার নেই। হল্‌দে রঙটা বেশি ব'লে এর নাম হয়েছে হল্‌দে পাখি।
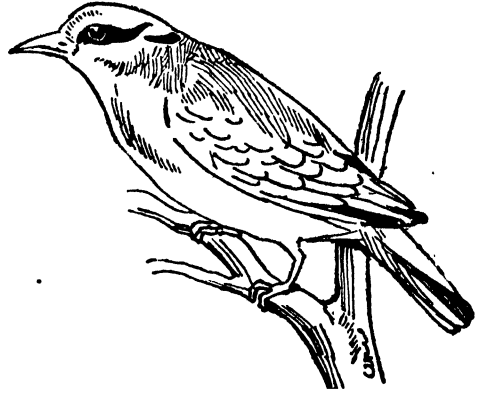
হলদে পাখীর চেহারা

হল্‌দে পাখি পোষ মানে না—বড়ই স্বাধীনতা প্রিয়। বাল্যকালে বইয়ে পড়েছি, একটি বালক হল্‌দে পাখি দেখে তাকে ডাকছে—

হল্‌দে পাখি হল্‌দে পাখি এস মোর কাছে
পরিপাটি খাঁচা এক তোমার তরে আছে ;
সুকোমল মখমল দিব শয্যা পেতে
সুন্দর সুন্দর ফল দিব তোমায় খেতে।

এতে পাখি উত্তর দিচ্ছে—

না-না ভাই যাব না আমি তরুলতা ছাড়ি
সুন্দর কাননে মোর আছে ঘর-বাড়ি;
উড়িতে বাসনা মোর নীলাকাশে ভাসি
হলেও সোনার খাঁচা ভাল নাহি বাসি।

পূর্ববঙ্গে মেয়েরা অক্ষয়তৃতীয়ার দিন সরষে কুটে কাসুন্দি করে। তার আগে সরষে বেশ করে ধুয়ে শুকিয়ে নেয়। হল্‌দে পাখি গান গেয়ে গেয়ে বউদের সতর্ক করে দেয়। গানের বুলি হ'ল—'ও বউ সরষে ধো।' স্বরটাও ভারী মিষ্টি। ছেলে-বুড়ো সকলেরই সে বুলির অনুকরণ করতে ইচ্ছে হয়।

"কোকিল অখিল প্রিয় সুমধুর গানে।"

স্বরটার মধুতার জন্য মনুষ্যসমাজে কোকিলের আদর খুব। কোন সঙ্গীতজ্ঞ বিশেষ পারদর্শিতা দেখাতে পারলে কোকিল-কণ্ঠ উপাধিতে ভূষিত হন। শ্রুতিমধুর গান হতে থাকলে পণ্ডিত ব্যক্তি—"বন্দে বাল্মীকি কোকিলম্" ব'লে গায়কের প্রশংসা করেন।

কণ্ঠ বাদ দিলে কোকিলের প্রশংসার আর কিছুই থাকে না। তার গায়ের রঙ কালো, দেখতেও কাকের মত। কাক একটা ঘৃণ্য প্রাণী মানুষের কাছে।

"কাকের কঠোর রব বিষ লাগে কানে।"

গেরস্ত বাড়ি-ঘরে ব'সে কাক ডাকতে থাকলে তাকে দূর-দূর ব'লে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। জ্ঞানবান ব্যক্তিরা বলেন, বিহগকুলের মধ্যে কাক সর্বাপেক্ষা ধূর্ত। পণ্ডিত লোকে কথায় বলে—"পক্ষিষু বায়সো ধূর্তঃ।"

কাক যে এমন ধূর্ত তাকেও ঠকিয়ে থাকে চালাকিতে কোকিল। কোকিল কাকের বাসায় লালিত-পালিত এবং বর্ধিত হয়। এজন্য কোকিলের এক নাম অন্যপুষ্ট বা কাকপুষ্ট! কোকিল ডিম পেড়ে গোপনে কাকের বাসায় রেখে আসে। এতে তা দেওয়া এবং সন্তান পালনের হাত থেকে সে রেহাই পায়।

"কাক কোলাহলে হলেও লালিত
মধুর কাকলি ভোলে কি কোকিলে?"

হল্‌দে পাখির এ জাতীয় কোন অখ্যাতি নেই। সে বড় নিরীহ, গান গেয়ে দেখা দিয়ে মানুষকে তৃপ্ত করাই তার কাজ। কারো কোন ক্ষতি সে কখনও করে না।

হল্‌দে পাখি দল বেঁধে বেড়ায় না। বাগানে একটা কি দুটোর বেশি দেখা যায় না। ছায়াবহুল যায়গায় সে থাকে। রোদ তার সহ্য হয় না। বৃষ্টিতেও সে ভিজতে চায় না। বড়ই আরাম-প্রিয়। মশা, মাছি এবং অন্য নানা পোকামাকড় খায় আর খায় ছোট ছোট পাকা বুনো ফল। বড় ফলের ধারেও সে যায় না।

সূয্যি ডুবে গেলে হল্‌দে পাখি কোন বড় গাছের, যেমন আম, জাম, কাঁঠাল, জামরুল প্রভৃতির মোটা ডালে গিয়ে বসে থাকে। বাসস্থান সে পাল্‌টায় না। এমন গাছ সে বেছে নেয়, যেখানে অন্য পাখি থাকে না। অনেক উঁচু ডালে পাতার আড়ালে থেকে সে রাত কাটায়। নীচেকার কোন দুর্গন্ধ তার কাছে যেতে পারে না। হল্‌দে পাখি ঘুমোয় একপায়ে ভর দিয়ে; অন্য পাটা পেটের পালকের ভেতর গুঁজে এবং ঠোঁটটা পিঠে পুরে।

সূয্যি উঠলে হল্‌দে পাখির ঘুম ভাঙ্গে। তখন সে উদীয়মান তপন দেখে—যতক্ষণ তার রঙটা জবা ফুলের রঙ-এর মত থাকে। রোদ উঠলেও পূর্ণিমার চাঁদ এবং কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী পর্যন্ত তিথির চাঁদ আকাশে থাকে। চোখ ঝল্‌সে আসতে থাকলে মুখ ফিরিয়ে পশ্চিম

দিক্‌কার চাঁদ দেখতে থাকে। চাঁদ দেখা না গেলে তখন ওরা জায়গা ছেড়ে খাবারের চেষ্টা করতে থাকে। পেট ভ'রে গেলে উড়ে উড়ে বেড়িয়ে আনন্দ করে। তবে বাগান ছাড়ে না। সময় সময় গান গেয়েও মানুষকে তৃপ্তি দান করে হল্‌দে পাখি।

আবহাওয়ার জ্ঞানটা হল্‌দে পাখির বেশ আছে। জল-ঝড়ের সম্ভাবনা বুঝলে সে বাসা ছাড়ে না। খিদের কষ্ট সহ্য করেও থাকতে পারে।

অনেক পাখি আছে যেমন কাক, শালিক, টিয়া ইত্যাদি এরা নেয়ে থাকে। বিশেষতঃ গরমের দিনে। দুপুর বেলায় কোন পুকুর বা নদীতে গিয়ে তীরে ব'সে ডুব দিয়ে দিয়ে নেয়ে আরাম উপভোগ করে, তারপর জল ঝাড়ে। বৃষ্টির জলেও বেশ স্ফূর্তি ক'রে ঐ সব পাখিকে নাইতে দেখা যায়। হল্‌দে পাখিকে কিন্তু কোন সময় জলের কাছে যেতে দেখা যায় না। বরষা নামবার আগেই সে বাংলাদেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়।

কবিরা বলেন, হল্‌দে পাখি বড়ই সৌখিন জীব। তার চেহারা যে চোখ জুড়ান এবং গলার সুরটাও যে মন মাতান, এ জ্ঞান তার আছে। সে কারণ সে ঋতুরাজ বসন্তের চিরসহচর। গাছের শ্যামল ছায়ায়, বনফুলের সুগন্ধের ভেতর চন্দ্র-সূর্য দেখে আরামে আরামে কাটায়। সে জানে দুঃখ-কষ্টের জন্যে চেহারা নষ্ট হয়, সঙ্গে সঙ্গে স্বরের মিষ্টত্বও চলে যায়।

সুধীন্দ্র-স্মরণে

শ্রীমল্লিকা ঘোষাল

মৌ-ভরা মৌচাক হাতে দিয়ে তুলে
কচিমুখে হাসিরাশি তুমিই ফোটালে।
বড়দের রচনায় ছিলে তুমি রথী
শিশুদের তরেও যে সম ব্যথা-ব্যথী।
ছোট বড় সকলেরে করেছ আপন,
স্মিত হাসি ভ'রে রত প্রশান্ত আনন।
তব হৃদি অহমিকা করেনিকো গ্রাস,
সদাশয় ব্যবহার, ছিলে মিতভাষ।
আদর্শ পুরুষ ছিলে একালে-সেকালে,
তব স্মৃতি স্মরি' আজি আমরা সকলে।

মন্দ কর্মের মন্দ ফল

রামপদ মুখোপাধ্যায়

আসলে এটা গল্প নয়, সত্য ঘটনা। যেমন শুনেছি, একটুও রং না ফলিয়ে সেই মতই বলে যাব, আর এটা শুনলে বুঝতে পারবে, কবি যে বলেছেন—পৃথিবীতে এমন অনেক সত্য ঘটনা ঘটে যা বানানো গল্পের চেয়েও আশ্চর্যজনক—তা বর্ণে বর্ণে সত্য। দিনরাত মন্দ চিন্তা করলে, অন্যের অনিষ্ট কামনা করলে, সেই চিন্তার ফলভাগী যে নিজেকেই হতে হয়—এ দৃষ্টান্ত আমাদের জীবনে কতই তো চোখে পড়ে, অথচ চোখে দেখেও আমরা তার ফলাফল বিচার করতে ভুলে যাই। মন্দ কর্মের ফল যে কখনই ভাল হয় না—এটা আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত। কথাটা নীতিবাক্যের মত লাগছে তো? তা লাগুক, কিন্তু ভুললে চলবে না যে, সৎ-নীতি গ্রহণ না করলে ভালভাবে জীবনযাপন করার সুযোগ কখনই আসে না। সুস্থ জীবনযাপনের মূলেই রয়েছে সৎ-নীতি, নিয়ম শৃঙ্খলা ও উন্নত চিন্তাধারার প্রভাব।

এখন গল্পটা শুনলে বুঝতে পারবে কেন এ কথা বলছি।

পশ্চিমের একটা মাঝারি গোছের ষ্টেশন। ষ্টেশনের কাছ-বরাবর লোকজনের বসতি নেই বললেই হয়—আছে শুধু দশ-বারোটি রেলওয়ে কোয়ার্টার, আর আশেপাশে কুলি-মজুরদের কয়েকখানা অস্থায়ী চালা ঘর। আসলে এটা রেলওয়ে কলোনী। ষ্টেশন মাষ্টার তার সহকারী কয়েকজন, কিছু ভেণ্ডার এবং কুলি-মজুর, খালাসী ইত্যাদি নিয়ে জায়গাটা মোটের উপর জমজমাট। এখানে দোকানপাট নেই, হাট-বাজার বসে না, ইস্কুলের কথা তো ভাবাই যায় না; এ সবের জন্যে আছে শহর। সেটা এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে, মস্ত বড় মাঠ পেরিয়ে তবে সেই লোকালয়। এক্কা আর টাঙ্গা এই দুটি যান-বাহনের সঙ্গে ষ্টেশনের যোগাযোগ। তবে সে ব্যবস্থাও খুব আশাপ্রদ নয়। বেশীরভাগ পায়দলের যাত্রী—দু'চার ক্রোশ পথ হাঁটা তাদের পক্ষে খেলাধূলার সামিল। টাঙ্গা-এক্কার সংখ্যা তাই খুব অল্প—বেশি রাত হলে ষ্টেশনে তাদের টিকিটিও আর দেখা যায় না।

তখনকার দিনে যখন সাইকেল-রিক্সার চলন হয়নি, সেই সময়কার কথা বলছি। সেখানকার ষ্টেশন মাষ্টারের নাম ধরা যাক করালীবাবু। শক্ত-সমর্থ চেহারার মানুষ; তার গোলগাল প্রকাণ্ড মুখ, সজারুর কাঁটার মত মোটা গোঁফ, আর ভাঁটার মত বড় বড় দুটি চোখ দেখলে ছোট ছেলেরা আঁত্‌কে উঠে মায়ের কোলে মুখ লুকোয়, বড়দের বুকটাও ছ্যাৎ করে ওঠে। অধীনস্থ কর্মচারীরা তো তাঁর ভয়ে সর্বদাই তটস্থ। ভারী কড়া-মেজাজের মানুষ—কাজে একটু এদিক-ওদিক হলেই লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে ধমক লাগিয়ে তুলকালাম কাণ্ড

বাধিয়ে দেন। তাঁর ভয়ে মুখ ফুটে কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। ষ্টেশন এলাকার তিনি একচ্ছত্র সম্রাট—যা বলেন তাই আইন, যা করেন তাই দৃষ্টান্ত। রাজাবাবু অবশ্য বলে না লোকে—কেউ বলে সাহেব, কেউ বলে বড়বাবু। তা সাহেবদের মতই বেশ খানিকটা কম্পাউণ্ড ঘেরা কোয়ার্টারে থাকেন, সামনের জমিতে খানিকটা ফুলের বাগান, খানিকটা ফলের—মাঝে মাঝে সিমেণ্ট দিয়ে গাঁথা। তার উপরে চেয়ার পেতে কখনও চায়ের আসর, কখনও গল্পের আসর বসে— আবার গ্রীষ্মকালে সেখানে শোবার জন্যে বিছানাও হয় খাটিয়ায়।

পশ্চিমের দিকে খোলা জায়গায় শোয়াই হলো রেওয়াজ। মাষ্টার মশায়ের বাসাটা বড় হলেও সংসারে মানুষজন তাঁর কম। স্ত্রী আর গুটিচারেক ছেলেমেয়ে। বড় ছেলেটি ষোল উতরে সতরোয় পড়ছে আর বছরখানেক বাদে ভর্তি হবে কলেজে। আদৌ ভর্তি হবে কিনা সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। পড়াশোনায় তার মনোযোগ কম—বাপের তাড়নার ভয়ে স্কুলে যায় বটে, কিন্তু ক্লাসের পড়া তৈরী করার চেয়ে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আড্ডা-ইয়ারকি দিয়ে বেড়াতেই বেশি ভালবাসে। সিনেমা দেখার নেশাও জমেছে। সপ্তাহে অন্ততঃ একটি দিন সিনেমায় তার যাওয়া চাই-ই। যেদিন বাপের ডিউটি থাকে রাত্তিরে, সেদিন ছবি দেখার তার স্বুবর্ণ সুযোগ। ডিউটি সেরে বাপ আসে রাত একটায়; তার আগেই সিনেমার পাট সেরে ছেলেও বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে কাদা। ব্যাপারটা জানে শুধু মা, কিন্তু ছেলের শাসনের ভয়ে তিনিও বোবা। বাপের উগ্র মেজাজের কিছু অংশ ছেলেও পেয়েছে তো, আর দুটি ছেলে এখনও কৈশোরে পদার্পণ করেনি—কোলের মেয়েটি তো সবে হাঁটতে শিখেছে।

পয়েণ্টস্‌ম্যান, লাইনস্‌ম্যান আর তাদের বৌউরা ষ্টেশন মাষ্টারের সংসারের যাবতীয় কাজগুলি করে দেয় বটে, তবে তারা এখানে রাত্রিবাস করে না, কাজ সারা হয়ে গেলে নিজের নিজের ডেরায় চলে যায়। কাছেই আশেপাশে আরও কয়েকটা কোয়ার্টার আছে এ্যাসিসটেণ্ট ষ্টেশন মাষ্টারের, বুকিং ক্লার্কের, টিকিট কালেকটারের, গুডস ক্লার্কের ও সিগন্যালার প্রভৃতি চারিদিকে ঘিরে আছেন—সুতরাং ভয়ের কোন কারণ নেই।

করালীবাবু নিশ্চিন্তে রাতের ডিউটিতে যান—ওঁর স্ত্রী নির্ভয়ে বাচ্চাগুলিকে নিয়ে বাসায় থাকেন। পাঁচিল-ঘেরা কম্পাউণ্ডের গেটটা একরকম খোলাই থাকে।

একদিন রাত ন'টার ট্রেনে এক যাত্রী এসে নামল এই ষ্টেশনে। কৃষ্ণপক্ষের রাত, এরই মধ্যে চারিদিক নিশুতি হয়ে এসেছে—টাঙ্গা-এক্কার কোন চিহ্নই দেখা যায় না। যে দু'চারজন যাত্রী নেমেছিল, তারা দেখতে দেখতে সেই অন্ধকারে কোথায় মিশিয়ে যায়।

চায়ের ছোট ষ্টলটা সন্ধ্যার ট্রেনটা চলে যেতেই ঝাঁপ বন্ধ করেছে, কুলিরাও মোটঘাট না দেখে যে-যার নিজের ডেরায় চলে গেছে। যাত্রীটি এদিকে নতুনই এসেছে—কি করে শহরে যাবে ভেবে সে অকূলপাথারে পড়লো। ষ্টেশন ঘরে আলো জ্বলতে দেখে হাঁটতে হাঁটতে সে এগিয়ে গেল সেই দিকে। টেবিলের উপরে বিস্তর খাতা আর কাগজপত্র জড়ো করা—হিঙ্কের বড় ল্যাম্পটা টেবিলের মাঝখানে বসানো, (তখনও ইলেকট্রিকের আলো আসেনি এদিকে) তারই তলায় ঝুঁকে মস্ত বড় একখানা খাতা সামনে বিছিয়ে কাজ করছিলেন ষ্টেশন মাষ্টার। লোকটি আসতেই মাথা তুলে জিজ্ঞাসা করলেন কি চাই?

লোকটি ওর চেহারা দেখে ও গম্ভীর স্বর শুনে কেমন ভড়কে গেল— আমতা-আমতা করে বলল, বড্ড বিপদে পড়েছি।

বিপদ! ষ্টেশনে সরকারী আশ্রয়ে রয়েছেন বিপদ! স্বরে বিস্ময়ের সঙ্গে ভরসার স্বর যেন মেশানো ছিল।

লোকটি মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললো, না সে কথা বলছি না। মানে, আমি এখানে নতুনই এলাম তো—শহর কোন দিকে জানি না—একখানা গাড়ীও নেই ষ্টেশনে···তাই

এত রাত্তিরে গাড়ী প্রায়ই থাকে না। গম্ভীর গলায় জবাব দিয়ে, লোকটার আপাদমস্তক তীক্ষ্নদৃষ্টিতে দেখে নিলেন করালী মাষ্টার। তারপর বললেন, তা কি করতে চান আপনি?

সাহায্য চাই—যদি কোন কুলিকে বলে দেন, শহরে পৌঁছে দিতে—আমি বকশিশ করবো।

বকশিশ করবেন। তা কত টাকা দিতে পারবেন। এই রাত্তিরে ওরা যেতে চাইবে না, তা ছাড়া যায়ও যদি—হয়তো দশটাকা চেয়ে বসবে, দেবেন?

লোকটি একমুহূর্ত চুপ থেকে বলল দেবো। কারণ আপনাকে বলতে বাধা নেই আপনি সরকারী কর্মচারী। আমিও সরকারের কজের দায়িত্ব নিয়ে চলেছি।

অনেকগুলি টাকা আছে সঙ্গে—কাজেই দায়িত্বটা বুঝছেন তো?

করালীবাবু আর একবার লোকটার সর্বাঙ্গ ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, বসুন। কাজটা সেরে নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলছি—ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে লোকটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো।

হাতের কাজটুকু সেরে—খাতাটা বন্ধ করে করালীবাবু বললেন, দেখুন, আমি বলি কি এই রাত্তিরে অজানা শহরে নাই বা গেলেন, কাজটা রিস্কি নয় কি?

একজন কুলিকে অবশ্য সঙ্গে দিতে পারবো, কিন্তু টাকার গন্ধ পেলে সে যে বিশ্বাস

ভঙ্গ করবে না, সে কথাই বা বলি কি করে! জানেন তো—আজকাল সৎমানুষ কত কম।

তাহ্‌লে কি করব—কোথায় থাকব? শুকনো গলায় শুধলো লোকটি।

করালীবাবু হেসে বললেন, ঘাবড়াবেন না—ব্যবস্থা আমিই করবো, যাতে সরকারী কাজটা নির্বিঘ্নে করতে পারেন—সে ভার আমিই নিচ্ছি, আমিও সরকারের চাকর; নাই হলাম এক ডিপার্টমেণ্টের—এক রাজার অধীন তো!

এতে আমারও একটা দায়িত্ব রয়েছে। ওর কথা শুনে লোকটার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো লক্ষ্য করে করালীবাবু বললেন, শুনুন, আজ রাত্তিরে আমার কোয়ার্টারে আসুন, খাওয়াদাওয়া করে—দিব্যি একটা ঘুম দিয়ে কাল সকালে শহরে যাবেন। কোন চিন্তা করার নেই।

লোকটি বিব্রত হয়ে বললো, সেকি—আপনার যে ভারী অসুবিধা হবে!

না না অসুবিধা কি, কোয়ার্টারে ঘর কম বলে ভাবছেন? আরে রাম—পশ্চিমে এই গ্রীষ্মে—ঘরে কেউ শুতে পারে নাকি!

পাঁচিল-ঘেরা মস্ত কম্পাউণ্ড—সারি সারি খাটিয়া পড়ে—আমরা সবাই বাহিরে শুই—কোন অসুবিধা হবে না।

লোকটির কিন্তু-কিন্তু ভাব তবু যায় না। সে বললে, আচ্ছা তা নয় হ'ল, তবে খাওয়ার আয়োজন আর করবেন না—রাতের খাওয়াটা আমি একরকম সেরেই এসেছি।

করালী মাষ্টার হাসমুখে বললেন, বিলক্ষণ, আপনি অতিথি নারায়ণ তুল্য—আপনাকে অভুক্ত রেখে আমরা খেতে পারব, না খাওয়া উচিত? যাই বলুন মশাই—যতই ইংরেজের অফিসে কাজ করি—মনে-প্রাণে আমরা এখনো ভারতীয়। কি বলেন, নয় কি?

লোকটি অভিভূত হয়ে বললে, আপনি মহাশয় ব্যক্তি।

না-না কি যে বলেন, বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন করালী। বললেন, আসুন আমার সঙ্গে আপনার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে আমি ফিরে আসবো, এখানে রাত একটার গাড়ী, মানে ৪২ ডাউন পাস করিয়ে তবে আমার ছুটি।

রাম খেলান—

রাম খেলানের সঙ্গে আর একজনকে আসতে দেখে ভ্রূকুঞ্চিত হল করালীর। বললেন, আপনি যে আবার ফিরে এলেন অবনীবাবু? আগন্তুক বলল, একটি আর্জি নিয়ে এলাম বাবু। কাল সকালের ডিউটি থেকে ঘণ্টা তিন-চারের জন্য 'অফ' হতে চাই—ছোটবাবুকে বলে টিকিট ক'খানা যদি কালেক্ট করিয়ে নেন—কাল সকালেই একবার শহরে যেতে হবে ডাক্তার বাড়ী।

ছোটবাবু রাজী হবেন? বলেছেন ওঁকে?

বলব। আপনার অনুমতি পেলেই বলব।

করালী হাসিমুখে বলল, বেশ তো উনি যদি রাজী হন আমার আপত্তি কি। কো-ওয়ার্কার···যদি আপদে-বিপদে না দেখলাম—তা হলে মানুষ হয়ে জন্মেছি কেন! কি বলেন মশাই?—ভাল আপনার নামটি কি?

লোকটি বলল, আমার নাম দিলীপ বসু। আমাকে আপনি বলবেন না—নাম ধরেই ডাকবেন।

হেসে মরুব্বিয়ানার ভঙ্গিতে বলল করালী মাষ্টার, বেশ বেশ তা আমার চেয়ে বয়সে তুমি অনেক ছোট হবে; অন্ততঃ বছর চারেকের তো হবেই, কি বল?

নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব ব্যবস্থা করে দিল করালী। কম্পাউণ্ডের একটেরে যে চবুতরাটা ছিল—তারই উপর খাটিয়াখানি টেনে এনে নিজের হাতেই বিছানা পেতে দিল। চবুতরার একপাশে ছোট একটি সোরাইয়ে জল ভর্তি করে গেলাস দিয়ে ঢেকে দিলে তার মুখটা।

জল-ভর্তি আর একটি বালতি—তার সঙ্গে একখানা গামছা গুছিয়ে রাখলে। থালা ভর্তি লুচি ও ভাজি এনে বললে, এই সামান্য খাবারটুকু খেয়ে শুয়ে পড়। আরাম কর। হ্যাঁ, ভাল কথা—টাকাটা কি আয়রণ সেফের মধ্যে রেখে আসবো, নাকি সঙ্গেই রাখবে? আমি বলি কি কাছেই থাক—কারণ ঘরে তো আমরা কেউ থাকবো না। কথায় বলে সাবধানের মার নেই—আর আমরা তো সবাই বাইরে শোব, কি বলো? কোমরের কষিতে বেশ করে বেঁধে রাখ ওটা। ব্যস ব্যস এইবার আরাম করে ঘুম দাও। আমি যখন ফিরব তখন মাঝ রাত। আচ্ছা ভাই, গুড নাইট। হাসতে হাসতে ফিরে গেল করালী।

যতই আশ্বাস দিয়ে যাক্ নতুন জায়গায় টাকা ট্যাঁকে করে নিশ্চিন্তে ঘুম আসে না। মনে নানান চিন্তা—এলোমেলো হাওয়ার মত নানা দিকে তার গতি। কত উদ্ভট কল্পনা, অহেতুক ভয়, সন্দেহ, অশ্বস্তি।

একটার পর একটা আসছেই। ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠলো—বিছানায় উঠে বসলো দিলীপ। ইচ্ছা হ'ল খানিক পায়চারি করে নেয়। কিন্তু এইটুকু জমির মধ্যে ওধারে যদি মেয়েরা শুয়ে থাকেন—কি জানি কে কি মনে করবে। তার চেয়ে ফটক খুলে বাইরেটা একবার দেখে নেয়া যাক।

(আগামীবার সমাপ্য)

একটি কলি দুটি পাতা

শ্রীসুকুমার রায়

[ঘড়িতে ঢংঢং করে সাতটা বাজল। ঘরটি বেশ সাজানো। একপাশে টেবিল, মাঝখানটাতে একটি গোল টি-পয় চারদিক থেকে ঘেরা। একটি ছোট পর্দা দিয়ে ঘরটিকে ভাগ করা হয়েছে। পর্দার ওদিকে আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। জানালা দিয়ে ভোরের রোদ এসে পড়েছে। রোদের খানিকটা শিববাবুর ঘুম-ভরা মুখেচোখে পড়েছে। তবু ঘুমুচ্ছেন শিববাবু। মাঝে মাঝে নাক ডাকছে।

রামচন্দ্র চা-এর ট্রে নিয়ে টি-পয়ের উপর রেখে সামনে এসে দাঁড়াল। ওদিকে টেবিলের ওপরে রাখা বড় চা-এর কৌটো খুলে দু-চামচ চা পটের মধ্যে ফেলে দিল। ঢাকা দেওয়া হ'ল না কোনোটাই। কাপ সাজাতে গিয়ে ঠুংঠুং করে শব্দ করতে লাগল যাতে শিববাবুর ঘুম ভেঙে যায়। ট্রে সাজিয়ে রেখে রাম একবার শব্দ করে হাই তুলল যেন, রামের চোখেও ঘুম-ঝিমুনি আসতে চায়। চোখ মুদ্রিত করেই আপন মনে কথা বলে ঝিমুতে লাগল।]

রাম—সুগন্ধি চা কি আর ঘুম ভাঙাতে পারে? বাবু বলেন ওটা সাজিয়ে দিলেই গন্ধে ঘুম ভেঙে যাবে। আমার ঘুম দেখ, ঠিক সময়েই ভাঙে। কাজের লোক কি অপেক্ষা করতে পারে? (হাই—তুড়ি)

শিব—হাঁ, কি বললি রাম? (ঘুম-জড়ান কণ্ঠে) ঘুম ভাঙে—তোর (রামকে নীরব দেখে) রাম, রাম!—দাঁড়িয়ে ঘুমুচ্ছ?

রাম—হুজুর, সব ঠিক।

শিব—সব ঠিক কি রে? রাত ক'টা হল?

রাম—রা৩ নয় দিন। বেলা সাতটা হবে।

শিব—দিন! তাই বল, ঘরে রোদ আসছে। আমি ভাবছিলুম রাস্তার লাইট টা বুঝি এসে চোখে পড়েছে। দে, জানালাটা ভেজিয়ে দে। (রাম ঝিমুচ্ছে) রাম! রাম!!

রাম—এঁজ্ঞে, সব ঠিক।

শিব—সব ঠিক কি রে? দাঁড়িয়ে ঘুমুচ্ছিস! বেশ জুটেছি আমরা দু'জন। আমি বলি আমায় দেখ আর ও বলে আমায় দেখ।—জানালাটা বন্ধ কর আগে। (রাম ঘুম-ভরা চোখ কচলাতে কচলাতে এগিয়ে গিয়ে জানালা ভেজিয়ে দিল।) আচ্ছা, বলতে পারিস রামের সঙ্গে শিবের দেখা হয়েছিল কিনা?

রাম—এঁজ্ঞে আপনার সঙ্গে তো আমার দেখা হয়েইছে।

শিব—আজ্ঞে তোমার সঙ্গে নয়!—রামায়ণের রাম। তোর নাম কুম্ভকর্ণ হ'ল না কেন? কুম্ভকর্ণের সঙ্গে তো শিবের সম্পর্ক ছিল। জুটেছি ভাল। নে আর একটু ঘমুতে দে। দরজা ভেজিয়ে যা।

রাম—এদিকে তো সব ঠিক। সুগন্ধ চা পটে ভিজিয়ে দিয়েছি জুড়িয়ে যাবে যে! ওদিকে টেবিলের ওপর চা-এর কৌটো আর টি-পায়ের ওপর চা-এর পট মুখ খোলা অবস্থায় পড়ে রইল।

শিব—তুই চা খেয়েছিস তো?

রাম—আজ্ঞে, আমার তো ঘুম ভাঙেনি।

শিব—তা হলে এখন ভেঙে ফেলগে যা।

রাম—আগে তো কয়লা ভাঙি, তারপর ঘুম ভাঙব। (রামচন্দ্র দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। শিববাবু আবার নাক ডাকাতে সুরু করলেন। আকস্মিক ঘরের ভেতরটা ছোটদের হাসিতে ভরে গেল।)

শিব—কে? কে হাসছে? রা! রাম! রাম!!

রাম—(দূর থেকে) এজ্ঞে? (উঁকি মেরে) কই কেউ তো আসেনি! আপনার স্বপ্ন হচ্চে বুঝি! (রাম চলে গেল। আবার ছোটদের হাসিতে ঘর ভরে গেল। শিব নাক ডাকাচ্ছেন। টেবিলের তলা থেকে বেরিয়ে এল দুটো পাতা—দুটো মেয়ে। আবার খিলখিল করে হেসে উঠল। চা-এর টেবিলটা খট খট করে নেড়ে দিল ওরা।)

শিব—কে তোমরা? সাহস তো কম নয়! (শিববাবুর চা-এর টেবিল নাড়ছ?) রাম! রাম!! রাম!!

রাম—(বহু দূর থেকে) সব ঠিক হ্যায়।

প্রথমা—সব ঠিক নেই।

শিব—কি ঠিক নেই? তোমরা কে?

দ্বিতীয়া—আমরা তোমার চা।

প্রথমা—আমরা দুটো পাতা। আমাদের ভাই একটি কলি অনুপস্থিত।

শিব—কিন্তু তোমরা কেন উপস্থিত তাই বলো।

প্রথমা—আমাদের গন্ধ উড়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছ? আমরা চা। আমাদের গন্ধ নষ্ট হচ্চে।

দ্বিতীয়া—আমাদের রং হচ্চে না। ঠাণ্ডা জলে দিলে কি আর রং পাবে?

প্রথমা—জল শুধু গরম হলেই তো চলবে না। কতটা গরম করতে হবে—নিয়ম আছে।

শিব—রাম! রাম!!

রাম—(বহু দূর থেকে) সব ঠিক বাবু। দুটো পাতা হাসতে লাগল।

প্রথমা—তোমার নেইকো কিছুই ঠিক।

দ্বিতীয়া—আমরা হাসছি ফিক ফিক।

প্রথমা—আমরা নামব গরম জলে।

দ্বিতীয়া—রংটি করবে ঝিকমিক।

শিব—তা তোমরা যদি চা-এর পাতা হয়ে থাকো তবে চা-এর জলে গিয়ে ডুব দাও। ফিকফিক করে হাস্ত করবার দরকারটা কি? দুটো পাতা আর একটি কুঁড়ি নিয়ে যে চা তৈরী হয় সে কথা আমি জানি। আমি জানি তোমরা সোনার রং নিয়ে জন্মাও। তারপর তোমাদের সোনার মতো রং দেখে মানুষেরা অবাক হয়, পাখীরা গান করে। ভ্রমররা গুনগুন করতে থাকে।

প্রথমা—ক্রমাগত মুখ চেপে হাসতে থাকে।

দ্বিতীয়া—হা হা হা হা হা—হি হি হি হি হি—হা হা হা হা…

শিব—কী ই ই ই? হাসছ যে তোমরা? একি? হাসছ তবু? অল্ রাইট! রাম, রাম! রাম!! (দূর থেকে শোনা গেল—সব ঠিক হ্যায় হুজুর।)

শিব—শিগ্‌গীর লাঠিটা নিয়ে আয় তো।

প্রথমা—সব তো ঠিক হ্যায়, তবে লাঠি চাইছ কেন?

দ্বিতীয়া—উল্টোপাল্টা কথা বলছ, এজন্তেই আমরা হাসছি।

শিব—কি কি উল্টা কথা?

প্রথমা—কোথায় পাচ্ছ সোনার বেশ?
আমাদের তো সবুজ দেশ।

দ্বিতীয়া—নেইক গন্ধ নেইক রং
ওসব শুধু কথার ঢং।

শিব—তা হলে তোমরা বলতে চাও তোমরা কখনো সোনার রং নিয়ে জন্মাও না। জন্ম থেকে তোমাদের কোন গন্ধ থাকে না। তোমাদের গন্ধ ও রং দেখে পাখী গান গায় না, ভ্রমরা গুনগুন করে না। বাগান ফুলে ফলে ভরে ওঠে না। কিন্তু তবু তাকে বাগান বলা হয়?

প্রথমা—(আবার হাসতে থাকে)।

দ্বিতীয়া—একেবারে কিছুই জানে না দেখতে পাচ্ছি। (হাসি)

শিব—রাম!...একবার লাঠিটা নিয়ে আয় তো!

রাম—(দূর থেকে) সব ঠিক হ্যায় বাবু। সব ঠিক।

শিব—ওই আর এক জুটেছে! এখন, যাই কোথায় বলো!

প্রথমা—চা-বাগান অনেক দূরে। তোমাকে যেতে হবে না। আমরা যা বলব তা মনযোগ দিয়ে শোনো। উঁচু জমিতে যেখানে বৃষ্টি হয় প্রচুর, অথচ জল দাঁড়ায় না একেবারেই, সেখানেই হয় আমাদের ক্ষেত।

দ্বিতীয়া—সেখানে গাছে দুটো পাতা আর একটি কলি—সবুজ হয়ে গাছগুলো ছেয়ে আমরা জন্মাই। তাতে নেই গন্ধ, থাকে শুধু সবুজ রং। তারপর শ্রমিকরা দলে দলে এসে আমাদের নিয়ে যায়। ওরা ফ্যাক্টরীতে নিয়ে চলে যায়।

শিব—তার মানে তোমাদের সোনার মত রং আর কচিকাঁচা চেহারা দেখে দলে দলে লোক এসে তোমাদের গাছ থেকে উপড়ে নিয়ে যায়।

প্রথমা—আবার ভুল বললে তো? ভালো করে শোনো। একরের পর একর জমিতে থাকে আমাদের ক্ষেত। বছরের পর বছর বৃষ্টিতে, রোদে, ছায়ায় আমরা গাছের আগায় জন্মাই। আমাদের গাছগুলোর বয়স কম নয় মনে রেখ। মানুষের সমান বয়সেরও চা-গাছ আছে, বয়স তার পঁচাত্তর। আশি-নব্বুই বছরের চা-গাছও থাকতে পারে।

দ্বিতীয়া—মনে রেখ, প্রচুর বৃষ্টি আর উঁচু পাহাড়ী জমি চাই। দেখে এসো—দার্জিলিং-এ জলপাইগুড়িতে, আসামে, ত্রিপুরায়—সব কাছেই আছে।

শিব—কিন্তু রং আর গন্ধের কথা বলো।

প্রথমা—শ্রমিকেরা আমাদের নিয়ে যায় কারখানায়। সেখানে কি হয় জানো?

দ্বিতীয়া—সেখানে বাছাই করা হয়। শুকানো হয়। তারপর লম্বা পাইপের মধ্য দিয়ে পাঠিয়ে নানান ভাবে পরিশোধন করে চা তৈরী হয়।

প্রথমা—তারপর আসে আমাদের শরীরে রং আর গন্ধ। বাছাই করে প্যাক করে আমাদের রং আর রূপ-গন্ধ বজায় রাখতে হয়।

শিব—ও? এত বড় ব্যাপার! তা হলে দেখা যাচ্ছে তোমরা স্বাধীনভাবে জন্মাও নি।

দ্বিতীয়া—আমরা জন্মেছিলাম আদিমকালে পাহাড়ে পর্বতে। চীনেরাই প্রথম আমাদের ব্যবহার সুরু করে। তারপর যুগ এগিয়ে গেছে। এখন আমাদের রং-এ রূপে গন্ধে নতুন পরিচয় হয়েছে।

'ভীষণ জোরে হেসে উঠল প্রথমা ও দ্বিতীয়া।'

শিব—এতো ব্যাপার! পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে তো তোমাদের দেখা পাইনি। (ভীষণ জোরে হেসে উঠল প্রথমা ও দ্বিতীয়া। হাসি থামতে চায় না।)

শিব—আবার হাসছ? আবার! (রেগে আগুন হলেন শিববাবু)।
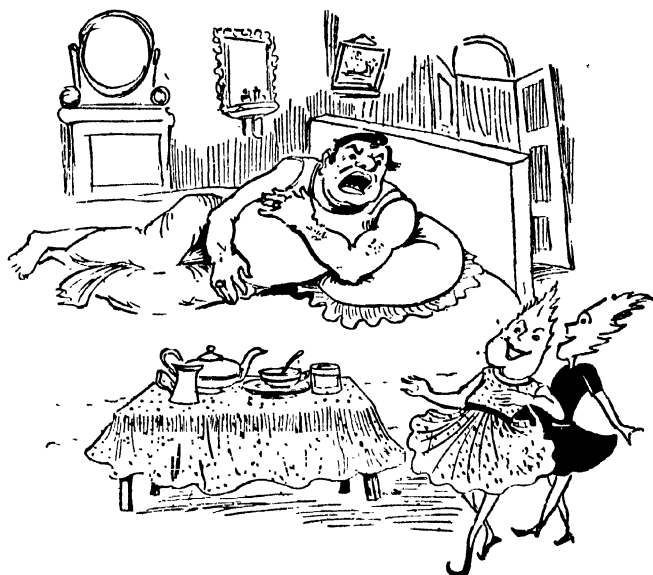
প্রথমা—হাসব না? ঐ যে বললে পাহাড়ে ঘুরে আমাদের দেখা পেতে চাও। সেখানে তো আমরা চা-এর গাছে থাকি। চারদিকে চেয়ে দেখতে পাবে শুধু সারি সারি গাছে আমরা আছি প্রত্যেক দুটো পাতা একটি কুঁড়ি হয়ে। পাতা আর কুঁড়ির সৃষ্টি চলেছে নিরন্তর, দেখতে পাবে আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে আমরা অপেক্ষায় আছি সকলের সেবার জন্যে।

দ্বিতীয়া—কিন্তু সে তো গেল পাতা আর কুঁড়ির কথা। আমরা কিন্তু ওখানে থাকি না।

শিব—সেখানেই দেখেছি তোমাদের আমি। (আবার হেসে উঠল দু'জনে।)

দু'জন—আমরা তো তোমার চা-এর কৌটোর মধ্যে থাকি। কৌটোর মুখটা খুলে রাখা হয়েছে দেখতে পাচ্ছ না? আমরা ভূত হয়ে বেরিয়ে এসেছি। দু'জন খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠতেই শিববাবু চেঁচালেন, "রাম, রাম! লাঠিটা নিয়ে আয়!" ধীরে ধীরে দু'জন হাসতে হাসতে মিলিয়ে গেল। শিববাবু উঠে বসলেন। রাম লাঠি নিয়ে এল। শিববাবুকে তাকিয়ে থাকতে দেখে দৌড়ে ফিরে গেল। এবারে নিয়ে এল চামচ। চা-এর জলটা নেড়ে শিববাবু বললেন, স্বপ্ন না ভূত?

রাম—ভূত কোথায়? আমি এসেছিলাম যে।

শিব—তুমি এসেছিলে? (ভেংচি কেটে) ভাল করেছিলে। রেখে গেছ ঠাণ্ডা জল আর চিনির বদলে নুন। (চীৎকার) আমার এমন দামী চা-এর কৌটোর মুখ খুলে রেখেছিস। হতভাগা। এজন্যে!...ভূত!...ভূত!

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বাবার ঘরের কাছে এসে ভয়ে-ভয়ে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকল পাপিয়া। আগে কোয়েলী দেখুক কারা এসেছে এত রাতে। বাবাকে ডেকে আনেনি বলে এখন পাপিয়ার খুব মন খারাপ হয়ে গেল।

কোয়েলী পাপিয়ার হাত ছেড়ে দিয়ে খুশীতে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, "রণু দাদা।"

পরী কিংবা ভূত কেউ না, বাবার ঘরের সোফায় রণু দাদা বসে আছে। তার টুপিটা পড়ে আছে টেবিলের ওপর। সাদা প্যান্ট আর শার্ট পরে এক মনে একটা বাজনা বাজিয়ে যাচ্ছে রণু দাদা, তারই শব্দ এতক্ষণ শুনতে পাচ্ছিল পাপিয়া।

রণু দাদা ওদের দেখতে পেয়ে হেসে বলল, "কী রে, উঠে পড়েছিস? বলেছিলাম না, এবার আমি অনেক রাত্তিরে আসব—"

ততক্ষণে রণু দাদার শার্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে কোয়েলী, "বলেছিলে খুব বড় চকলেট আনবে আমার জন্যে?"

পাপিয়া জিজ্ঞেস করল, "সাউণ্ড অব মিউজিকে"র লং প্লেয়িং রেকর্ড আজ আমাকে দিতেই হবে—"

"কী বললি? সাউণ্ড অব মিউজিক?" রণু দাদার হাতে যে সুন্দর বাজনা ছিল তা চেপে চেপে সে 'ডো—রে—মী—' বাজাতে বাজাতে বলল, "শুনছিস? কেমন বাজাতে পারি বল?"

"এটা কী?"

"এটা পিয়ানো একরডিয়ান।" রণু দাদা বাজনা থামিয়ে বলল, "এবার প্লেন নিয়ে হাওয়াই দ্বীপে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে এটা এনেছি"—

কোয়েলী রণু দাদার পকেট থেকে চকলেটের একটা বড় স্ল্যাব বের করে অল্প একটু পাপিয়াকে ভেঙে দিয়ে বলল, "আমাদের প্লেনে চড়াবে না রণু দাদা?"

"এখখুনি চড়াব।" পিয়ানো একরডিয়ান আস্তে সোফার ওপর রেখে রণু দাদা বলল, "আমি প্লেন নিয়ে এসেছি।"

"কই?"

"পুলিশ-মাঠে আছে।"

পাপিয়া হেসে উঠল, রণু দাদার কথা বিশ্বাস করল না, "ওইটুকু মাঠে প্লেন নামে কখনো?"

"কী বললি?" টেবিল থেকে টুপি নিয়ে মাথায় পরল রণু দাদা, পাপিয়াকে কোলে তুলে নিয়ে গলা মোটা করে বললে, "আমি ইচ্ছে করলে তোদের ড্রয়িং রুমেও প্লেন নামিয়ে দিতে পারি—" সে দু-হাত দিয়ে পাপিয়াকে অনেক ওপরে তুলল, "জানিস আমি কে? আমি স্কোয়ার্ডন লীডার-আর, কে, সেন?"

কোয়েলী সব চকলেট মুখের মধ্যে পুরে রণু দাদার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে খুব আস্তে বলল, "সত্যি প্লেন এনেছ রণু দাদা?"

"হ্যাঁ রে, আমি হাওয়াই দ্বীপ থেকে সোজা এখানে উড়ে এলাম।" পাপিয়াকে নামিয়ে দিয়ে কোয়েলীর হাত ধরল রণু দাদা। বললে, "চল না, যাবি? এক্ষুনি তোদের প্লেনে চড়াব।"

"চল রণু দাদা।"

পাপিয়া কিছু সময় কী ভাবল, একটু পরে বলল, "বাবাকে ডাকব?"

"উঁহু, আমার প্লেন বড়দের জন্যে নয়।" রণু দাদা পাপিয়া আর কোয়েলীকে নিয়ে রাস্তায় নামল। পিয়ানো একরডিয়ান পড়ে থাকল সোফার ওপর।

পাপিয়া কোয়েলীদের বাড়ির খুব কাছেই পুলিশ-মাঠ। ওরা দূর থেকেই রণু দাদার প্লেন দেখতে পেল।

অনেক রাতে পুলিশ-মাঠে প্লেন দেখে এত বেশী অবাক হয়ে গিয়েছিল পাপিয়া আর কোয়েলী যে ওরা বুঝতেই পারেনি কখন রণু দাদা ওদের পাশ থেকে সরে গেছে। কিছু পরেই সোঁ সোঁ আওয়াজ হল আর ওরা দেখল প্লেনের প্রপেলার খুব জোরে ঘুরতে শুরু করেছে। ওদের পায়ের কাছে ঝপ করে সিঁড়ির মতন কি একটা নেমে এল।

এতক্ষণ কোয়েলী খুব সাহস দেখাচ্ছিল, কথা বলছিল—এখন একেবারে চুপ হয়ে

গিয়ে পাপিয়ার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকল। প্রপেলারের আওয়াজ আরও বাড়ছে। ঢং ঢং করে পুলিশ-ফাঁড়িতে ঘণ্টা বাজল। রাত দুটো বেজেছে। জড়োসড়ো হয়ে রাস্তায় যত কুকুর শুয়েছিল, এত রাতে প্লেনের শব্দে তারা সব উঠে দাঁড়িয়ে এক সঙ্গে ডাকতে শুরু করল।

কোয়েলী কথা বলতে পারছে না, পাপিয়া ঠকঠক করে কাঁপছে—এমন সময় কালো একটা মেঘের খণ্ড আকাশে ভাসতে ভাসতে চাঁদের কাছে গিয়ে পড়তেই চারপাশ হঠাৎ বেশ অন্ধকার হয়ে গেল। দূরে-দূরে যে গাছ আর লাল রঙের ছোট ছোট বাড়ি-ঘর দেখা যাচ্ছিল মাঠের আর একদিকে, এখন সেসব কিছুই আর দেখা গেল না। শুধু প্লেনের পিছনে লাল ও সবুজ আলো মিটমিট করছিল।

এত রাতের পুলিশ-মাঠ একেবারেই অন্যরকম। আজও বিকেলে পাপিয়া আর কোয়েলী নীল রঙের নতুন ফ্রক পরে, ম্যাচ করা রিবন বেঁধে নারায়ণের সঙ্গে রোজকার মতন এখানে খেলতে এসেছিল—জয়ী, ঋতু, লিপি, পুপালি, পুতুল, রত্না সকলেই এসেছিল তখন। উঁচু ঢিবির ওপর উঠে ছুটে ছুটে বার বার সব চেয়ে আগে নিচে নামতে পেরেছিল পাপিয়া। কোয়েলী বেচারীর নতুন ফ্রকে ধুলো লেগেছিল অনেকটা, পড়ে গিয়ে পা ছড়ে গিয়েছিল। তখন এখানে কত মানুষ ছিল, কত গোলমাল হচ্ছিল! এখন কুকুরের চিৎকার আর প্লেনের প্রপেলারের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। অন্ধকারে আর কোন মানুষকেও দেখতে পেল না পাপিয়া আর কোয়েলী।

ওদের সামনে প্লেনের যে সিঁড়ি জ্যোৎস্নায় চিকচিক করছিল, তা বেয়ে-বেয়ে ওরা প্লেনের মধ্যে গিয়ে ঢুকবে কিনা যখন ভেবে ঠিক করতে পারছিল না, তখন যেন অনেক ওপর থেকে রণু দাদা কথা বলে উঠল, "চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছিস যে? এই বোকারা! আমি এক্ষুনি প্লেন ছাড়ব কিন্তু—শীগগির উঠে আয়!"

রণু দাদার মুখ দেখতে পেল না পাপিয়া আর কোয়েলী—শুধু কথা শুনল। সব শুনে ভিজে ঘাসের উপর খসখস করে পা ঘষে কোয়েলী ভয় কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টা করতে করতে আস্তে বলল, "পুপু দিদি, চল!"

বাবাকে ফেলে একা একা এত রাতে রণু দাদার প্লেনে চড়ে বেড়াতে যাবার ইচ্ছে মুছে গিয়েছিল পাপিয়ার। রণু দাদা তাকে বোকা কিংবা ভীতু যা খুশী ভাবুক না কেন, সে আজ কখনোই প্লেনে চড়ত না—আর এক মিনিটের মধ্যেই কোয়েলীর হাত ধরে পিছন ফিরে দৌড়ে বাড়ি গিয়ে পৌঁছত—আবার মশারী ফাঁক করে চুপে চুপে বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ত বাবার পাশে।

(ক্রমশঃ)

পণ্ডিত ও মূর্খ

(ডোগরী লোককথা)

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

কয়েকশো বছর আগের কথা। এক পণ্ডিত এক রাজার কাছে গিয়ে বলেন, আমি দার্শনিক, আমার চেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত পুরুষ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। অতএব আপনার রাজপ্রাসাদে আমাকে এক উচ্চপদে বহাল করুন।

রাজা বললেন, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই, তবে এক শর্তে আপনাকে রাজী হতে হবে। আপনাকে আমার দরবারের অন্যান্য পণ্ডিতদের তর্কে পরাজিত করতে হবে।

পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে বললেন, শুধু তাই নয়, পরাজিত হলে আমি যে কোন শাস্তি সানন্দে ভোগ করব।

রাজা এ বার্তা ঘোষণা করে দিলেন। দিন ঠিক হলো। রাজ্য থেকে সমস্ত পণ্ডিতদের ডাক পড়ল। পণ্ডিতদের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। তাদের সম্মান চাকরি সব যায় যায় অবস্থা। নানান চিন্তায় পণ্ডিতরা উদ্বিগ্ন। তাঁরা নিশ্চিত যে, যে পণ্ডিত এরকম ঘোষণা রাজাকে দিয়ে করাতে পারেন, তিনি সাধারণ দার্শনিক হতে পারেন না। অগত্যা ওঁরা নিজেদের মধ্যে গোপনে সভা করলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করে তারা ঠিক করলেন যে, পরাজয় যখন নিশ্চিত তখন কোন পণ্ডিত না গিয়ে মূর্খ কোন লোককে পাঠানোই ভাল। মূর্খের সন্ধান করতে করতে পেলেন তাঁরা একজনকে। লোকটা মাথায় পাগড়ি বেঁধে ঘোরে। সেই পাগড়ির ভেতর রাখে একটি ডিমের খোলস। পণ্ডিতরা সেই মূর্খের গায়ে দামী দামী কাপড়-চোপড় চড়িয়ে নির্দিষ্ট দিনে রাজদরবারে নিয়ে গেলেন। পণ্ডিতরা রাজাকে বললেন, মহারাজ, ইনি আমাদের গুরু। তবে ইনি কথা বলেন না। মৌন থাকেন। ইশারায় সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়ে থাকেন।

বিদেশী দার্শনিকের সামনে মূর্খকে দাঁড় করানো হলো। দার্শনিক প্রথমে একটি তর্জনী দেখালেন। তৎক্ষণাৎ মূর্খ দুটো আঙুল দেখাল। তারপর দার্শনিক আকাশের দিকে হাত তুললেন আর সঙ্গে সঙ্গে মূর্খ নিচের দিকে হাত দেখাল। মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে দার্শনিক নিজের থলে থেকে একটি মুরগি বের করে ছুঁড়ে দিলেন প্রতিপক্ষের দিকে মূর্খ চোখের পলকে তার পাগড়ির ভেতর থেকে ডিমের একটা খোলস বের করে ছুঁড়ে দিল দার্শনিকের দিকে।

পরক্ষণেই যা ঘটল তাতে রাজা পণ্ডিতবর্গ আর অন্যান্য দর্শক সবাই অবাক।

দার্শনিক প্রতিপক্ষের পায়ে প্রণাম করে রাজাকে বললেন, মহারাজ আমি পরাজিত, আমি আপনার শাস্তি গ্রহণ করতে চাই।

'সঙ্গে সঙ্গে মূর্খ নাচের দিকে হাত দেখাল।' —পৃঃ ৯৩

ফেরার সময় মূর্খকে যাঁরা পাঠিয়েছিলেন সেই পণ্ডিতরা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি করে বুঝলে দার্শনিকের ইশারাগুলো?

মূর্খ বলল, না বোঝার কী আছে! আমার দিকে লোকটা তর্জনী দেখিয়ে বলতে চাইল, আমার একটা চোখ ফুঁড়ে দেবে আমিও জবাবে জানিয়ে দিলাম যে আমি তার দুটো চোখ ফুঁড়ে দেব। তারপর লোকটা ওপরের দিকে হাত তুলে বলতে চাইল যে, সে আমাকে ছাদে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। আমিও জানিয়ে দিলাম যে তাকে আমি জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে ফেলতে পারি। শেষে সে গায়ের জোর বোঝানোর জন্য আমার দিকে মুরগি ছুঁড়ে মারল। তার মানে আমি মুরগি খাই, পালোয়ান লোক আমি। সাবধান! ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে ডিমের খোলস ছুঁড়ে ফেলে আমিও জানিয়ে দিয়েছি যে আমি ডিম খাই। তোমার চেয়ে কম যাই না। এইভাবে চটপট জবাব দিয়ে আমি ওকে হারিয়ে দিয়েছি।

মূর্খের কথা শোনার পর কয়েকজন পণ্ডিত ঐ দার্শনিক-পণ্ডিতের কাছে গিয়ে তাঁর পরাজয়ের কারণ জিজ্ঞেস করল। দার্শনিক বললেন, আমি তর্জনী দেখিয়ে জানাতে চেয়েছি যে ঈশ্বর এক। আর উনি দুটো আঙুল দেখিয়ে বললেন, এবং অদ্বিতীয়। আমি আকাশের দিকে হাত তুলে জানাতে চাইলাম যে, স্রষ্টা আকাশ সৃষ্টি করেছেন। উনি মাটির দিকে আঙুল দেখিয়ে জানাতে চেয়েছেন, সেই স্রষ্টাই জলের উপর এই ভূমি সৃষ্টি করেছেন। আমি থলে থেকে মুরগি বের করে বলতে চেয়েছিলাম যে, ঈশ্বর জড় থেকে প্রাণীর সৃষ্টি করেছেন। আর উনি আমার দিকে ডিমের খোলস ছুঁড়ে বলতে চান যে, ঈশ্বর যে শুধু জড় থেকে প্রাণীর সৃষ্টি করেন তাই নয়, উনি প্রাণীকে জড়ও করতে পারেন। অতএব, পণ্ডিত হিসেবে ওঁর কাছে আমি ছেলেমানুষ। উনি আমার অনেক উর্ধ্বে

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

হঠাৎ দলে দলে চিন্‌চিনিয়া, কেক্‌রালি আর সবজিনিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকে সোৎসাহে চেঁচাতে লাগ্‌ল, "কেয়া মজা, কেয়াবাৎ! যুদ্ধ জাহাজ এসে গেছে। আশ্চর্য নগরের জয়!

চোরামাণিক্য বাহাদুরের জয়!

গুগ্‌লী ঝিনুকের জয়!"

কাকীবুড়ী বললে, "এতদিনে আমাদের দেশ সভ্য হ'ল!"

খুড়ো জিজ্ঞাসা করলে, "আশ্চর্য নগরের ধারে কাছে তো সমুদ্র দেখছি না—খাল নেই, বিল নেই, নদী নেই—তবে যুদ্ধ জাহাজ এলো কোত্থেকে?"

কাকীবুড়ী বললে, সব দেশের যা আছে, আমাদের দেশেও তা থাকবে—নাই বা রইল সমুদ্র!"

সারস সার্জেন্ট এসে কাকীবুড়ীকে স্যালুট করে বললে, "চোরামাণিক্য বাহাদুরের হুকুমে যুদ্ধ জাহাজের প্রকাশ্য প্রথম প্রবর্তনের দিনে আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।"

খুড়ো ও খুড়ী বিনীত ভাবে বললে, "আমাদের নিয়ে যেতে পারেন না?

সারস সার্জেন্ট বললে, "চোরামাণিক্য বাহাদুরের হুকুম পেলে আপনাদেরও নিয়ে যাবো।"

এই বলে সারস সার্জেন্ট কাকীবুড়ীকে সামুদ্রিক ঝিনুকের খোলের উপর বসিয়ে

ঘরের মধ্যে ভিড় কমতে লাগ্‌ল। সবাই চলছে যুদ্ধ জাহাজ দেখতে। খুড়ো-খুড়ী উস্‌খুস্‌ করতে লাগল।

কিছুক্ষণ বাদে একদল পরচুলওলা একটা প্রকাণ্ড কড়াইয়ের হাতলের মধ্য দিয়ে বাঁশ ঢুকিয়ে দু'ধারে কাঁধ দিয়ে তাকে পাল্কীর মত ঝুলিয়ে নিয়ে রান্নাঘরে হাজির হ'ল।

তারা বললে, "আপনারা বিদেশী তবুও কাকীবুড়ীর বিশেষ সুপারিশে আপনাদের নিয়ে যাবার হুকুম মিলেছে। এখন কড়াইয়ের মধ্যে বসুন।"

খুড়োখুড়ী তো বেজায় খুশি! কড়াইয়ের মধ্যে বসে চতুর্দোলার মত দুলতে দুলতে চললো তারা।

মাঝে মাঝে পরচুলওলা বেহারারা হাঁকতে লাগল—

হেঁইয়ো মারি হুকুম দাবড়ে
পাল্কী চলে, ওরে বাপ্‌রে!
পথ বেশী নয় মাইল তিনেক
হুম্পাহুমা এই ধারে দেখ্‌!
ঝুঁকতে মানা, ঝুঁকলে বিপদ
দুল্‌কি তালে গাইছি তো গৎ।

অল্পক্ষণেই খুড়ো-খুড়ী পৌঁছে গেল।

নীল রং-করা একটা মঞ্চের উপর যুদ্ধ জাহাজগুলো সারি সারি সাজানো। যুদ্ধ জাহাজের রং লাল হল্‌দে। স্রেফ পিজবোর্ড দিয়ে সব তৈরী। বেতের মাস্তুল আর সিল্কের পাল খাটানো। প্রত্যেক জাহাজে একটা করে সোনালী কাগজের চোঙ বসানো। চোঙ থেকে কোন ধোঁয়া-টোঁয়া বেরুচ্ছিল না কিন্তু।

চতুর্দিকে বেজায় ভিড়। গুগ্‌লী ঝিনুক সব তদারক করছে। এক ধারে চোরা-মাণিক্যবাহাদুর সিংহাসনে বসে আছেন।

খুড়ো গুগ্‌লী ঝিনুককে ফিস্‌ফিস্‌ করে জিগ্যেস করলে, "চোঙ থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে না কেন?"

গুগ্‌লী হুকুম দিলেন, "নৌ সেনাপতি, ধোঁয়া লাগাও—"

তক্ষুনি তুলোতে আগুন লাগিয়ে প্রচুর ধোঁয়া করা হ'ল আর যুদ্ধজাহাজের চোঙ দিয়ে ধোঁয়া বেরুতে লাগ্‌ল।

খুড়ো-খুড়ী দেখলে যে নৌ-সেনাপতি একজন জলদেবতা—বাদামবাটা আর ক্ষীর দিয়ে তৈরী করা জ্যান্ত পুতুল। মাথায় মাছের মুকুট—দুই হাতের বদলে মাছের পাখনা।

যুদ্ধ জাহাজের আরো সব কর্মীদের দেখা গেল। একটি ডলফিন, একটি শীলমাছ, একটি সিন্ধুঘোটক ডেকে পায়চারি করছিল। তার মধ্যে আবার দুই কাঁধ থেকে হুইশিল ঝোলানো একটা লম্বা ঠুঁটো রোগা মাছকে দেখা গেল। তার কোমর থেকে ঝোলানো একটা বয়ামে অনেক কুচো মাছ জীয়োনো রয়েছে। রোগা মাছ, ক্ষিদে পেলেই বয়াম থেকে কুঁচো মাছ দোক্তার মত মুখে ফেলে দিচ্ছিল।

খুড়ো গুগলী ঝিনুককে ডেকে জিগ্যেস করলে, "জল কই? ডাঙায় যুদ্ধ জাহাজ বড় বেমানান।"

গুগলী ঝিনুক কাকীবুড়ীর পরামর্শ চাইলে। কাকীবুড়ী বললে, "বেশ তো, ইঁদুর বাহিনী দিয়ে একটু জল দেবার ব্যবস্থা করো না—"

গুগলী ঝিনুক মাথা চুলকে বললে, "দেখি চোরামাণিক্য বাহাদুর কী বলেন—" সে গেল চোরামাণিক্যের পরামর্শ নিতে।

চোরামাণিক্য সব শুনে বললে, "উঁহু! বুঝছো না? সব যে পিজবোর্ডের জাহাজ—জল লাগলে সব পয়মাল হয়ে যাবে যে!"

মাথা চুলকে গুগলী ঝিনুক বললে, "তাই তো! তাই তো! কথাটা আমার মনেই হয়নি।"

এদিকে দলে দলে পরচুলওলারা জাহাজের গায়ে খড়ি দিয়ে নিজের নাম লিখছিল। হঠাৎ সেদিকে চোরামাণিক্যের নজর পড়তে সে তাদের ধম্‌কাবার জন্যে "খবর্দার" মার্কা বদ্‌খদ্‌ মুখোসটা মুখে এটে দাঁড়ালো।

তাই দেখে সবে সবাই নিরস্ত হয়েছে অমনি আবার সোরগোল উঠল, "জেলখানা আসছে—পালাও, পালাও।"

কয়েদী যরলব বোধহয় জানতে পেরেছে এদের যুদ্ধজাহাজের কথা। তাই এগুলো ধ্বংস করার জন্যেই বোধ হয় সে এই দিকে আসছে।

চতুর্দিকে কেবল পলায়ন, চম্পট, পশ্চাদপসরণ।

আখের জঙ্গল ঝড়ের বেগে এগিয়ে এল। ইঁদুররা তাতে হোস পাইপ, পিচকিরি আর ঝারি দিয়ে জল ছিটোতে ছিটোতে আসছে।

কড়াইয়ের মধ্যে খুড়োখুড়ী ভয়ের চোটে আঁকুপাঁকু।

জেলখানা কাছে আসতে খুড়ী চেঁচিয়ে উঠল— "বাছা যরলব—একটু থামো—একটা কথা আছে।"

মানুষের গলার স্বর শুনে যরলব'র রাগ জল হয়ে গেল।
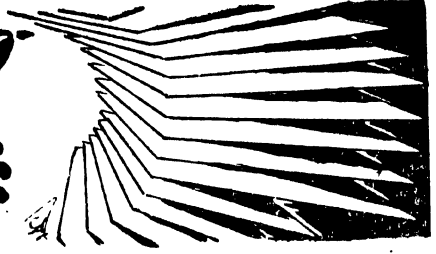
সূর্য্যিমামা বসেন পাটে

ঝিক্ ঝিক্ হুস্ হাস
রেলগাড়ী ছোটে,
খোকাখুকু দেখে তাই
খুব মজা লোটে।

ওইখানে মাঠ পারে—
দিগন্ত রেখায়
সূয্যিমামা সেইখানে
অস্ত চলে যায়।

ধীরে ধীরে রেলগাড়ী
চলে যায় দূরে,
সাঁঝ-কালো ছায়া নামে
কি উদাস সুরে।

ধীরে ধীরে খোকাখুকু
বাড়ী ফিরে আসে;
মা বলেন, "কোথা ছিলি
খুঁজি আশেপাশে।"

খোকা বলে জানো মাগো
লাইনের ধারে,
সূয্যিমামা দাঁড়িয়েছিলেন
মাঠের শেষ পারে।

ধীরে ধীরে তিনি মাগো
নিলেন বিদায়,
বনে-মাঠে সাঁঝ বুড়ী
আঁধার বিছায়।

সূয্যিমামা পাটে ব'সে
ঘোরেনাকো মোটে,
লোকে বলে সূর্য নাকি
পূব দিকে ওঠে।

আর সারা দিন ধরে
হেঁটে হেঁটে চলে
পূব থেকে ধীরে ধীরে
অস্ত-অচলে।"

মা বলেন, বোকা ছেলে
আজগুবি কথা,—
সূর্যকেই কেন্দ্র করে
জগৎ ঘোরে সদা!

সূর্য সে স্থির থাকে
অটল, প্রতীক;
পৃথিবীই ঘোরে খালি
তার চরিদিক।"

শ্রীলপিতা বসু

বাজিকর

জোড়-বিজোড়

১। পাশের ছবিটিতে অনেক রকম জিনিস আছে। ওর কতকগুলি আছে জোড়ায় জোড়ায়, আবার কতকগুলির জোড়া নেই—একটিই আছে। কোনগুলির জোড়া আছে এবং কোনগুলির জোড়া নেই তাড়াতাড়ি ছবিটি দেখে বলতে পার কিনা দেখ।
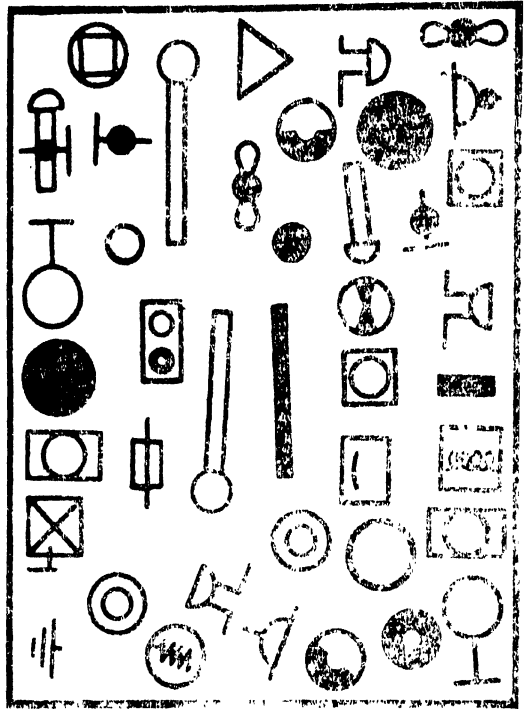
শব্দ সাজানোর ধাঁধা

২। নীচে আটটি তিন অক্ষরের ধাঁধা দেওয়া হ'ল। এগুলির প্রত্যেকটির আগে এমন দেখে দুটি করে শব্দ বসাতে হবে, যাতে প্রতি ক্ষেত্রেই পাশাপাশি ও খাড়াখাড়ি প্রথম সারিতে একই শব্দ হবে, পাশাপাশি ও খাড়াখাড়ি দ্বিতীয় সারিতে একই শব্দ হবে, আবার ঐ ভাবে তৃতীয় সারিতেও একই শব্দ হবে। শব্দগুলি হচ্ছে: (১) ললনা (২) জনক (৩) মমতা (৪) নরক (৫) কলস (৬) কলম (৭) কতক (৮) লবণ। একটি নমুনা দেখান হ'ল।

—শ্রীবিনয় বাগচী

স ম তা

ম ধু র

তা র কা

গতবারের ধাঁধার উত্তর

১। উপরের চিত্রে বাঁ-দিকের ঘণ্টা, চামড়ার ব্যাগে চাবির জায়গা ও বাঁ-দিকের গাছের ডাল, নীচের চিত্রের অনুরূপ নয়। ২। রসুনচৌকি ৩। 'ক'

মেঠুড়ে

ক্রিকেট : ইংলণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

পোর্ট অব স্পেনের চতুর্থ টেস্টে ইংলণ্ড সংগ্রামী ক্রিকেটের উজ্জল উদাহরণে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে ৭ উইকেটে পরাজিত করে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্যাপ্টেন গারফিল্ড সোবার্স টসে জিতে প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন। বৃষ্টির জন্যে ১০০ মিনিট সময় নষ্ট হলেও দিনের শেষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ২ উইকেটে ১৬৮ রান ওঠে। ওপেনিং ব্যাটসম্যান ক্যামাচো ৮৭ রান করে আউট হন। বারবাডোজ টেস্টে ৫০ রান করতে ক্যামাচো ৫ ঘণ্টা সময় নিয়েছিলেন। ক্যামাচোর মধ্যে ওপেনিং ব্যাটসম্যানের সংযম ও দৃঢ়তা দুই-ই যে বর্তমান প্রথম দিন তিনি আবার তার প্রমাণ দেন। সেমুর নার্স এবং রোহন কানহাই নট আউট থাকায় দ্বিতীয় দিনের সূচনায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের আশু বিপদের সম্ভাবনা কম থাকে। বৃষ্টির জন্যে দ্বিতীয় দিনের খেলা আরম্ভ হতেও ৯০ মিনিট দেরি হয়, কিন্তু বৃষ্টির ফলে পীচের কোনো ক্ষতি হয় না। ইংলণ্ডের বোলারদের কোনোরকম সমীহ না করে নার্স ও কানহাই সাবলীলভাবে ব্যাট চালিয়ে সেঞ্চুরী করেন। কানহাই ১৫৩ ও নার্স ১৩৬ রান করে আউট হন। দিনের শেষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৪ উইকেটে ৪৭৯ রান ওঠে। দ্বিতীয় দিনের নট আউট খেলোয়াড় সোবার্স ও লয়েড তৃতীয় দিনের সূচনা থেকেই মারমুখী হয়ে ওঠেন। লয়েড ৪৩ ও সোবার্স ৪৮ রান করে আউট হবার পর আর মাত্র ৯ রানের মধ্যে রডরিগস আউট হলে সোবার্স ৭ উইকেটে ৫২৬ রানের মাথায় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ঘণ্টার মত সময় ব্যাট করে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বড় রানের ইনিংসের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের সূচনাও ভালো হয়। মধ্যাহ্ন ভোজের ৫৫ মিনিট আগে থেকে ব্যাট করতে আরম্ভ করে দিনের শেষে এডরিচ ও বয়কটের উইকেট হারিয়ে ইংলণ্ড ২০৪ রান তোলে। অধিনায়ক কাউড্রে ৬১ ও ব্যারিংটন ২৮ রান করে নট আউট থাকেন। চতুর্থ দিনের সূচনায় নিজের ভুলেই ব্যারিংটন আউট হয়ে যান এবং ২৬০ রানের মাথায় পর পর আউট হন গ্রেভনি ও ডলিভেরা। স্কোর বোর্ডে তখন উঠেছে ৫ উইকেটে ২৬০ রান। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সব রকমের আক্রমণের বিরুদ্ধে

ব্যাট হাতে মাঠে নামেন অধিনায়ক কলিন কাউড্রে, তরুণ উইকেটকিপার নটকে সঙ্গে নিয়ে। সোবার্স নিজে সাতজন বোলার নিয়ে আক্রমণ করেও জুটি ভাঙতে পারেন না। আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে থাকেন কাউড্রে ও নট। ষষ্ঠ উইকেটে দুজনের জুটিতে ১১৩ রান যোগ হবার পর কাউড্রে অপূর্ব একটা ইনিংস খেলে নিজস্ব ১৪৮ রানের মাথায় আউট হন। ৪০৪ রানে ইংলণ্ডের ইনিংস শেষ হবার পর আলোর অভাবের জন্যে দু' ওভার খেলার পর খেলা বন্ধ হয়ে যায়।

পঞ্চম ও শেষ দিনে সোবার্স ফলাফলের আশায় এক দারুণ ঝুঁকি নেন। ২ উইকেটে ৯২ রান তুলে এবং ২১৪ রান হাতে নিয়ে যখন তিনি ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন, তখন খেলায় ১৬৫ মিনিট সময় বাকি। জয়ের জন্যে ইংলণ্ড দলের দরকার ছিল ২১৫ রান। সোবার্সের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে ইংলণ্ড শুরু থেকে মেরে খেলতে থাকে এবং সাহসী সংগ্রামের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে খেলাটাকে টেস্ট ইতিহাসের এক স্মরণীয় খেলায় পরিণত করে ৭ উইকেটে জিতে যায়। ১৬৫ মিনিটে ২১৫ রান সংগ্রহের মূলে দুই ওপেনিং ব্যাটসম্যান এডরিচ ও বয়কট এবং অধিনায়ক কলিন কাউড্রের অবদানই মুখ্য।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে পরাজিত করে 'রাবার' পাবার পর ইংলণ্ডকে এখন ক্রিকেটের ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়ন বলা যায়। এবারের পাঁচটা টেস্ট সিরিজে চারটে খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থেকে গেছে। পোর্ট অব স্পেনের চতুর্থ টেস্টে সাত উইকেটে জয়ী হয়ে ইংলণ্ড পেয়েছে 'রাবার'—যে রাবার ছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দখলে। দু দেশের টেস্ট খেলার হিসেবে মোট পঞ্চান্নটা খেলার ভেতর এখন ইংলণ্ড জয়ী আঠারটা টেস্টে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয়ের সংখ্যা ষোলো। একুশটা টেস্টের ফলাফল অমীমাংসিত।

পঞ্চম টেস্টে টসে জয়ী হয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ৭২ রানের ভেতর তিনটে মূল্যবান উইকেট হারায়। কিন্তু চতুর্থ উইকেটে কানহাই-সোবার্স জুটি অনমনীয় দৃঢ়তায় ব্যাট করতে থাকেন। ফলে শেষ পর্যন্ত আর কোনো উইকেট না পড়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ২৪৩ রান সংগৃহীত হয়। চতুর্থ উইকেটে দু'জনের জুটিতে ২৫০ রান যোগ হবার পর কানহাই ১৫০ রানে ও সোবার্স ১৫২ রানে আউট হন। সোবার্স-কানহাই জুটি ভাঙা থেকে মাত্র ৯২ রানের ভেতর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সাতটা উইকেট পড়ে যায়। ৪১৪ রানে শেষ হয় তাদের প্রথম ইনিংস।

দ্বিতীয় দিনের শেষ দিকে ইংলণ্ড তেরো রানের মাথায় প্রথম উইকেট হারিয়ে ৪০ রান সংগ্রহ করে। তৃতীয় দিনের শেষে স্কোর বোর্ডের দিকে তাকালে দেখা যায় ইংলণ্ডের ১ উইকেটে ১৪৬ রান উঠেছে। বয়কট ৯৩ ও কাউড্রে ৪৩ রানে নট আউট থাকেন। এই

দিন ৫০ রান করার পর টেস্ট খেলায় বয়কটের দু' হাজার রান পূর্ণ হয়। চতুর্থ দিনের সূচনায় বয়কটের সেঞ্চুরি পূর্ণ হয় এবং জিওফ বয়কট ১১৬ রান করে আউট হন। কাউড্রে ৫৯ রানের মাথায় আউট হন। এর পর ঘন ঘন উইকেট পড়তে থাকে। ২৫৯ রানের মধ্যে অষ্টম উইকেট পড়ে যায়। দলের নবম খেলোয়াড় টনি লক এক সাহসী সুন্দর ইনিংস খেলে ইংলণ্ডকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেন। পঞ্চম দিন লক ১৩ রান যোগ করে ৮৯ রানের মাথায় আউট হয়ে যান। ৩৭১ রানে ইংলণ্ডের ইনিংস শেষ হবার পর প্রথম ইনিংসের বাড়তি ৪৩ রান হাতে নিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের লক্ষ্য ছিল দ্রুত রান তোলার দিকে। ফলে সূচনা ভালো হলেও উইকেট পড়ে ঘন ঘন। জন স্নো-র বলও হয় খুব মারাত্মক। সোবার্স' সব রকম আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, কিন্তু সময়াভাবে তিনি ৫ রানের জন্য সেঞ্চুরি করতে পারেন নি। দিনের শেষে ২৬৪ রানে যখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়, তখন গারফিল্ড সোবার্স ৯৫ রানে নট আউট।

ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ল্যান্স গিবস-এর স্পিন বলে ৪১ রানের মধ্যে ইংলণ্ডের পাঁচজন ব্যাটসম্যান আউট হন। ষষ্ঠ উইকেটে কাউড্রে ও এলান নট ব্যাট করতে থাকেন। ষষ্ঠ উইকেটে কাউড্রে যখন নিজস্ব ৮২ রানের মাথায় আউট হন তখন স্কোর ১৬৮। এবার ইংলণ্ডের বিপদের আশঙ্কা দেখা দেয়। কিন্তু নট-এর দৃঢ়তায় শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়। খেলার সমাপ্তি-ক্ষণে ইংলণ্ডের ৯ উইকেটে ২০৬ রান—নট ৭৩ রানে নট আউট। খেলার ফলাফল হয় ড্র।

প্রথম ডিভিসন হকি লীগ

এবার প্রথম ডিভিসন হকি লীগ জয় করেছেন গতবারের বেটন কাপ বিজয়ী ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব। অপরাজিত থাকার গৌরবে ইস্টবেঙ্গলের লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ এবং এবার নিয়ে পাঁচবার লীগ জয়ের মধ্যে তিনবারই অপরাজিত থেকে লীগ জয় খুবই আনন্দের। উনিশটা খেলায় ইস্টবেঙ্গল নষ্ট করেছে মাত্র একটা পয়েন্ট প্রতিপক্ষ মোহন-বাগানের সঙ্গে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করে। শেষ খেলায় গত তিন বছরের অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ন বি, এন, রেল দলের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের ২-১ গোলে জয়ও ক্রীড়াধারার সঙ্গতিসূচক ফলাফল।

অপরাজিত লীগ রানার্স মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল ও বি. এন. রেলের কাছে একটা করে পয়েন্ট হারানো ছাড়া পোর্ট কমিশনার্সের কাছে একটা মূল্যবান পয়েন্ট হারিয়েছে। গতবারের অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন বি. এন. আর সবচেয়ে বেশী পঁয়তাল্লিশটা গোল করে কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও সাতটা গোল খেয়ে রক্ষণভাগের দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছে।

পূর্ব ভারত ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা

ইডেনের ইনডোর স্টেডিয়ামে পূর্ব ভারত ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়নশিপের আর একটা অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে। ভারতীয় ব্যাডমিণ্টনের প্রথম সারির প্রায় সব খেলোয়াড়ই অংশ গ্রহণ করলেও খেলা তেমন জমেনি। এবারের প্রতিযোগিতায় বাংলা ও রেলওয়ের খেলোয়াড় দীপু ঘোষের কৃতিত্বই সবচেয়ে উল্লেখ করার মতন ঘটনা। প্রাক্তন এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন দীনেশ খান্নাকে ফাইন্যালে হারিয়ে দীপু ঘোষ শুধু সর্বপ্রথম পূর্ব ভারত চ্যাম্পিয়নশিপই পাননি, ভাই রমেন ঘোষকে জুটি নিয়ে খেলে ডাবলস-এও জয়ী হয়ে দ্বি-মুকুটের সম্মান অর্জন করেছেন।

জাপানে ভারতীয় যোগ-ব্যায়াম প্রদর্শনকারী দল

জাপানের একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে, বিশ্বের বিস্ময়কর অনুষ্ঠানে যোগদান করে দেহ সৌষ্ঠব ও যোগ-ব্যায়াম দেখাবার জন্য ঘোজে কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশনের প্রতিষ্ঠাতা ব্যায়ামাচার্য অধ্যক্ষ শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ তাঁর পাঁচজন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ২৫শে মে জাপানের পথে রওনা হয়েছেন। জাপানে যাবার প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর রাজভবনে শ্রীযুক্ত ঘোষ ও তাঁর অনুগামীদের সম্বর্ধনা জানিয়ে শুভযাত্রা কামনা করেন।

শ্রীযুক্ত ঘোষ এই সম্পর্কে সাংবাদিকদের কাছে বলেন যে, জাপানে বিশ্বের এই বিস্ময়কর অনুষ্ঠানে তাঁর দলের নির্বাচিত সদস্যগণ নিশ্চয়ই ভারতের গৌরব ও সুনাম প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন।

শ্রীযুক্ত ঘোষসহ অন্যান্য যাঁরা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে যাচ্ছেন, তাঁরা হলেন— সর্বশ্রী বিশ্বনাথ ঘোষ, কমল ভাণ্ডারী, শান্তি দত্ত, কুমারী রেবা পাত্র ও মনোতোষ চৌধুরী। এই অনুষ্ঠানটি সারা জাপানের জনগণকে টেলিভিশনের মাধ্যমে দেখান হবে।
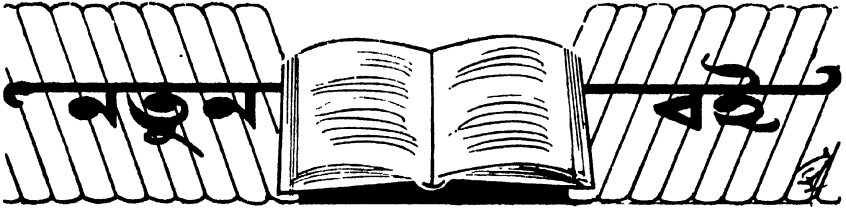
(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

বিজ্ঞানের ছড়া—শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত। মনীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১.৫০

সূর্য, পৃথিবী, মানুষ, আকাশ, বাতাস, চাঁদ, তারা, জল, গাছ, কয়লা, লোহা, রামধনু প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এমন সহজ সুন্দর ছড়া যে লেখা যায়, এ বইখানি হাতে না পড়লে তা বোঝা যায় না। ছেলে-মেয়েদের ঐ বিষয়গুলি সম্বন্ধে সুন্দর একটি প্রাথমিক জ্ঞান হবে এই ছড়াগুলি থেকে। বড় টাইপে দু'রঙে ছাপা, আর ছবি আছে পাতা-ভরা। প্রচ্ছদপটটি কিন্তু ছোটদের মন-ভোলাবার উপযোগী হয়নি।

অজানারে—শ্রীঅমর নাথ রায়। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, এ১৩২, ১৩৩, কলেজ ষ্ট্রীট, মার্কেট, কলিকাতা—১২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২.০০

ছোটদের জন্যে লেখক অনেক ভাল ভাল বই লিখে নাম করেছেন এবং কয়েকটি পুরস্কারও পেয়েছেন। এই বইখানির মধ্যে অল্প কথায় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতিষ, ভূবিদ্যা, জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, প্রভৃতি বিষয়ের বহু জিনিস, যার সঙ্গে আমাদের নিত্যকার প্রয়োজন ঘটে, সেগুলি সুন্দর ও সহজ ভাষায় এবং স্থান বিশেষে ছবি দিয়ে বোঝান হয়েছে। প্রত্যেক ছেলে-মেয়েরই এ বই পড়া উচিত।

ছড়ার ছবি—শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ, ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১.০০

ছোটদের জন্য ছাপা শিশু সাহিত্য সংসদের প্রত্যেকটি বই-ই রঙচঙ ও ছবি-ছাপার দিক থেকে যেমন মন-ভোলান, তেমনি শিক্ষণীয়। প্রথমেই বই হাতে নেবার জন্য আগ্রহ জাগলে, ছবি দেখার জন্য মন আকুলি-বিকুলি করলে, স্বভাবতই না পড়ে পারে না তারা। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছড়ার ছবি' সিরিজের এই বইখানি ছোট বাচ্চারা হাতে পেয়ে লাফালাফি ফেলে দেবে তারপর যারা পড়তে পারে তারা পড়তে আরম্ভ করলে খুশিতে মন ভরে যাবে। যুক্ত ও কঠিন শব্দ বর্জিত এই ছড়াগুলির প্রত্যেকটিই পড়ুয়াকে আনন্দ না দিয়ে পারবে না।

গুপ্তর বাংলা সন ডায়েরী—

কত কথা, ১/১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১.৩৫

বহু নিত্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংবলিত গুপ্তর বাংলা ১৩৭৫ সালের একটি দিনলিপি আমরা পেয়েছি। এটির ছাপা, কাগজ সুন্দর এবং কাপড়ে মজবুত বাঁধাই।

শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক

বাঁ দিকে ঃ পুরীর মন্দির

নীচে ঃ রথ সাজাবার প্রস্তুতি

আলোকচিত্র ঃ শ্রীঅরুণ সেনগুপ্ত

✲ ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র
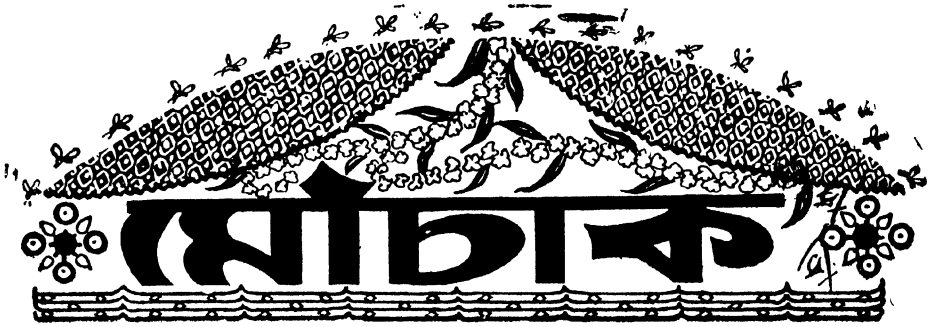
৪৯শ বর্ষ]   আষাঢ় : ১৩৭৫   [৩য় সংখ্যা

আমাদের দেশ

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

আমাদের দেশ,
দেশের যা কিছু—আমরাই করি ভোগ
আমাদের সাথে
রয়েছে দেশের মাটির নাড়ীর যোগ।

কত মহামারী,
যুদ্ধ-ধ্বংস, খরা ও বন্যা শেষে—
দেশকে বাঁচিয়ে
আমরা বেঁচেছি, উঠেছি আবার হেসে

স্বদেশের সেবা
স্বদেশ ধর্মে—স্বাধীনতা আলো চেয়ে

স্বদেশী কর্মে
মৃত্যু-মূল্যে আমাদের ছেলে-মেয়ে
দেশ মাতৃকার
সম্ভ্রম রেখে হয়েছেন বরণীয়।
সেই আমরাই
সব ভুলে, হায়, খুঁজছি স্বার্থ, প্রিয়।
আমরা এখন
কেন পাইনাক' দেশের অন্ন, ফল,
কেন উদ্ধত,
অসংযমী, নানা মত, নানা দল?
আমরা মানুষ
যেন ভুলিনাক' সত্য, হিংসা-লোভে—
দেশকে চিনি না,
এ কী লজ্জা, সীমা থাকবে না ক্ষোভে॥

ঝিঁঝি

শ্রীপ্রীতিভূষণ চাকী

ঝিঁঝি পোকা ডাকে,
খুঁজে ফেরে কাকে
জানো কি?

ওরা যায় কাজে
ডানা দুটি বাজে
মুখ ওরা খোলে না—
মানো কি?

মশা

শ্রীসুমিতা রায়চৌধুরী

বাপ্‌রে কি মশা!
যায় না যে বসা;—
কানে কানে গান গায়,
তারপরে কামড়ায়,
তারপরে কামড়ায়,
হুল ফুঁড়ে চামড়ায়,
তাজা তাজা খুন খায়।
একি হ'ল হায় হায়!
রাতে আসে দিন যায়

আত্মীয় নিবারক

শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায়

কী কুক্ষণেই যে দেওঘরের এ বাড়িটা কিনেছিলাম! রাখহরিবাবু পরম দুঃখে একটা স্বগতোক্তি করলেন।

কেন? এটা ভূতের বাড়ি নাকি? আমি প্রশ্ন করলাম।

ভূত? রাখহরিবাবু বেশ তাচ্ছিল্যভরেই বললেন, ভূতও এ বাড়ি ছেড়ে পালাবে।

ভূতের চেয়েও অদ্ভুত কিছু আছে নাকি? যদি থাকে বলুন না। একটা গল্প লিখতে চাই অথচ প্লট কিছু পাচ্ছি না।

আপনি মশায় আছেন আপনার প্লট নিয়ে। বেশ খাচ্ছেন-দাচ্ছেন, আর গালগল্প লিখছেন। হ ত যদি আমার মত অবস্থা!

কেন? আপনার অবস্থা খারাপ কিসে? দেওঘরে নতুন বাড়ি করেছেন। শেষ বয়সে বেশ হাত পা ছড়িয়ে আছেন। দু'বেলা পেঁড়া খেয়ে ফুলছেন।

আমি তো মশায় চেঞ্জার। পূজোর ছুটিতে বেড়াতে এসেছি। দু'দিন পরে কলকাতায় ফিরে গিয়ে আবার কলম পিষতে হবে।

সেও অনেক ভাল। এখানে নিজে যে ভাবে পিষে যাচ্ছি, মানে যে ভাবে পিষ্ট হচ্ছি, তার চেয়ে কলকাতায় গিয়ে কলম পেষা অনেক ভাল—এমনকি হাল-চাষ করাও ভাল। এভাবে হাড়ির-হাল হওয়ার চেয়ে।

কী হয়েছে বলবেন তো? এবার আমি রাগত স্বরেই জিজ্ঞাসা করলাম।

আত্মীয় মশায়—আত্মীয়! কে জানত আমার এত আত্মীয় আছে। যদি না দেওঘরে এই বাড়িটা করতাম, তাহলে আমিও কি টের পেতুম! আত্মীয়ে একেবারে ছেঁকে ধরেছে মশায়। আমার বাড়ি নয় তো যেন আত্মীয়-সভা। যেন হোটেলখানা। আর শুধু কি আত্মীয়—আত্মীয়ের আত্মীয়, তস্য আত্মীয়, আত্মীয়ের বন্ধু, বন্ধুর আত্মীয়, আমার বাড়িখানা একবার দেখে আসুন। এই সবে পূজোর ছুটি সুরু হল, এর মধ্যে বাড়িটার কোথাও তিল ধরার জায়গা নেই।

রাখহরিবাবুর চোখ ফেটে জল আসার উপক্রম হল।

রাখহরিবাবু মোটাসোটা বেঁটে মানুষ। বড়বাজারে আলু পোস্তায় তিসির কারবার। ছেলের হাতে ব্যবসা দিয়ে কর্তা-গিন্নী নিরিবিলিতে থাকবেন বলে দেওঘরে এই বাড়িটা সবে করেছেন। কিন্তু তাঁর আত্মীয়স্বজন কোথা থেকে খবর পেয়ে গেল। ব্যস, অমনি দলে দলে তারা আসতে লাগল তাঁর বাড়ি। কেউবা দু'তিন দিনের নাম করে দু'সপ্তাহ গেড়ে

বসে থাকল। কেউবা কাশী যাবার পথে বাবা বৈদ্যনাথকে দর্শন করে যাই বলে দশদিন রাখহরিবাবুর বাড়িতে কাটিয়ে গেল। আর আত্মীয় এবং বিপদ কখনও একা আসে না। সঙ্গে করে তাদের ছানা-পোনাকে নিয়ে আসে। এখন দু'বেলা রাখহরিবাবুকে অন্তত: ত্রিশজনকে খাওয়াতে হচ্ছে। তিনি ও তাঁর স্ত্রী কোন রকমে একটা ঘরে সেঁধিয়ে আছেন। তিনটে চাকর তাদের ফাইফরমাশ খাটতে খাটতে হাঁপিয়ে উঠছে।

রাখহরিবাবু তাই বলছিলেন, একবার আমার অবস্থাটা দেখে আসুন কেষ্টবাবু। শুধু একবার চোখের দেখা।

রাখহরিবাবুর বাড়ি খুঁজে বার করতে কষ্ট হল না। গিয়ে দেখি বাড়ির সামনে দুটো রিক্‌সা দাঁড়িয়ে। একটি রিকসায় গোটা চারেক ছোট ছোট ছেলে। আর এক রিকসার সামনে এক বৃদ্ধা সমানে রিকসাওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করছে।

এইটুকু পথ ভাড়া বলতা হ্যায় দো রুপিয়া? তোমলোক ডাকু হ্যায়।

রিকসাওয়ালাও সামনে চেঁচাচ্ছে। ভাড়া দিজিয়ে তব বাত বোলিয়ে।

কভি নেহি!

আমি গিয়ে দাঁড়াতেই বৃদ্ধা বললেন, তুমি কেগো? রাখু তোমার কে হয়?

আমি বললাম, ইয়ে, আমার বন্ধু।

তা তুমি কেমন বন্ধু বাছা? রাখু এখন বাড়িতে নেই বলে ওরা আমায় অপমান করছে দেখতে পাচ্ছ না? আমি রাখুর পিসী। এরা আমার বোনঝি। বাবা বদ্যিনাথের ছিচরণ দর্শন করতে এসেও দেখছি সুখ নেই। ভাড়াটা মিটিয়ে দাও। রাখুর কাছ থেকে পরে চেয়ে নিও।

আমতা আমতা করে লাভ হল না। পকেট থেকে চারটে টাকা খসাতে হল। ভেতরে যাচ্ছি হঠাৎ পিসী হাঁ হাঁ করে উঠলেন। যাচ্ছ কোথায়? বলি মালপত্তরগুলো কে তুলবে শুনি?

আমি বললাম, দাঁড়ান, আমি চাকরবাকর কাউকে দেখি পাই কিনা।

ভেতরে ঢুকে দেখেই মনে হল যেন ধর্মশালা। তিনতলা বাড়ির প্রতিটি তলায় লোক। অনেকে জায়গা না পেয়ে বেডিং বিছিয়ে বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছে।

একজন চাকর গলদঘর্ম হয়ে ছুটোছুটি করছে। তাকে বললাম, ও ভাই শুনছ?

লোকটি আমার দিকে বক্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, আপনি কে? ভাইপো, না ভাগ্নে? মানে?

আপনি থাকবেন তো? কিন্তু আর জায়গা নেই। দেখছেন না, ছাদে পর্যন্ত

লোক রয়েছে। সত্যি, বাবুর আত্মীয় ভাগ্য আছে বটে!

লোকটি আরও কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় একটি মোটা মতন লোক এসে তাকে ধমক দিয়ে বলল, এই তুমি এখানে আড্ডা মারছ। তোমাকে না বলেছি একপোয়া শাদা ছাগলের দুধ আর আধ পোয়া পেস্তা নিয়ে আসতে। সন্ধে বেলাটা পেস্তা বাটা না খেলে আমার গা'টা বড় ম্যাজ ম্যাজ করে।

ধমক খেয়ে চাকরটি চলে গেল। আমি এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিচে নামতেই পিসী ধমকে উঠলেন, ওগো ভালমানুষের ছেলে, সেই যে গেলে আর আসার নাম নেই। নাও এগুনো তোল। এই বলে এমন রক্তচক্ষু করে পিসীমা আমার দিকে তাকালেন যে, ভয়ে রক্ত আমার জল হয়ে উঠল। আমি ভয়ে ভয়ে সেই ভারী তোরঙ্গটা কাঁধে তুললাম। ও: মনে হল, কাঁধ যেন ছিঁড়ে পড়ে যাবে। ভগবান জানে, কি আছে ওর মধ্যে। টাল সামলাতে না পেরে একটু হেলে গিয়েছিলাম। অমনি পিসীমা হাঁক পাড়লেন, ও অলপ্পেয়ে, বলি চেহারাটা তো বেশ নাড়ুগোপালের মত—এদিকে কাজের বেলায় তো ঢেবাচন্দর! একটা জিনিস যদি ভাঙে তাহলে তোমায় আমি থেঁতো করবো!

তিন তলায় উঠে কাঁধে করে মাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। মনে হচ্ছে যেন দুশো বিছে কামড়াচ্ছে আমায়—চোখের চারিদিকে রাশি রাশি সরষের ফুল।

হাঁক-ডাক করতে রাখহরিবাবুর গিন্নী বেরিয়ে এলেন।

পিসী বললেন, ওমা, তুমি আমাদের ফুটি মানে রাখুর বউ না? আমি রাখুর পিসীমা। আমায় চিনতে পারছ না? তা চিনবে কি করে, সেই কতকাল আগে এঁড়েদতে দাদার ছেরাদ্দর সময় দেখা হয়েছিল। সেকী আজকের কথা! তা আমি এলাম, বদ্যিনাথ দর্শনে। ভাবলাম, রাখু এখানে বাড়ি করেছে, মাস কয়েক কাটিয়ে আসি।

শুনে আমারই কাঁধ থেকে তোরঙ্গটা পড়ে যাচ্ছিল। পিসী ধমকে উঠল, এই উল্লুক!

পিসী আবার বলল, তা কোন্ ঘরে থাকব বউ? রাখহরিবাবুর গিন্নী বললেন, সব ঘর তো ভরতি। আমরা তিন তলায় এই ঘরটায় আছি। ছাদেও ত্রিপল টাঙিয়ে কিছু লোক আছেন। তা আপনি বরং ঐ ছাদে—।

পিসী বললেন, কী বলছ বউ? আমি থাকব ছাদে? আমার মণ্টু, পিণ্টু, ঘণ্টুর ঠাণ্ডা লাগবে না। একথা তুমি বলতে পারলে? আমরা বাপু তোমার ঘরটাতেই থাকব। তোমাদের বয়স কম আছে, তোমরা বরং ছাদে যাও—এই, এই ঘরে মাল নামাও।

আমি ততক্ষণে আর নেই। কোন রকমে সামনের ঘরে তোরঙ্গটা রাখলাম।

আরও মাল আছে আনতে হবে না। ধিনি-কাত্তিকের মত দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে?

আমি বললাম, আনছি, এখনই আনছি। তারপর নিচে নেমে এদিক-ওদিক তাকিয়ে সুট করে সরে পড়লাম।

পরদিন সকালে রাখহরিবাবু আমার কাছে এসে কেঁদে ফেললেন। কাল সারারাত বাইরে শুয়ে তাঁর গলা বসে গেছে। ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে হাঁচছেন।

আমাকে বললেন, এ পর্যন্ত আত্মীয়দের খাওয়াতে তাঁর দু'হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। এখনও আত্মীয় আসছে। আজ সকালেও এসেছে অনেকে দাবি করছে, আর একটি বাড়ি ভাড়া করার জন্য। আত্মীয়দের ছেলেমেয়েদের জন্য রোজ দশসের করে দুধ যোগাড় করতে হচ্ছে। এ ছাড়া কারুর জন্য চাই পেঁড়া কারুর জন্যে বা মুরগি, কারুর জন্য আবার রাবড়ি—এসবই যোগাড় করে দিতে হচ্ছে তাঁকে। আত্মীয়রা নাকি একজোট হয়ে একটি কমিটিও তৈরি করে ফেলেছে। কমিটির দাবি, অবিলম্বে আত্মীয়দের জন্য আরও সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

রাখহরিবাবুর অবস্থা দেখে দুঃখ হল। বেচারা! তাঁকে আমি দুঃখহরণবাবুর কাছে নিয়ে গেলাম।

দুঃখহরণবাবু আমার খুব বন্ধু। দেওঘরের পুরনো বাসিন্দা। আর প্রখর তাঁর বুদ্ধি। সব শুনে বললেন, কিচ্ছু ভাবনা নেই। ডামবেলকে নিয়ে আসতে হবে।

আমি বললাম, কে সে? গুণ্ডা?

আরে না না, টুলু মাসীর ছ' বছরের ছেলে ডামবেল। সে একাই একশ। ওরা থাকে শিমুলতলা। কত জায়গা থেকে ডাক আসে। আমি টেলিগ্রাফ করে দিচ্ছি। ওরা দু'দিনের মধ্যে এসে পড়বে। এলে আমি সব শিখিয়ে দেব কি করতে হবে। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না রাখহরিবাবু।

বিচ্ছু ছেলে বুঝি?

বিচ্ছু মানে? একবার এনেই দেখুন না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি ফাঁকা যদি না হয় তো কি বলেছি!

টুলু মাসী আর ডামবেল যখন এসে পৌছল তখন পিসীমা রাবড়ি দিয়ে রুটি খাচ্ছেন। ওদের দেখে ব্যাজার মুখে বলে উঠলেন, তোমরা আবার কে গা?

টুলু মাসী বলল, রাখুদা আমার জামাইবাবু। আমি ওঁর ছোট শালী। এই আমার ছেলে ডামবেল।

ডামবেল শোঁ করে গিয়ে পিসীমার রাবড়ির বাটি ধরে দিল এক টান। তারপর মুহূর্তের মধ্যে রাবড়িতে পিসীমার মুখ মাখামাখি। পিসীমা এমন করে চেঁচিয়ে উঠলেন যেন বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। মুহূর্তের মধ্যে ঘরে লোক জমে গেল। এত লোক দেখে ডামবেল করল কি, ঘরের মেঝের এক হাঁড়ি দই দিল ভিড়ের মধ্যে ছুঁড়ে। তারপর সামনে যাকে পেল তার পেটে মারল দমাদম ঘুঁষি।

'পিসীমা এমন করে চেঁচিয়ে উঠলেন যেন বাড়িতে ডাকাত পড়েছে।' —পৃঃ ১১০

টুলু মাসী চিঁ চিঁ করে বললেন, এই ডামবেল অসভ্য ছেলে। অমন করে পেটে মারতে নেই। ছিঃ!

বিকেলের মধ্যে হুলুস্থুল কাণ্ড। ডামবেল সারা বাড়ি দৌরাত্ম্য করে বেড়িয়েছে।

ঘরে ঘরে গিয়ে কারুর বা ঘুমন্ত অবস্থায় চুল কেটে নিয়েছে কাঁচি দিয়ে। কারুর বা গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়েছে, কাউকে বা সোজা গিয়ে মেরেছে দমদম ঘুঁষি

দোতলায় রাখহরিবাবুর কোন্ এক ভাগ্নে দিন পনর ধরে গেড়ে বসেছিল। রোজ দুপুরে সে ডুগি-তবলা বাজাত। ডামবেল গিয়ে হাঁতুড়ি দিয়ে তবলা দুটো ফাঁসিয়ে সরে পড়েছে। নিচের তলায় রাখহরি-বাবুর মাস-শাশুড়ী এসে রয়েছেন। ডামবেল সোজা গিয়ে তাঁর গায়ে খানিকটা গোরুর চোনা ছিটিয়ে চলে এল। তার পাশের ঘরে রাখহরিবাবুর মামাতো ভাই বলে পরিচয় দিয়ে এক ভদ্রলোক থাকতেন। ভদ্রলোক ঘুমের ঘোরে 'বাবা'রে মা'রে' বলে চিৎকার করে উঠলেন। জানা গেল, কে তাকে দমাদম ঘুঁষি মেরে চলে গিয়েছে।

কিন্তু এসবের জন্য ডামবেলকে কেউ কিছু বলে কার সাধ্যি! টুলু মাসী রয়েছেন না! তিনি অমনি বলবেন, লজ্জা করে না, ছেলেমানুষের সঙ্গে ঝগড়া করতে?

পরের দিন রাখহরিবাবুর বাড়ি একেবারে ফাঁকা। শোনা গেল, আত্মীয়রা ভোর না হতেই সরে পড়েছে।

খবর শুনে আমি তো ভাবছিলাম ডামবেলকে প্রাইজ দেব। সরকারের কাজে ওর নামে সুপারিশ পাঠানো দরকার। যাতে এবার সাহসিকতার পুরস্কারটি ওই পায়।

তাই ভাবছিলাম একবার রাখহরিবাবুর বাড়ি ঘুরে আসি। ওঁর বাড়ির দিকে এগুতে গিয়ে দেখি, রাখহরিবাবু ও তাঁর গিন্নী একটা রিকসায় মালপত্তর তুলে এদিকেই আসছেন।

আমাকে দেখে ওঁরা রিক্সা থামালেন।

আমি বললাম, একি, কোথায় চললেন?

রাখহরিবাবুর দিকে চেয়ে দেখলাম জামা-কাপড় ময়লা, চুল উস্কখুস্ক, খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বললেন, আপনার বিরুদ্ধে কেস করব মশায়, দেখে নেব আপনাকে!

আমি বললাম, কি হল রাখহরিবাবু?

রাখহরিবাবু ভেংচে উঠলেন, কী হল রাখহরিবাবু! লজ্জা করছে না বলতে। আপনার বন্ধু ঐ দুঃখহরণবাবু, ওকেও আমি দেখে নেব।

আরে কি হয়েছে বলবেন তো?

আরে মশায়, আপনার ঐ ডামবেল ছোঁড়াটা—ঐ ছোঁড়াটার জন্যেই আমাকে বাড়ি ঘর ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে।

কেন? আমি তো শুনলাম, সে আপনার উপকারই করেছে। আত্মীয়দের তাড়িয়েছে।

ওঃ, এর চেয়ে আত্মীয়রা ভাল ছিল! রাখহরিবাবু ককিয়ে কেঁদে উঠলেন। আমিও তো তাই ভেবেছিলাম। ছোঁড়া আমার মহৎ উপকার করেছে। কিন্তু তারপর—ওহ! তারপর আমাকে আমার গিন্নীকে একা পেয়ে—ওহ! এই দেখুন গিন্নীর সব চুল কেটে নিয়েছে। ওগো, তুমি একটু ঘোমটাটা খুলে দেখাও না। রাখহরিবাবুর গিন্নী ফুঁফিয়ে কেঁদে উঠলেন।

আমি বললাম, থাক থাক।

তারপর, রাখহরিবাবু বললেন, কাঁচি দিয়ে আমার সব জামা কাপড় কেটে রেখেছে। আমার মুখে জুতোর কালি আর পাথুরে চুন মাখিয়ে নাকের ভেতর পাতি জরদা ঢুকিয়ে দিয়েছে। বাড়ির সারা দেওয়ালে আলকাতরা দিয়ে ছবি এঁকেছে! বাড়িতে কাচের জানালা আর একটাও নেই!

টুলু মাসীকে বলেন নি?

বলেছি, অনেকবার বলেছি। কিন্তু প্রতিবারই টুলু মাসী হেসে বলেছেন, ও, ওই রকম দুষ্টু। কি করব বলুন, ডাক্তার ওকে বেশী বকতে বারণ করে দিয়েছে। বকলে ওর কান্না পায়।

অতএব?

অতএব ভোর না হতেই কর্তা-গিন্নী চুপি চুপি বেরিয়ে পড়েছেন। দেওঘর আর না। এই সকালের ট্রেনেই কলকাতা ফিরে যাবেন।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ রাখহরিবাবু রিকসাওয়ালাকে ধমক দিলেন, এই, এই জল্দি চালাও। ট্রেন ফেল হো জায়গা।

মন্দ কর্মের মন্দ ফল

রামপদ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ফটকে তালা লাগান ছিল না—লোহার ছিটকিনিটা আটকানো ছিল শুধু। আস্তে আস্তে সেটা খুলে বাহিরে এসে দাঁড়াল দিলীপ। বাহিরে আসতেই মনে হ'ল আবছা অন্ধকারে একটি মূর্তি যেন এগিয়ে আসছে তার দিকে। যখন বোধ হ'ল মূর্তি তারই দিকে এগিয়ে আসছে, অমনি পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেমন শিরশির করে উঠল—মাথার চুলগুলো কাঁটার মত খাড়া হ'ল—একটা বরফের মত ঠাণ্ডা বাতাসের স্রোত পায়ের তলা থেকে মাথার উপরে উঠে এলো। সেই অশরীরী মূর্তি না কোন দুবৃত্তকে দেখে দিলীপ তাড়াতাড়ি লোহার ফটকটার দিকে এগিয়ে গেল—ইচ্ছা হ'ল ভিতরে ঢুকে পড়ে।

এমন সময় কে যেন আস্তে আস্তে ডাকলে—দিলীপবাবু, শুনুন।

দিলীপ দাঁড়াল।

তেমনি আস্তে আস্তে ডাক এলো, ভয় নেই, এগিয়ে আসুন।…আগে আমায় দেখেছেন—চিনতে পারছেন না বোধ হয়। আমি অবনীবাবু, টিকিট কালেক্টার—

দিলীপ সরে আসতেই তিনি বললেন, আপনি যে বড়বাবুর পরিচিত নন জানি। এখানে এই প্রথম এলেন। ঠিক কিনা?

মাথা নাড়ল দিলীপ।

অথচ অনায়াসে একজনকে বিশ্বাস করে তার ডেরায় উঠলেন—বিশেষ করে এই রাত্তিরে। সঙ্গে নিশ্চয় মূল্যবান জিনিসপত্তর কিংবা মেলা টাকাকড়ি আছে—তাই একা শহরে যেতে সাহস করলেন না। কেমন ঠিক নয়?

দিলীপ স্থানুর মত দাঁড়িয়ে ওর কথা শুনতে লাগলো। অবনীবাবু চাপা গলায় বললেন, শহরে গেলেন না যে ভয়ে—সেই ভয় এখানেও যে থাকবে না, কেমন করে সে কথা ভাবতে পারলেন? শুনুন, সেই ভয় এখানেও আছে এবং খুব বেশিরকমই আছে। বড়বাবুকে বিশ্বাস করবেন না—উনি মোটেই লোক ভাল নন।

এতক্ষণে দিলীপের মুখে কথা ফুটলো। শুকনো গলায় বললে, ওঁকে বিশ্বাস করবো না তো যাবো কোথায়? অজানা জায়গা, অন্ধকার—এই রাতে যাব কোথায়?

ইচ্ছে করলে আমার কোয়াটারে আসতে পারেন। হ্যাঁ—চলে আসুন। যদি প্রাণে বাঁচতে চান চলে আসুন। যদি টাকা খোয়াতে না চান—

এই সামনেই আমার কোয়াটার যখন খুশি আসবেন দুয়ার খোলা পাবেন।

বলতে বলতে অন্ধকারের মধ্যেই মিশিয়ে গেলেন অবনীবাবু।

দিলীপ বেশ খানিকক্ষণ স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। ক্রমে অন্য চিন্তা পেয়ে বসলো ওকে। এখন কি তার কর্তব্য, কি করা উচিত, কাকে বিশ্বাস করবে সে? এই আশ্রয় ত্যাগ করে নতুন আশ্রয়ে গিয়ে উঠবে, না উঠবে না?

এক আশ্রয় থেকে অন্য আশ্রয়ে যাওয়া—সেই আশ্রয়েই যে বিপদের ফাঁদ পাতা নেই কে বলবে? যত অনর্থের মূল হ'ল অর্থ। এরই জন্য এখন প্রাণ সংশয়। উপকারের ভূমিকা নিয়ে এই লোকটাই যদি সর্বনাশ করে—তা' হলে? করালীবাবু তো সরকারের চাকোর—দায়িত্বজ্ঞান আছে, কাজ করছেন, তাঁর দ্বারা এতখানি অনিষ্ট হতে পারে—এ যেন বিশ্বাস করাই যায় না!

ভাবতে ভাবতে লোহার ফটক খুলে নিজের জায়গায় ফিরে এলো দিলীপ, হাতে-মুখে জল দিয়ে খাটিয়ায় শুয়ে পড়লো। ঘুম আর কিছুতেই আসে না। কোমরের গেঁজের নোটের বাণ্ডিলগুলো ফুটতে লাগলো—দূর-ছাই এরই জন্য এত অশান্তি। এতই লোভের জিনিস যে কোন মানুষকেই সৎ ভাবতে পারা যাচ্ছে না। এত যত্ন করে যে আহার দিলে, আশ্রয় দিলে, তাকেও পরস্বাপহারী বলে সন্দেহ হচ্ছে, আবার বিপদের আভাস দিয়ে যে সাবধান করে দিয়েছে, তাকেও সাধু ভাবা যাচ্ছে না। হায় ভগবান এখন আমি কি করব, কোথায় যাব, অজানা শহর, অন্ধকার পথ; কোথায় খানাখন্দ, কোথায় সাপ, শেয়াল, কুকুর হিংস্র জন্তু জানোয়ার কোথায় চোর খুনী লুটেরা ওত পেতে আছে—কেমন করে জানব! হায় ভগবান এখন আমি কি করব—কোথায় যাব?

ছটফট করতে করতে বিছানায় উঠে বসলো দিলীপ। বিছানা থেকে নেমে এক পা এক পা করে এগিয়ে গেল ফটকের দিকে। কম্পাউণ্ডের বাহিরে এলো দিলীপ—এবং আশ্চর্যের বিষয় মোহগ্রস্তের মত সেই দিকেই চলল—যেদিকে একটু আগে যাবে না বলে স্থির করেছিল। কে যেন তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে টেনে নিয়ে গেল জোর করে, চালনা করলো সেইদিকে।

দুয়ারে মৃদু ধাক্কা দিতেই দুয়ার খুলে গেল—হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন অবনীবাবু। বললেন, আসুন, আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই দুয়োরের খিল তুলে দিল দিলীপ। তারপর জামাটা উঠিয়ে কোমরের গেঁজে থেকে বার করলে সেই নোটের বাণ্ডিলটা। সেটা অসঙ্কোচে অবনীবাবুর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললে, এতে বিশ হাজার টাকা আছে—সবই নম্বরী নোট। এখন যা খুশি করুন আপনি—নোটের বাণ্ডিল হাতে করে অবনীবাবু বেশ কিছুক্ষণ অবাক

'হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন অবনীবাবু।'—পৃঃ ১১৪

হয়ে রইলেন। ক্রমে অল্প অল্প হাসি ফুটল ওঁর মুখে। হেসে বললেন, কমপ্লিট সারেণ্ডার! ভয় নেই আসুন আপনাকে শোবার জায়গা দেখিয়ে দিই।

মাথা নেড়ে দিলীপ বলল, এখন ঘুমুতে পারবো না, ঘুম আসবে না। এই চেয়ারে বসে বসে রাতটা কাটিয়ে দেবো।

অবনীবাবু বললেন, বেশ তো—আমিও না হয় রাত জাগবো আপনার সঙ্গে। তার আগে এই বাণ্ডিলটা যথাস্থানে রাখুন। নোটের বাণ্ডিলটা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, এখন কিন্তু আলোটা জ্বলবে না, গল্প করাও চলবে না চড়া গলায়। আসুন আস্তে আস্তে আলাপ করা যাক।

দিলীপ বললে, এখন রাত কত?

অবনীবাবু বললেন, সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে।

তারপরই কতক্ষণই বা, আধঘণ্টাও হয়নি। একটা চাপা গলার আর্তনাদ আর সেই সঙ্গে মাটির উপর দিয়ে ছুটে যাওয়ার দুপ-দাপ শব্দ শোনা গেল। শুনে চমকে উঠল দু'জনে। অবনীবাবু আলোটা জ্বেলে ফেললেন তাড়াতাড়ি এবং দুয়োর খুলে হাঁক দিলেন তেওয়ারি তেওয়ারি, ছোটবাবু, রামখেলন, অতুল, হরিচন্দর—

অন্য কোয়াটারের দুয়োরগুলোও সশব্দে খুলে যেতে—কলোনী এবং চারদিকে শোরগোল উঠল। মাঝরাত্রে হঠাৎ যেন জেগে উঠল রেল কলোনী।

তখন জাগ্রত কলোনিটি প্রচণ্ড জলস্রোতের আকার নিয়ে হুড়হুড় করে নেমে এলো ষ্টেশন মাষ্টারের কোয়াটারের দিকে। গেট পেরিয়ে কম্পাউণ্ডের সেই জায়গাটিতে এসে ভিড় জমল। একটু আগে যেখানে চবুতরাটির উপর পাতা খাটিয়ায় শুয়েছিল দিলীপ, সেইখানে।

দিলীপ সেই দিকটায় চেয়ে থাকতে পারল না আর। দলের সঙ্গে পাঁচ-সাতটা

সুধীরবাবু সভাপতির কাজ করেছিলেন। সেই উপলক্ষে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা বড় সুন্দর আর স্বাভাবিক হয়েছিল। মেঝদাদার আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুরা সেই ভাষণ শুনে তৃপ্তি পেয়েছিলেন। উপস্থিত সকলেই সুধীরবাবুর কথাগুলি শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনেছিলেন।

"মৌচাক" পত্রিকায় ছাপাবার জন্য সুধীরবাবু অন্যদের কাছ থেকে যে সব গল্প পেতেন তার মধ্যে কয়েকবার ময়লা চিরকুট কাগজে লেখা কয়েকটা গল্প পেয়েছিলেন। ঐ রকম বাজে টুকরো টুকরো কাগজে লেখা গল্পগুলো পড়তে তাঁর খুবই অসুবিধা হয়েছিল, কিন্তু লেখাগুলোকে তিনি অবহেলা করেন নি। প'ড়ে দেখেছিলেন যে গল্পগুলো কেমন হয়েছে। সেগুলোর মধ্যেও ভাল গল্প পেয়ে তিনি ছাপিয়েও ছিলেন। যাদের লেখবার শক্তি আছে, তাদের উৎসাহ দিতে তাঁর অশেষ আগ্রহ ছিল। সুধীরবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করতে গিয়ে আমি এই চিরকুটের ব্যাপারের কথা জানতে পেরেছিলাম।

সুধীরবাবুর বন্ধুরা বলতেন যে, তাঁকে দেশ-ভ্রমণের সঙ্গী হিসাবে পেলে তাঁদের উৎসাহটা অনেক বেড়ে যেত। বন্ধুরা তাঁর আনন্দের ভাগ পাওয়াতে তাঁর নিজের আনন্দও অনেক বেড়ে যেত। তাঁর সঙ্গ পেয়ে বন্ধুদের চোখের দৃষ্টি যেন আরো সজাগ হয়ে উঠত, মনের দরজা-জানালাগুলো যেন আরো বেশী খুলে যেত। দেশ বেড়িয়ে তিনি নিজেও বিচিত্র বিচিত্র জ্ঞান সঞ্চয় করতেন, তাঁর বন্ধুরাও নানা জায়গায় নানারকম দেখবার আর জানবার জিনিসের পরিচয় লাভ করতেন।

কাজ করতে করতে সুধীরবাবু যখন ক্ষণেকের জন্য একটু অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন, তখন তাঁর চোখে একটা স্বপ্নরাজ্যের শোভা ফুটে উঠত; অনেকেই হয়তো এটা লক্ষ্য করেছেন। কিসের স্বপ্ন তিনি দেখতেন? ভবিষ্যতে নতুন বিষয়ে নতুন কিছু লিখে দেশের আরো উপকার করার স্বপ্ন সেটা। তাই পরে দেখা যেত যে তিনি সেই স্বপ্নকে সফল ক'রে তুলবার জন্য বীরের মতন উঠে-পড়ে লেগে গিয়েছেন—ছেলে-মেয়েদের আর বড়দের জ্ঞানভাণ্ডারে নতুন নতুন জিনিস দেবার জন্য তিনি বছরের পর বছর খেটেই চলেছেন, খেটেই চলেছেন, খেটেই চলেছেন!

এতখানি সদিচ্ছার সৌরভ কি উবিয়ে যেতে পারে? যাঁদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে দেশের বাতাস ধন্য হয়ে যায়, সুধীরচন্দ্র ছিলেন তেমনি একজন মানুষ। যিনি বন্ধু-বান্ধবদের মাথার মাণিক হয়ে তাঁদের আসর আমোদিত করতেন, যিনি শিশুদের আর কিশোরদের জন্য যত্নে মধুসঞ্চয় ক'রে তাদের হাতে মধুপূর্ণ পত্রিকা আর মধুমাখা পুস্তকরাশি তুলে দিতেন, যিনি চেহারার প্রসন্নতা, ব্যবহারের প্রসন্নতা আর অন্তরের প্রসন্নতা দিয়ে তাঁর কর্মক্ষেত্রটিকে একটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করেছিলেন, তাঁকে ভুলে যেতে কে চায়? তাঁর ব্যবহৃত জিনিস-পত্র, গ্রন্থরাশি, চেয়ার-টেবিল, খাতাপত্র, সব-কিছুই তাঁর স্নেহস্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রাণ যতদিন তাজা থাকবে, ততদিন সে সুধীরচন্দ্রের বিপুল সৎকর্মরাশির আর মহাপ্রাণতার সাক্ষ্য দিয়ে যেতে থাকবে।

পাঠানদের মুকুটহীন রাজা

শ্রীকৌশিক চট্টোপাধ্যায়

সীমান্ত গান্ধী

সীমান্ত প্রদেশের রুক্ষ মাটিতে দাঁড়িয়ে, দূর দিগন্তে পর্বতমালার দিকে তাকিয়ে ভাবছে পাঠান তরুণটি। এবার সে কী করবে? জীবনের কোন্ পথ বেছে নেবে? পূর্বপুরুষদের অনেকেই সেনাবিভাগে কাজ করে গেছেন বলে, আত্মীয়স্বজনেরা পরামর্শ দিলেন সৈনিক হও। সৈনিকই সে হোল বটে, কিন্তু বিদেশী সরকারের অধীনে বেয়নেটধারী সৈনিক নয়, অহিংসার সৈনিক, শান্তির সৈনিক। কি করে তার জীবনের মোড় ঘুরে গেল, সে কাহিনীটি এখানে বিস্তারিত ভাবে বলছি।

তরুণটি গেল পেশোয়ারে তার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। বন্ধুটি কাজ করত সামরিক দপ্তরে। বন্ধুর দেখা মিলল না বটে, কিন্তু এক অদ্ভুত দৃশ্য তার চোখে পড়ল। দেখল এক নিম্নপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী, অতি বিশ্রীভাবে এক প্রবীণ ভারতীয় সৈনিককে অপমান করছে। আর ভারতীয় সৈনিকটি মুখ বুজে সে অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করে যাচ্ছে। পরাধীন জাতির কালো চামড়ার লোক বলেই এ অন্যায় অসম্মানের প্রতিবাদ সে করতে পারল না।

পাঠান তরুণটি দ্রুতগতিতে সেখান থেকে বেরিয়ে এল। মনে তার দৃঢ় সংকল্প—দাসত্ব আর নয়, শৃঙ্খলিত মাতৃভূমি ও অনুন্নত পাঠান জাতির সেবাতেই সে এবার থেকে আত্মনিয়োগ করবে। কী হবে শুধু খেয়ে-পরে বেঁচে থেকে, যদি দীন-দরিদ্রের জন্যই এ জীবন উৎসর্গ করা না যায়?

এই উন্নত-শীর্ষ পাঠান তরুণটির নামই খান আবদুল গফফার খান—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অনন্য বীর।

বিত্তশালী জমিদার বংশে জন্ম গফফার খানের, কিন্তু সব সম্পদ, ঐশ্বর্য, বিলাস আরাম ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি গ্রামে-গ্রামান্তরে বেরিয়ে পড়লেন। দেখলেন পাঠানদের

অবর্ণনীয় দুর্দশা ও অশিক্ষা। বিংশ শতাব্দীতেও সমাজ পড়ে রয়েছে মধ্যযুগের অন্ধকারে। এই তরুণ বয়সেই গফফার খানের অদ্ভুত সংগঠনী শক্তির স্ফুরণ হোল। কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন—'অঞ্জুমান-ই ইস্লা-ই আফাগিনা' নামে একটি সংঘ। সংঘের উদ্যোগে পেশোয়ার ও মর্দান জেলার নানাস্থানে ছোট ছোট কতগুলো বিদ্যালয় গড়ে ওঠে—যেন রিক্ত জীর্ণ শাখায় অঙ্কুরিত হোল নব কিশলয়।

সাড়া পড়ে গেল সমস্ত পাঠান জাতির ভেতর। যারা ছিল খণ্ড খণ্ড উপজাতিতে বিভক্ত, পরস্পরের সঙ্গে বংশপরম্পরায় কলহ-কোন্দলে মত্ত, তারা এগিয়ে এল গফফার খানের শান্তি ও ঐক্যের আহ্বানে। গফফার খান ধীরে ধীরে তাদের হৃদয়ে নেতার আসন লাভ করলেন।

এদিকে বৃটিশ সরকার শংকিত হয়ে উঠল। সরকার চেয়েছিল এই দুর্ধর্ষ বীর পাঠান জাতিদের চিরদিন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও দারিদ্র্যের মধ্যে রেখে শাসন ও শোষণ কার্য চালিয়ে যেতে। কিন্তু গফফার খানের শিক্ষা ও ঐক্য প্রচারের আন্দোলনের ভেতর বৃটিশ শাসকবৃন্দ যেন বিপদের আভাস পেল। গফফার খানকে নিরস্ত্র করবার জন্য তারা এক ফন্দি আঁটল। গফফার খানের বৃদ্ধ পিতা বৈরাম খানকে নির্দেশ দিল তিনি যেন তাঁর পুত্রকে ভ্রান্ত পথ থেকে সরিয়ে আনেন। তা না হলে পুত্রের জন্য পিতাকেই কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

বৈরাম খান এ বিষয়ে পুত্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই গফফার খান ধীর শান্ত অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন—পিতা, আজ যদি বৃটিশ সরকার আমার দৈনন্দিন প্রার্থনা বন্ধ করতে আদেশ দেয়, আপনি কি সেই আদেশ আমাকে পালন করতে বলবেন?

বৃদ্ধ পাঠান সিংহের মত গর্জন করে উঠলেন—কখনই না।

তখন বিনীতভাবে গফফার খান নিবেদন করলেন—গরীব দুঃখীদের সেবা করা আমার প্রার্থনার একটি অঙ্গ। সুতরাং শত বাধা বিপদ এলেও আমি আমার পবিত্র কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হব না।

বৃদ্ধ পিতা পুত্রের নিষ্ঠা ও সংকল্পের দৃঢ়তা দেখে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, আর সরকারকে জানিয়ে দিলেন যে, পুত্রকে আদর্শচ্যুত করবার কোন ইচ্ছা বা ক্ষমতাই তার নেই। গভর্ণমেণ্ট ক্রুদ্ধ হয়ে বৃদ্ধের এই অবাধ্যতার প্রতিশোধ নিল। নব্বই বৎসরের বৃদ্ধ বৈরাম খান, তাঁর পুত্র ও পরিবারের আরো কয়েকজনকে গ্রেপ্তার ও বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করে রাখলে।

কিছুদিন পরেই অবিশ্যি বৃটিশ সম্রাটের ঘোষণার ফলে পিতা, পুত্র ও অন্যান্য সকলে

মুক্তি পেলেন। মুক্ত বীর গফফার খানকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করবার জন্য এক বিরাট জনসভার আয়োজন করা হলো। সেই সভায় দরিদ্র পাঠান জনসাধারণ তাদের সর্বত্যাগী প্রিয় নেতাকে একটি আন্তরিক উপহার দান করে। গফফার খানকে তারা উপাধি দিল, 'বাদশা খান' অর্থাৎ পাঠানদের রাজা। মুকুটহীন রাজা বটে, কিন্তু তার প্রতিটি নির্দেশ পাঠানদের কাছে হাজার মুকুটওয়ালা রাজার নির্দেশের চেয়েও বেশী মূল্যবান। এরপর থেকে গফফার খান পাঠানদের ভেতর 'বাদশা খান' নামেই পরিচিত হলেন। এটা ১৯১৯ সালের কথা।

দীর্ঘ দশ বছর ধরে চলল অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রাম। সীমান্ত প্রদেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরতে ঘুরতে গফফার খান বুঝতে পারলেন যে, দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভিন্ন সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব নয়। এক বিরাট পরিকল্পনা গফফার খানের চিন্তায় প্রতিভাত হোল, আর অচিরেই সেই পরিকল্পনা রূপায়িত হোল বাস্তবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে প্রধান আদর্শ করে, গফফার খান সংগঠন করলেন, একটি দল, নাম দিলেন—খোদাই খিদ্‌মদ্‌গার (ঈশ্বরের সেবক)। দলে দলে পাঠান নর-নারী ছুটে এল এই নতুন প্রতিষ্ঠানের সভ্য হোতে। প্রত্যেক সভ্যকেই এক পবিত্র প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করতে হোত। কয়েকটি প্রতিজ্ঞা হোল এই :—

'দেশের জন্য আমি আমার সুখ, সম্পদ, ও জীবন উৎসর্গ করলাম।'

'আমি সর্বদা অহিংসার নীতি অনুসরণ করে চলব।'

'মানুষের সেবা, এবং আমার দেশ ও ধর্মের মুক্তিসাধন করাই আমার লক্ষ্য।'

'আমি ঈশ্বরের যে কাজে আত্মনিয়োগ করব, তার জন্য কখনই কোন পুরস্কারের আশা করব না।'

খোদাই খিদ্‌মদ্‌গারদের জন্য রচনা করা হোল সংগ্রাম-সংগীত। সংগ্রামী তারা, কিন্তু অহিংসা সংগ্রামের যোদ্ধা। তার প্রথম স্তবকটি বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায় এইরকম :—

'আমরা ঈশ্বরের সেনানী, মৃত্যুকে আমরা পরোয়া করি না, অর্থ-সম্পদের প্রতি আমাদের নেই লালসা ; নেতার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এগিয়ে চলেছি—মরতে আমর প্রস্তুত।'

১৯৩০ সাল। গন্ধীজীর নেতৃত্বে সুরু হোল সারা ভারতবর্ষে সত্যাগ্রহ আন্দোলন। গফফার খান তাঁর খোদাই খিদ্‌মদ্‌গারদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই আন্দোলনে। বৃটিশ পুলিশ ও মিলিটারী অকথ্য অত্যাচার ও উৎপীড়নের দ্বারা আন্দোলনকে দমাবার চেষ্টা করল। কিন্তু অহিংস-ব্রতী পাঠানেরা ধীর, স্থির, অচঞ্চল। তারা প্রমাণ করে দিল যে, তরবারী হস্তে যেমন তারা দুর্ধর্ষ, তেমনি অহিংস সংগ্রামেও তারা অতুলনীয়। একটি ঘটনা এইখানে উল্লেখ করছি।

পেশোয়ারের রাজপথে খোদাই খিদ্‌মদ্‌গারেরা সত্যাগ্রহ করছে। প্রথমে পুলিশ এসে তাদের থামাবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হোল। তারপর ডাকা হোল মিলিটারীদের। বৃটিশ জেনারেলের অধীনে একদল গাড়োয়ালী সৈন্য এগিয়ে এল। শান্ত নিরস্ত্র জনতাকে দেখে বন্দুক নামিয়ে নিল গাড়োয়ালী সৈন্যরা। সেনাপতির আদেশেও গুলী চালাতে অস্বীকার করল। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি অদ্বিতীয় ঘটনা।

সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য গফফার খান অন্যান্য অনেক সহকর্মীর সঙ্গে কারারুদ্ধ হন। পাঠানদের ওপর থেকে গফফার খানের অপরিসীম প্রভাব দূর করবার জন্য বৃটিশ সরকার এক মিথ্যা প্রচারের আশ্রয় গ্রহণ করে। অভিযোগ করা হোল যে, সাম্যবাদী রুশদের সঙ্গে গফফার খানের রাজনৈতিক দলের গোপন যোগাযোগ আছে। কিন্তু মিথ্যা দিয়ে স্পষ্টবক্তা ও দৃঢ় বিশ্বাসী পাঠানদের বিভ্রান্ত করা গেল না। গান্ধী-আরুইন চুক্তির ফলে গফফার যখন জেল থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন তিনি পূর্বের মতই পাঠানদের কাছ থেকে পেলেন সম্মান ও ভালবাসা। সত্য ও অহিংসায় অবিচল এই পাঠান কর্মীকে কংগ্রেসের নেতারা 'সীমান্ত গান্ধী' বলে ডাকতেন। গফফার খান ও মহাত্মা গান্ধী দুজনেরই ছিল পরস্পরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। গান্ধীজীর অহিংসা আদর্শকে কেবলমাত্র সংগ্রামের উপায় নয়, জীবনের ব্রতরূপে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪২ সালের আন্দোলনে ভারতবর্ষের নানাস্থানে জনতা ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত, সহিংস হয়ে ওঠে কেবল; সীমান্ত প্রদেশের আন্দোলনকারীরাই ছিল অহিংস ও সংযত।

গফফার খানের খ্যাতি ক্রমে ক্রমে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর এই অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তার জন্য তাঁকে একাধিকবার কংগ্রেসের সভাপতি হবার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু সবিনয়ে তিনি সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি একজন সাধারণ কর্মী হিসেবেই কংগ্রেস ও দেশের সেবা করতে চেয়েছিলেন।

দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। গফফার খানের প্রিয় মাতৃভূমি সীমান্ত প্রদেশ চলে যায় পাকিস্তানের অধীনে। গফফার খান ঘোষণা করলেন, পাকিস্তানে থেকেই তিনি আজীবন পাঠানদের স্বাধীনতা ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য সংগ্রাম করে যাবেন। তারপর চলল তাঁর ওপর পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের অমানুষিক অত্যাচার। বছরের পর বছর তাঁকে আটকে রাখা হলো নির্জন কারাগারে। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল, কিন্তু ঋজু বলিষ্ঠ মনটি রইল তেমনি অটুট। বর্তমানে তিনি আফগানিস্থানে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত হয়ে আছেন।

পাঠানদের প্রিয় নেতা বাদশা খান এক মহান্ সৈনিক। তাঁকে স্মরণ করে এসো আমরা সকলে ধন্য হই।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

মহারাণী এল। রাজা বলল, "না মা। আমি কিসসু করিনি। হাঁচি এসেছিল, বোতাম ছিটকে—" তারপর হাউ মাউ করে কান্না শুরু করল।

মহারাণী তার গায়ে হাত বুলিয়ে বলে, "তবে কাঁদছ কেন খোকন?"

রাজা বলে, "তার জন্য কাঁদি না। বোতাম ছিঁড়ল বলে কাঁদি। দোকানী আমাকে ঠকিয়ে আঁটা জামা দিয়েছে। আমি কি পরে দেশে যাব?"

মহারাণী বলে, "ঠিক হয়ে যাবে। বোতাম জুড়ে দেবে'খন!"

তখন নাক-কান মলার কথা ভুলে, আহ্লাদী আর জল্লাদী বোতাম লাগিয়ে দেয়। এবার জামা গায়ে দিয়ে রাজা হি হি করে হাসে। নাকে কাঠি দিয়ে হেঁচে দেখে বোতাম ছেঁড়ে কিনা। এবার হ্যাঁচছো হ্যাঁচছো করেও বোতাম এঁটে থাকে। রাজা নিশ্চিন্ত হয়ে শোয়। তারপর ঘুমিয়ে দিগ্বিজয়ের রঙচঙে স্বপ্ন দেখে।

সকালবেলা ট্রেন। ভোর রাত্রে ট্যাক্সি এসে দাঁড়ায়। ভোঁ ভোঁ করে হর্ণ বাজায়। সবাই উঠে মুখ হাত ধুয়ে তৈরী হয়। রাজা ঘুম-কাতুরে। তাতে পোষাক পরে, বন্দুক দিয়ে শিকার আর দিগ্বিজয়ের মজাদার স্বপ্ন দেখছিল। তাকে ঠেলেঠুলে জাগান হ'ল।

তখনো চোখে ঘুমের আমেজ। তবু সে বন্দুক হাতে ড্রাইভারের পাশে বসে। ভরসা-জাগানো ফরসা আলো ফোটেনি। হয়ত ছেলেধরা ছড়িয়ে আছে। যদি আসে

সে গুড়ুম করে বন্দুক ছুঁড়বে। রাজা গ্যাঁট হয়ে বসে। আর তার হাতে ছেলেধরার কি দশা হবে তা ভেবে ফিক্‌ফিক্ করে সে ফিকে হাসি হাসে। হেসে হেসে ফের ঝিমোয়। মোটর জোরে চলে। ফুর্‌ফুর্ করে হাওয়া গায়ে লাগে। রাজার বন্দুক ছোড়া হয় না। সে কাত হয়ে ঘুমোয়।

তারা শেয়ালদ' ষ্টেশনে পৌছয়। তখনো আলো জ্বলছে। সারা রাত জেগে আলোর চোখেও কেমন ঘুম ঘুম ভাব। তারা মোটবহর নিয়ে নাবে। আর ভাড়া নিয়ে ট্যাক্সি চলে যায়। এবার মেলাই মালপত্র। তাই কুলি না নিয়ে উপায় নেই। কিন্তু কলকাতার কুলি চোখে ধূলি দিয়ে মাল নিয়ে পালাতে পারে। তা আটকাতে মহারাজা নিজের কোঁচা আর কুলির কাছায় গাঁটছড়া বাঁধতে চায়।

কিন্তু কুলি রাজি হয় না। বলে, "হাম্ হিন্দু হ্যায়, কাছা নেহি খুলে গা।"

মহারাজা বোঝায়, "এ কাছা খোলা নেহি। ভিড় বাঁচাকে সাথ সাথ চলার ফিকির। নয় তো হারাকে যায়েগা।"

কুলি বলে, "ক্যা! হাম্ টিশানকা কুলি বেপাত্তা হো যায়েগা! হাম্ গোরু নেহি হ্যায়। কাহে বাঁধে গা?" (কি, আমি ষ্টেশনের কুলি, হারিয়ে যাব? আমি গোরু নই। কেন বাঁধবে?)

মহারাজা বলে, "আহা-হা, বুঝতা নেই। গরু বাঁধাকা বাত নেহি। হামলোক হারিয়ে না যাই সেই ওয়াস্তে (জন্য)।"

তবু কুলি বলে, "ঐছা হোনে নেহি সেক্তা বড়াবাবু। সাদিকা বখত ঐছা গিঠ হোতা। টিশন পর আদমী লোগ দেখকে ক্যা বোলে গা?" (ওরকম হতে পারে না বড়বাবু। বিয়ের সময় ওরকম গাঁটছড়া হয়। ষ্টেশনের লোকেরা দেখে কি বলবে?)

মহারাজ হা হা করে বলে, "কি মুস্কিল কা বাত! কেউ বোলেগা নেহি। ডর নেই হ্যায়। হাম্‌লোগ হারাকে না যাই, ওহি ডর।" (কি মুস্কিলের কথা! কেউ কিছু বলবে না। ভয় নেই। আমরা হারিয়ে না যাই, সেই ভয়।)

কুলী এবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে হাসে। বলে, "ক্যা তাজ্জব লাগায়া বড়বাবু? বুঢ্‌ঢা আদমী, আউর খোয়া যায়েগা!" (কি তামাশা লাগালে বড়বাবু? বুড়ো মানুষ, আর হারিয়ে যাবে!)

মহারাজা জিভের শব্দ করে বলে, "আহা হা, হামার হারাবার কথা নেহি। তোমার হারানকো বাত।" (আমার হারাবার কথা নয়। তোমার হারাবার কথা।)

কুলী বলে, "পাগলা হোগিয়া বাবু? হাম্ টিশানকা কোলী। লোম্বর হ্যায়।

দেখিয়ে।" (পাগল হয়েছেন বাবু? আমি ষ্টেশনের কুলী। নম্বর আছে। দেখুন।)

সে নম্বর দেখায়। ইংরেজী নম্বর। মহারাজা বোঝে না। এখন কুলীর পেছনে ছুটে তাকে নজর রাখতে হবে। মহারাজা সবাইকে বলে, "সবাই পা চালিয়ে ছলছলিয়ে চল গো।"

এবার জল্লাদী সবার পিছনে ছিল। পথে খাবে বলে সে আঁচলে চিড়ে, মুড়ি, জিলিপী বেঁধে এনেছে। আহ্লাদী দেখবে ভয়ে পেছনে রেখেছে। কিন্তু সে জানে না ধর্মের নামে উৎসর্গ করা ষাঁড় এ শহরের পথে-ঘাটে কেড়ে কুড়ে খায়। শুধু তাই নয়, সুযোগ মত তারা মেরেধরেও খায়,—কোনও পরোয়া করে না—

দোকানী হৈ-হল্লা করে তাড়ায়, কিন্তু মারধোর করে না। খাবার গন্ধ পেয়ে তার একটি জল্লাদীর পিছু নিয়েছিল। হঠাৎ সুবিধা পেয়ে জল্লাদীর আঁচল চেপে চিড়ে, মুড়ি খেতে লাগল।

জোরদার ষাঁড়। জল্লাদী পা বাড়ায়, কিন্তু এগুতে পারে না। ভাবল, এই সেরেছে। পেছন থেকে নির্ঘাৎ ছেলেধরা তার আঁচল ধরেছে। সে পেছনে তাকিয়ে দেখে, ওরে মারে, একটা ষণ্ডাগুণ্ডা ষাঁড়! সে তার সব খাবার সাবাড় করছে। তা না হয় করুক। কিন্তু তারপর তাকে না ধরে!

জল্লাদী সার ভেঙ্গে ছুট দিতে চায়। কিন্তু ষাঁড় তার আঁচল কামড়ে আছে! টানা-হ্যাঁচড়া হৈ-হল্লা লাগে। তাতে ষাঁড় তাদের ছেড়ে যায়। কিন্তু জল্লাদী দেখে সে তার আঁচল ছিঁড়ে নিয়ে গেছে! গাঁটছড়ার বাঁধনও নেই। ষাঁড় গেছে, এবার ছেলেধরা না আসে! তার সামনে আহ্লাদীর বেণী ঝুলছিল। সে তা আকড়ে ধরে। আহ্লাদী আপত্তি করে, কিন্তু জল্লাদী ছাড়ে না! তারা হুটোপুটির পাল্লা দিয়ে চলে। এভাবে এগিয়ে সবাই ট্রেনে চড়ে। কুলী বিদায় করে এবার মহারাজা লোক গুণে দেখে, ঠিক আছে কিনা। সেই রাম, এক, দুই করে গোনা। নিজেকে রাম বলে বাদ দেয়, আর একজন কম হয়। তখন মহারাজা হায় হায় করে। সবাইকে নিয়ে নেবে পড়ে। একজনকে কে নিল, কোথায় গেল, কে জানে? এক বুড়ো লোক ট্রেনে চল্‌ছিল। সে জিজ্ঞেস করে, "কি হ'ল?"

মহারাজা তা অজানা লোককে খুলে বলতে চায় না। তাতে নতুন গোল বাঁধতে পারে। গোল গোল চোখে তার দিকে চায়। সে বলে, "আমিও রেলে চলছি। আমি যাত্রী।"

মহারাজা বলে, "যাত্রার দল আছে? দলের লোক গুণে চলেন। আমার টান পড়ে গেল!"

যাত্রী জিজ্ঞেস করে, "তার মানে?"

মহারাজা বলে, "চিলে কান নেয়, শুনেছেন তো? চিল না থাকে, ইষ্টিশনে ছেলেধরা থাকে, কুলি থাকে। হয়ত ঝোলায় ভরে নিলে! লোকে বলে,—ইষ্টিশনে মিষ্টি ফুল, শখের বাগান গোলাপ ফুল,—উঁহু—।" সে বুড়ো আঙুল নাড়ে।

যাত্রী বলে, "গুণে দেখুন।"

মহারাজা বলে, "নুন না দিয়ে নোন্‌তা বলছি নাকি? আমি বেকুব নই।" যাত্রী বলে, "তবুও দেখুন।" মহারাজা আবার টেনে টেনে গোনে। সেই 'রাম' বলে নিজেকে ছেড়ে দেয়। তারপর এক, দুই, তিন। রামের মহিমা দেখে যাত্রী মুচকী হাসে। নিজে গুণে মিলিয়ে দেয়। মহারাজা হাঁ করে যাত্রীর দিকে চেয়ে থাকে।

যাত্রী বলে, "কি দেখছেন?"

মহারাজা বলে, "মাথা।"

যাত্রী অবাক হয়ে বলে, "মাথা!"

মহারাজা বলে, "মগজ।" সে যাত্রীর মাথা দেখায়। তারপর বলে, "এতবার গুণে ভুল হ'ল। তা চট্ করে মিলিয়ে দেওয়া চাট্টিখানি মগজ নয়। দাঁড়িপাল্লা পেলে—"

যাত্রী মুখ টিপে বলে, "মেপে দেখতেন? তা পরের কথা। ট্রেনে উঠে পড়ুন। গার্ড নিশান দেখাল।"

মহারাজা সবাইকে নিয়ে উঠতে যায়। গাঁটছড়ায় টান লেগে সবাই হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ে! তারপর কোনও রকমে কাম্‌রায় ওঠে। মহারাজা বেঞ্চি টিপে দেখে। যাত্রী জিজ্ঞেস করে, "কি দেখছেন?" মহারাজা বলে, "কাঠের বেঞ্চি কিনা দেখছি। যদি গদী থাকে তা' হলে খাল হয়ে যাবে নদী। তারপর কুমীর—" সে সেদিনের চেকারের কথা জানায়। তারপর গাঁটছড়া খোলে।

সিটি দিয়ে ট্রেন ছাড়ে। আর মহারাণী, আহ্লাদী, জল্লাদী উলু দেয়। মহারাজা, রাজা, আর যাত্রী পাশাপাশি বসেছিল। ট্রেন নড়েচড়ে চলতে রাজার চোখের ঘুম কাটে। অবাক হয়ে দেখে, তার হাতে বন্দুক নেই। আছে একটা লোহার ডাণ্ডা! সে তখন এদিক-ওদিক বেঞ্চির উপর নীচে খোঁজে। তারপর হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে!

মহারাজ জিজ্ঞেস করে, "কি হ'ল?". কিন্তু রাজা খালি কাঁদে। নিজের পকেট, মহারাজার পকেট, বাক্স-পেটরা-গাঁঠরি খোঁজে, আর কান্না ছড়ায়। যেন মেঘের চূড়া থেকে ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি ঝরে। রাজা বলে, "গুড়ুম নেই।"

মহারাজা বলে, "মেঘ নেই, তাই বাজ নেই।"

রাজা বলে, "সে আওয়াজ নয়। আমার বন্দুক নেই! এত কষ্ট করে কিন্‌লেম, আর ছেলেধরায় নিলে!"

(ক্রমশঃ)

ভালো ছেলে

শ্রীরুণু চট্টোপাধ্যায়

সবে সিঁড়ির তলায় গিয়ে কিছু কাঠকুটো যোগাড় করে অলক দেশলাইটি জ্বালিয়েছে, এমনি সময় ওপর থেকে দাদু, দিদু দু'জনের গলা পেলো ও, 'অলক, অলক, কোথায় তুমি? এক্ষুনি ওপরে এসো।'

কেন যে ওঁরা সব সময় ওকে ডেকে ডেকে অস্থির করেন অলক বুঝতে পারে না। ছোটবেলায় মা-বাবাকে হারিয়েছে ও। দাদু-দিদুর নয়নের মণি সে সবই জানে। কিন্তু তাই বলে এই বন্দীদশা! ডাকুন ওঁরা। অঙ্কের পরীক্ষা বন্ধ করতে এ যজ্ঞ তাকে করতেই হবে। আর ঠিক সেই সময়ই ওকে যে মানুষ করেছে সেই লোকটি, যাকে ও জগুদা বলে ডাকে, সে এসে উপস্থিত। সবে চোখ বুজতে যাচ্ছিল অলক, ওমনি জগুদার বিকট চিৎকার—'এই যে খোকা, এখানে আগুন জ্বালিয়ে বাড়ি পোড়াচ্ছে।'

তিন লাফে অলক মেথর ওঠার লোহার সিঁড়ি দিয়ে পড়ার ঘরে গিয়ে অঙ্ক, সংস্কৃত নিয়ে পড়তে বসে গেলো।

একটু পরেই চটির আওয়াজ পেলো আর অলক সংস্কৃত ধাতুরূপ চিৎকার করে পড়তে শুরু করলো।

দাদু এসে বললেন, 'আবার আগুন নিয়ে খেলা করতে শুরু করেছো? চলো তোমার দিদুর কাছে, মেরে হাড় গুঁড়ো করবে?'

অলক বললো, 'আমি তো এইখানে বসে পড়ছি। কে কোথায় সিঁড়ির নীচে কি করছে আর সেই নিয়ে আমায় বকুনি!' তারপরই দেখলো দিদু এসে গেছেন। তিনি বলতে লাগলেন, 'এই দস্যিকে মানুষ করার জন্যে ওরা আমায় রেখে গেছে। নিজেরা তো এর হাত থেকে মরে বেঁচেছে। শেষ পর্যন্ত বুড়ো বয়েসে নাতির হাতে মরবো। আগুন জ্বালিয়ে বাড়ি পোড়াচ্ছে। হতভাগা! এক্ষুনি বল্ আর কখনো এরকম করবি না।'

তারপর সারাদিন ধরে হাহুতাশ, বকুনি চললো। আর সন্ধ্যে বেলা যখন অলক সত্যি পড়তে বসেছে, তখন বড় একটা চকলেট হাতে করে দিদু ঘরে এলেন, 'এই নাও!'

তখন আর অলকের চকলেট খেতে ইচ্ছে করছে না। 'না থাক, এখন খাবো না।' অলক বললো।

এমনি করেই দিন কাটতো অলকের। একদিন কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেলো। সেদিনটা ছিলো ছুটি। ১০টা ১১টা নাগাদ অলক পড়ার ঘর থেকে উঠে দিদুর ঘরে গিয়ে দেখলো ঘর খালি। বইয়ের আলমারির চাবিটা খোলা। আর সেলাইয়ের কলটা বাইরে।

কাঁচিটা পাশে। কী যেন সেলাই করতে করতে দিদু উঠে গেছেন। কী জানি কেমন ইচ্ছে হলো দু-একবার কলটাকে চালাতে। সেই সেলাইটার ওপর বার দুই তিন কলটা চালিয়ে, কাঁচিটা হাতে নিয়ে, আলমারি থেকে গোটা দশেক বই নিয়ে বাইরের ঘরের দিকে সে চললো। বাইরের ঘরেও কেউ নেই। ভালো সোফাটাকে দেখে কেমন যেন হাত নিস্‌পিস্ করে উঠলো, আস্তে করে গদিটাতে কাঁচিটা বসিয়ে দিতেই তুলো বেরিয়ে পড়লো। কাঁচিটাকে গদির ভেতর রেখে, বইগুলো নিয়ে পাড়ার অমিয়'র বাড়ি সে গেলো। অমিয় অনেকদিন ধরে গল্পের বই পড়তে চেয়েছিল ওর কাছে। আলমারি বন্ধ থাকতো তাই দিতে পারেনি। বইগুলো ওর মা'র। দিদু তাই খুব যত্ন করে রাখতেন। অমিয়কে বললো, 'সময় মতো পড়ে ফেরত দিস।' তারপর একটা লজেন্স কিনে মুখে ফেলে বাড়ি ঢুকলো আর বাড়ি ঢুকে শোনে ভীষণ চেঁচামেচি। কী ব্যাপার?

বাইরের ঘরে দাদুর এক বন্ধু এসেছেন। তিনি সোফার সেই ছেঁড়া জায়গাটায় বসতে গেছেন। কাঁচিটা ছিলো, কাজেই লেগেছে একটু। দাদু ভীষণ রাগারাগি করছেন। বলছেন, 'জানেন একাজ কার?' সে-কথা ভেতরে বলতে তিনি এসেছেন। দিদু রান্নাঘরে ছিলেন। কাঁচির কথা শুনে এসে দেখেন, তাঁর সেলাইয়ের কলে যে সেমিজটা সেলাই করছিলেন, সেটায় অনেক সেলাই এলোমেলো। কাঁচিটাও যেখানে ছিল সেখানে নেই, আর সবচেয়ে ক্ষেপে গেলেন বইয়ের আলমারির বেশ খানিকটা অংশ খালি দেখে।

'আজ ওকে বাড়ি থেকে বার করে দেবো। সাপের পাঁচ-পা দেখেছে!' রেগে তিনি বললেন। ঠিক সেই সময়েই অলককে আসতে দেখে আবার বললেন, 'এক্ষুনি বেরোও বাড়ি থেকে।' আর অলক, সে একটা কালো রং-এর ড্রেনপাইপ প্যাণ্ট, আর লাল সার্ট পরে (এগুলো ওর পছন্দ জেনে মাসী কিনে দিয়েছিলেন), চুলগুলো কপাল অবধি নামিয়ে, সরু জুতো পরে, হিন্দী গানের একটা কলি গাইতে গাইতে রাস্তায় নেমে গেল। অলক জানতো এই পোষাক দেখলে দু'জনেই রেগে যান, বিশেষ করে দাদু। তার ওপর ঐরকম চুল আঁচড়ানো, আর হিন্দী গান!

অনেকক্ষণ ট্রামে চড়ে বেড়ালো অলক। খিদে পেয়েছে মনে হতে ট্রাম থেকে নেমে খুঁজে খুঁজে 'লাহোর রেষ্টুরেন্ট' বের করলো। (এসব জায়গায় খেলে দাদু দিদু ভারী রাগ করেন)। ভাগ্যিস আসার সময় হাত-খরচের পাঁচ টাকা সঙ্গে এনেছিলো। নইলে উপোষ করতে হতো। 'লাহোর রেষ্টুরেন্টে' মোগলাই পরটা খেয়ে হেঁটে হেঁটে একটু ঘুরবে ঠিক করলো। ফুটপাথে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় দেখলো দুটো ছোট ছেলে মারামারি করছে। একটা ছেলের পায়ের পাতাগুলো মোড়া, মাথায় টুপি পরা, গালফোলা, হাতে একটা বালতি। বালতিটার জন্যেই ঝগড়া বুঝলো। আর অন্য ছেলেটা রোগা, গাল চড়ানো, দেখলেই রাগ হয়। সেই রোগা ছেলেটা একটা ধাক্কা দিতেই গালফোলা, পা-মোড়া ছেলেটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো। দুটো লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিড়ি খাচ্ছিল, বোধহয়

'অলক একটা কালো রং-এর ড্রেন পাইপ প্যান্ট আর সার্ট পরে রাস্তায় নেমে গেল।' পৃঃ ১২৮

কোনো দোকানদার সেই রোগা গাল-চড়ানো ছেলেটাকে বললো, তাকে ওরা মেরে লাড্ডু বানিয়ে দেবে। ও বেচারার পা খোঁড়া, আর তাকেএই রকম করে মার! সেই গাল ফোলা ছেলেটা চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো। রোগা ছেলেটা বললো, 'ছেলেতে ছেলেতে ঝগড়া, তোমরা বুড়োরা কেন এর মধ্যে এসেছো?' এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে লোক দুটো ছেলেটার কান টেনে দুটো চড় কসিয়ে দিলো। আর তারপর অলক দেখে আশ্চর্য হলো কত লোক জমে গেলো, আর তারা দু'দল হয়ে কী মারামারিই করতে লাগলো। আরো আশ্চর্য হয়ে অলক দেখলো, ছেলে দুটো গলাগলি করেমোড়ের দিকে চলে গেলো। অলকও হাঁটতে শুরু করলো।

গড়ের মাঠে ঘাসের ওপর শুয়ে আকাশ দেখতে লাগলো অলক। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় মেঘগুলোয় দাদু, দিদু, মা, বাবা সবাইয়ের চেহারা ফটোর মতো ভেসে ভেসে বেড়াতে লাগলো। ঐ তো মা হাত বাড়িয়ে ডাকছে আর সে স্পষ্ট দেখছে, বাবা মাথায় হাত দিয়ে অলকের ওপর রাগ করে বসে আছে। বলছে, 'ছিঃ ছিঃ আমার ছেলে এই রকম?' আর দিদু কাঁদছে, 'অলক অলক' বলে।

উঠে বসলো অলক। একটা বড় চিলের ছায়া পড়েছে গায়ে। গা থেকে ধুলো ঝেড়ে নিয়ে বাড়ির দিকে চললো।

মোড়ের সেলুন থেকে চুলগুলো দাদুর পছন্দ মতো করে ছেঁটে বাড়ি ঢুকলো অলক। বাড়ি অন্ধকার। দাদু, দিদু চুপ করে বসে আছেন পশ্চিমের বারান্দায়।

হাত পা ধুয়ে, ধুতি পরে পৈতে গলায় দিয়ে বারান্দায় এসে বললো, 'ঠাকুর-ঘরে আহ্নিক করেছি, আর খারাপ ছেলে হবো না।'

দিদু হাত বাড়িয়ে অলককে কোলের কাছে টেনে নিলেন। দাদু ঘরে আলো জ্বালালেন।

শ্রীদীপায়ন বিশ্বাস

জোনাস হ্যানওয়ে নামে জনৈক ইংরেজ ১৭৫৬ সালে ভারতের কাছ থেকে ছাতার ব্যবহার শিখে, একটু উন্নত করে ইংল্যাণ্ডে ছাতার ব্যবহার প্রচলন করেন।

বিকৃত হস্ত ও পদবিশিষ্ট ও পঙ্গু শিশুদের জন্য পশ্চিম জার্মানীর বিকলাঙ্গদের একটি হাসপাতালে নতুন ধরণের এক প্রকার চেয়ার তৈরী হয়েছে। এটি পঙ্গু শিশুর কণ্ঠস্বর অনুযায়ী চলতে থাকে।

ভূপালের জনৈক সরকারী কলেজের অধ্যাপক পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেবার জন্য ছাত্রের কাছ হতে টাকা নিয়ে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন।

সম্প্রতি মূল সংস্কৃত থেকে জার্মান ভাষায় উপনিষদের অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। ইতিপূর্বে ঋক্‌বেদের শ্লোকাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

পশ্চিম জার্মানীর রাসায়নিকরা 'ডেভেনাল' নামে এমন এক ক্যাপসুল আবিষ্কার করেছেন যা খেলে বৃদ্ধ কুকুর বা বিড়াল তার হারানো যৌবন ফিরে পাবে।

হামবুর্গের জনৈক শল্যচিকিৎসক 'ম্যাক্স গিবেল' এমন এক জীবাণুরোধক আঠা বানিয়েছেন যা ক্ষতস্থানে লাগালে আলো হাওয়া লেগে জুড়ে যায় কিন্তু তেল বা জল লেগে উঠে যায় না।

পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সম্পূর্ণ চলন্ত রেডিও-টেলিস্কোপ পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী বনের নিকট তৈরী হবে।

পশ্চিম জার্মানীর কোন একটি প্রতিষ্ঠান তুষারশুভ্র সারে চার মিটার দীর্ঘ ও চারজনের বসার উপযুক্ত এমন এক ট্রলার তৈরী করেছেন যা স্থলেও চলে আবার জলেও চলে।

সম্প্রতি ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কিন পরমাণু-শক্তি কমিশনের প্রচেষ্টায় তরল জাতীয় প্লাষ্টিকের সঙ্গে কাঠের গুঁড়ো মিশিয়ে, গামা রশ্মির সাহায্যে শোধন করে, প্লাষ্টিক কাঠ নামে এমন একরকম উন্নতশ্রেণীর কাঠ আবিষ্কার করেছেন যার কোন অংশ পুড়ে বা নষ্ট হয়ে গেলে সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে তার আগের মসৃণতা ফিরিয়ে আনা যায়।

ম্যাগসেসাই পুরস্কার

শ্রীচুনীলাল রায়

ম্যাগসেসাই পদক

চলো আজ আমরা একটু পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে ঘুরে আসি। জান তো নিশ্চয়ই যে, এই দ্বীপপুঞ্জগুলির মধ্যে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জও একটি।

প্রায় সাত হাজারেরও বেশী ছোটবড় দ্বীপ নিয়ে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ গঠিত।

সবুজ নারিকেল গাছে ছাওয়া একটা ছোট্ট গ্রামেই এসে আমরা ঢুকে যাই—

এই ছোট্ট গ্রামে বাস করে ম্যাগসেসাই পরিবার। খুব গরীব তারা অথচ বিরাট এক সংসার—মা-বাবা আর তাদের আটটি ছেলেমেয়ে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয় ছেলেটি একটু চালাক-চতুর। তার নাম র‍্যামন।

র‍্যামন যখন ছোট্ট তার বাবা ছিলেন এক স্কুলের শিক্ষক—কাঠের কাজ শেখাতেন তিনি স্কুলের ছাত্রদের। খুব কড়া আদর্শবাদী শিক্ষক ছিলেন তিনি। কোনরকম অন্যায়ই সহ্য করতে পারতেন না।

একবারের এক ঘটনা বলি শোনো—সেবার পরীক্ষায় স্কুলের এক হোমরা-চোমরা কর্তৃপক্ষের ছেলে কাঠের কাজের পরীক্ষায় ফেল করল। ব্যাস্, সেই অপরাধে র‍্যামনের বাবার গেল চাকরি। বন্ধুবান্ধব, শুভানুধ্যায়ী সবাই উপদেশ দিলেন ছেলেটিকে পাশ করিয়ে দিতে। কিন্তু র‍্যামনের বাবা কিছুতেই রাজী হলেন না ঐ প্রস্তাবে।

তিনি জানতেন তার চাকরী যাওয়ার অর্থ দরিদ্র সংসারকে আরো দারিদ্র্যের মুখে ঠেলে দেওয়া। কিন্তু তবুও ঐ অন্যায়কে কি করে তিনি মেনে নেবেন?

শেষে একদিন তার পিতৃপুরুষের, সপ্তপুরুষের ভিটে ছেড়ে তিনি চলে গেলেন পরিবারের সকলকে নিয়ে।

নতুন জায়গায়, নতুন পরিবেশে সেখানে নতুন করে জীবন শুরু করলো ম্যাগসেসাই পরিবার। সেখানে র‍্যামনের মা ছোট একটা দোকান খুললেন। একটা ছোট খুচরো জিনিস বিক্রির দোকান। বাবা গরীব, যারা একসঙ্গে দু'চামচ ভিনিগার বা এক চামচ গুঁড়ো মসলা বা অল্প একটু আচার চাটনির বেশী কিনতে পারে না, তাদের জন্য এই দোকান। ফিনিপিনো ভাষায় এই রকম দোকানকে বলে "সারি সারি" দোকান।

এই ছোট দোকান থেকে যা' লাভ হ'তো তাতে ঐ বিরাট পরিবার প্রতিপালন করা সম্ভবপর ছিল না। তাই র‍্যামনের বাবাকে এমনকি ছোট্ট র‍্যামনকেও সেই বয়সেই কঠোর পরিশ্রম করতে হ'ত।

মাত্র আট বছর বয়সে ছোট্ট র‍্যামন রাস্তা তৈরীর কাজেও একদিন যোগ দিতে বাধ্য হয়েছে।

এমন একদিনও গিয়েছে যেদিন সমস্ত ম্যাগসেসাই পরিবারকে গৃহপালিত ফিলিপিনো মহিষের দুধ আর সামান্য ভাত খেয়ে দিনের পর দিন কাটাতে হয়েছে।

কিন্তু দারিদ্র্যের এই তীব্র কশাঘাতেও ম্যাগসেসাই পরিবার একদিনের জন্যও আদর্শচ্যুত হননি।

তাই সেই র‍্যামন—সেই ছোট্ট র‍্যামন একদিন পেল বিজয়লক্ষ্মীর শ্রেষ্ঠ বরমাল্যটি। সে নির্বাচিত হ'ল ফিলিপাইনস্-এর প্রেসিডেন্ট।

তার মধুর ব্যবহারে, স্বীয় প্রতিভায় অচিরেই সে দেশবাসীর হৃদয় জয় করে নিল। সমস্ত দেশ 'র‍্যামন' বলতে পাগল। সবাই তাকে ভালবাসতো। আর তার রাজনৈতিক জীবনে এই ভালবাসার উপরই ছিল তার জয়ের ভিত্তি।

কিন্তু এত সুখ কি ভাগ্যে সয়?—১৯৫৭ সালের মার্চ মাসের এক ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় অকালে প্রাণ হারালেন ফিলিপাইনস্-এর প্রিয় প্রেসিডেন্ট র‍্যামন ম্যাগসেস।

সমস্ত দেশ হাহাকার করে উঠল। শোকসাগরে নিমজ্জিত হ'ল সমস্ত দেশ।

আর তাই তাদের প্রিয় নেতাকে, ঘরের আদরের ছেলেটিকে চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্য গঠিত হ'ল 'ম্যাগসেসাই ফাউণ্ডেশন সংস্থা।'

ম্যাগসেসাই পুরস্কার কেবলমাত্র এশিয়াবাসীদের জন্য। মানবকল্যাণব্রতে সার্থক সাধনার স্বীকৃতি হিসাবে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

প্রতি বছর প্রায় চার-পাঁচজন এই পুরস্কার পেয়ে থাকেন। এই পুরস্কারের অর্থ-মূল্য দশহাজার মার্কিন ডলার।

৩১শে আগষ্ট প্রেসিডেন্ট ম্যাগসেসাই-এর জন্মদিন। ফিলিপাইনস্-এর রাজধানী ম্যানিলায় সেদিন এক বিশেষ অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার বিতরণ করেন।

ভারত থেকে এই পুরস্কার যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা হলেন—

১৯৫৮—আচার্য বিনোবা ভাবে।

১৯৫৯—চিন্তামন দেশমুখ।

১৯৬১—অমিতাভ চৌধুরী (শ্রী নিরপেক্ষ)।

১০৬২—মাদার টেরেসা!

(ইনি জন্মসূত্রে যুগোশ্লাভিয়ার অধিবসী, কিন্তু কর্মসূত্রে ভারতীয়। কলিকাতায় বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ইনি যুক্ত)।

১৯৬৪—জয়প্রকাশ নারায়ণ।

১৯৬৬—কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়।

১৯৬৭—সত্যজিৎ রায়।

(সত্যজিৎ রায় তাঁর শিল্পকৃতির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের প্রতি যে সমত্ববোধ এবং সহানুভূতির পরিচয় দিয়ে এসেছেন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে 'ম্যাগসেসাই পুরস্কার' দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে)।

বিভিন্ন দেশের ম্যাগসেসাই পুরস্কার প্রাপ্ত কয়েকজন। এর মধ্যে সর্বশেষ বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে আছেন ভারতের বিখ্যাত শিল্পী শ্রীসত্যজিৎ রায়

টরটয়েস আর টরটেল

শ্রীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

"কার্তিক মাসে কাউট্যার তেল যে না খাইল তার জনম বৃথা গেল।" সেদিন রসিকতা করে বললো আমার শ্রীহট্টবাসী বন্ধু। ওদেশে কচ্ছপকে 'কাউট্যা' বলে। রসিকতা করতে-করতেই আবার জিজ্ঞেস করলো—"আইচ্ছা, কাউট্যারে ইংরেজীতে তো টরটয়েস কয়, তবে আবার টারটেলও কয় কেন রে?" সত্যিই তো একই সঙ্গে এই দুই নামের তাৎপর্য তো সত্যি এতদিন ভেবে দেখিনি ভাল করে! চট করে তক্ষুণিই আর জবাব দিতে পারলাম না। জবাব পেলাম পরে। কচ্ছপদের কথা ঘেঁটেঘুঁটে। সেই নাম মহিমার কথাই তবে বলি। তা'হলেও গোড়ার কথাগুলি গোড়ায় বলে নেওয়াই ভাল।

কচ্ছপ সরীসৃপ সম্প্রদায়ের জীব। যে সম্প্রদায়ের প্রাণী হ'ল সাপ, ব্যাঙ, গোসাপ, গিরগিটি প্রভৃতিরা। ভারতবর্ষ নদ-নদীর দেশ। এদেশে কচ্ছপেরও অভাব নেই। এমনকি বৃন্দাবনের মত বৈষ্ণবপ্রধান জায়গায়ও যমুনার তীরে গেলেই দেখা যায় অজস্র রকমারি কচ্ছপের ভেল্‌কী খেলা বৃন্দাবনের ঘাটে ঘাটে। তবে মারা নিষিদ্ধ। এমন নদীপ্রধান অথ কচ্ছপপ্রধান দেশে কচ্ছপ দেখেনি এমন ছেলেমেয়ে কেউ আছে বলে তো মনে হয় না। অতএব কচ্ছপের দেহসৌষ্ঠব নিয়ে আর কথা বাড়িয়েও লাভ নেই। অমন দেহশ্রী একবার চোখে পড়লে কী আর সহজে ভোলা যায়? তার উপর আবার কচ্ছপ হ'ল পয়মন্তের পয়মন্ত! নাম উচ্চারণ করলেই নাকি যাত্রা ভঙ্গ হয়। দর্শন তো পরের কথা। বাঙলা-দেশের, বিশেষ করে পূর্ব-বাঙলার অনেক গৃহস্থ ঘরের পেছনে দেয়ালে লটকানো দেখেছি মৃত কচ্ছপের খোল। প্রশ্ন করে জেনেছি, ওটা নাকি চোরের যাত্রা-ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যেই বিশেষ করে টাঙানো হয়ে থাকে। ভাববার মত কথাই বটে। কেবল বেঁচে থেকেই নয়, মরেও যাত্রাভঙ্গ করার বিক্রম তার এতটুকু কমে না তা'হলে? যাত্রাভঙ্গের ব্যাপারে এত বিক্রম দেখেই বোধহয় কচ্ছপকে অবতার পর্যায়ে ফেলে, মানুষ দূর থেকেই নমস্কার জানিয়ে রেহাই চায়। তবে কচ্ছপের মাংসে যারা প্রলুব্ধ, তাদের কাছে কিন্তু কচ্ছপের অন্যরূপ—"যে না খাইল তার জনম বৃথা গেল গোছের।"

কচ্ছপ যে জাতের সরীসৃপ ইংরেজীতে সেই জাতের সব সরীসৃপদের বলা হয় 'টেষ্টুডিনস্' বা 'কেলোনিয়া।' এই জাতের সরীসৃপ সংখ্যায়, রকমফের ও ছোটবড় মিলিয়ে প্রায় দু'শোর মত আছে। তবে এই দু'শোর মাঝে আবার দু'টি ভিন্ন ভিন্ন সমাজও আছে। ডাঙার সমাজ আর জলের সমাজ। সাপেদের মতই আর কী। জলের সাপ আর ডাঙার সাপ। সাপেদের মাঝেও যেমন চেহারায় বা প্রকৃতিতে খুব বেশী পার্থক্য নেই,

কচ্ছপদের বেলাও ঠিক তাই। হবে নাইবা কেন? আসলে দু'ই তো সরীসৃপ শ্রেণীর জীব। এক শ্রেণী। টেষ্টুডিনস্ বা কেলোনিয়া।

তা'বলে অমিল নেই এমন কথাও বলা চলে না কিন্তু। এবার তবে মিল-অমিল দু'দিকের কথায়'ই আসা যাক। তার আগে সেই প্রশ্নেরও জবাবটা দিয়ে নিই। সেই, যে প্রশ্ন নিয়ে এ লেখার সূত্রপাত। 'টরটয়েস' আর 'টারটেল-এ পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য
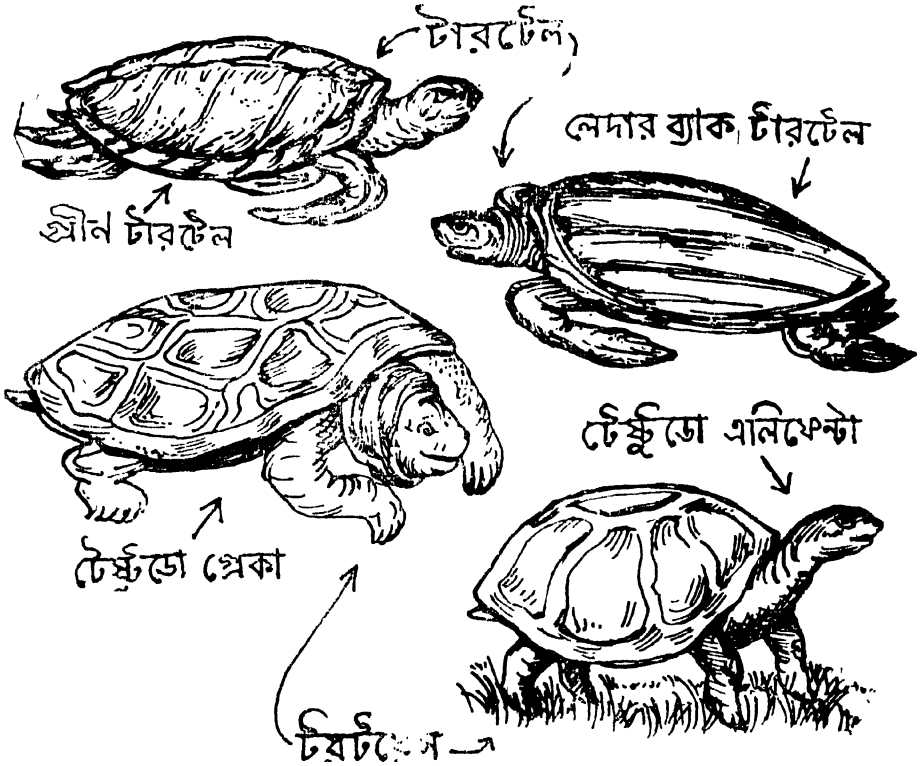
জলে আর ডাঙায়। জলের কচ্ছপ অর্থাৎ জলচর কচ্ছপকে বিশেষ করে সাগরবাসী কচ্ছপকে বলা হয় 'টারটেল।' আর স্থলচর অথবা স্থলে ও জলে দু'জায়গায়ই যার অবাধ গতি কিন্তু জলচর অর্থে জলচর নয়, এমন কচ্ছপকে বলা হয় 'টরটয়েস'।

মিলের কথা বলতে গেলে প্রথমেই আসে এদের শ্রেণীর কথা। উভয় সম্প্রদায়ই একই সরীসৃপ শ্রেণীভুক্ত। উভয়েই ডিম পাড়ে এবং ডিমগুলি কচ্ছপ মায়ের আকৃতি অনুযায়ী বড়-ছোট হলেও দেখতে সাদা হয় এবং শক্ত খোলের ডিম হয়। একবারে ২ থেকে

৪টি অবধি ডিম এরা পেড়ে থাকে। ডিম ফুটে যে সব বাচ্চারা বের হয়, তারা তখনই দেখতে অবিকল মায়ের ক্ষুদ্র সংস্করণ সব। আর তেমনি সব চালু বাচ্চা। জন্মেই যেন বুভুক্ষা ব্যাধিতে ভুগতে স্বরু করে। হ্যাঁ, যারা 'কাউট্যা' খাবার নামে পাগল, তারা কিন্তু কচ্ছপের ডিম খাবার নামেও পাগল। জলে-স্থলে শত্রুর অভাব নেই বলেই তো কচ্ছপ মা'কে অত লুকিয়ে-চুরিয়ে ডিম পাড়তে হয় আর মাটির নীচে লুকিয়ে রাখতেও হয়। কচ্ছপের শক্তি তার চোয়ালে। দেহের শক্তির বহুগুণ অধিক। তবে রক্ষে এই যে, দাঁতের বালাই নেই। দাঁত থাকলে আর উপায় ছিল না। তা'হলেও দাঁতের অভাব ষোলআনা না হলেও দশআনা পুরিয়ে দিয়েছে চোয়ালের ভিতরের দিকে প্রায় দাঁতেরই মত শক্ত উপাস্থির সারি। উপাস্থির ইংরেজী নাম 'কার্টিলেজ'। কচ্ছপের কামড় বলতে কিন্তু চোয়ালের সেই উপাস্থির সারের নিষ্পেষণকেই বুঝায়। উভয় শ্রেণীর কচ্ছপই গলা সম্প্রসারিত ও সংকুচিত করতে পারে। তবে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারেও দুই শ্রেণীর মাঝে বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে বলা চলে—একজন বৈষ্ণব আর অপরজন শাক্ত। অর্থাৎ এক শ্রেণী সাধারণতঃ অমাংসাশী আর অপর শ্রেণী ঘোরতর মাংসাশী। স্থলচর কচ্ছপ অর্থাৎ টরটয়েস হ'ল এই আপাতবৈষ্ণব অর্থাৎ অমাংসাশী সম্প্রদায়ের, আর টারটেল, ঘোরতর মাংসাশী সম্প্রদায়ের জীব।

স্থলচর কচ্ছপ অর্থাৎ টরটয়েসের চারটি পা'ই স্থলে চরে বেড়াবার মত। পায়ে নখও আছে। পায়ের শক্তিও নেহাত কম নয়। টরটয়েসের সারা দেহ হাড়ের মত শক্ত ও মজবুত পদার্থে আগাগোড়া ঢাকা। ইংরেজীতে এই বর্ম আচ্ছাদনকে 'সেল' বলা হয়। স্থলের শত্রু জলের শত্রুর চাইতেও ভয়াবহ। সে কারণেই বোধ হয় খোদ প্রকৃতির বিধানেই এদের শক্ত বর্ম আচ্ছাদন। মজবুত দুর্গে আত্মরক্ষার এই পাকা ব্যবস্থা। বুক পিঠ কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। ভয় পেলে তাই টরটয়েস গুটিয়ে গিয়ে এই দুর্গে সিঁধিয়ে আত্মরক্ষা করে।

টরটয়েসের পিঠের উপর আবার নানাবিধ নক্সা আঁকা থাকে। হঠাৎ দেখলে অনেকটা ভূগোলের প্রাকৃতিক ম্যাপের মতন লাগে। এ নক্সা টারটেলের পিঠেও দেখা যায়। তবে টারটেলের পেট বা পিঠের উপর কোন শক্ত আবরণ নেই। তার বদলে আছে শক্ত চামড়ার আবরণ? টারটেল পুরোপুরি জলচর প্রাণী। প্রকৃতির বিধানে তার চারটি পা'ও ঠিক সেইভাবে তৈরী। যেন চারটি ডানা। সাঁতরাবার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। টারটেলের এই চারটি ডানা সদৃশ পায়ের ইংরেজী নাম হল 'ফ্লিপার্স'। টারটেল ডাঙায় আসে না তাই তার পায়েরও দরকার হয় না। ডাঙায় আসে কেবল ডিম পাড়ার সময়। ডিম পেড়ে বালির নীচে লুকিয়ে রেখে যায়। তখন ঐ ফ্লিপার্সের সাহায্যেই কোন মতে গড়িয়ে গড়িয়ে এসে কাজ শেষ করে আবার জলে ফিরে যায়।

কচ্ছপের একটি শ্রেণী আছে যাদের কচ্ছপকুলের মধ্যে বামন বলা চলে। এরা মাত্র

ইঞ্চি দশেকের মত লম্বা হয়। এদের ইংরেজী নাম 'টেষ্টুডো গ্রেকা'। এই বামন শ্রেণীর কচ্ছপ নাকি উপযুক্ত শিক্ষা পেলে রীতিমত পোষও মানে। ক্ষেত-খামারে পোকামাকড়ের উপদ্রব সুরু হলে নাকি এসব বামন কচ্ছপকে ছেড়ে দিলে খুবই উপকার পাওয়া যায়। কারণ ছোট হলে হবে কি, এদের বুভুক্ষার শেষ নেই। অতএব বৈষ্ণবধর্ম ত্যাগ করে পোকামাকড় ভোজনে এরা উঠে পড়ে লেগে যায়। টরটয়েস আলস্যতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি; তার উপর ঘুম-কাতুরে। পেটটা ভরা থাকলে আফিমখোরের মত বসে বসে কেবল ঝিমুতে পারলে যেন আর কিছুই এরা চায় না। গোটা শীতকাল ধরে চলে এদের ঘুমের দাপট। ইংরেজীতে এই ঘুমের নাম 'হাইবারনেসান্'। শীতের সুরুতেই এরা ঘুমের জায়গা খুঁজে নিয়ে গিয়ে আস্তানা গাড়ে। তারপর চলে ঘুম আর ঘুম।

'এমিস্ অরবিকুলারিস্' নামে স্থলচর কচ্ছপের অপর একটি শ্রেণী আছে। এরা সাঁতারে টারটেলদের মতই দক্ষ। এদের অন্য নাম 'স্মল ওয়াটার টরটয়েস'। এদের পা ঠিক হাঁসের পায়ের মত। আর সাঁতরাবার কায়দাকানুনও এরা জানে ঠিক হাঁসেরই মত।

টারটেলদের মাঝেও আবার রকমফের আছে। এক এক রকমের এক এক নাম। যেমন, 'গ্রীণ টারটেল', 'লেদার ব্যাক টারটেল', 'স্নাপিং টারটেল' প্রভৃতি। গ্রীণ টারটেলের খ্যাতি ভুবন জোড়া। তার ধূসর সবুজ চবির সুস্বাদু সুপ'ই তার খ্যাতির কারণ। গ্রীণ টারটেলের নাম শুনে জিভে জল আসে না এমন টারটেল সুপ ভোক্তা কেউ আছে বলে তো মনে হয় না। পৃথিবীর সর্ববৃহদাকৃতির কচ্ছপ হ'ল লেদার ব্যাক টারটেল। ইংরেজী নাম 'ডারমোকোলিস্ কোরিয়াসিয়া'। আবার অতিশয় ক্ষুদ্রাকৃতির কচ্ছপও আছে। মাত্র ৭/৮ ইঞ্চির মত। এদের পিঠে অবিকল ভূগোলের ম্যাপের নক্সা থাকে। তাই এদের নাম হ'ল 'জিওগ্রাফিক টেররাপিন'।

টরটয়েসদের মাঝে যিনি আকৃতিতে সর্ববৃহৎ তার নাম হ'ল হস্তী কচ্ছপ বা 'এলিফাণ্টিনো' (টেষ্টুডো)। এরা কেবল ছোটখাট এলিফ্যাণ্ট'ই নয়, আয়ুর ব্যাপারেও রীতিমত অশ্বত্থামা! প্রায় একশো পঞ্চাশ বছরের উপর হয় এদের পরমায়ু। এদেরই একজন আজও ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে। স্বয়ং নেপোলিয়ান বোনাপার্টির সমসাময়িক প্রাণী। নেপোলিয়ান যখন সেণ্ট হেলেনাতে নির্বাসিত হন, তখন তিনি তথায় ছিলেন। আজও সেখানেই আছেন বহাল তবিয়তে! কত দেখলো তবু যেন দেখার শেষ হয় না। প্রাণেরও শেষ নেই। প্রাণের বন্ধন এমন অক্ষয় বলেই কী মানুষে চলতি কথায় উপমা দিয়ে বলে—'যেন কচ্ছপের প্রাণ'?

কচ্ছপ বুদ্ধিমান প্রাণীদের অন্তর্ভুক্ত কী? চালচলন দেখে তো মনে হয় না। তবে পোষ যখন মানে আর অমন অক্ষয় প্রাণ-ধারণের মূলমন্ত্র যখন জানে, তখন বুদ্ধিমান নয়ই বা বলি কোন যুক্তিতে? পৃথিবীর সব চাইতে বুদ্ধিমান জীব মানুষ। কই সেও তো এমন বাঁচার মন্ত্র আজ অবধি আয়ত্তে আনতে পারলো না।

ফন্দি-বিশারদ

শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

খরগোশটা আর পারে না, বেজায় যন্ত্রণা !
একদিন তাই গেল নিতে প্যাঁচার মন্ত্রণা।
বল্‌লে, "দাদা, বেঁচে-থাকাটা চল্‌লো নাকো আর,
ভেবে চিন্তে তুমি যদি না উপায় করো তার !

মানুষেরাও বেজায় পশু—শৃগাল-নেকড়ে ছাড়া
দেখতে পেলেই কুকুর নিয়ে মারতে করে তাড়া।"
তাই না শুনে মুখখানাকে করে বিজ্ঞতরো
চোখটি বুজে বল্‌লে প্যাঁচা—"ভোল্‌টা বদল করো।

নেউল হ'য়েই যাওনা কেন, চুকেই যাবে ল্যাঠা,
ধারালো নখ দাঁতের কাছে এগোবে কোন্ ঢ্যাঁটা !"
"খাসা তোমার বুদ্ধি দাদা, বল্‌বো কিবা আর !
ভেবে দেখবো—" ব'লে শশক জানায় নমস্কার।

হপ্তাখানেক পরে আবার এসে গাছের তলে
নুইয়ে মাথা, হাত কচলে প্যাঁচায় শশক বলে—
"ফন্দিটা যা বাত্‌লে দিলে অতি চমৎকার !
কেমন ক'রে নেউল হবো উপায় বলো তার।"

মুখটা আরো পেঁচিয়ে প্যাঁচা চোখ টেরিয়ে কয়—
"খুঁটিনাটি সব উপায় বলা আমার পেশা নয়।
ফন্দিফিকির মতলব চাও, তা পারি মুই দিতে।
হাসিল করার উপায় হবে তোমায় ক'রে নিতে।"

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

খুড়ী বললে, "আমরা গো, তোমাদের খুড়ো খুড়ী আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চাই—এদেশ থেকে উদ্ধার করতে চাই।"

যরলব যেন গান শুনছে—এমন মধুর ভাষা সে অনেকদিন শোনেনি—তার পাগলামি কেটে গেল, মনটা সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল। ধীরে ধীরে তার মনে পড়তে লাগল—তার তিন মেয়ের কথা। সে সামনের সারির আখ মট্ মট্ করে ভেঙে খুড়ো খুড়ীর কাছে এগিয়ে এলো—

ইঁদুররা বিশ্রাম করতে লাগল। তারা জল দেওয়া বন্ধ করায় আর নতুন আখ জন্মালো না।

যরলব জিজ্ঞাসা করলে, "বাঁচাবে, সাহায্য করবে, আমাদের মেয়েদেরও বাঁচাবে—তাদের উদ্ধার করে দেবে?"

খুড়ো খুড়ী বললে, "নিশ্চয়, আমরা তোমার মেয়ে তিনটি চাই—তাদের নিয়ে যেতে এসেছি যে!"

যরলব বললে, "সে তো ভাল, তোমরা তাদের দেখবে—মানুষ করবে।"

খুড়ো বল্লে, "দেখ ঐ সীমান্ত যেখানে আকাশ মিশেছে মিছরির পাহাড়ে, ওখানে আছে একটা দারুচিনি গাছ। ঐ গাছে যখন লাল নিশান উড়বে তখন জেলখানাটাকে নিয়ে ওখানে যাবে। ঐখান থেকেই আমরা পলায়ন করব।"

"মেয়েরা? তাদের ব্যবস্থা?" যরলব জিজ্ঞেস করলে।

খুড়ো বললে, "সব ব্যবস্থাই হবে।"

খুড়ী বললে, "কিন্তু বল তো কি করে ওরা তোমাকে জেলে পুরেছিল।"

যরলব'র আত্মজীবনী

ব্যাং মহারাজের ফুঁয়ের জোরে ছিটকে এসে হাজির হলাম আশ্চর্য নগরে। তখন ঘরে ঘরে আমার আদর। আমি ওদের বহু কাজ শেখালাম, মানুষ করলাম। ময়দার দেওয়াল, মিহিদানার রাস্তা সব আমিই করেছি আর গুগলী ঝিনুক প্রশংসা পেয়েছে। ওর অধীনে আমি ছিলাম সর্বময় কর্তা।

গুগলী ঝিনুকটা একটা আস্ত গাধা। ওর বোকামির জন্যেই এদেশের লোকের সুখসমৃদ্ধি নেই। ও যে কত বোকা তার প্রমাণ দিচ্ছি। কেন আমাকে আখ গাছের গারদে পুরেছে শোনো।

একদিন মাথায় পালক গোঁজা একদল লোক ওকে বোঝাতে লাগল: সেতু কাকে বলে।

সেতুর বর্ণনা শুনে পরের দিনই ও দেশের মধ্যে এক পেল্লায় খাল কাটিয়ে ফেললে। তারপর হুকুম দিলে—খালে জল ঢালো। কিন্তু চিনি-ময়দার দেশে জল সব শুষে গেল।

তবুও আহাম্মক ঐ গুগলী ঝিনুক হুকুম দিলে এপার থেকে ওপার পর্যন্ত সেতু বানাতে।

জল নেই খালে, তবু সেতু চাই। চিনি জমিয়ে বাদাম বাটা আর জিলিপি অমৃতির রেলিং করে সেতু খাড়া করা হ'ল।

তারপর হুকুম হ'ল কেউই সেতু দিয়ে ছাড়া খাল পারাপার হতে পারবে না। যদি হয় তো তার শাস্তি প্রাণদণ্ড।

অথচ আমি যেই ওদের সেতুতে পা দিই সেতু ফেটে চৌচির হয়ে যায়। অমৃত আর জিলিপির রেলিং ধ্বসে পড়ে। গুগলী ঝিনুক তা মেরামত করায়, আর গজগজ করে।

একদিন সন্ধ্যার ঝোঁকে কেউ কোথাও নেই দেখে আমি ওদের শুকনো খাল এক লাফে পার হয়েছি আর ওদের দু'জন পরচুলওলা পাহারাদার আমাকে ক্যাঁক্ করে ধরে ফেললে।

তারপর হাজির করলে চোরামাণিক্য বাহাদুরের সামনে। আইন লঙ্ঘন এদেশের গুরুতর অপরাধ। চোরামাণিক্য রেগে টং। হুকুম হ'ল কয়েদ। আর আশ্চর্য নগরের

সবাই আশ্চর্য। বন্দী করলো আখ গাছের গারদে। ঐ ইঁদুররা জল দিয়ে দিয়ে আখ গাছ গজাচ্ছে, যত ভেঙে দিচ্ছি হু হু করে গজাচ্ছে।

ব'লে ষরলব আখ গাছ ভাঙতে লাগল মট্‌মট্‌ করে।…

খুড়ো খুড়ী দেখলে যে চোরামাণিক্য সারস সার্জেন্টের মাধ্যমে একজন জুতোর বাক্সওলার সঙ্গে কি সব ফিস্‌ফিস্‌ করে পরামর্শ করছে।

ওরা শুনলে সারস বলছে চোরামাণিক্যকে, "তোমার পিঠ ফুটো হয়ে ঝাঁজরা হয়ে পড়েছে এখনি মেরামত করা দরকার।"

হঠাৎ চোরামাণিক্য লক্ষ্য করলে খুড়ো খুড়ী একথা শুনে ফেলেছে। বিদেশীর কাছে ঘরের খবর আউট্‌ হওয়ায় সে ভারী অপমানিত বোধ করলে। হুকুম দিলে কয়েকজন সবজিনিয়াকে—"কড়াই করে এদের সীমান্ত পার করে দিয়ে এসো।"

খুড়ো খুড়ী দেখলে যে তারা পরচুলওলা আর চিনি, সন্দেশ, মেওয়া, মণ্ডার দেশের সীমান্তে পৌঁছে গেছে।

মিছরির পাহাড়ের ওপারে দারুচিনি গাছের তলায় তাদের রেখে গেছে সবজিনিয়ারা।

খুড়ো খুড়ী ক্লান্ত হয়ে সেই দারুচিনি গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়লো। সারা দিন ধরে তাদের ওপর দিয়ে বড় কম ধকল যায়নি তো!…

জেগে উঠে দেখলে মিছরির পাহাড়ের ওপারে পরচুলওলাদের রাজ্য, ছবির মত সব দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট।

তিনটি বাগান চোখে পড়ল তাদের। ঐগুলো নিশ্চয়ই ষরলব-র তিন মেয়ের বাগান।

খুড়ো হঠাৎ দেখলে তার মুখে পাখীর ঠোঁট নেই—চেয়ে দেখলে খুড়ীরও ঠোঁটের বালাই ঘুচেছে। তখন দু'জনে উঠে দাঁড়িয়ে হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে খানিক নাচল।

তারপর খুড়ী গান জুড়ে দিল—

"চাই আমাদের তিনটি মেয়ে
গোলাপী রং ফুট ফুটে—"

একদল জোনাকী হাত-লণ্ঠন ঝুলিয়ে বাগান পাহারা দিচ্ছিল, তারা বলে উঠল, "এখানে চেল্লাচেল্লি চলবে না—"

বাগানের মালীকে দেখতে ঠিক পান্তুয়ার মত থপথপে। সে গাছের গোড়া নিড়ুতে নিড়ুতে গান ধরলে—

"আহা! ফড়িং-এর কনসার্ট
হেথায় রাত্রিদিন বাজে
সূর্য্যি উঠলে হেথা
সপ্তাহ ধরে নামে না যে!
পাখীরা মাথায় টুপি
বুট জুতা পায়ে পথ হাঁটে,
পোকারা চশমা পরে
তরোয়াল দিয়ে দাড়ি কাটে।"

খুড়ো বললে, "থাক আর চাল মারতে হবে না। যত সব ফাজিল ফক্কড় তোমাদের আশ্চর্য নগরের সব দেখে এসেছি গো—"

পাস্তয়ারাম নিড়ুনি তুলে বললে, "কি কি দেখলে?"

খুড়ী বললে, "চোরামাণিক্য বাহাদুর, গুগলী ঝিনুক, প্যাপীলিক চিনচিনিয়া, কেকরালি, সবজিনিয়া, যরলব, ঘোড়ামুখ, ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, কাকীবুড়ী, তেচোখো কাক—যুদ্ধজাহাজ···কুচকাওয়াজ···

পাস্তয়ারাম বললে, "থাক! থাক! আর বলতে হবে না—বুঝেছি, বুঝেছি, তোমরা গুপ্তচর, সি, আই, ডি!"

"ছাই বুঝেছ, পাস্তয়ারাম!" খুড়ো ধমকে উঠলো। লোকটা দারুণ দমে গেল, "পাস্তয়ারাম কে? আমার নাম সারেগামা, বাবার নাম পাধানিসা।"

খুড়ো বললে, "ঐ বাগান সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলবে কি?"

সারেগামা বললে, "তোমরা যখন গুপ্তচর বা সি, আই, ডি নও তখন নিশ্চয়ই বলবো। শোনো—"তোমরা তো ঐতিহাসিকের বাড়ীর জানলা দেখেছ! ঐ মেয়েদের বাগানগুলো ঠিক সেই কায়দায় তৈরী। দেয়াল দিয়ে সেগুলো আলাদা করা হয়নি। আসল কথা কি জানো, লোকেরা মুখ দিয়ে কথা কয় আর চোখ দিয়ে দেখে, তাই মেয়েরা দাঁড়ালে যেখানে তাদের মুখ আর চোখ পড়ে, সেই পর্যন্ত উঁচু করে বাদামের বরফির তক্তা এড়োভাবে মারা হয়েছে। তা ছাড়া মেয়েরা বসলে যেখানে তাদের মুখ আর চোখ পড়ে সেইখানগুলোতে বাদাম বরফির তক্তা আঁটা হয়েছে। এগুলো আগেকার তক্তা থেকে একটু নীচুতে বসানো।

লক্ষ্য কর, প্রত্যেক মেয়ের জন্যে চারটে করে তক্তা আড়াল করার ব্যবস্থা হয়েছে। যে যেমন ঢ্যাঙা বা বেঁটে তার তেমনি ব্যবস্থা। এত সব ব্যবস্থা আর সাবধানতা শুধু ওরা যাতে পরস্পর কথা কইতে না পারে সেই জন্যে। আমাদের এই সব ব্যবস্থার মূলে রয়েছে ঐতিহাসিকের নির্দেশ। এক সঙ্গে ছাত্ররা ছেলেদের রাখলে একজনের ভুল আর বদভ্যাস অন্যে চট করে শিখে নেয়। আশ্চর্য নগরে সে সব হতে পারে না। (ক্রমশঃ)

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কিন্তু খুব কাছেই সেই বুড়ো বটগাছ। নারায়ণ পাপিয়াকে বলেছে, রোজ অনেক রাতে ওই গাছের সব চেয়ে উঁচু ডালে ভয়ংকর এক রাক্ষস এসে বসে। ছোট ছেলেমেয়েদের একা পেলেই সে ধরে নিয়ে যায়—তাদের ঘাড় মটকে চুষে চুষে রক্ত খায়।

পাপিয়া কোয়েলীর হাত শক্ত করে ধরে বুড়ো বটের দিকে তাকাল। হঠাৎ গাছের ডাল খড়খড় করে উঠল! কাজেই একসঙ্গে অনেক শেয়াল ডেকে উঠল আর বড় রাস্তার ওপর আবছায়া কতগুলো মূর্তি খাটিয়া কাঁধে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি চলতে চলতে চিৎকার করে বলে উঠল, "বল হরি—হরি বোল!"

পাপিয়া কোন দিকে না তাকিয়ে কোয়েলীকে টানতে টানতে হুড়মুড় করে প্লেনের ভেতরে গিয়ে পড়ল। চারপাশে ইজিচেয়ারের মতন নিচু নিচু অনেক চেয়ার—লম্বা লম্বা বেলটও ঝুলছে। কোয়েলী দেখল, ঠিক যেন তাদের বসবার ঘরের মতন সাজান প্লেন—আলো জ্বলছে।

এইসব দেখে কোয়েলী আবার আগের মতন সাহসী হয়ে উঠল, হাততালি দিয়ে ডাকল, "রণু দাদা!"

কিন্তু কোয়েলীর ডাক শুনে সাড়া দিল না কেউ। ভীষণ শব্দ করে প্লেনটা চলতে শুরু করল। গাছ বাড়ি-ঘর সব সরে-সরে যাচ্ছে। আর অল্প পরেই পাপিয়ার মনে হ'ল ওরা যেন অনেক ওপরে উঠে গেছে। যে-মেঘ থাকে চাঁদের কাছে তা খেলা করতে ছুটে এল পাপিয়া আর কোয়েলীর সঙ্গে।

খুব ভাল প্লেন চালাচ্ছে রণু দাদা। মেঘেরা দল বেঁধেও প্লেনের মধ্যে ঢুকে পাপিয়া আর কোয়েলীর গায়ের ওপর পড়তে পারছে না। রণু দাদার প্লেন কখনো মেঘের ওপর দিয়ে, কখনো নিচ দিয়ে আর এক-একবার যেন লাফিয়ে তুলোর মতন হাল্কা মেঘ পার হয়ে যাচ্ছিল।

"পাপিয়া, কোয়েলী—" যেখানে বসে পাইলট প্লেন চালায় সেখান থেকে মোটা গলায় কে বলল, "পড়ে যাবে—শক্ত করে বেল্ট বেঁধে নাও, তারপর চেয়ারে ঠেস দিয়ে বস—"

ভয় পাবার মতন গলার স্বর। রণু দাদার গলা না। পাপিয়া কিংবা কোয়েলী বুঝতে পারল না কে কথা বলল। ওরা চেষ্টা করল, কিন্তু কেউই বেল্ট বেঁধে চেয়ারের সঙ্গে সেঁটে বসতে পারল না। ওদের হাত কেঁপে বেল্ট পড়ে পড়ে যাচ্ছিল।

এমন সময়, কোয়েলী প্রথম দেখল থপথপ করে ওদের ঠিক সামনেই এক থুড়থুড়ে বুড়ো এসে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে ঘড়ি নয়, কিন্তু ওই রকমই খুব বড় কালো একটা যন্ত্র—তা থেকে ঘড়ির মতন টিক-টিক শব্দ হচ্ছে। তাকে দেখে বুক কেঁপে উঠল পাপিয়ার, সে দু-হাতে চোখ চেপে মনে মনে ডেকে উঠল, "বাবা!"

বুড়ো কাউকে বকল না, ভয়ও দেখাল না—ভাঙা গলায় হো-হো করে হাসতে হাসতে বলল, "এই যে মেয়েরা—আমি তোমাদের বেল্ট বেঁধে দিতে এসেছি—"

কোয়েলী সাহস করে বলল, "কে তুমি?"

"চিনবে, চিনবে—বড় হলে আমাকে ঠিক চিনবে—"বুড়োর হাতে ঘড়ির মতন যে যন্ত্র ছিল খুব আস্তে আস্তে সে তা ঘুরিয়ে যাচ্ছিল, "আমি এই যন্ত্র ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সকলকে বড় করি, বুড়ো করি—"

পাপিয়া মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বুড়োর কথা শুনল। কোয়েলীর গোল-গোল চোখে অদ্ভুত একটা কৌতূহল থরথর করছিল। এখন যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে সে বুড়োকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল, "ওটা এদিকে না ঘুরিয়ে ওদিকে ঘোরালে কী হয়?"

"ওরে বাব্বা—" কোয়েলীর কথা শুনে বুড়ো যেন বেশ ঘাবড়ে গেল, "এটা উল্টো দিকে ঘোরালে যারা এই প্লেনের মধ্যে আছে তারা যেমনকার তেমন থাকবে, কিছু হবে না—"

পাপিয়া বাবার কথা ভাবতে-ভাবতে এত পরে জিজ্ঞেস করল, "যারা অন্য জায়গায় আছে তাদের কী হবে?"

বুড়ো আবার হাসল, "তাদের কী হবে?...তারা আবার ছোট্টটি হয়ে যাবে—এই এই এই, খুকী তুমি কী করলে!"

কোয়েলী ঘুরিয়ে দিয়েছে উল্টো দিকে যন্ত্র। প্লেন ঘুরপাক খাচ্ছে—এঞ্জিন থেকে হু-হু করে কালো ধোঁয়া বার হচ্ছে। এখুনি মাটিতে পড়ে প্লেন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় বুড়োকে আর দেখা গেল না।

পাপিয়া কেঁদে উঠল, "রণু দাদা!"

কেউ সাড়া দিল না। আশ্চর্য, কোয়েলী কিন্তু খুব হাসছিল।

ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় চোখে জল এসে গিয়েছিল পাপিয়া আর কোয়েলীর, হুড়মুড় করে এ ওর ঘাড়ের ওপর পড়ছিল। দু'জনেই ধরে নিয়েছিল যে ওরা আর বাঁচবে না। প্লেনের বিকট শব্দে ঝাপসা চোখে ওরা দেখছিল রাতের আকাশ আগুনের হলকায় লাল হয়ে উঠেছে আর যেন ভয় পেয়ে এক-একটি জলজলে তারা ফুলের মতন টুপটাপ ঝরে পড়ছে।

হঠাৎ একটা থালার মতন হয়ে এক ঝলক আগুন কোয়েলীর কান ঘেঁষে বোঁ করে ওপরের দিকে ছুটে গেল আর ঠিক তখন সব আওয়াজ থেমে গেল। মাটির মতন কী ঠেকল কোয়েলীর পায়ে। আগুনের সে থালা অল্প আগে ছুটে গিয়েছিল, এখন তা আকাশে সেঁটে আছে।

কোয়েলী খুশীতে চিৎকার করে উঠল, "পুপু দিদি, সূর্য!"

পাপিয়া এতক্ষণ ঠোঁটে ঠোঁট চেপে কোন রকমে কান্না ঠেকিয়ে রেখেছিল, তার শুধুই মনে হচ্ছিল, বাবাকে সে আর দেখতে পাবে না—কেন সে অত রাতে চুপে চুপে বেরিয়ে এল পুলিশ মাঠে রণু দাদার সঙ্গে! এসব কথা ভাবতে ভাবতে কোয়েলীর কথা শুনে পাপিয়া মাথা তুলে আকাশ দেখল।

কোথায় প্লেন! কোথায় রণু দাদা! তাদের সামনে বড় কোন মাঠও নেই। সবে ভোর হয়েছে। বাতাস ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা, ঝির-ঝির করে বয়ে যাচ্ছে। মাথার ওপর দিয়ে অনেক সুন্দর পাখির ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে—এক সঙ্গে এত পাখি কখনো দেখেনি পাপিয়া।

ওরা যেখানে দাঁড়িয়েছিল তার সামনেই খুব বড় একটা দীঘি, হাওয়ায় সবুজ জল টলোমলো করছে। পানকৌড়ি উঁকি মারছে থেকে-থেকে। আর কত পদ্মফুল ফুটে আছে দীঘিতে! এক-একটা ভাল করে ফোটেনি, এখনো আধ-ফোটা। মাটির গন্ধও বড় মিষ্টি। এখানে দাঁড়িয়ে পাপিয়ার চোখের জল একেবারে শুকিয়ে গেল।

কিন্তু ওরা কোথায় এসে পড়ল! কোন মানুষ নেই কাছাকাছি। রাস্তায় লাল সুরকি ঢালা। এদিকে-ওদিকে অনেক গাছ। ফুলের গন্ধ আসছে। বাড়িও দেখা যাচ্ছে অনেক। এমন বাড়ি কলকাতায় একটাও নেই। পাপিয়া অনেক সময় নিয়ে সব দেখল। পরে কয়েক পা এগিয়ে গেল।

চারটে ঘাঠ আছে দীঘির। চারপাশ পাঁচিল ঘেরা। দীঘির কাছে জমি অনেকটা ঢালু। প্রত্যেক ঘাঠেই সিঁড়ি আছে। পাপিয়ার ইচ্ছে হ'ল সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে জলের খুব কাছে গিয়ে টাটকা একটা পদ্মফুল ছিঁড়ে আনতে।

"কোয়েলী।" পাপিয়া কোয়েলীর কাঁধে আস্তে হাত রেখে বলল, "একটা পানকৌড়ি ধরে আনি চল?"

কোয়েলী পাপিয়ার কথা বুঝল না। পানকৌড়ি কী সে তা জানে না। সারা রাত ঘুম হয়নি বলে এখন ওর কান্না পাচ্ছিল, খিদেও পেয়েছিল খুব। ছোট একটা হাই তুলে কোয়েলী বায়না করার মতন বলল, "আমার ঘুম পেয়েছে—খিদে পেয়েছে।"

পদ্মদীঘির জলে ভিজে ভোরের হাওয়া আরও ঠাণ্ডা হয়ে পাপিয়ার চুল ছুঁয়ে যাচ্ছিল, সে কয়েক মুহূর্তের জন্যে চোখ বন্ধ করে বাতাসের ঘ্রাণ নিতে নিতে বলল, "কলকাতা অনেক দূর। রণু দাদার প্লেন পুড়ে গেছে। আমরা আর বাড়ি ফিরে যেতে পারব না—"

এর পরে কোয়েলী ফুঁপিয়ে কাঁদল, "মা, ওমা!"

পাপিয়া তার কান্না শুনে তাকে ভোলবার চেষ্টা করতে করতে বলল, "ওই যে কোয়েলী দেখ, ওই বাড়িটা কী সুন্দর!"

দীঘির যে দিকে ওরা দাঁড়িয়েছিল সেদিকে নয়, অন্য দিকে একটা খুব লম্বা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল, দু-তিনটে গেট, সাদা-সাদা রেলিং আর সুন্দর একটা বাগানও আছে। সেখানে অনেক আম গাছ, লিচু গাছ। দূরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পাপিয়া আর কোয়েলী দেখল বড় বড় গাছ ভরে গেছে আম আর লিচুতে। লিচু গাছের মাথা জলে দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে।

এসব দেখে কোয়েলী কান্না থামিয়ে বলল, "ওটা কাদের বাড়ি পুপু দিদি?"

পাপিয়া কোয়েলীর হাত ধরে কয়েক পা এগিয়ে যেতে যেতে বলল, "চল আমরা গেট খুলে ভেতরে যাব—"

"যদি কেউ বকে?"

"তাহলে বাবাকে বলে দেব—" এতটা বলেই পাপিয়ার চোখ হঠাৎ ছলছল করে উঠল। কোথায় বাবা! কত দূরে! আবার কবে সে বাবাকে দেখতে পাবে! আস্তে আস্তে পা ফেলে ওরা দু'জন সেই সুন্দর সাদা-সাদা রেলিঙ-ঘেরা লম্বা বাড়িটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

পুলিশের মতন একটা খুব মোটা লোক বুট জুতোর খটখট শব্দ করতে করতে থপথপ করে এদিকেই আসছিল, ওকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে মুখ শুকিয়ে গেল পাপিয়ার—কোয়েলীর হাত শক্ত করে চেপে ধরে সে ফিসফিস করে উঠল, "পুলিশ আমাদের ধরতে আসছে, কী হবে!"

(ক্রমশঃ)

মেঠুড়ে

ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্ট ম্যাচে খুব সহজেই ইংলণ্ডকে ১৫৯ রানে হারিয়ে দেয়। যোগ্য দল হিসেবে অস্ট্রেলিয়া যে জয়ী হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ইংলণ্ড এই ম্যাচে হারার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে নি।

ইংলণ্ড সফরে প্রথম দিন থেকে অস্ট্রেলিয়া দলকে বৃষ্টির মধ্যে খেলতে হয়। অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়রা জলবৃষ্টির মাঠে খেলতে মোটেই অভ্যস্ত নন, কিন্তু তা সত্বেও ভিন্ন দেশে বিপরীত আবহাওয়ায় তাঁরা সম্পূর্ণ মানিয়ে নিয়ে খেলেছেন। তরুণ খেলোয়াড় ডগলাস ওয়ালটারস্, পল সিহান, আয়ান চ্যাপেল অস্ট্রেলিয়া দলকে প্রথম ইনিংসে চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। গতবার ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে দুটো টেস্টেই ওয়ালটারস সেঞ্চুরি করেছিলেন। এবার কিন্তু দুবারই আটের কোঠায় রান করে আউট হন। চ্যাপেল রান আউট হওয়ায় সিহান প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরি করার সুযোগ হারান। চ্যাপেল ভালো খেলে ৭০ রান করে আউট হন। চ্যাপেল আউট হবার পর সিহান আর আগের মতন খেলতে পারেন নি।

ইংলণ্ড দলের এমিসের কাউগে খেলায় খুব নামডাক আছে, কিন্তু তিনি টেস্টে দু ইনিংসেই শূন্য রানে বিদায় নেন।

প্রথম টেস্ট ম্যাচ ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী দ্বিতীয় টেস্ট লর্ডস মাঠে হবে এবং ইংলণ্ড দলের হয়ে প্রথম টেস্টে যে-সব খেলোয়াড়রা খেলেছেন তাঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ কেউ দ্বিতীয় টেস্টে বাদ পড়বেন।

হকি

হকি লীগের অপরাজিত রানার্স মোহনবাগান পূর্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ হকি প্রতিযোগিতা 'বেটন' জয় করেছে। বাইরের যে নটা দল নিয়ে বেটনের খেলার তালিকা তৈরি হয়েছিল তাদের ভেতর বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (প্রাক্তন পাঞ্জাব পুলিশ), কোর অব সিগন্যাল,

ভিলাই স্টীল, সেন্ট্রাল রেল, মহীশূর একাদশের বেশ নামডাক ছিল। কিন্তু একমাত্র ভিলাই স্টীল ছাড়া বাইরের কোনো দলই সেমিফাইন্যাল পর্যন্ত উঠতে পারে নি। গতবারের বেটন রানার্স ভিলাই দলও সেমিফাইন্যালে অতি সহজে মোহনবাগানের কাছে হার স্বীকার করে। অলিম্পিকে খেলেছেন এমন কয়েকজন খেলোয়াড় নিয়ে গড়া বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সও তাদের খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে না পারলেও গোল্ড কাপ জয়ের গৌরবের পর বেটনের কোয়ার্টার ফাইন্যালে বি. এন. রেল দলের কাছে তাদের পরাজয় খুবই অপ্রত্যাশিত। বি. এন. আর সেমি ফাইন্যালেও ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ভালো খেলে বিজয়ী হতে পারে নি। আর ফাইন্যালে মোহনবাগানের সঙ্গে তো একেবারেই ভালো খেলতে পারে নি। খেলার ধারা অনুযায়ী মোহনবাগানের বেশী গোলেই ফাইন্যালে জেতা উচিত ছিল, কিন্তু পুরোভাগের খেলোয়াড়দের সুযোগ কাজে লাগাবার ব্যর্থতায় মোহনবাগান একটার বেশী গোল করতে পারে নি।

বি. এন. আর ও ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে তুলনায় বেটনে মোহনবাগানের প্রতিটা খেলায় সামঞ্জস্যপূর্ণ আত্মবিশ্বাসী প্রতিযোগিতা, প্রতিটা খেলায় প্রতিপক্ষ নৈপুণ্য ও গতিবেগে পরাভূত। তাই তাদের বেটন জয় যোগ্যের যোগ্য পুরস্কার। দুবার যুগ্মজয়ের হিসেব ধরে এবার নিয়ে ছ'বার মোহনবাগান বেটন কাপ লাভ করল।

মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিংকে নিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকা শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত ত্রি-দলীয় ফুটবল লীগে মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। প্রথম খেলায় ইস্টবেঙ্গল ১—০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়ে দেয়। মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং-এর দ্বিতীয় খেলাটা ২—২ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। শেষ খেলায় ইস্টবেঙ্গলকে ২—০ গোলে হারিয়ে মোহনবাগান চ্যাম্পিয়নশিপের সম্মান লাভ করে। লীগ টেবলে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং যথাক্রমে পায় ৩, ২ ও ১ পয়েন্ট। চ্যাম্পিয়ন দলের (মোহনবাগান) সঙ্গে আই. এফ. এ. একাদশের অতিরিক্ত খেলাতেও মোহনবাগান ১—০ গোলে জয়ী হয়।
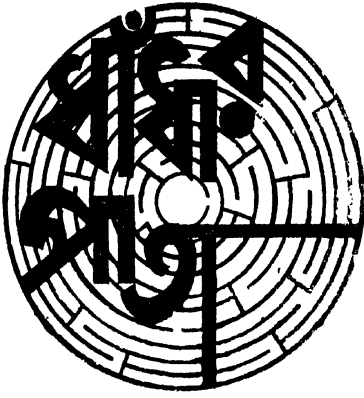
বাজিকর
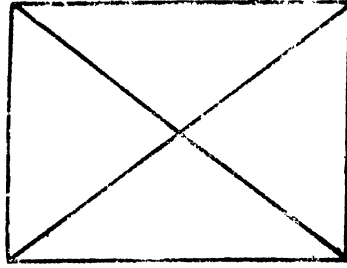
১। উপরের এই আয়ত ক্ষেত্রের মধ্যে দুটি কর্ণ পরস্পর ছেদ করেছে। এটির লাইনগুলি ধরে ইংরেজীতে কোন্ কোন্ সংখ্যা লেখা যায় চেষ্টা করে দেখ।

২। পাশে প্রায় একই রকম দেখতে দুটি ছবি আছে উপর নীচে। কিন্তু দুটি ছবির মধ্যে কিছু কিছু অমিল আছে। সেই অমিলগুলি কোথায় বার করতে পারো ?

গতমাসের ধাঁধার উত্তর

১। জোড়-বিজোড়—যেগুলির জোড় আছে সেগুলি সহজেই তোমরা বার করতে পারবে কাজেই যেগুলির জোড় নেই সেগুলির কথাই শুধু এখানে বলি: বৃত্তের মধ্যে চতুর্ভুজ, একটা ত্রিভুজ, একটা আয়তনের মধ্যে দুটো গোল চিহ্ন, চতুর্ভুজের মধ্যে স্প্রিং, বোল্টু, বৃত্তের মধ্যে স্প্রিং, লাটাই, ছোট কালো ফোঁটা, কালো বৃত্তের মধ্যে সাদা ফোঁটা, কালো ছোট ফিতে, তিনটি বড় থেকে ছোট সরল রেখা, একটি কালো মোটা লাইন, একটি ছোট কাল মোটা
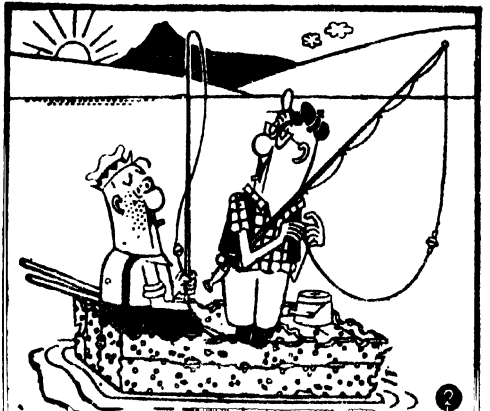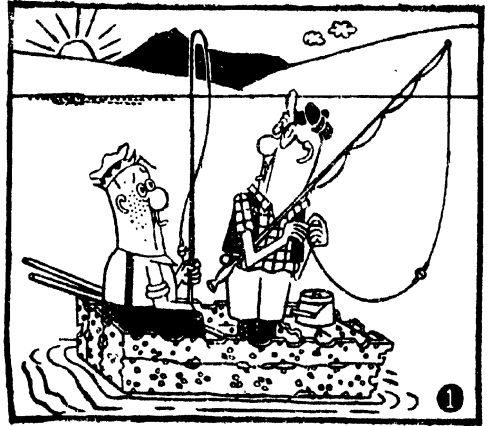
উদ্যোগে কি না হয়! এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হলেন 'হেলেন কেলার'। এ নাম তোমরা নিশ্চয় শুনেছ? ছবিও দেখেছ! মেয়েটি যখন জন্মগ্রহণ করলো তখন সুস্থ, সুন্দর, বলিষ্ঠ শিশু—কিন্তু জন্মের উনিশ মাস পরেই তার সুন্দর চোখ দু'টি নষ্ট হয়ে গেল। প্রকৃতির সৌন্দর্যভাণ্ডার সব যাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল—তারই চোখে নেমে এলো গভীর কালো অন্ধকার। মা বাবা সকলেই নিদারুণ দুঃখে ভেঙে পড়লেন। হেলেন কেলারও প্রথম দুঃখের ধাক্কা কাটিয়ে উঠে মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হলেন।

তোমরা জানো অন্ধদের লেখাপড়া শেখার পদ্ধতির মূলে ছিলেন শ্রীমতী হেলেন কেলার। অন্ধ হয়ে যাবার পর তিনি নিজের চেষ্টায় বিশেষ শিক্ষিতা হয়েছিলেন এবং তাঁর অধ্যবসায়ের জন্য অন্ধ হয়েও মানুষের জীবন আজ ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে না। লেখাপড়া শিখে কৃতবিদ্য হয়ে উঠছেন। অন্ধজনে তিনিই আলোর পথ দেখিয়েছেন। সমস্ত জগতের শ্রদ্ধেয়া এই মহীয়সী মহিলা সাতাশি বছর বয়সে গত ২রা জুন (১৯৬৮) পরলোক-গমন করেছেন।

তোমরা পড়বে—

যে কাজই কর, তোমার গুণে তাহা হইল, কখনও তা মনে করিবে না। করিলে পুণ্যকর্ম অকর্মত্ব প্রাপ্ত হয়।···

এখন বলো দেখি মা, তোমার এই ধনরাশি লইয়া তুমি কি করিবে?

প্রশ্ন করছিলেন ভবানী পাঠক।

জবাব দিলেন প্রফুল্ল :

যখন আমার সকল কর্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম তখন আমার এ ধনও শ্রীকৃষ্ণে অর্পন করিলাম।

—সব?

—সব!

ভবানী পাঠক আরো জানতে চেয়েছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে এ ধন পৌঁছিবে কি প্রকারে?

উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন প্রফুল্ল, শিখিয়াছি, তিনি সর্বভূতাস্থিত, অতএব সর্বভূতে এ ধন বিতরণ করিব।

প্রফুল্লর জবাব শুনে খুসী হয়েছিলেন ভবানী পাঠক। পাঁচ বছর ধরে প্রফুল্লর জন্য যে শিক্ষা ও সংযম অভ্যাসের ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন তা সার্থক হতে দেখে খুসীতে তৃপ্তিতে ভরে উঠেছিল তার মন। অনেক কথাই তিনি সেদিন বলেছিলেন। তখনকার যুগের কথা। দেশে তখন ঘোর অরাজকতা, মোগল মহিমার তখন শ্মশানশয্যা। ইংরাজ বনিকের মানদণ্ড তখনও রাজদণ্ডে পরিণত হয়নি। দেশের শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে— দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন কোনোটাই সম্ভব হচ্ছিল না—সুযোগ পেয়ে স্বার্থান্বেষীর দল সেদিন দেশের ভালোমন্দের কথা একটুও না ভেবে শুধু নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির চষ্টায় মেতে উঠেছিল—প্রবল সেদিন শুরু করেছিল দুর্বলের ওপর অন্যায় অত্যাচার—সে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের পথ বা উপায় ছিল না কারুর। রাজকর্মচারীদের অত্যাচারের সীমা ছিল না, সেদিন যারা রক্ষক নির্লজ্জভাবে তারাই ভক্ষক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অত্যাচারের বীভৎসতা সে যুগে কতখানি মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল তা বোঝাবার জন্য ভবানী পাঠক বলেছিলেন :—

কাছারীর কর্মচারীরা বাকীদারদের বাড়ী লুঠ করে, লুকান ধনের তল্লাসে ঘর ভাঙ্গিয়া মেঝে খুঁড়িয়া দেখে, পাইলে একগুণের জায়গায় সহস্রগুণ লইয়া যায়, না পাইলে মারে, বাঁধে, কয়েদ করে, পোড়ায়, কুড়ুল মারে, ঘর জ্বালাইয়া দেয়, প্রাণবধ করে।”

আরো কত দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন ভবানী ঠাকুর। কিন্তু শুধু অত্যাচারের কাহিনী বলেই কর্তব্য শেষ করেননি তিনি। তিনি বলেছিলেন : এই দুরাত্মা দিগকে আমিই দণ্ড দিই! অনাথ দুর্বলকে রক্ষা করি, কি প্রকারে করি তাহা তুমি দুই দিন সঙ্গে থাকিয়া দেখিবে?

প্রফুল্ল খুসী মনে রাজী হলেন।—কর্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছি। কর্ম তাঁহার— আমার নহে। কর্মোদ্ধারের জন্য যে সুখ দুঃখ, তাহা আমার নহে, তাঁরই। তাঁর কর্মের যাহা করিতে হয় করিব।

ভবানী পাঠক, প্রফুল্ল (তাঁর পরিচয় এবার দেবী চৌধুরাণী বলে) আর তাদের অনুচরেরা সেদিন কী ভাবে দেশের দুর্দশা দূর করার জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন, অত্যা-চারের স্পর্ধা কি ভাবে তাদের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিল তার কাহিনী অমর লেখনী দিয়ে লিখে রেখে গেছেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ‘দেবী চৌধুরাণী’ উপন্যাসে। বড়

হলে এই বই তোমরা পড়বে। কিন্তু আজ এইটুকু জেনে রাখো যে, তাঁরা দেশের কাজ আর ভগবানের কাজ, মানুষের সেবা আর ঈশ্বরের আরাধনার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে করতেন না। আদর্শ আর সেবাধর্মের কাছে তাঁরা সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিয়েছিলেন ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ আর লাভ-ক্ষতির হিসাবনিকাশ।

শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়, ধানবাদ : তোমাদের চিঠিতে উত্তর দেবার যদি বিশেষ কিছু না থাকে—কি উত্তর দেবো বল ?

চন্দ্রাবতী মণ্ডল, বাদুরিয়া : মৌচাকের সব কিছুই ভাল লাগে ? বেশ তো।

নবনীতা দে, দমদম ; পাপড়ী ঘোষ, কোলকাতা ; হীরক ও মোহর চক্রবর্তী, অনীতা পত্রনবীশ, মালবিকা চক্রবর্তী, বেলগাছিয়া ; মিষ্টু ঘটক, কোলকাতা।

অদিতি ও অর্ণব রায়, সুখচর ; নিমি দত্ত, যাদবপুর ; জ্যোৎস্না দাস, কোলকাতা—তোমাদের সকলের চিঠি পেয়েছি।

তোমাদের

মধুদি'

শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক :: শ্রীসুপ্রিয় সরকার মূল্য : ০·৫০ পয়সা

মন্দিরময় দিল্লী

বুদ্ধ মন্দির

কালী মন্দির

বিড়লা মন্দির

আলোকচিত্র : শ্রীঅরুণ সেনগুপ্ত
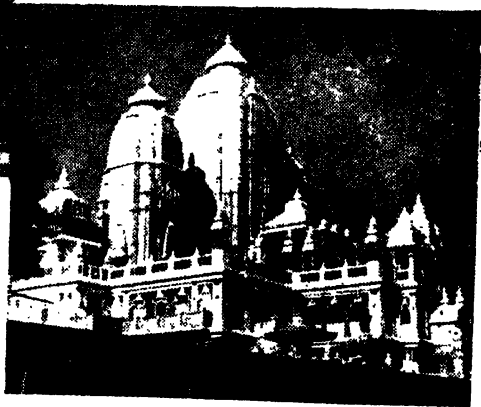
❋ ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র ❋

৪৯শ বর্ষ] শ্রাবণ : ১৩৭৫ [৪র্থ সংখ্যা

রাজা ও ভিখারী

শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস

কুখ্যাত এক দস্যু-নায়ক
 নির্ভীক থ্রেসিয়ান,—
ম্যাসিডনটাকে করছিল যেন
 লুণ্ঠনে খান্‌খান্‌।
সেকেন্দারের হুকুমে সেদিন
 আঁটিয়া অনেক ফন্দী,—
সান্ত্রীরা তারে করিল হাজির
 শৃঙ্খলে বাঁধা বন্দী।
বন্দীরে হেরি' ম্যাসিডন-পতি
 হলেন ভীষণ ক্ষিপ্ত,
কহিলেন, "কেন হয়েছিস্‌ হেন,
 সামাজিক পাপে লিপ্ত ?"
শুনি' থ্রেসিয়ান হাসিয়া কহিল,—
 "এই তো বিশ্বে চলছে।
আমি তো দস্যু। লুণ্ঠন করি
 একটু সীমিত ক্ষেত্রে ;

কিন্তু তোমার অমিত লালসা
দিগ্বিজয়ের নেত্রে।
কেড়েছ কত না রাজার রাজ্য,
শ্মশান করেছ দেশ ;
বাহুতে তোমার অজেয় শক্তি,
হৃদয়ে ভিখারী বেশ !
তবু কেন মোরে বলো নির্মম,
নগণ্য তস্কর !—
একই মানুষের দ্বৈত-সত্তা,—
দীন ও রাজেশ্বর।
আত্ম-তুষ্টি বাদশা স্বয়ং
লোভ সে তো ভিক্ষুক,—
তুমি তাই এত কাঙালের মত
দেশ জয়ে উৎসুক।
অথচ দেখনা নিঃস্ব ভিখারী
পণ্ডিত ডায়োজিনিস,
আপন রাজ্যে সম্রাট সে যে
করে না কাউকে কুর্নিশ।
অথবা শুনেছি বুনো রামনাথ
তিন্তিড়ী-ব্যঞ্জনে,—
আছিলেন সুখে আত্ম-তুষ্ট
একান্ত অনটনে।
শুনেছি একদা শ্রাবস্তীপুরের
ভিক্ষুনী সুপ্রিয়া,
রুখিয়া ছিল সে মম্বন্তরে
ভিক্ষার ঝুলি নিয়া।
সে তেজ প্রেরণা আছে কি তোমার
মানব সেবার ধর্মে ?
তোমাতে আমাতে তফাত যা' কিছু
মাত্রার তারতম্যে।

অচিনপুরে খোকন

শ্রীসুমিতচন্দ্র মজুমদার

মা, মাগো, আমি কি আর ভালো হব না?

কেন হবে না বাবা, নিশ্চয়ই হবে।

কবে হব মা? দাদা তো আর আগের মত আমাকে আদর করে না! বলে না, 'ভাইটি আমার সোনা।' দিদিভাইও কি আমাকে আর ভালবাসে না। কই, 'বাপী' বলে ডাকে না তো আর।

ভালবাসে তোমায় সোনা সকলেই। তোমার বাবা, আমি, পিসীমণি, দাদা, দিদি সবাই। তোমাকে ভাল না বেসে থাকা যায়।

তবে যে আমার কাছে আসে না?

তুমি অসুস্থ। ডাক্তারবাবু বারণ করেছেন তোমাকে বেশী কথা না বলতে। তুমি তো জানো না—যখন তুমি ঘুমিয়ে পড়ো সবাই তোমার ওই বিছানার চারপাশে ঘিরে বসে। তোমায় আদর করে।

সব্বাই! যেমন করে চাঁদকে ঘিরে তারারা আদর করে?

হাঁ, সবাই। ঠিক তেমনি করে।

বাবা, পিসীমণি, তুমি—সকলে?

হাঁ বাপী। তুমি একটু শোও এবার চুপটি করে।

এখনও কত দেরি মা, বাবা আসতে।

অনেক দেরি।

তাই তো! আমি কি বোকা হয়ে গেছি মা। ভুলেই গিয়েছিলাম, আগে তো দাদাভাই, দিদিভাই আসবে, তারপর পিসীমণি কলেজ থেকে। বাবা একেবারে শেষে।

হাঁ লক্ষ্মী, এবার চুপটি করে শোও। তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠলে আবার স্কুলে যাবে। আবার ওড়াবে ঘুড়ি। পিসীমণির হাত ধরে বিকেলে যাবে পার্কে, খেলবে মিলন দিলীপদের সঙ্গে।

ওরা আমাকে দেখতে আসে না মা?

হাঁ, ওরা যে তোমাকে ভীষণ ভালবাসে।

তুমি কিন্তু বাবাকে একদম ভালবাস না।

কেন সোনা?

কেবল বকো।

তোমার বাবাকে বকতে দেখলে কোথায় ?

আমি যেন শুনিনি। সেই যে বলছিলে বাবাকে, 'এই ক'টা টাকা আনো, খুকু যদি চাকরি না করতো তবে সুখের মুখও দেখতাম না।' আচ্ছা মা, সুখ কি ?

বড়ো হও, বুঝবে।

আর কবে বড়ো হব। অন্ততঃ দাদার মতন। কে জানে কবে। মা গো, তোমার ওই সুখ আমার নেই। তাই তো অসুখ। তাই তো এত কষ্ট!

ভারী পাকা হয়েছ তুমি। এবার শোও। আমি সংসারের কাজ করি। তুমি ঘুমোবার চেষ্টা করো।

তুমি হাসছ মা ? আমাকে দাদা বলে, 'পাকা'। পিসীমণিও। সবাই বলে পাকা। কিন্তু পাকলে সবাই লাল রঙ-এর হয়ে যায়। সেই যে টুকটুকে লাল আম। সবাই বলে, 'কি পেকেছে আমটা' কিন্তু আমি যদি পাকাই হই, তবে এত কালো হয়ে যাচ্ছি কেন মা ?

কে বললে তোমায় ? তুমি আমার সেই লাল খোকনটিই আছ !

তুমি আমায় ঠিক বলছো না মা। তোমরা ভাবলে আমি ঘুমোচ্ছি। কিন্তু মোটেই ঘুমোই নি। পিসীমণি বললে তোমায়, 'দেখছো বৌদি, খোকনের সারা দেহে কে যেন কালী ঢেলে দিয়েছে।' আমি চুপ করে শুয়েছিলাম। তারপর পিসীমণি আমার কপালে এসে চুমু খেলে। আচ্ছা মা, আমি যে ক'দিন আগে পড়েছি, না বলে কারুর জিনিস নিলে তাকে চুরি করা বলে। আমি যে না বলে তোমাদের কথা শুনেছি। চুরি করলে পাপ হয়—আমার কি হবে মা!

কিচ্ছু হবে না বাবা, তুমি শোও।

তোমাদের কিন্তু সবারই পাপ হবে।

কেন বাপী ?

তোমরা সবাই বার বার বলো আমি ভালো হয়ে যাব। কিন্তু জানি ভালো হব না। আমি শুনেছিও, আমার অসুখ সারবে না কোনদিন।—মা, তুমি চলে যাচ্ছ কেন ?

যাইনি বাবা, আমি তোমার কাছেই আছি।

মা, তুমি কাঁদছ ? আমি অন্যায় করেছি না মা, তোমাদের কথা না বলে শুনে।

কাঁদছি কোথায় ? চোখে ধূলো পড়েছে যে।

টেবিলের কোণে ওই ধূলোর মধ্যে আমার অনেক খেলনা আছে। এনে দেবে মা ?

দেব বই কি বাবা। এই নাও তোমার খরগোশ—এই যে তোমার জেব্রা, এই বাঘটা আর এই সেই পরীটা।

আচ্ছা মা, এবার তুমি কাজে যাও। কিন্তু আমায় বললে না তো সেই কথাটা!

কোন কথাটা?

বাবাকে বকবে না তো।

না বাবা, বকবো না। কিন্তু তুমি লক্ষ্মী ছেলের মতো শুয়ে পড়ো।

ও কি খরগোশ ভাই, আমার পায়ে পড়ছো কেন?

বাঁচাও খোকন, বাঁচাও।

কি হ'ল তোমার?

কি আবার হবে! ওই যে তোমার ডোরা-কাটা বাঘ, সারা গায়ে নীল নীল দাগ; দিন রাত বলে খাবো খাবো; বলতো কোথায় আমি যাবো।

কাকে?

কাকে আবার, আমাকে! দিনরাত্তির জিভ দিয়ে জল ঝরছে, দৃষ্টি শুধু আমার দিকেই পড়েছে। ছোট্ট আমি সাদা রঙের খরগোশ, করিনি ভাই কোনোরকম ছোটো দোষ।

ঠিক বলছো তুমি? কিন্তু তুমি যদি দোষ না করো তবে ও তোমাকে ভয় দেখাবে কেন?

ছোট্ট তুমি ফুলের মতন ভাইটি, দেখতে না পাও কারো দোষ তাই কি? মোর গায়েতে নেইকো জোর, এই তো আমার দোষ। তার জন্যেই বাঘ মশাই-এর আমার উপর রোষ।

কিন্তু জেব্রা ভাই?

জেব্রা ভাই! ওকে তুমি বলো 'ভাই', নিন্দুক একটি। সবার নামের শেষে যোগ দেন চিমটি। বাঘকে বলেন কেবল, 'তুমি দাদা ভালো, তুমি ছাড়া এ জগতে আর সবই কালো।' আমি যে পারি না বলতে জেব্রার মতন বানিয়ে বানিয়ে কথা। পারি না বাঘের সব কথায় সায় দিতে। তাইতো আমায় সব সময় কেবলই ভয় দেখায়—আর আমি চুপচাপ থাকি। একলা—কেবল একলা।

আচ্ছা আমি বকে দেব ভীষণ। কিন্তু তুমি একা থাকো কেন খরগোশ ভাই?

কি করব ভাইটি আমার। আমার যে কোনোও বন্ধু নেই।

আমার কাছে আসবে। আমার সঙ্গে গল্প করবে।

তুমি কি আমার সঙ্গে গল্প করবে? তোমার ভালো লাগবে?

নিশ্চয়ই খরগোশ ভাই! আমার অসুখ করেছে। তাই তো দিনরাত আমিও তোমার মতো একলা। আচ্ছা ভাই, তুমি আমার নাম জানলে কি করে?

আমাকে যে তোমার দাদা কিনে এনেছিল। তোমার হাতে দিয়ে বলেছিলে, 'নে ভাইটি, তোর জন্যে কিনে এনেছি।'

জানো খরগোশ ভাই, দাদাভাই আমায় আর ভালবাসে না। আমায় না হলে দাদাভাই ঘুড়ি ওড়াত না। এখন আমায় ঘুড়ি কিনে এনে দেখায়ও না।

না ভাইটি, তোমার দাদা ওড়ায়-ই না আর ঘুড়ি। ছাদের ঘরে যেখানে থাকতো লাটাই—সেখানেই পড়ে আছে। তোমার অসুখের পরে দাদা ছোঁয়ও না। ধুলোয় পড়ে আছে তারা সেদিন থেকে। কিন্তু ভাইটি, আমাকে তোমার ভাল লাগবে তো?

কি বলছো তুমি খরগোশ ভাই! পিসীমণির হাতে আছে আংটি। সেই আংটির পাথরের মতো তোমার চোখ দুটি। আর ছোটোবেলায়, আমি তো এখন অনেক বড়ো হয়ে গেছি, সেই ছোটোবেলায় গল্প শুনেছি ঠাকুমার কাছে। রাজপুত্তুর যেত রাজকন্যার কাছে; দুধ সাগর পেরিয়ে, হিম পাহাড় ডিঙিয়ে। তোমার গাটা ওই দুধ সাগরের মতো, হিম পাহাড়ের মতো। আর সন্ধ্যেবেলায় সূর্যিমামা যখন বাড়ী ফিরে যায়—তখন আকাশ তোমার ওই চোখের মতন হয়। তোমাকে ভালো লাগবে না।

ভাইটি তুমি ভালো, বড়ো ভালো। সবাইকে কত ভালবাস।

আমি সব্বাইকে ভালবাসি। সেই জন্যেই ঝগড়া আমি ভালবাসি না। ববাকে মা বকে, মাকে বাবা। আমার কি ভীষণ কষ্ট হয় কি বলবো। একদিন একটা বই পড়া নিয়ে দাদাভাই আর দিদিতে ঝগড়া। আর দিদিটা এমন পাজী না, দাদাভাইয়ের হাত খিমচে দিলে। মাথা ঠুকে হ'ল আলুর মতন। সারাদিন কি বিশ্রী। সেই যেমন এক-একদিন সারা দিন সারা রাত ধরে বৃষ্টি—সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়; সেই রকম। আর সেই জন্যেই তো আমার অসুখ। সেই জন্যেই!

সেই জন্যে।

হাঁ গো। যখন ঝগড়া হয়, মনে হয়, পালিয়ে যাই অনেক দূরে। ঠাকুমা সেই গল্প বলত, সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে, দুধ সাগর আর হিম পাহাড় ডিঙিয়ে, রাজপুত্তুর চলেছে কোন অচিন গাঁয়, সেখানে তো ঝগড়া-ঝাঁটি কিচ্ছু নেই। আমারও সেই অচিন গাঁয়ে যেতে ইচ্ছে করে। আচ্ছা খরগোশ ভাই 'অচিন' মানে কি? জানো তুমি?

জানি না ভাইটি। ওই লাল পরী জানে বোধ হয়।

আমার ঠাকুমাও বোধ হয় ওই অচিন গাঁয়ে গেছে। সবাই বলে মারা গেছে। আমি জানি, পালিয়ে গেছে। পাশের বাড়ীর সন্তুর বাবা ভারি দুষ্টু। সন্তুর মাকে মারতো। আর এক-একদিন ওই যে দূরের রাস্তার কলটা—ওখানে কি ঝগড়া!

'বলতে পারো কতদূরে অচিনপুর ধাম ?' পৃঃ—১৬০

ঠাকুমা বলতো, আর পরি না বাপু। ঘেন্না ধরে গেল। মনে হয় পালিয়ে বাঁচি।

আচ্ছা, এখন আমি চলি ভাইটি ওই যে বাঘ আসছে। আমার কথা বলতে ভুলো না যেন ওকে।

কি কথা হচ্ছিল তোমাদের ?

এসো বাঘ দাদা, এসো এসো।

শোনো খোকন—তুমি অতি বাচ্চা, মোর কথা জেনো রেখো সাচ্চা। অতি পাজি ওই বোকা খরগোশ, গুণ নেই কোনো ওর, সবই দোষ।

কিন্তু ও যে বললে—

এতদিন জানতাম তোমার মাথায় আছে বুদ্ধি; শেষ পর্যন্ত এও শুনতে হ'ল, রামঃ রামঃ—ছি ছি! দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথায় বিশ্বাস কেউ করে—বেশী বিশ্বাস করে যারা শেষটা তারাই মরে।

তবে তুমি ওকে ভয় দেখাও না ?

রাম রাম, ভয় দেখাবো না! আমি যে ওর চেয়ে অনেক বেশি বড়ো, দেখো না জেব্রা কেমন ভয়েই জড়োসড়ো। সেদিনের ওই পুঁচকে ছোঁড়া, ভয় নেইকো প্রাণে; কথা আমার শোনে না যে—লাগে না মোর প্রাণে।

কিন্তু তুমি যদি একটু বুঝিয়ে বলো—নিশ্চয়ই শুনবে। তুমি ওর বড়ো—কেন শুনবে না ? আমি কি বাবার কথা শুনি না—শুনি না মায়ের কথা। তুমি ওকে ভালবাসো।

ভালবাসবো ?

হাঁ, দেখবে ও তোমার কথা নিশ্চয়ই শুনবে। বাবা বলে, বাপি তোর অসুখ। বাইরে যাস না। আমি কি যাই। যাই না—এই ঘরেই থাকি সারাদিন। আর অনেক

রাতে, যখন ঘুম ভেঙে যায়—দেখি মা আমায় জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে। আর আমার তখনই মনে হয়, মায়ের কাছ থেকে ওই যে তারারা—ওদের মাঝে পালিয়ে যাই—কেউ যাতে আমাকে খুঁজে না পায়।

খোকন, তুমি কাঁদছ।

কাঁদব না বাঘ দাদা। মানুষরাও দুষ্টুমি করে। তোমাদের সঙ্গে খেলতে এলাম, দেখি তোমরাও ঝগড়া করো। তবে আমি কার সঙ্গে খেলি!

আচ্ছা, তোমায় আমি কথা দিলেম খোকন, ঝগড়া আমি করবো না। খরগোশকে ভালবাসবো। কারুর মনে ব্যথা দেবো না।

তুমি বড়ো ভালো বাঘ দাদা। বড়ো ভালো। ঠিক বাবার মতন, মায়ের মতন।

এখন আমি চলি খোকন—দেখি খরগোশ ভাই গেল কোথায়?

আবার এসো তুমি, আসবে তবে?

আসবো খোকন।

তবে একা নয়— অন্যদের নিয়েও।

আচ্ছা, তবে চলি আমি।

শুনছো তুমি, তোমায় বলছি—লালটুক মেয়ে. লাল পরী তো নাম, বলতে পারো কতদূরে অচিনপুর ধাম?

জানি খোকন জানি, সে যে অনেক দূরের পথ—পারবে নাকো হেঁটে যেতে, লাগবে যে গো রথ।

আমার কাছে নেই যে একটিও পয়সা। তবে আমি কি যেতে পারবো না। কিন্তু আমার যে এখানে থাকতে ভালো লাগে না।

কেন পারবে না খোকন, কিন্তু বলো তো তার আগে—কে বললে জানি আমি অচিনপুরের খবর।

কে আবার, খরগোশ ভাই। আমার বড়ো যেতে ইচ্ছে করে সেখানে।

কিন্তু সেখানে বাবাকে পাবে না, মাকেও না, পিসীমণি, দাদাভাই আর দিদিকেও নয়।

কিন্তু আমার যে বড়ো যেতে ইচ্ছে করে। আচ্ছা লাল পরী, সেই অচিন গাঁয়ে কেউ দুষ্টুমি করে,—ঝগড়া করে?

না।

সেখানে হিংসে আছে?

একদম না।

সবাই সেখানে সবাইকে ভালবাসে ?

সে যে অচিনপুর! সেখানে গেলে যে ভালবাসতেই হবে।

সেখানে সন্তুর বাবা নেই ?

সন্তুর বাবাও সেখানে গিয়ে ভালো হয়ে যাবে।

তুমি ঠিক বলছো।

তোমায় কি আমি মিথ্যে বলতে পারি। যারা দুষ্টু তাদের সেখানে ঢুকতেই দেওয়া হয় না।

তবে আমায় নিয়ে চল। এক্ষুনি। তবে রথে নয়। পক্ষিরাজে। যেমন করে রাজপুত্তুর যেত দৈত্যদের মারতে। যেত রাজকন্যার কাছে।

আচ্ছা, তাই হবে।

ও মা—বাবা, দাদাভাই, পিসীমণি সবাই এসে গেছে। ও আজ যে শনিবার তাই ওদের ছুটি হয়ে গেছে। ওরা যদি দেখে আমি পালিয়ে যাচ্ছি তোমার সঙ্গে—তা হলে যেতে দেবে না। আনো তোমার পক্ষিরাজ। তাতে সওয়ার হয়ে আমি যাবো অচিনপুরে। আমাকে আর কেউ ধরতে পারবে না। বাবা, মা, পিসীমণি কেউ না। কেউ না। নিয়ে চলো আমায়, আনো তোমার পক্ষিরাজ।

সুধীরচন্দ্র-স্মরণে

শ্রীনির্মলচন্দ্র দাসগুপ্ত

আত্মার সাথে আত্মার মিল
আত্মীয় হন তাঁরা
বন্ধুর পথে হাত ধরে নেয়
প্রকৃত বন্ধু যাঁরা॥
রথী-মহারথী কবি-লেখকের
আত্মীয় ছিলে তুমি
শিশুর দরদী বন্ধু "সুধীর"
ধ্বনিছে জন্মভূমি॥

অগণিত যত মধুকর দল
তব সুমধুর ডাকে
জমা করিয়াছে মধুরূপ সুধা
সুগঠিত "মৌচাকে"
সঞ্চিত সেই মধুর আড়ালে
সব গুঞ্জিত সুর
শিশু-প্রবীণের তৃষ্ণা মিটায়
মন করে ভরপুর॥

আজ বিষণ্ণ যত অলিকুল করে প্রার্থনা অবিরাম
ঘুমাও শ্রান্ত ওগো মধুকর! লভ শান্তি ও বিশ্রাম॥

হেলেন কেলার

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

হেলেন কেলার

পৃথিবীর এক অত্যাশ্চর্য মানুষ ছিলেন আমেরিকার কুমারী হেলেন কেলার। তিনি অন্ধ ও বোবা হয়েও অদম্য চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে খুব পণ্ডিত হয়ে গিয়েছিলেন। গত ১লা জুন ওয়েস্টপোর্ট শহরে তিনি সাতাশি বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। এক বিস্ময়কর ও বৈচিত্র্যময় জীবনের অবসান ঘটলো। তিনি জন্মেছিলেন ১৮৮১ সালের ২৭শে জুন।

এই মহিলাটি জন্মাবধি অন্ধ-মূক ছিলেন না। জন্মের পর কিছুকাল তিনি খুব সুস্থ ও সুন্দর শিশুই ছিলেন। মাত্র ছয় মাস বয়সে তাঁর মুখ দিয়ে প্রথম কথা ফোটে এবং ঠিক এক বছর বয়সে হাঁটতে আরম্ভ করেন। কিন্তু পৌনে দুই বছর বয়সে মস্তিষ্ক পীড়ায় ও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে এমনি ভুগতে লাগলেন যে, দৃষ্টিশক্তিও গেল, কথা বলাও বন্ধ হলো, আর সেই সঙ্গে কর্ণও বধির হলো! সেই থেকে বরাবরই তিনি অন্ধ ও মূক-বধির। পিতা মাতা খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যখন হেলেন ছয় বছরে পদার্পণ করলেন, তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো ডক্টর বেলের কাছে। ডক্টর বেল টেলিফোন যন্ত্রের আবিষ্কর্তা এবং বধিরদের শিক্ষক। তিনি মেয়েটির ভার নিজে না নিয়ে এক বিখ্যাত অন্ধ-বধির বিদ্যালয়ের একজন উপযুক্ত শিক্ষিকাকে আনিয়ে তাঁর উপর হেলেনের সকল দায়িত্ব ও শিক্ষাভার চাপিয়ে দিলেন। এই মহিলার নাম অ্যানি সালিভান। সালিভান হলেন হেলেনের শিক্ষিকা, বন্ধু, খেলার সাথী, ভ্রমণে-শয়নে-ভোজনে সঙ্গী। ইনি নিজেও আগে অন্ধ ছিলেন, কিন্তু চিকিৎসার ফলে দৃষ্টিশক্তি পান। তাই অন্ধ হেলেনের প্রতি মমতায় ভরে থাকতো সারাক্ষণ তাঁর মন এবং সব সময় নানাভাবে সাহায্য করতেন। মহাপ্রাণা ছিলেন অ্যানি সালিভান। আর হেলেনও ছিলেন তাঁর গুণমুগ্ধ। তাঁরই আপ্রাণ চেষ্টায় হেলেন জগতে যে এত খ্যাতি লাভ করেছিলেন, সে কথা পরবর্তীকালে

হেলেন সালিভানের যে জীবনচরিত লিখে গেছেন, তাতে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। অন্ধ-বধিরকে শিক্ষা দেবার অপূর্ব প্রথা ছিল সালিভানের, সেই সঙ্গে ছিল তাঁর আশ্চর্য কৌশল। সালিভানের চেষ্টায় হাতের সাহায্যে হেলেন অন্যের মুখের কথা বুঝতে শিখলেন; সে এক অপূর্ব কৌশলে। অন্যেরা যখন কথা বলতো, তিনি তাদের ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে দিতেন। সেই আঙুলের স্পর্শে বুঝতে পারতেন কি বলছে। আর ভাব ও ভঙ্গীর মাধ্যমে নিজের মনের কথা প্রকাশ করতে লাগলেন। এই রকম এক অন্ধ ও বধির মেয়ের গুরু দায়িত্ব নিয়ে শ্রীমতী সালিভানকে যে সংগ্রাম করতে হয়েছে তা যেমনি বিস্ময়কর তেমনি প্রেমপূর্ণ।

এই পরম দয়াশীলাকে নিয়ে পরবর্তীকালে একটি নাটক রচিত হয়েছে এবং চলচ্চিত্রে তার চিত্ররূপও প্রদর্শিত হয়েছে। "মিরাক্‌ল্‌ ওয়ার্কার" হলো তার নাম। তাতে সালিভানের অলৌকিক ক্ষমতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যে ক্ষমতা আরোপ করে তিনি সার্থকভাবে হেলেন কেলারের অন্ধ-বধির জীবন সার্থক করে তুলেছেন। হেলেনের অদম্য উৎসাহ ছিল অন্ধ-বধির হয়েও কি ক'রে গুণী জ্ঞানী হওয়া যায়। তাই উপযুক্ত শিক্ষিকা পেলেন, উপযুক্ত শিক্ষার্থিনী। সেইজন্য হেলেন নব নব শিক্ষায় ব্রতী হতে লাগলেন দিনে দিনে। অবিশ্যি বহুদিন লাগলো অল্প অল্প করে শিক্ষার জন্যে। দশ বৎসর বয়সে হেলেন স্থির করে ফেললেন যে, যেমন করেই হোক কোন-না-কোন প্রকারে কথা বলতে হবে। তাই সালিভান তাঁকে নিউ-ইয়র্ক শহরের একটা বোবা-স্কুলে নিয়ে গেলেন। সেখানে বিশেষ পদ্ধতিতে হেলেন কথা বলা শিখতে লাগলেন। এক একটি কথা আয়ত্ত করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমনকি দিনের পর দিনও লেগে যেত। এই ভাবে অনেক দিন পরে তিনি প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। যদিও সে সব কথায় উচ্চারণে অনেক ত্রুটি থেকেই যেত। তবু শ্রোতারা বুঝতেন। এর পর তিনি শিখলেন ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ এবং জারমান ভাষা।

১৮৯৬ সালে যখন তিনি ১৬ বছরের মেয়ে তখন কেমব্রিজের বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। পরে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির মেয়ে বিভাগে ভর্তি হয়ে গ্র্যাজুয়েট হন অর্থাৎ বি. এ. পাশ করেন। এই সময় তিনি "আমার জীবন-কথা" নামে একটা বই লেখেন।

এর পর তিনি নানা দেশের মূক-বধির বিদ্যালয়ের সাহায্যকল্পে নানা কাজে লেগে গেলেন। নিজে বক্তৃতা দিয়ে টাকা সংগ্রহ করে দিতে লাগলেন। সরকারের কাছ থেকে অন্ধ, বোবা ও কালাদের জন্যে অনেক নতুন স্কুলের ব্যবস্থা করলেন। হোলিউড-এ গিয়ে অভিনয় করে যে অর্থ পেলেন সে অর্থ ঐ সকল স্কুলের সাহায্যে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর

কার্যক্ষমতার জন্যে তিনি "অ্যাচিভ্‌মেণ্ট প্রাইজ" পেলেন, যার মূল্য পাঁচ হাজার ডলার। এই অর্থের সমস্তই তিনি ঐ সব স্কুলে দান করে দিলেন, যদিও তাঁর নিজের তখন আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। এমনি মহাপ্রাণা অন্ধ-বধির মহিলা ছিলেন তিনি। অদম্য কর্মী ছিলেন হেলেন সারাজীবন ভোর। আশি বছর বয়সেও দিনে ১০ ঘণ্টা ক'রে কাজ করে যেতেন। তাঁর বিশেষ "ব্রেইলি" টাইপ রাইটার দিয়ে তিনি কত কি যে লিখতেন তার ইয়ত্তা নেই!

জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সকলের সঙ্গেই তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন। যেমন—রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন, বার্ণার্ড শ, মার্ক টোয়েন প্রভৃতি।

তিনি বহু বই লিখেছেন, যেমন—Teacher Anne Sullivan, The world I live in, The Song of the Stone wall, Out of the Dark, My Religion, Let us have Faith ইত্যাদি।

১৯২০ সালে প্রায় দেড় মাস কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যখন আমেরিকায় ছিলেন, সেই সময় কুমারী হেলেন কেলার গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি কবির স্বকণ্ঠের গান ও আবৃত্তি শুনতে চাইলেন। রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি আবৃত্তি ও গান করলেন। হেলেন কবির কণ্ঠে, ওষ্ঠে, আঙ্গুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে সঙ্গীত ও কবিতার পূর্ণ রস সম্ভোগ করতে লাগলেন। করস্পর্শের দ্বারা অন্ধ হেলেন কাব্যের আলোক লোকে যেন গিয়ে পৌঁছলেন। দশ বছর পরে আবার কবি যান সেই আমেরিকায়। সেখানে এক সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে দেখেন হেলেন কেলার বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে সেখানে হাজির। বক্তৃতার পরই তিনি এসে কবিকে জড়িয়ে ধরলেন এবং শ্রোতাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে লাগলেন: "জাতিতে জাতিতে মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের যে শুভ সূচনা দেখতে পাচ্ছি তার শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ এই ট্যাগোর।"

কবি আমেরিকা থেকে চলে আসবার দিনে হেলেন তাঁকে ফুলের ডালা পাঠিয়ে দিলেন এবং সঙ্গের চিঠিতে লিখলেন, "আমার এই পুষ্পহার গ্রহণ করুন। আপনার খুব ভাল লাগবে এই ফুলগুলি। আমার হৃদয়ের প্রীতি-কুসুমও আপনি ওরই মধ্যে পাবেন।"

হেলেন কেলার ভারতবর্ষ সফরে এসেছিলেন দু' বার। একবার ১৯৪৮ সালে এবং পরে ১৯৫৫ সালে। কিন্তু হায়, তখন রবীন্দ্রনাথ আর ইহজগতে নেই! হেলেন অবিশ্যি এখানে এলে তাঁকে সর্বদাই স্মরণ করতেন এবং যখন যেখানে বক্তৃতা দিতেন রবীন্দ্রনাথে সঙ্গে সৌহার্দ্য ছিল তাঁর, সে কথার উল্লেখ করতেন। কলিকাতার অন্ধ-মূখ বিদ্যালয় পরিদর্শন ক'রে তিনি খুবই খুসী হয়েছিলেন।

তাঁর তিরোধানে এসো আমরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

যাত্রী বলে, "ছেলেধরায় বন্দুক নিলে! উঁহু কোথাও ফেলে এসেছ। ভেবে দেখ দেখি।"

রাজা ভাবে। তখন মনে পড়ে ড্রাইভারের পাশে সে বন্দুক নিয়ে বসেছিল। কোণায় ছিল ড্রাইভারের লোহার ডাণ্ডা। নিশ্চয় ঘুমের ঘোরে হাত ফস্‌কে তা তার গায়ে পড়েছিল। সে টের পায়নি। আর নাবার সময় ঘুম ঘুম চোখে বন্দুকের বদলে সে ডাণ্ডা নিয়ে নেবেছে।

এখন তা টের পেয়ে তার শরীরের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এল। কেঁদেকেটে তা গরম না করে উপায় নেই। সে সেকথা ভেঙে বলে। সব শুনে মহারাজা বোঝায়, মহারাণী বোঝায়,—খাবার দেয়। কিন্তু মহারাজা খায়, আর কাঁদে। কাঁদে আর কি করে বন্দুক ফিরে পাবে তা ভাবে। ট্রেন থামিয়ে ষ্টেশনে ছুটে গেলে এখনো হয়ত ট্যাক্সিতে বন্দুকটা পাওয়া যেতে পারে। সে চেঁচিয়ে উঠে, "বাঁধো, বাঁধো" বলে। সে দেখেছে, একথা বললে ট্রাম, বাস্ বাঁধে। কিন্তু ট্রেন বাঁধল না। তাকে ঠাট্টা করে আরো জোরে ছুটল।

যাত্রী মুখ টিপে বলল, "বাঁধো বাঁধো বললে ট্রেন বাঁধে না খোকা।" এ কথায় অত দুঃখের মধ্যেও রাজা ক্ষেপে যায়। বলে, "আমি বুঝি খোকা? আমি রাজা। আপনি কিস্‌স্যু জানেন না।"

যাত্রী রাগ করে না। বলে, "ঠিক বলেছ রাজা। আমি হলেম গিয়ে প্রজা। কি করে জানব? কিন্তু প্রজার কাছে তো রাজার কাঁদতে নেই।"

রাজা বলে, "বন্দুক হারালেও না?"

যাত্রী বলে, "বন্দুক কি হারায়? বন্দুক হ'ল গিয়ে বুদ্ধি। সে বুদ্ধি খাটিয়ে লোহার ডাণ্ডাকে বন্দুক বানিয়ে নাও। তোমার সব কাজ হবে।"

যাত্রীর খুব মিষ্টি কথা। রাজা তার গা ঘেঁষে বসে। তারপর বন্দুক দিয়ে শিকার আর দিগ্বিজয়ের কথা বলে। সে কথা বল্‌তে তার তীর-ধনুকের কথা, লক্ষ্মণ আর ইন্দ্রজিতের কথা, বন্দুক কেনার কথা, সব কথামালার মত এসে দাঁড়ায়।

যাত্রী কান পেতে শোনে, আর মুখ টিপে হাসে। এক ফাঁকে গাঁঠরি থেকে খাবার বার করে রাজাকে মিষ্টিমুখ করায়। অনেক শোনপাপড়ি, তিলের নাড়ু তার সঙ্গে ছিল। লোকটি মুখে মিষ্টি, কাজে মিষ্টি। তাই রাজা তুষ্ট হয়ে তার ন্যাওটা হয়ে ওঠে।

রাজা বলে, "ডাণ্ডাকে বন্দুক বানাব কি করে?"

যাত্রী আঙুল দেখিয়ে বলে, "ধর,—"

রাজা যাত্রীর আঙুল ধরে। যাত্রী বলে, "আঙুল ধরতে বলিনি। মনে কর তোমার লোহার ডাণ্ডা নিয়ে তুমি শিকারে গেছ। এখন পশুপাখীর তো মানুষের মত বুদ্ধি নেই—"

রাজা বলে, "তা নেই। ওরা বুদ্ধু!"

যাত্রী বলে, "তুমি যদি ডাণ্ডা দিয়ে তাক কর, আর সঙ্গে সঙ্গে পা দিয়ে লাথি মেরে ফটাস্ করে পটকা ফোটাও, তা হলে কি হবে? ওরা ভাববে সত্যি করে বন্দুক মেরেছ। আর তোমার বন্দুকের কাজ শুদ্ধমত হয়ে গেল।"

এমন কথা এতক্ষণ রাজার মাথায় আসেনি। সে হাততালি দিয়ে বলে, "বাঃ, আপনার মাথা আছে তো!" যাত্রী মুখ টিপে বল্‌ল, "তুমি বলায় সে কথা জান্‌লেম।" রাজা বলে, "সত্যি আছে। কিন্তু আমার নেই।"

যাত্রী বলে, "না থাকলে মুকুট পরেছ কি করে?"

তাও তো কথা! রাজা বলে, "আছে, কিন্তু আপনার মত নেই।"

যাত্রী বলে, "চেষ্টা কর, হবে।"

রাজা বলে, "আপনি কি খান?"

যাত্রী রহস্য করে বলে, "হাতী, বাঘ, সিংহ, গণ্ডার—" রাজা বলে, "ঠান ঠাট্টা কচ্ছেন। মানুষ এসব খায় বুঝি?" যাত্রী হাসে। বলে, "সামান্য খাই। যা জোটে। ভাত ডাল।" রাজা বলে, "ডিম, মাছের মুড়ো, মাংস।"

যাত্রী বলে, "ওসব খাই না।"

রাজা বলে, "তবে অমন মাথা হ'ল কি করে বলুন না!" যাত্রী বলে, "লেখাপড়া করে। তুমি কোন্ ক্লাসে পড়?" রাজা বলে, "স্কুলে পড়ি না।" যাত্রী বলে, "পড় না! তোমার তো স্কুলে পড়ার বয়স হয়েছে। তবে পড় না কেন?"

রাজা বলে, "আমি মহারাজার ছেলে রাজা তো। আমাদের রাজ-পাঠ আছে। তাই স্কুলে পড়ি না।"

যাত্রী বলে, "তাই তো বেশী করে লেখাপড়া শেখা উচিত। তা নৈলে রাজ্যপাট চালাবে কি করে?"

রাজা বলে, "ও আপনি জানেন না বুঝি? আমাদের মন্ত্রী আছে, সেনাপতি আছে, কোটাল আছে। রাজার তো মেহন্নত করতে নেই। অন্য লোকেরা চালাবে, আমরা কাঁধে চেপে চল্‌ব।" যাত্রী বলে, "কিন্তু রাজা যদি লেখাপড়া না শেখে, তার জ্ঞান-বুদ্ধি বাড়বে কি করে? লোকেরা রাজাকে বোকা পেয়ে ঠকাবে। আর তাদের জুলুমে প্রজা ক্ষেপে যাবে।" রাজা বলে, "তাতে বয়েই গেল। তাদের অ্যায়সা শাসন করব যে"—

যাত্রী জানে রাজা-মহারাজার রাজপাট উঠে যাচ্ছে। কিন্তু রাজা তার খবর রাখে না। তাকে সে কথা না বলে জিজ্ঞেস করে, "রাজার যদি মেহন্নত করতে না হয়, সময় কাটাবে কি করে?"

রাজা বলে, "হেসে, খেলে, খেয়ে, ঘুমিয়ে, পান-চিবিয়ে গল্প করে, প্রজার কান মলে, আর পাত্রমিত্রের মুখে জয় জয় শুনে।" সে চোখ মুখ ঘুরিয়ে, বুরবক রাজ্যশলার মজাদার কথা বলে। বলে তার দুষ্টুমীর কথা, হাঁদামীর কথা,—শুরুতে উকুন মারা, জ্যান্ত মাছ কোটা, পাঁঠা কাটার দৃশ্য দেখে তার মন কেমন করার কথা।···

যাত্রী বোঝে, আসলে রাজাকে মানুষ করে গড়ার বাধা ছিল না। কিন্তু তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে বুদ্ধিমান হবার সুযোগ না দেওয়ায় সে হাঁদা হয়ে আছে। আজব গল্প শুনিয়ে, অন্যায় আহ্লাদ দিয়ে, কুড়েমী আর অহঙ্কার শিখিয়ে তাকে বোকা জানোয়ার বানান হচ্ছে। কিন্তু চেষ্টা করলে এখনও তাকে গড়া সম্ভব। যাত্রী তাকে পরখ করার জন্য নানা গল্প তোলে।

বলে, "রাজা, তোমার তো শিকার আর দিগ্বিজয় করার খুব সখ?"

রাজা ঘাড় কাত করে বলে, "হাঁ তাই তো পোষাক আর বন্দুক নিয়ে এলাম।"

যাত্রী বলে, "তুমি শহর দেখে এলে। ট্রাম, বাস, মোটর, জাহাজ, বিদ্যুতের আলো, সিনেমা দেখেছ?" রাজা বলে, "হাঁ।" আর হাত মুখ নেড়ে তা বলে। যাত্রী বলে,

"গরুর গাড়ী ভাল না ট্রাম বাস্ মোটর ভাল? তেলের বাতি ভাল না ইলেকট্রিক আলো ভাল? নৌকো ভাল, না জাহাজ ভাল? এই যে ট্রেন চেপে যাচ্ছ তা ভাল, না ছ্যাকড়া গাড়ী ভাল? তীর-ধনুক ভাল না বন্দুক ভাল?"

রাজা পাড়াগেঁয়ে জিনিসের চেয়ে শহরে যা দেখে এসেছে তা ভাল বলে।

যাত্রী জিজ্ঞেস করে, "যে সব জিনিস এত ভাল বললে, তা কারা কি করে তৈরী করল তা জান?" রাজা তার কিছুই জানে না। জানার আগ্রহও নেই। যাত্রী তাকে অবাক করে বলে, "সব প্রজাদের তৈরী। কোনও রাজা তৈরী করতে পারেনি। কেন, তা জান?"

রাজা মাথা নেড়ে বলে, "না।"

যাত্রী বলে, "তার কারণ হ'ল, কুড়ে আর অহঙ্কারি রাজারা লেখাপড়া শিখে না, জ্ঞান-বুদ্ধি বাড়াবার চেষ্টা করে না। মাটি দেখেছ তো! পরিশ্রম করে তা কুপিয়ে, জল দিয়ে, বীজ ছড়ালে তবে তাতে সোনার ফসল হয়। আর কুড়েমী করে ফেলে রাখলে, তাতে হয় অগাছা, কাঁটা আর বিছুটির জঙ্গল। প্রজারা মেহনত করে একদিকে ফসল ফলিয়ে মানুষ বাঁচায়, অন্য দিকে, স্কুল-কলেজে কষ্ট করে বিদ্যা-বুদ্ধি জ্ঞানসঞ্চয় করে নানান্ জিনিস বানায়। তারা হ'ল গিয়ে জ্ঞানী আর বিজ্ঞানী।"—

রাজা শুনে হাঁ করে থাকে। প্রজা—যাদের সে চাষাভূষা, কামার-কুমার, চাকর-নফর বলে ঘৃণা করতে শিখেছে, তারাই নাকি তৈরী করেছে জৌলুস, রোশনাই আর চেকনাই ভরা শহরের আজব কারখানা! সে নিজের চোখে তা দেখে এসেছে। তার তুলনায় আজগুবী পক্ষিরাজ ঘোড়া আর ময়ূরপঙ্খী নায়ের গল্প কিছু না!

যাত্রী বলে, "শুধু জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি আর কাজ করার ক্ষমতার তফাতে আজ কুড়েমী রাজ্য ভাঙ্গল। রাজা আর মহারাজা নিচে নাবল, প্রজা উঠল উপরে। প্রজারা দল বেঁধে—"

রাজা ভয় পায়। বলে, "রাজাকে শূলে দেবে?" যাত্রী বলে, "উঁহু। প্রজারা বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। তারা কক্ষনো তা করবে না। তারা জানে রাজা আর প্রজা দুই-ই মানুষ। রাজার কুড়েমী আর অহঙ্কার কেড়ে নিয়ে তাদের দলে টানবে। রাজা থাকবে না, প্রজাও না। সব হয়ে যাবে মানুষ। তাদের খেটে খেতে হবে,—একজনেরটা অন্যে কেড়ে খেতে পারবে না। জাল, জোচ্চুরি, জুলুম চলবে না।"···

(ক্রমশঃ)

দামোদরের পরাভব

শ্রীমিনতি গঙ্গোপাধ্যায়

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন:

"মন্বন্তরে মরিনি আমরা, মারী নিয়ে ঘর করি
বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশিসে অমৃতের টিকা পরি।"

বিধাতার আশীর্বাদে আমরা যে অমৃতের টিকা পরতে পেরেছি তার মূলে আছে যুগে যুগে মন্বন্তর, মহামারী ও বন্যার সঙ্গে আমাদের নিরন্তর সংগ্রাম। মানুষের ইতিহাসে এর ব্যতিক্রম নেই।

আমাদের বাংলা দেশের কতো লোক যে কতোবার দামোদরের বন্যায় বিপন্ন হয়েছে তার হিসাব দেওয়া কঠিন। এই নদটির উৎপত্তি বিহারের একটি পাহাড় থেকে। বর্ষায় এখানকার কয়েকটি স্ফীত উপনদী হ'য়ে দামোদরের সঙ্গে মিশে নিম্ন উপত্যকাকে প্লাবিত করত। গত একশো বছরের মধ্যে এই সমস্যা নিয়ে যে কেউ মাথা ঘামায় নি, তা নয়।
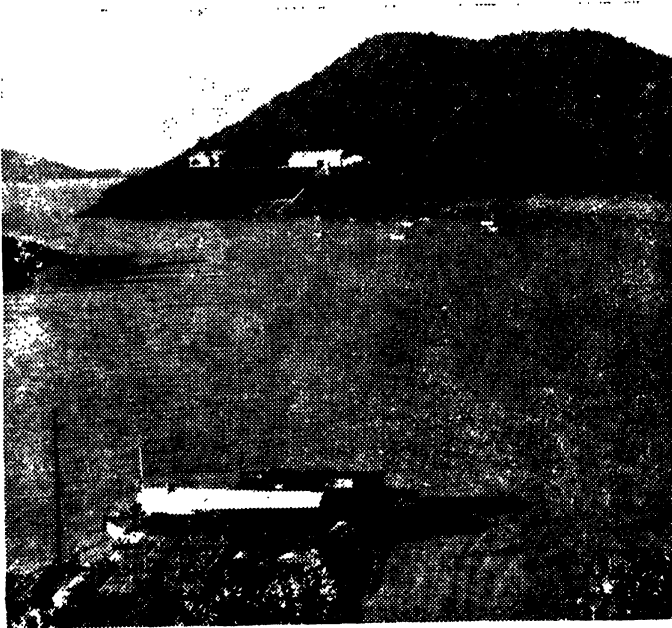
মাইথন জলাধার

কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। ১৯৪৩ সালে দামোদরের বানে কলকাতা থেকে যাতায়াতের

রেললাইন ও পথ গেল ডুবে। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। তাতে অবস্থা আরও গুরুতর হ'য়ে উঠল। এই বন্যায় যে ক্ষতি হয়েছিল ১৯৫০ সালের হিসাবে তার পরিমাণ হ'ল প্রায় আট কোটি টাকা। যাই হোক, ১৯৪৩ সালের দামোদরের প্লাবনের পর সরকার বিশেষ তৎপর হ'য়ে উঠলেন। আমরা স্বাধীন হবার পর এই নদকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে 'দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন' গঠন করা হ'ল। প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল তিনটি: বন্যা নিয়ন্ত্রণ, চাষের জন্যে জল সরবরাহ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন।

তারপর কুড়ি বছর কেটে গেছে। এবং মধ্যে চারটি বাঁধ তৈরি হয়েছে। বিহারে হাজারীবাগ জেলায় বরাকর নদের ওপর তিলাইয়া, কোনার নদের ওপর কোনার, ধানবাদ জেলায় বরাকর নদের ওপর মাইথন এবং দামোদর নদের ওপর পাঞ্চেত। এই বাঁধগুলির সাহায্যে জল ধ'রে রাখা হয়। আবার তিলাইয়া, মাইথন ও পাঞ্চেত বাঁধের কিছু জল দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করে নেওয়া হচ্ছে।
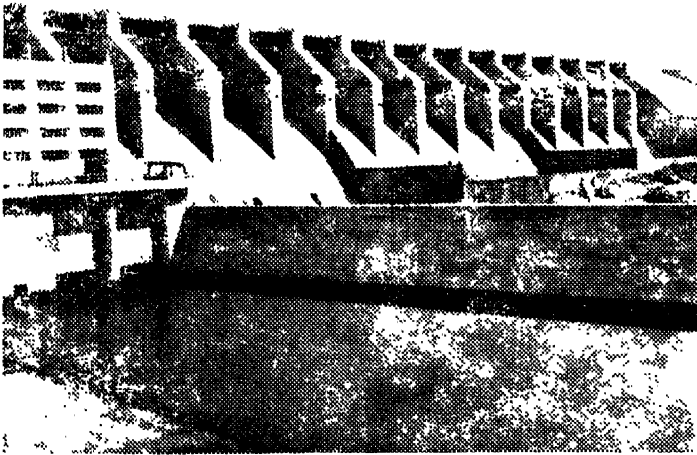
দামোদর প্রকল্পের দীর্ঘতম পাঞ্চেত বাঁধ

কয়লা দিয়েও বোকারো, দুর্গাপুর ও চন্দ্রপুরায় বিদ্যুৎ তৈরি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে দামোদর প্রকল্পের স্থান সকলের ওপরে। শতকরা এগারো ভাগ বিদ্যুৎ এদের কাছ থেকেই আমরা পাই। চন্দ্রপুরায় যে বিদ্যুৎ কারখানাটি আছে তা ভারতে বৃহত্তম। এর জন্যে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছেন।

এই বিদ্যুতের সাহায্যে সমগ্র দুর্গাপুর উপত্যকায় শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে। পশ্চিম বাংলায় রাণীগঞ্জ, কলকাতা, দুর্গাপুর, বার্ণপুর, চিত্তরঞ্জন, এবং বিহারে জামসেদপুর, ঝরিয়া প্রভৃতি জায়গায় যে সব কারখানা চলছে তার বিদ্যুৎ যোগাচ্ছে দামোদর প্রকল্প। ইষ্টার্ণ ও সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্যের ইলেকট্রিসিটি বোর্ডও এই বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে।

দুর্গাপুরে একটি ব্যারেজ তৈরি করা হয়েছে। এর কাজ হ'ল দামোদরের জলের বেগ নিয়ন্ত্রণ করা। এই ব্যারেজ থেকে দুটি খাল দু'দিকে চ'লে গেছে। একটি খাল দিয়ে বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া, এবং অপরটি দিয়ে বাঁকুড়া জেলায় চাষের জন্যে জল সরবরাহ করা হয়। তাই শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিরও উন্নতি হচ্ছে।

আমাদের দেশে দামোদর প্রকল্পই হ'ল প্রথম বহুমুখী পরিকল্পনা। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়াও ভূমি সংরক্ষণ, জনস্বাস্থ্য, নৌবহন প্রভৃতি কাজও এগুচ্ছে। তা ছাড়া ভ্রমণের উপযোগী করে তোলা হয়েছে কয়েকটি স্থানকে। এদের মধ্যে মাইথন, পাঞ্চেত, কোনার আর তিলাইয়ার নাম আগেই মনে পড়ছে। এই বাঁধ ও জলাধারগুলির সৌন্দর্য ভুলবার নয়। এখানে চড়ুইভাতি করার উপযুক্ত জায়গা আছে। কয়েকটি বাংলা ফিল্মও মাইথনে তোলা হয়েছে। তিলাইয়া, পাঞ্চেত আর মাইথনের জলধারগুলিতে মোটর বোটে করে বেড়ানো যায়।

মাইথনের জল-বিদ্যুৎ কারখানাটি তৈরি করা হয়েছে পাহাড় কেটে মাটির নিচে। ভারতে এই ধরনের বিদ্যুৎ কেন্দ্র এই প্রথম।

এখানকার কল্যাণেশ্বরী মায়ের মন্দিরটি বিখ্যাত। প্রত্যহ এখানে বহু পুণ্যার্থীর ভিড় হয়। এটি মায়ের স্থান বলেই নাকি নাম হয়েছে 'মাইথন'। এই দেবী সম্পর্কে সুন্দর একটি কিংবদন্তী আছে।

ডানা মেলে

শ্রীপ্রীতিভূষণ চাকী

একদিন খুকুমণি বলেছিলো হেঁকে—
বলো দেখি প্রজাপতি আসে কোত্থেকে?
প্রশ্নটা শুনে খোকা খুশি হয় ভারী,
কিছুতেই ঠকবে না, জিত হবে তারই।
শুঁয়োপোকা গুটি গুটি 'গুটি' হয় আগে
তার থেকে ডানা মেলে প্রজাপতি জাগে।

সহনশীলতা

শ্রীঅতসি সেন

কথায় বলে 'শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়' কথাটা খুব খাঁটি। নাহলে তুমি আমি একটু খাটা-খাটুনি করতেই হাঁপিয়ে পড়ি আর মজদুরেরা প্রচুর পরিশ্রম করলেও দেখ কেমন সুন্দর স্বাস্থ্য! সেই গল্পটা জানো ত, এক চাষার ঘাড়ে জ্বরের ভূত চেপেছিল। তা চাষা ত তাকে আমোলই দিলে না, জ্বর গায়েই চাষ-আবাদ করে এসে পান্তা খেলে। জ্বরজারি তাই না দেখে পাঁই পাঁই করে পালালো জমিদার মশায়ের প্রাসাদে। তিনি সুখী মানুষ, জ্বর হতেই লেপ কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। ডাক্তার বদ্যিতে ঘর ভরে গেল, টেবিল বোঝাই হয়ে গেল হরেক রকমের ওষুধপত্রে, আর ওদিকে এত তোয়াজ পেয়ে জ্বরের ভূত আর যেতেই চায় না। এটা গল্প হলেও, নীতি কথাও বলতে পায়। অল্প অল্প করে সইয়ে নিলে কোন কষ্টই আর গায়ে লাগে না। সব কিছুই সয়ে যায়।

আমরা গরম দেশের লোক দার্জিলিং শিলং গেলেই হি হি করে কাঁপি, কিন্তু সেখানকার বাসিন্দারা দেখ কেমন সেই ভীষণ ঠাণ্ডার মধ্যেও কাজকর্ম সব করে চলেছে। দেখে মনেই হয় না, যে তাতে তাদের কোন অসুবিধেই হচ্ছে। ঠিক এর উল্টোটা হয় আবার, তারা যখন আসে আমাদের এখানে। সারাদিন ঘাম ঝরে, শরীর ক্লান্ত লাগে। এদিকে আমরা কিন্তু এ সবে অভ্যস্ত হওয়ায় আর কোন কষ্টই অনুভব করি না।

আবার এমনি মজা যে, আমরা যদি কেউ শীতের দেশে বদলী হয়ে যাই, কিংবা ধর ঠাণ্ডা দেশের লোকেরা এসে বাস করতে থাকে আমাদের এখানে, তাহলে আস্তে আস্তে এই কষ্টটাও সয়ে যায়, তখন আর বিশেষ কোন অনুভূতিই আসে না। পরীক্ষা করে দেখা গেছে এক জাতের মাছ আছে যারা ৯৩° ডিগ্রী তাপেই একঘণ্টায় অর্ধেকের বেশী মরে যায়। কিন্তু প্রথমে দিন চারেক যদি ৮৬° ডিগ্রীতে রাখা যায়, তবে গরমটা অনেক সয়ে যায় আর তখন ১০০° ডিগ্রী পর্যন্ত বেশ বাঁচতে পারে।

আমরা, মানে মানুষ পাখী আর যে সব প্রাণী গরমে বাঁচতে পারে তাদের চবি শক্ত হয়, অর্থাৎ চট করে গলে যায় না। আর যারা ঠাণ্ডায় থাকে যেমন ধর মাছ, সরীসৃপ এদের চবি অল্প আঁচেই গলে যায়। আবার গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষের চবি ঠাণ্ডা দেশের লোকেদের চেয়ে কঠিনতর হয়। চিনি থেকে শক্ত চবি উৎপাদিত হয়, তাই গরম দেশের লোকেরা রুটি, ভাত, আলু এইসব শর্করাপ্রধান খাদ্য গ্রহণ করে। এগুলো থেকে প্রথমে চিনি তৈরী হয়, আর তার থেকে গ'ড়ে ওঠে শক্ত চবি।

শুধু ঠাণ্ডাই নয়, আমাদের মত সমতলের লোকেরা যখন পাহাড়ে দেশে বেড়াতে যায়

বা পর্বতারোহণ করে, তখন ওই উচ্চতাও আমাদের অনেক বেশী কষ্ট দেয়। এভাবেই কি নন্দাঘুন্টিতে আমরা উঠেছি, কিন্তু যে কি কষ্টে তা ত আর জান না! বিপদ বাধা ছাড়াও উঁচুতে উঠলেই বাতাসের চাপ বাড়ে আর অক্সিজেন আসে কমে। তখন হৃৎপিণ্ড আরও দ্রুত চলতে থাকে, লোকে হাঁপিয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি, গা গুলোতে থাকে, বমি করে ফেলে, যন্ত্রণায় যেন মাথাটা ফেটে পড়তে চায়। নাক দিয়েও অনেক সময় রক্ত বেরোয়। তাই এসব থেকে আত্মরক্ষার সরঞ্জামও সঙ্গে নিতে হয়। আর তাছাড়া যাত্রার পূর্বে নানান্ সাধনার মধ্যে দিয়ে এ জাতীয় কষ্টের অভ্যাসকরণও শিক্ষণীয়। তখন উঁচুতে উঠলেই ফুসফুসের ফুটোগুলোও বড় হতে থাকে, যাতে বেশী হাওয়া ঢুকতে পারে, রক্তের লোহিত কণিকা (যা দিয়ে শরীর অক্সিজেন হজম করে) বেড়ে যায় আর তাদের অক্সিজেন হজমের ক্ষমতাও অনেক বাড়ে। শেরপারাই এর জাজ্বল্য প্রমাণ।

শুধু শীত, তাপ কি উচ্চতাই নয়, সহ্য করলে হয়ত মহাদেবের মতন সমুদ্রমন্থনের বিষও হজম করা যায়। অন্ততঃ অতটা না হলেও মানুষ নেশার জন্যে গুলি, আফিং এই সব যা খায়, তার অনেকগুলোই মারাত্মক বিষ। খেলে সাধারণ মানুষ মারাই যাবে। কিন্তু একটু একটু করে নেশা করে তারা নিজেদের শরীরটাকে এতই সহনশীল করে তোলে যে, তখন যতটুকু পরিমাণ খেলে মানুষ মারা যেতে পারে, তার থেকে অনেক বেশীই তারা হজম করে ফেলে। গল্পে আছে, এক গুলিখোরকে সাপে কামড়াতে, সাপের বিষে তার কিছুই ক্ষতি হ'ল না, ওদিকে তার দেহের বিষেই সাপটা মরে গেল। গল্পটা গুলিখোরের হলেও 'গাঁজা-গুলি' মনে করার কারণ নেই। সাপের বিষ থেকে ওষুধ তৈরী, সে ত ডাক্তারী কবরেজী সব শাস্ত্রেই হয়ে থাকে। ঠিক তেমনি বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড বা অঙ্গারাম্ল গ্যাসের আধিক্য, কি জলীয় ভাগ বেশী-কম, সব কিছুই সময়ে সহ্য হয়ে যায়। নাহলে শীতের কোলকাতায় খোলা উনুন আর ষ্টেটবাসের ডিজেল এঞ্জিনের শ্বাসরুদ্ধ ধোঁয়াশায় কবেই আমরা ফৌত হয়ে যেতাম।

মাছেদের মধ্যেও যারা সমুদ্রের নোনা জলে থাকে, তাদের নদীর মিষ্টি জলে বাস করতে কষ্ট হয়। আবার মিষ্টি জলের মাছেদের কষ্ট হয় সমুদ্রের নোন্‌তায়। নোনা জলের মাছ নদীতে এলেই তার শরীরে বাইরের জল ঢুকে সব কিছু ফুলিয়ে দেয় আর নদীর মাছ সমুদ্রে গেলে তার শরীরের রস বেরিয়ে গিয়ে চুপসে যেতে থাকে। তবে অভ্যাসকরণ প্রক্রীয়ায় নদীর মাছকে যদি কয়েক সপ্তাহ খুব অল্প নোনা জলে ধরে রাখা হয়, আর নুনের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়ান যেতে থাকে, তাহলে দেখা যায় যে, তখন তাকে সমুদ্রে ছেড়ে দিলে তার আর কোন অসুবিধেই হয় না। নোনা জলের মাছেদেরও এমনি ভাবে মিষ্টিজল সওয়ানো যেতে পারে।

সাধারণতঃ মাছেরা তাদের কান্‌কো দিয়েই তাদের সহ্যশক্তি কিছুটা বাড়াতে পারে। নোনা জলে পড়লে তারা তাদের কান্‌কো দিয়ে বাড়তি নুনটা বের করে ফেলে। আবার ব্যাঙেরা যখন জলের তলায় যায়, তখন তাদের সারা শরীর দিয়েই জল ঢুকতে থাকে বলে, সেই বাড়তি জলটুকু তারা বেশী প্রস্রাব করে বার করতে থাকে। অতএব দেখা যাচ্ছে পরিবর্তনটা যদি খুব দ্রুত না হয়, তাহলে জীব-জগত তার শারীর-বিজ্ঞানের তৎপরতা দিয়েই নতুন পরিবেশে জীবনধারণে প্রবৃত্ত হয়।

ঠিক একই কারণে, আমাদের শরীরে যে সব রোগ জীবাণুরা ঢোকে, তারাও ওষুধপত্রের বিষ হজম করতে করতে ক্রমশঃই ওষুধের গুণাগুন নষ্ট করার মত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এক সময় কয়েকটা মাত্র সালফাডাইজিন কি পেনিসিলিনেই তারা খতম হয়ে যেত, কিন্তু এখন কেউ কেউ এমনই পেল্লাদ-মার্কা হয়ে উঠেছে যে, আর অত সহজে কার্য-সমাধা হচ্ছে না।

শুধু মানুষ, জীবজন্তু কি জীবাণুরাই নয়, উদ্ভিদ-জগতেও সহনশীলতার ভূরিভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। তামাক পাতা যা আজ ভারতেই জন্মায় তার আদিভূমি ছিল আমেরিকায়, রবার কি কুইনাইনও দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসী। তুলাও আমদানী হয়েছিল ইজিপ্টের মাটি থেকে। তাহলে দেখ কত বিভিন্ন আবহাওয়ায় গাছপালা এই দেশের জলবাতাস সহ্য করে নিয়েছে।

মানুষ, জন্তুজানোয়ার আর উদ্ভিদের এই যে সহনশীলতা, যার দ্বারা তারা তাদের স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিকতা ছেড়ে নতুন বা বিপরীত পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, তাকেই বিজ্ঞানের ভাষায় 'অ্যাক্লিমেটাইজেশন্' বা 'ন্যাচারালাইজেশন্' বলে। জীব-জগতের ক্ষেত্রে এই সহিষ্ণুতা গরম, ঠাণ্ডা, বায়ু-চাপের পার্থক্য কি রাসায়নিক পরিবেশ সম্পর্কে সহনশীল করে তোলে। এই শক্তির দ্বারাই তারা তাদের অচেনা অজানা প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকতায় নিজেদের মানিয়ে নেয়। শরীরের কোন একটি বিশেষ যন্ত্র বা অনেক সময় সমস্ত শরীর দিয়েই তারা তাদের সহ্যশক্তিকে কাজে লাগায়। যার ফলে যে পরিবেশ পূর্বে তার কাছে অসহনীয় ছিল, ক্রমে ক্রমে তাই বাসোপযোগী হয়ে ওঠে।

'অ্যাক্লিমেটাইজেশন' বা সহনশীলতা কিছুটা বিলম্বিত। এ পরিবর্তন ধীরে ধীরে হয়ে থাকে। আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা আমরা যা সর্বদাই সহ্য করে চলেছি, যেমন ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ, কি ফ্রিজিডেয়ারের মটোরের আওয়াজ কানে না যাওয়া, এগুলো কিন্তু এ পর্যায়ে পড়ে না। আবার বংশানুক্রমিক ধারায় অনেক পুরুষানুক্রমে যে পরিবর্তন হয়ে চলে। যেমন, আমাদের মাটি-ছোঁয়া হাত ছোট হতে হতে আজ আর 'আজানুলম্বিত'ও নেই, এও পৃথক শ্রেণীর। সহনশীলতা হ'ল এই দুই পর্যায়ের মাঝামাঝি।

জীব-জগতের প্রতিটি উদ্ভিদ প্রাণীই বিভিন্ন পরিবেশে নিজেদের মানিয়ে নেবার ক্ষমতা ধারণ করে। এটাই হ'ল তাদের জীবনযাত্রার সবচেয়ে আশ্চর্য অভ্যাস। কোথা থেকে, কিভাবে যে এ শক্তি তারা আহরণ করেছে তা বলা কঠিন। তবে এ ক্ষমতা না থাকলে যে তারা এই নিষ্করুণ পৃথিবীর বুকে টিঁকে থাকতেই পারত না, সে কথাটা বলাই বাহুল্য।

খেজুর রস

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

চাই খেজুর রস, খেজুর রস চাই—

সন্ধ্যাবেলা রাস্তায় হাক দেয় রসের ফেরিওয়ালা। বাঁকে তার দুই ভাঁড় রস। এক ভাঁড়ের মুখে একটা গেলাস। এটাই তার মাপবার পাত্র।

রমু বলল, সন্ধ্যেবেলার রসই ভালো। সকালে, বেলা উঠলে যে রস পাওয়া যায়, সেটা কেমন ঘোলা মত। আর খেতেও তেমন সুস্বাদু নয় সে রস।

খেজুর রস কেনে ওরা।

ওদের মেসোমশাই জিজ্ঞাসা করেন শলীকে, বলত খেজুর রস হয় কিসের থেকে?

সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় কেন, খেজুর থেকে!

রমু আর মনা খিলখিল করে হেসে ওঠে।

গৌরী শলীকে সমর্থন করে বলে, আখ থেকে যদি আখের রস হয়, তাহলে খেজুর থেকে খেজুর রস হবে না কেন? আবার ওরা হেসে ওঠে।

মেসোমশাই বলেন: না, আখ থেকে আখের রস হলেও, তাল থেকে তালের রস বা খেজুর থেকে খেজুর রস হয় না। রস বের করবার পদ্ধতি আলাদা। আখকে কলে মাড়াই ক'রে রস বের করে, কিন্তু তালের রস বের করতে হয় তাল গাছে লম্বা জটার মত যেগুলো গজায়, তার মাথা থেকে। খেজুর রস বের করে খেজুর গাছের মাথা খুব ধারাল অস্ত্র দিয়ে কেটে। এই অস্ত্রকে 'ছান-দা' বলা হয়।

শুনু উৎসাহের সঙ্গে বলে: আমাদের উঠানে কতকগুলো খেজুর গাছ লাগালেই তো হয়। বেশ মজা করে রস খাওয়া যায়!

খেজুর গাছ থেকে রস বের করা খুব সহজ কাজ নয়। তাছাড়া উঠানে খেজুর গাছ লাগালে চলা-ফেরার অসুবিধা হয়। খেজুর গাছের ডালপালায় কাঁটা থাকে খুব।

তাঁর কথা শেষ না হ'তেই শুনু তাড়াতাড়ি বলে: আমরা রোজ জল দেবো চারা গাছে, যেমন ফুল গাছে দিই।

মেসোমশাই হেসে উত্তর দেন: খেজুর-চারা জল দেওয়ার তোয়াক্কা রাখে না। সারেরও দরকার হয় না ওর জমিতে। নেহাৎ অযত্নেই এই গাছ যেখানে-সেখানে বেড়ে ওঠে। ছাগল-গরুতেও এর কিছু করতে পারে না; কারণ, এর ডেগোর গোড়ায় থাকে অসংখ্য কাঁটা। পাতার মাথায়ও সূচের মত কাঁটা আছে।

তারপর গাছ পাঁচ-ছ বছরের হলে, ওর চারপাশের ডাল কেটে পরিষ্কার ক'রে দিয়ে, একটা দিক বেশ করে ছাড়িয়ে নিয়ে সেখানে 'নলি'—অর্থাৎ ছোট একটা বাঁশের নল চিরে

নিলে যে আধখানা হয়, তা পুঁতে দিতে হবে। ঐ নলি বেয়ে খেজুরের রস পড়বে। নলির তলায় ভাঁড় পেতে রাখা নিয়ম। ছোট চারাগাছের জন্য ভাঁড়টি মাটিতেও রাখা যায়; কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, শিয়ালে ঐ ভাঁড় থেকে রস খেয়ে যেতে পারে। এই জন্য ঐ ভাঁড়ের চারদিকে কাঁটা দিয়ে রাখা দরকার। গাছ বড় হয়ে গেলে তখন গাছের মাথার একটা ডেগোর সঙ্গে একটা দড়ি বেঁধে রেখে, ঐ দড়ি ভাঁড়ের মুখের দড়ির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়।

: খেজুর গাছে ওরকম এদিক-ওদিক খাঁজ-কাটা মত দেখা যায় কেন ?

: তার কারণ খেজুর গাছের একই দিকে প্রতি বছর কাটলে গাছ মরে যায়। সেই জন্য এক বছর যে দিকটা কাটা হয়, পরের বছর কাটতে হয় ঠিক তার উল্টো দিক। এই জন্যই খেজুর গাছে এদিক-ওদিক খাঁজ কাটা দেখা যায়। ঐ রকম খাঁজ-কাটা থাকায় গাছে উঠতেও স্নবিধে।

: 'নলেন গুড়' কাকে বলে ? জিজ্ঞাসা করে বাপী।

: শীতের প্রথমে, যদি বৃষ্টি বা কুয়াশা না হয়, তা হ'লে তখনকার রস থেকে যে গুড় পাওয়া যায় তাকেই 'নলেন গুড়' বলে। এই গুড়ের স্নন্দর একটা গন্ধ আছে এবং এর আস্বাদও অপূর্ব। দেখতে অবশ্য অনেক সময় এ গুড় পাতলা ও কালচে মত হয়; কিন্তু এই গুড় দিয়ে পিঠে-পায়েস কি মোণ্ডা বাংলার একটি বিশিষ্ট উপাদেয় খাদ্য।

রমু জিজ্ঞাসা করে: রসওয়ালা বলছিল তার 'জিরেন-কাটের' রস। 'জিরেন-কাট'টা কি মেসোমশাই ?

: জিরানের পর যে গাছ কাটা হয় তাকেই জিরেন-কাট বলে। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করে বলি—খেজুর গাছকে রোজই কাটা হয় না। তা হ'লে গাছ মরে যাবে। সেইজন্য পর পর তিনদিন কেটে গাছকে পরের তিনদিন 'জিরান' অর্থাৎ বিশ্রাম দিতে হয়। বিশ্রামের পরই আবার যখন কাটা হয়, তখন ওটাকে বলে জিরেন-কাট। জিরেন-কাটের রস খুব স্নস্বাদু হয়।

: হাঁ, রসের কথা বলছিলাম। রসপূর্ণ ভাঁড়গুলি সকালে নামিয়ে নিয়ে ওগুলিকে নিয়ে যাওয়া হয় 'বানে'। যেখানে ধান ঝাড়া বা মাড়াই করা হয়, সেখানটাকে যেমন 'খামার' বলে, তেমনি যেখানে রস জমা ক'রে, উনুনে জাল দিয়ে গুড় ও পাটালী করা হয়, সেখানটাকে বলে বাইন বা 'বান'। এখানে বিশেষ ধরনের উনুন ও রস জাল দেওয়ার বিশেষ ধরনে তৈরি পাত্র থাকে। জাল দেওয়ার মধ্যেও গুড় ভালো-মন্দ হওয়া অনেকটা নির্ভর করে। রস থেকে হয় গুড়, গুড় থেকে পাটালী।

অন্নের জন্যে

(নাটক)

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু

(এই নাটকের কুশীলবগণের বয়ঃসীমা বারো বৎসর)

প্রথম দৃশ্য

বনের ধার। একদিকে কতকগুলি লোক (মজুর) বসে পুঁটুলি থেকে বার করছে লা, ঘটি, চিড়ে, গুড়, কলা, তেঁতুল, মোটা রুটি, ছাতু, নুন, লঙ্কা। কেউ কেউ খেতে রম্ভ করবে। কেউ কেউ বিড়ি টানবে। কেউ বা চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়বে, হাই তুলবে। সবে (তুড়ির সঙ্গে) "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ !"

অন্য দিকে অন্য একদল বসেছে গোল হয়ে। মাথা নেড়ে, হাতে তালি বাজিয়ে ইছে গান। গানের ধুয়া :

"সাঁঝের বেলা কদমতলা কে বট হে
বাঁকা চূড়ায় শিখিপাখা
বংশী বাজাও নটবর হে।"

ওদের মধ্যেই একজন (তার গালে ঠাসা পান) বটুয়া খুলে পান সাজছে, অন্যদের তে তুলে দিচ্ছে। খুব খুশি খুশি ভাব।

(পট উঠবার আগেই গান বাজনা শোনা যেতে থাকবে। পট ওঠার পরেও গান লতে থাকবে।)

হাই-তোলা লোকটির নাম গণশা।—"কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ।" (বলতে বলতে সে ঠে বসবে এবং বলবে) :

ণশা। বাপ্ অরে বাপ্ অ! খটি খটি মরি গলি রে বাপ্ অ! (দুই হাত সামনে মেলে দিয়ে, কোমর বেঁকিয়ে, ক্লান্তি দূর করবার ভঙ্গী করবে। আবার বলবে) : "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ!"

(মুখের কথা মুখে। উইংয়ের পাশে রাখা একটা টেবিল থেকে ঝপাং করে লাফ দিয়ে ষ্টেজে প্রবেশ করবে এক সৈনিক। পায়ে নাগরা, মাথায় পাগড়ী, হাতে তলোয়ার। ঢুকেই হাঁক ছাড়বে) :

সৈনিক। এ—ই! ই দিকে আয়! ই দিকে আয় দেখি একজন। আমার ঘোড়াটাকে ধর দিকি। এ-ই, শুনছিস্? এ—ই।

(গণশার মুখের সামনে তলোয়ারটা উঁচিয়ে ধরে আবার বলবে) : কানে গেল কথাটা?

গণশা। ই—বাপ্ অরে বাপ্ অ! যাউছি, যাউছি! বাপ্ অরে বাপ্ অ! ই—

(গণশা চলে যাবে। অন্য সবাই ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে, যে যা করছিল তাই করতে থাকবে। সৈন্যটি লাফ দিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে সবার সামনে। খাপ থেকে তলোয়ারটা ঘ্যাচাং করে বার করবে, দু'চার পাক সেটা ঘোরাবে সাই সাই করে। তারপর সেটা খাপে পুরে রাখবে। গোঁফে চাড়া দেবে বার কয়েক। তারপর চেঁচিয়ে উঠবে) : এ্যাই—ই। এ্যাই! তোরা সব কে বটিস? কী করছিস এখানে? কোথাকার লোক তোরা?

(গানের দলটি বিরক্ত হয়ে গান থামাবে। দলের সর্দার উঠে দাঁড়িয়ে "কে বট হে, কে বট হে" গাইতে গাইতে এসে দাঁড়াবে সৈনিকের সামনে। বিদ্রূপের হাসি হেসে, হাত নেড়ে নেড়ে গাইবে) :

"বাঁকা চূড়ায় শিখিপাখা
বংশী বাজাও নটবর হে,
কদমতলায় কে বট হে,
কে বট হে—কে বট—"

সৈনিক। (ভীষণ ধমক দিয়ে) : এ্যা—ই, চোপরাও। মুণ্ডুটা কেটে দু'খান করে ফেলবো! (তলোয়ার দেখিয়ে) দেখেছিস্?

(লোকটি দুই হাত সামনে তুলে, মাথা বাঁচাবার ভঙ্গী করে সরে যাবে এক পাশে গণশা এসে ঢুকেছে ষ্টেজে, ইতিমধ্যে। এগিয়ে যাবে সৈনিকের কাছে এবং বলবে) :

গণশা : হঁ! তা ত দেখিচি। সেঠু হলা কণ? এতে রাগুচু কাহিঁকি, এঁ?

সৈনিক : তোরা কোন্ রাজ্যের লোক? কী করছিস এখানে, শুনি?

গণশা : আমে হউচুঁ লাগলাগল্‌রর্‌অ লোকঅ। আউ, তমে?

সৈনিক : আমি কাট্‌কাট্‌পুরের মহারাজার সৈন্য। রাজ্যের এই সীমানা পাহারা দেই আমি। তোরা কী করছিস এখানে, শুনি? (তলোয়ার উঁচিয়ে) সত্য কথা বল্!

গণশা : (মাথাটা চট্ করে সরিয়ে নিয়ে) : কহুচি, বাপ্‌অ কহুচি। (তলোয়ারটা দেখিয়ে) সেটাকু বন্দ-অ করি রখ ত আগত।

সৈনিক : (তলোয়ারটা খাপের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে) : বেশ, এবারে বল্। কী হচ্ছে এখানে? এতগুলি লোক মিলে কী করছিস?

গণশা : এতে লোকঅ মিলি আমে এঠি গাত্‌অ খোলুচুঁ।

সৈনিক : কেন? গর্ত খুড়ছিস কেন?

গণশা : সে কথা ত মুঁ জানে নাহিঁ। হুকুম হেইচি—খোলুচুঁ। বাস্। হুকুম!

সৈনিক : কা'র হুকুম, শুনি?

গণশা : বাপ্‌অরে! মহারাজালক হুকুম! হঁ!

আমি কাটকাটপুরের মহারাজার সৈন্য। রাজ্যের এই সীমানা পাহারা দিই আমি।'

সৈনিক : কতগুলি গর্ত খুঁড়েছিস ?

গণশা : সে হব।

সৈনিক : আরে, কি হব ? কতগুলি হব ?

গণশা : সে হব। হেই দুষমন-অ পাহাড়-অ তমাম গাত-অ খোলু চুঁ—যা উ চুঁ, যা উ চুঁ। গাত-অ খোলুচুঁ, খোলুচুঁ। গণি করি ত দেখিনি !

সৈনিক : তবু শুনি ? আন্দাজ ? দু'শো, পাঁচশো, হাজার, দু'হাজার—

গণশা : (এক গাল হেসে, বটুয়া থেকে পান বার করে, গালে ঠেসে) : হব, হব। হজুরে হেই পারে, দি হাজার বি হেই পারে।

সনিক : (কোমরে দুই হাত রেখে কিছুক্ষণ চিন্তা করলো, তারপর বললো) : আচ্ছা, তোদের এই পাহাড় সীমানা বরাবর এত এত গর্ত খুঁড়বার মৎলবটা কী ? হুঁ ! মৎলব একটা নিশ্চয়ই আছে, আর সেটা ভালোও নয়—এটাও ঠিক। হাঁ, ঠিক।

াণশা : মু এতে কণ্‌অ জানি ? কি মতলব অছি কি নাহি, মু কিমিতি জানিবি ? জানিবার দরকার বা কণ ? আমে সবু গরীব মজুরিয়া। হুকুম হেলে কামুঅ করুঁ, মজুরি

পাউ। ঘরকু জাউ। অ—অরে। ই বৃন্দাবন-অ, ইন্দ্রজিত-অ, গজানন-অ! লাগ-অ লাগ-অ—কামরে লাগ-অ!

(মজুরেরা সবাই গণশার কাছে আসতে থাকবে। সৈনিকটি গোঁপে তা দিতে দিতে বলবে):

সৈনিক: হু! আছেই একটা মৎলব। নিশ্চয় আছে। আরও সন্ধান নিতে হচ্ছে। আচ্ছা! দেখাচ্ছি মজাটা! কাটকাটপুরকে ফাঁকি দেওয়া অত সোজা নয় হে চাঁদেরা! কা'র চোখে ধরা পড়েছ জানোনা ত! হুঁ! (গোঁপে ঘন ঘন পাক। হঠাৎ চেঁচিয়ে) এ—ই! আমার ঘোড়াটা নিয়ে আয় ত এদিকে।

(সৈনিক চলে যাবে। মজুরেরা গণশার চারদিক ঘিরে দাঁড়াবে। ইশারা করে দেখাবে সৈনিকের চলে যাওয়ার দিকে। গোঁপ পাকানো দেখিয়ে ভেংচি কাটবে এবং শেষে কলা দেখাবে চলে-যাওয়া সৈনিকের উদ্দেশে। তারপর গান ধরবে সবাই মিলে, খুব ফুর্তি করে):

"সাঁঝের বেলা
কদমতলায়
কে বট হে, কে বট হে।"

পটক্ষেপ

দ্বিতীয় দৃশ্য

(কাটকাটপুর রাজ্যের মন্ত্রীর খাশ কামরা। মেঝের মাঝামাঝি তক্তপোশে ফরাস পাতা। দু'তিনটে তাকিয়া। ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার থালায় সাজা পান, মশলার কৌটো, জর্দা ইত্যাদি। লম্বা নল লাগানো গুড়গুড়িও থাকতে পারে। এক পাশে একটা ছোট, নিচু টেবিলে দোয়াত, কলম, কাগজ, শীলমোহর রাখা আছে। একটা জলচৌকির উপরে আসন পাতা।

(পাকা দাড়ি গোঁপ, পাকা চুল মন্ত্রীর প্রবেশ। ফরাসে উঠে বসবেন, একটা তাকিয়া নিয়ে বেশ আরাম করে। একটা পান কিংবা মশলা মুখে দেবেন। গুড়গুড়িটাও মুখে নিতে পারেন। তারপর ডাকবেন:

মন্ত্রী: ওরে—এই, কে আছিস?

(দৌবারিকের প্রবেশ। নিচু হয়ে নমস্কার জানিয়ে)

দৌবারিক: এজ্ঞে, আমাকে ডাকছিলেন?

মন্ত্রী : হঁ্যা, ডাকছিলাম। উনি গেলেন কোথায়? ঐ কলমচি ছোঁড়াটা? যা, ডেকে আন ওকে। যা, শীগগীর যা।

দৌবারিক : এজ্ঞে, হো-ই দিকে দেখলাম তেনাকে। বসে রইচেন। একেবারে ধরে নিয়ে আসবো এজ্ঞে?

মন্ত্রী : এজ্ঞে না। ডেকেই আনো। যাও।

(দৌবারিকের প্রস্থান। একটু পরেই পুনঃ প্রবেশ কলমচিকে পাকড়াও করে)

দৌবারিক : এই নিন এজ্ঞে। ধরে এনেছি।

মন্ত্রী : (ধমকের স্বরে) : কেন? ধরে আনলি কেন? বললুম না ডেকে আনতে? যা—বেরো! বেরো!

(দৌবারিকের সবেগে প্রস্থান। কলমচি ধীরে ধীরে মন্ত্রীর কাছাকাছি গিয়ে নিচু হয়ে তাঁকে নমস্কার করবে, দাঁড়িয়ে থাকবে। তার দিকে মুখ না ফিরিয়েই মন্ত্রী বলবে) : তারপর? মৎলবটা কী? লেখা হবে, কি হবে না? একখানা তো চিঠি! সাত-খানা কলম কাটলে! সাতটা দোয়াত ভাঙলে। সাতটা জামা নষ্ট করলে! এঁ্যা!

কলমচি : আজ্ঞে, এই যে সাত বার হাত কেটেছি, সে কথাটা তো বললেন না?

মন্ত্রী : চুপ করো, বাক্যবাগীশ। সাত ছত্রের একখানা পত্র লিখে উঠতে পারলেন না সাত দিনের মধ্যে—আবার কথা!

কলমচি : আজ্ঞে, সাত দিন এখনও হয়নি তো। ছয় দিন ছয় রাত পেরিয়েছে—

মন্ত্রী : থামো, থামো। নাও, লেখো দেখি চিঠিটা। যাও, বসো গিয়ে। (কলমচি তার আসনে গিয়ে বসবে। কাগজ, কলম, দোয়াত সব ঠিকঠাক করবে) খুব মন দিয়ে লেখো। ভারী জরুরি চিঠি। একটি শব্দ, একটি অক্ষর—কিছু যেন বাদ না যায়।

কলমচি : আজ্ঞে না, কিছু বাদ যাবে না। সব লিখবো। (মন্ত্রীর হাতের দিকে চিঠিটা ধরে রেখে) আজ্ঞে, চিঠিটা একটু পড়ে দেবেন—আরেকবার? (মন্ত্রী চিঠিটা নিলেন হাত বাড়িয়ে।)

মন্ত্রী : দাও। এই নিয়ে ক'বার তো পড়লাম।

কলমচি : আজ্ঞে, ক'বার? দেখি, লিখে রেখেছি।

মন্ত্রী : চুপ করো। একটি কথা কইবে না আর। শোনো।

কলমচি : আজ্ঞে না, কইবো না।

মন্ত্রী : হঁ্যা, হঁ্যা—শোন দেখি এবারে। প্রথমে লিখবে—

কলমচি : আজ্ঞে হাঁ, লিখবো।

মন্ত্রী : আঃ ! আবার বকবকানি ?

কলমচি : আজ্ঞে না। আর না।

মন্ত্রী : শোনো, ভালো করে। লিখবে—শ্রীল শ্রীযুক্তস্য মহামহা মহিমার্ণবস্য নাগলাগপুরস্য রাজাধিরাজস্য বরাবরেষু—বুঝেছ ? বানান টানান সব ঠিক হয় যেন। মনে রেখো। একটিও ভুল না হয়।

কলমচি : এজ্ঞে না।

মন্ত্রী : আবার ? একটি কথা নয়। চুপ করে শোন। হ্যাঁ, লেখো। লিখেছ, বরাবরেষু ? আচ্ছা, তারপর লেখো—

জানিতে পারিলাম আপনার কামারশালাগুলি মেরামত করা হইতেছে। খানখানগঞ্জ হইতে আপনার সেনাপতি মহাশয় দুই লক্ষ মণ লোহা আনাইয়াছেন এবং দুশমন পাহাড় বরাবর আপনার সৈন্যরা গর্ত খুঁড়িতেছে। এই সবের কারণ—

(চিঠিটা পড়তে পড়তে মন্ত্রী কয়েকবার হাই তুললেন। শেষ বার হাই তুলে, চিঠিটা দিয়ে দিলেন কলমচিকে।) বললেন—নাও, ধরো। লিখে ফেল চিঠিটা। বড্ড ঘুম পেয়েছে। চুপ করে লেখো। কথা কয়ো না। আচ্ছা, দাও দিকি—সইটা করে দিই। (চিঠিটা নিয়ে নাম সই করে দিলেন।) এইখানটায় শীলমোহরটা পরে মেরে দিয়ো। বুঝলে ? (তাকিয়া টেনে নিয়ে মন্ত্রী শুয়ে পড়লেন। একটু পরেই নাক ডাকাতে লাগলেন।)

(কলমচি খানিকক্ষণ চিঠিটা লিখলো। তারপর কলমটার দিকে তাকালো। দোয়াতের মধ্যে কলমটা ডুবিয়ে তুলে আবার তাকালো সেটার দিকে। শুকনো কলম। দোয়াতটা তুলে নিয়ে কাত করে দেখবে ধীরে ধীরে। শেষে উপুড় করে ফেলবে। দোয়াতে কালি ফুরিয়ে গিয়েছে।

শীলমোহর কাছেই ছিল। চিঠিতে মোহর লাগালো। তারপর চিঠিটা ভাঁজ করে একটা খামে পুরলো। নাম ঠিকানা লিখলো খামের উপরে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো চিঠিটা হাতে নিয়ে। তারপর ঘুমন্ত মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে অতি সন্তর্পণে নিঃশব্দে প্রস্থান করলো।)

পদক্ষেপ

তৃতীয় দৃশ্য

(লাগ্‌লাগ্‌পুর রাজসভা। সিংহাসনে রাজা বসে আছেন। এক পাশে, কিছুটা সামনে, মন্ত্রী, সেনাপতি, সৈনিক, দৌবারিক। অন্য পাশে রাণী এবং কয়েকটি কিঙ্করী।

হাতে চামর, পানের থালা, ফুলের থালা। ধূপদানি থেকে ধূপের ধোঁয়া উঠছে। দৌবারিকের সঙ্গে এক পত্রবাহক প্রবেশ করবে, এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে।)

দৌবারিক (আনত নমস্কার জানিয়ে): মহারাজ, বিদেশী পত্রবাহক!

পত্রবাহক (আভূমি নত হয়ে প্রণাম জানিয়ে): শ্রীলশ্রীযুক্তস্য মহামহামহিমার্ণবস্য লাগ্‌লাগ্‌পুরস্য রাজাধিরাজস্য জয়, জয় জয়স্তু! (হাতে চিঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।)

সেনাপতি: দৌবারিক!

দৌবারিক: আজ্ঞে!

সেনাপতি: কোথা থেকে এসেছে এই পত্রবাহক?

দৌবারিক: আজ্ঞে, কাট্‌কাট্‌পুর থেকে।

সেনাপতি: কাট্‌কাট্‌পুর? আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য?

দৌবারিক: আজ্ঞে হ্যাঁ।

সেনাপতি: উত্তম। তুমি যেতে পারো।

দৌবারিক: যে আজ্ঞে! (আনত নমস্কার নিবেদন করে, প্রস্থান।)

রাজা: মন্ত্রী!

মন্ত্রী: মহারাজ!

রাজা: পত্র!

মন্ত্রী: সেনাপতি!

সেনাপতি: আজ্ঞে!

মন্ত্রী: পত্র!

সেনাপতি: এই—কে আছিস?

(একজন সৈন্য এগিয়ে এসে নমস্কার করে দাঁড়ালো।)

সেনাপতি: বিদেশী পত্রবাহক—চিঠি!

(সনাপতি আনত নমস্কার নিবেদন করে তাকালো পত্রবাহকের দিকে। নিয়ে এলো তার হাত থেকে চিঠিটা। দিল সেনাপতির হাতে। সেনাপতি চিঠিটা দিলেন মন্ত্রীকে। মন্ত্রী দিলেন রাজাকে। রাজা চিঠিটা পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে রাগতে লাগলেন। ভ্রূকুটি করে গোঁপে ঘনঘন চাড়া দিতে লাগলেন। তারপর চিঠিটা দিলেন মন্ত্রীর হাতে। গম্ভীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে হাঁকলেন):

রাজা: মন্ত্রী!

মন্ত্রী (চমক খেয়ে): মহারাজ!

রাজা: চিঠি!

(মন্ত্রী হাত বাড়িয়ে নিলেন চিঠিটা। পড়তে পড়তে ঘন ঘন দাড়িতে হাত বুলোতে লাগলেন। পড়া শেষ হয়ে গেলে, গম্ভীর কণ্ঠে হাঁকলেন): সেনাপতি!

মন্ত্রী: সেনাপতি!

(সেনাপতি হাত বাড়িয়ে নিলেন চিঠিটা। পড়তে পড়তে চোখ পাকাতে লাগলেন। শূন্যে ঘুঁষি ছুঁড়তে লাগলেন। তলোয়ারে বারে বারে হাত ছোঁয়াতে লাগলেন। চিঠি পড়তে পড়তে।)—

সেনাপতি: হুম্!…আচ্ছা!…হুম্…আ জাও! দেখ লেঙ্গে!…হুম্…আ যাও!

মন্ত্রী: সেনাপতি।

(চিঠিটা নেবার জন্যে হাত বাড়ালেন। সেনাপতি চিঠিটা মন্ত্রীকে দিলেন।)

রাজা (ভয়ঙ্কর হুঙ্কার ছেড়ে): ম—মন্ত্রী!

মন্ত্রী (চমকে উঠে): মহারাজ!

রাজা: জবাব!…জ…বাব! চিঠির জবাব!

মন্ত্রী: যে আজ্ঞা, মহারাজ!

(রাণী এতক্ষণ কেবল তাকাচ্ছিলেন পরপর সেনাপতির, মন্ত্রীর এবং রাজার দিকে। ব্যাপারটা কিছুই বোঝা যাচ্ছেনা।)

রাণী: একটা নিবেদন আছে, মহারাজ!

রাজা (শান্ত স্বরে): বল রাণী, কি বলবে।

রাণী: চিঠিটা মন্ত্রীমশাই একবার পড়ে শোনাবেন কি?

রাজা: নিশ্চয়, রাণী! তুমি যখন বলছ।—মন্ত্রী!

মন্ত্রী: যে আদেশ মহারাজ! শুনুন রাণীমা!

(চিঠি পড়তে লাগলেন উচ্চ কণ্ঠে):

শ্রীলশ্রীযুক্তস্য মহামহামহিমার্ণবস্য লাগ্‌লাগ পুরস্য রাজাধিরাজস্য বরাবরেষু—

জানিতে পারিলাম আপনার কামারশালাগুলি মেরামত করা হইতেছে। খান্‌খান্‌গঞ্জ হইতে আপনার সেনাপতি মহাশয় দুই লক্ষ মণ লোহা আনাইয়াছেন। এবং দুশমন পাহাড় বরাবর আপনার সৈন্যেরা গর্ত খুঁড়িতেছে। এই সবের কারণ সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন, নতুবা—

সেনাপতি (পত্র পাঠের মাঝে মাঝে চোখ পাকাচ্চে, ঘুঁষি পাকাচ্চে): হুম্…আচ্ছা!… হুম্ · আ যাও!…হুম্…আচ্ছা·· দেখ লেঙ্গে···হুম্…আচ্ছা…

রাজা (হুহুঙ্কারে): নতুবা!…নতুবা…কী? মন্ত্রী!…জবাব! কড়া জবাব!

মন্ত্রী (জোরে দাড়ি নেড়ে): আলবৎ। (আগামীবার সমাপ্য)

পটক্ষেপ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ঐ দেখ ষরলব-র তিন মেয়েকে মিছিল করে বাগানে আনা হচ্ছে।

ঐ দেখ কিস্‌মিসিয়ানা। ঐ বড় মেয়ে। কী মিষ্টি নীল নীল চোখ। আর কী অমায়িক ব্যবহার। ও কাঁচা কড়াই খেতে ভালবাসে আর ফোচ্‌কা আর দই-বড়া।

আর ঐ যে বাদামী চোখ মেয়েটি, ও মেজ। ওর নাম পেস্তানিয়া। ভঙ্গী নম্র আর মিষ্টি। খেতে ভালবাসে কুলকুটো আর বেলের মোরব্বা। ও স্বপ্নবিলাসী রাত্রে তারার দিকে চেয়ে বসে থাকে।

সব চেয়ে মিষ্টি ঐ ছোট মেয়েটি নাম ওর আঙুরিনা, আঙুরের মত টুশটুশে গাল দুটো। ডালমুট আর ঝালছোলা খেতে ভালবাসে।

এদের আনা হয়েছিল একরকম মাথা খোলা পালকী করে। বাহকদের মধ্যে ছিল চিনচিনিয়া, কেকরালি, সবজিনিয়া, ফলসা। তদারক করে নিয়ে আসছিল ল্যাগবেগে ঐতিহাসিক আর গুগলী ঝিনুক।

চোরামাণিক্য বাগানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললে, "কিস্‌মিসিয়ানা, পেস্তানিয়া আর আঙুরিনা, তোমাদের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে তোমাদের এখানে এই বাগানে রেখে গেলাম। কেউ কারু সঙ্গে কথা কইবে না। প্রকৃতি তোমাদের শিক্ষা দেবে। পাখীরা গান শোনাবে, উড়ুক্কু মাছেরা দেশের খবর এনে দেবে—সারেগামা তোমাদের বাগানের

কাজ করবে। মাঝে মাঝে ডাক্তার আসবে—যদি রোগ হয় তার চিকিৎসার জন্যে। আর গুগলী ঝিনুক নিয়মিত তোমাদের খাবারের ব্যবস্থা করবে।"

তারপর চোরামাণিক্য তাদের বড় বড় ছুটো কেক উপহার দিলেন। এর পরই উপহার দেবার পালা। গুগলী ঝিনুক দিলে এক চ্যাঙারী ফল, ঐতিহাসিক দিলে গোল-করে পাকানো এক তাড়া কাগজ। সকলেই উপহার দিতে লাগল। উপহার দেওয়া শেষ হ'তে একটা ইঞ্জিন—কয়েকটা মালগাড়ীসুদ্ধ হুশ হুশ করে এসে হাজির হ'ল। কালো পোষাক পরা পরচুলওলারা সব উপহার মালগাড়ীতে বোঝাই করে নিয়ে চলে গেল।

খুড়ো খুড়ী দেখলে—সব্বাই চলে যাচ্ছে। রইল শুধু সারেগামা।

খুড়ী বললে, "কোথায় নিয়ে গেল উপহারগুলো?"

সারেগামা বললে, "যাতুঘরে। ওগুলো যাতুঘরে সাজানো থাকবে। মেয়ে তিনটি বড় হয়ে যাত্নঘরে গিয়ে দেখবে তাদের বিদ্যালয়ে যাবার আগে আশ্চর্য নগরের সবাই তাদের কেমন করে উৎসাহ দিয়েছিল।

সবাই চলে গেলে খুড়ো খুড়ী লক্ষ্য করলে ছু'জন পাহারাদার বাগানের তিনদিক ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে। এক দিকে মিছরির পাহাড়—বেজায় উঁচু—সেদিক দিয়ে কোন ভয় নেই, ভেবে তারা সেদিকটা পাহারা দিচ্ছিল না। সেই দিকেই পাহাড়ের এপারে খুড়ো খুড়ী দারুচিনি গাছের তলায় অপেক্ষা করছিল।

ওরা দেখলে ঐতিহাসিকের বাড়ীর ফোকর দিয়ে উড়ুক্কু মাছটা ঘরে ঢুকে বলে উঠল, "বিশ্রামের সময় হয়েছে।"

খুড়ী খুড়োকে বল্লে, "ওগো, দারুচিনি গাছের উপর লাল নিশান উড়িয়ে দাও।"

ইতিমধ্যে উড়ুক্কু মাছ দেশময় ঘুরে ঘুরে বিশ্রামের সময় বলে দিতে লাগল। সবাই একে একে ঘুমুলো। পাহারাদার ছুটো, ছুটো টুলে বসে ঘুমে ঝুঁকে পড়লো।

এই অবসরে খুড়ো খুড়ী মিছরি পাহাড় দিয়ে নেমে এসে ষরলব'র মেয়েদের বাগানের ধারে দাঁড়ালো।

মঠ, ছাঁচ, কেক, ফলফুলুরী আর মেঠাই-জীবদের মধ্যে থেকে তারা হাঁফিয়ে উঠেছিল। ছুটি মানুষকে দেখে তারা হাততালি দিয়ে উঠলো।

খুড়ী বললে, "বাচারা, তোমাদের আমরা নিয়ে যেতে এসেছি।"

"কোথায়, কোথায়, কোথায়"—সকলেরই চোখ উৎসাহে বড়ো বড়ো হয়ে উঠল।

"তোমাদের বাবাকে মনে পড়ে?" খুড়ী জিগ্যেস করলে।

"বাবা!" সকলের চোখই স্বপ্নের নেশায় ভরে এল। কিস্‌মিসিয়ানা বললে, "আবছা আবছা।"

পেস্তানিয়া বললে, "আমার খুব মনে পড়ে।"

আঙ্গুরিনা বললে, "কোথায় তিনি?" তার চোখ জলে ভরে উঠলো।

খুড়ো বললে, "আজই তিনি আসবেন। সবাই একসঙ্গে এদেশ ছেড়ে চলে যাবো। ওরা ঐ আশ্চর্য নগরের উদ্ভট বাসিন্দেরা তোমার বাবাকে কয়েদখানায় রেখেছে। আজ তাঁর মুক্তি!"

মেয়েরা বললে, "আমরা এখন কি করবো?"

খুড়ী বললে, "কথাটা কইবে না। যখন পাহারাদাররা নজর রাখবে না তোমরা মিছরি পাহাড়ে কেবল ধাপ কাটবে। ধাপ কাটা শেষ হলেই···হাঁটি হাঁটি পা পা করে উপরে উঠে এক লাফে দারচিনি গাছের তলায় আসবে। আমরা ওখানে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব। ঐ দেখ লাল নিশান উড়িয়েছি। ঐ নিশান দেখে তোমার বাবা এই এসে পড়লেন!

মিছরির পাহাড়ে ধাপ কাটা সহজ—বিনা ধাপেই ওঠা যায়। তবু একটু-আধটু কেটে তিন বোন উপর পর্যন্ত ধাপ তৈরী করে ফেললে!

এদিকে দেখা গেল ঝড়ের বেগে আখের ঝাড় এগিয়ে আসছে। তার মধ্যে ছুটে আসছে যবলব। বাগানের কাছে আসতেই কিসমিসিয়ানা, পেস্তানিয়া আর আঙ্গুরিনা মিছরির পাহাড় ডিঙিয়ে দারুচিনি গাছের তলায় খুড়ীর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। খুড়ী আনন্দে অধীর হয়ে কাউকে কোলে, কাউকে কাঁখে করে ধরে ফেললে।

সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে যবলব মিছরির পাহাড় ডিঙিয়ে এদিকে চলে এল। আখের ক্ষেত ওপারে পড়ে রইল। ইঁদুররা সব মিছরির পাহাড়ের ফাটলে আশ্রয় নিলে।

কয়েকটা মেঘ পাহাড়ের খুব কাছ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল আশ্চর্য নগরের দিকে। খুড়ো সেই মেঘ লক্ষ্য করে পরপর কয়েকটা সয়াবীনের চাটনীর শিশি ছুড়ে দিলে। মেঘেরা সেই চাটনীর সঙ্গে জল মিশিয়ে আশ্চর্য নগরে বৃষ্টি নামলো। সব ঝাপসা করে বৃষ্টি হতে লাগলো।

এদিকে খুড়ো পকেট থেকে ক্ষুর কাঁচি বার করে যবলবকে কামিয়ে পরিষ্কার করে দিলে। এক ঝাঁক উড়ুক্কু মাছ কয়েকটা জামা কাপড় জুতো টুপি খুড়ো খুড়ীর দিকে ছুড়ে দিয়ে উড়ে চলে গেল।

খুড়ো যবলবকে জামাকাপড়, লপেটা জুতো আর টুপি পরিয়ে ফুলবাবু বানিয়ে হাজির করল খুড়ীর কাছে।

যরলব তার মেয়েদের আদর করে কোলে তুলে নিলে। তখন যরলবকে যা সুন্দর দেখাচ্ছিল। যেন ফুলের বনের প্রজাপতি।

এদিকে আশ্চর্য নগরে যখন বৃষ্টির জলের সঙ্গে সয়াবীনের চটনী মিশল তখন সব কিছু গলে যেতে লাগল। কোথায় গেল চোরামাণিক্য! গুগলী ঝিনুক নেতা-জোবড়া হয়ে গেল। চিনি মঠ ছাঁচ সব গলে একাকার হয়ে গেল। সারা নগরটা খুড়ো খুড়ীর চোখের সামনে থেকে যেন মুছে লোপাট হয়ে গেল।...

ঘাস গাছ সব বেড়ে বেড়ে আকাশ পর্যন্ত উঁচু হয়ে সব আড়াল করে দিলে।

খুড়ো খুড়ী, যরলব আর কিসমিসিয়ানা, পেস্তানিয়া, আঙ্গুরিনা চললো খুড়ো খুড়ীর দেশের দিকে। খুড়ী গুন্‌গুনিয়ে গান ধরলো—

"যত কিছু মিষ্টি তুনিয়ার—
তারি মাঝে তিনটি মেয়ে যার—।
কিস্ মিস্ কিস্‌মিসিয়ানা
কত মধুর কেউ জানে না—
পেস্তানিয়া আঙ্গুরিনা আর—
সব চেয়ে যে মিষ্টি তুনিয়ার—।"

যরলব চলেছে লটর-পটর লপেটা জুতো পায়ে, কোঁচা তুলিয়ে, খুড়োর সঙ্গে গল্প করতে করতে।

আর মেয়ে তিনটি—যেন তিনটি চঞ্চল হরিণ ছানা—নাচতে নাচতে পথ চলেছে।*

*গল্পটি তোমাদের কেমন লাগল? এ গল্পটা পুরোপুরি আমার লেখা নয়। বহুকাল আগে একটা পুরনো ছেলেদের বই আমার হাতে আসে। নাম "The City Curious"—ইংরাজীতে লেখা কিন্তু মোট একটি বেলজিয়ান্ লেখকের বইয়ের ইংরাজী অনুবাদ। লেখকের নাম Jean Bosschere. আমি অবশ্য স্বাধীন ভাবে তা অদল বদল করেছি। তবু ঋণ স্বীকার করতেই হবে। বেলজিয়ান ছেলেমেয়েরা এটাকে পছন্দ করেছিল, তোমাদের কেমন লাগল, সম্পাদক মশাইকে জানিও। —লেখক

সমাপ্ত

কাটল মাছ

শ্রীচন্দনকুমার সেনগুপ্ত

কাটল্ মাছের নাম শুনেছো? এরা সমুদ্রে বাস করে। এই মাছগুলির আছে কেবল একটি মাথা আর আটখানি পা। দেখতে এরা কতকটা অক্টোপাশের মত! এতগুলো পায়ের সহায়তায় এরা সমুদ্রের তলদেশে বিচরণ করতে পারে, আবার শিকার ধরবার ব্যাপারেও এই পাগুলিই এদের প্রধান অস্ত্র। কাটল্ মাছের দেহে কতগুলি চোখের মতো দাগ দেখতে পাওয়া যায়। এগুলির সাহায্যে এরা শিকারকে বেশ দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরে। চোখের মতো ঐ পদার্থগুলি পেশীযুক্ত কাপের মতো এবং এর চারিদিকে আছে বেশ মোটা এবং শক্ত মাংসের বন্ধনী। এরা যখন শিকারকে দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরে, তখন ঐ মাংসপেশী কাপের মধ্যে থেকে বাতাস বের করে দেয়, ফলে মাংসের বন্ধনী শিকারের গায়ে ভীষণ শক্তভাবে আটকে যায়। তখন শিকারে তা' থেকে মুক্তি পাবার ক্ষমতা থাকে না। এরা ঝিল্লির সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে। এই ঝিল্লি এদের দেহের মধ্যেই থাকে।

কাটল মাছের চেহারা
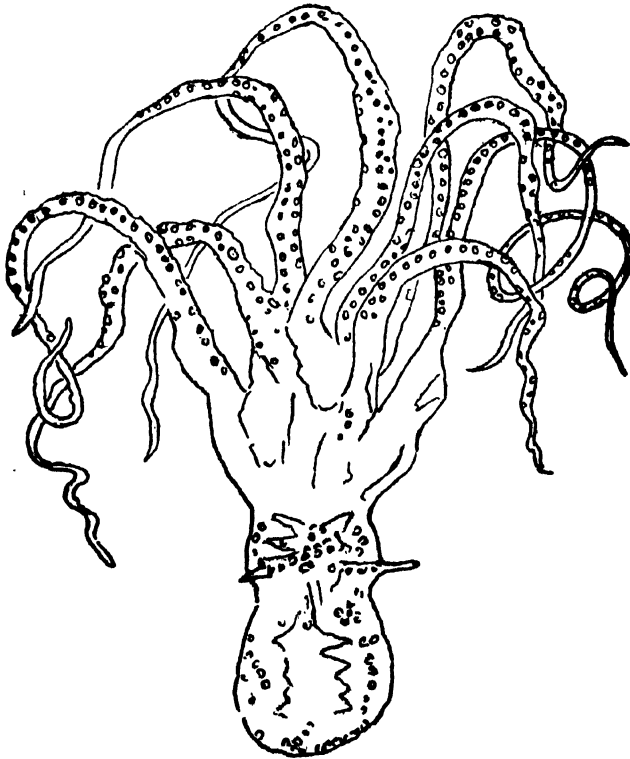
কাটল্ মাছের মধ্যেও আবার শ্রেণীবিভাগ আছে। "অক্টোপাস" বলে একটা শ্রেণী আছে তারা ভীষণ হিংস্র। কাটল্ মাছের দেহের মধ্যে কালির মতো তরল পদার্থে পূর্ণ একটি থলি আছে। যখন কোন শত্রু এদের আক্রমণ করে তখন এরা জলে খানিকটা কালি ছেড়ে দেয়, ফলে জল ভীষণ কালো হয়ে যায়, এদেরও আর দেখা যায় না। তখন এরা বেশ গভীর জলে পালিয়ে যায়।

এই কালো রং-এর কালিকে "সেপেয়া" বলে যারা ছবি আঁকে তারা এই কালি ব্যবহার করে। সুতরাং বুঝতেই পারছো যে, এই "সেপেয়া" রঙ অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু।

তুমি আমি

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

মৌমাছি মৌমাছি,
তুমি আছো আমি আছি,
দু'জনেই গড়ি মৌচাক ;
তুমি করো গুনগুন্,
আমি শুধু উন্মুমুন্
সবারে ফিরি যে দিয়ে ডাক।

তুমি আমি দু'জনেই
মনে মনে বেছে নেই
নির্জন একটি কিনার,
তারপর একে একে
সবার দৃষ্টি ঢেকে
গ'ড়ে তুলি মস্ত মিনার।

তুমি দাও মধু সুধা,
আমি আঁকি এ বসুধা
আপন মনের মধু দিয়ে,
একই কাজে দোঁহে রত,
একই প্রাণ, একই ব্রত,
তুমি আমি একটি হিয়ে।

দেখে যাক্ সবে এসে,
কত ভাবে কত বেশে
তোমাতে আমাতে কত মিল!
সব তেতো মিঠে ক'রে
সব প্রাণ দিই ভ'রে,
আজো তাই হাসে এ নিখিল।

মৌমাছি মৌমাছি,
তুমি আছো আমি আছি,
তুমি আমি বন্ধু দু'জন।
এস এস হাসি গাই,
দু'জনাতে ভেসে যাই,
যেথায় ছড়ানো ফুলবন॥
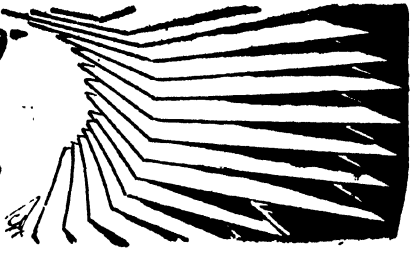
সিন্ধ্রি ভ্রমণ

গ্রীষ্মের ছুটির পর প্রথম দিনই স্কুলে যেয়ে শুনলাম যে. আমাদের ক্লাসের চারজন মেয়ে বৃত্তি পেয়েছে। শুনে আমাদের সকলের মনেই খুব আনন্দ হ'ল। এও শুনলাম যে, এই বৃত্তি পাওয়া উপলক্ষে স্কুল থেকে আমাদের সবাইকে সিন্ধ্রিতে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হবে। ক্লাসের বেশীর ভাগ মেয়েই যাবে। আমিও যাব ঠিক করলাম। আমরা দিনগুণতে লাগলাম। দেখতে দেখতে সে দিনও এসে হাজির হ'ল। সেই দিনটা ছিল মঙ্গলবার ! ঐ দিন আমরা সকলে সাদা জামা পরে,মাথায় লাল ফিতে বেঁধে মেদিনীপুর ষ্টেশনে এলাম। স্কুল থেকে আমরা ৪০ জন মেয়ে গিয়েছিলাম। দিদিমণিরা কয়েকজন ও একজন মাষ্টার মশাইও সঙ্গে গিয়েছিলেন। দিদিমণিরা ষ্টেশনে সকলকে গুণে নিলেন। ষ্টেশনে ট্রেন আসতে আমরা সকলে লাইন করে গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। ১২টা ৫৫ মিনিটে গাড়ী ছাড়ল।

সারা রাস্তা আমরা গান করতে করতে গেছি। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা নাগাদ আমরা ভাগা ষ্টেশনে এসে পৌছলাম। সেখান থেকে সিন্ধ্রি ১৫ মাইলের পথ। ভাগা ষ্টেশন থেকে বাসে করে আমরা রাত্রি ৮টা নাগাদ সিন্ধ্রিতে এলাম। সেখানে একটি কনভেন্ট স্কুলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। স্কুলটি খুব বড়। সেখানে দোলনা, স্লিপ ইত্যাদি খেলবার জিনিস আছে। আমরা যে সময় সেখানে পৌছেছিলাম সেই সময় ওদের স্কুলের ছুটি ছিল। ওখানে গ্রীষ্মের ছুটি দেড় মাস।

সাড়ে আটটার সময় আমরা সকলে হোটেলে খেতে গেলাম। যেখানে আমরা উঠেছিলাম, সেখান থেকে হোটেল খুবই কাছে। খেয়ে এসে যে-যার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। সকলেই খুব ক্লান্ত হয়েছিলাম বলে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে, জল খাবার খেয়ে সাদা জামা আর মাথায় লাল ফিতে বেঁধে বাসে করে কারখানা দেখতে গেলাম। এই কারখানা এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম সারের কারখানা।

সিন্ধ্রি বিহার প্রদেশের মধ্যে অবস্থিত। এই কারখানায় ছোটদের ঢুকতে দেওয়া হয় না। আমাদের ভাগ্য ভাল যে, আমরা ঢুকতে পেরেছিলাম। প্রথমে দেখলাম কোক ওভান। এখানে কয়লা পুড়িয়ে গ্যাস হচ্ছে। কয়লা তরল অবস্থায় বেরিয়ে যাচ্ছে। তা থেকে বেঞ্জিন ও আলকাতরা তৈরী হয়, আর হার্ড কোক গ্যাস তৈরীর কাজে লাগে। গ্যাস থেকে অ্যামনিয়া সার তৈরী হয়।

অ্যামনিয়া এক জায়গায় এসে জমা হয়। সেখান থেকে নল দিয়ে তা ব্যাগে এসে ভর্তি হয় এবং অন্য একটি যন্ত্রের সাহায্যে সেই ব্যাগগুলি সেলাই হয়ে যায়। সেখান থেকে আমরা কিছু অ্যামনিয়া সালফেট সঙ্গে নিলাম।

তারপর কারখানার মধ্যেই আর একটি জায়গায় এলাম। সেখানে এত গ্যাসের গন্ধ যে ঢুকতে পারলাম না। সেখান থেকে গেলাম আরও একটি জায়গায়। সেখানে জিপসাম্ পাথর দেখলাম। এই পাথর রাজস্থান থেকে চালান আসে। অ্যামনিয়া তৈরী করতে গেলে এর নাকি দরকার হয়। সেই পাথরও কিছুটা সঙ্গে নিলাম আমরা দু'একজন। সেখান থেকে এবার যে জায়গাটিতে আমরা গেলাম, সেটা তেতালার ওপর। লিফ্‌টে করে উপরে উঠলাম আমরা। সেখান থেকে দূরে দামোদর নদী দেখা যায়। ওখানে একটি air-conditioned ঘরে গেলাম, সেখান একটি গরম ঘরেও ঢুকলাম। এটা-ওটা দেখতে দেখতে একটি রঙিন কাচের সাহায্যে দেখলাম যে, কয়লা পুড়ে গেলে কি রকম দেখায়। এটির পর আমরা আর একটি জায়গায় এলাম, সেখানে দামোদর নদীর জল ফিল্টার করে কাজে লাগান হচ্ছে।

কেবলমাত্র দুটি জায়গায় আমাদের ঢুকতে দেওয়া হ'ল না বটে, তবে দিদিমণিরা ঐ স্থান দুটি দেখে এলেন। পুরো কারখানাটি দেখে যখন আমরা ফিরলাম, তখন বেলা দুটো বাজে। হোটেলে খেয়ে সেই স্কুলে ফিরে এলাম। চারটের সময় আবার আমরা বাসে করে শহর দেখতে বেরলাম। ওখানকার স্থানীয় হাসপাতাল দেখলাম। হাসপাতালে ১০০টি বেড্ আছে। মেয়েদের স্কুল ও একটি ক্লাবও দেখলাম। সেই ক্লাবে ব্যায়াম, নানা রকম খেলা, থিয়েটার ও বই পড়া হয়ে থাকে। একটি সিনেমা হলও আছে ওখানে। তারপর লেক্ দেখতে গেলাম। লেক্ এখনও সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়নি। যা দেখলাম তা খুবই সুন্দর লাগল। আশা করি সম্পূর্ণ হলে আরও অনেক সুন্দর হবে।

সিন্ধ্রি খুব পরিষ্কার শহর। ছবির মত। সন্ধ্যে বেলায় সব ঘুরে-ফিরে এসে আমরা নাচ, গান, আবৃত্তি ও কমিক করলাম নিজেরা। ঐসব শেষে হোটেলে খেয়ে এসে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম, কারণ পরদিন আবার ভোরেই রওনা হতে হবে। ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে উঠে, মুখ ধুয়ে, জল খাবার খেয়ে বাসে করে ডাগা ষ্টেশনে গেলাম। সাতটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে ট্রেন ছাড়ল। যাবার সময় যে যে দৃশ্য এবং ষ্টেশন দেখেছিলাম, আসার সময়ও সেগুলিই আবার দেখলাম। অনেক পাহাড়, অনেক শালবন চারিদিকে। সিন্ধ্রি আমার এতই ভাল লেগেছিল যে, সেখান থেকে আর ফিরে আসতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। সিন্ধ্রি-ভ্রমণের আনন্দ আমার চিরকাল মনে থাকবে।

শ্রীঅদিতি মৌলিক

রান্নাঘরের জিনিসগুলো

শ্রীঝুমুর চৌধুরী

রান্নাঘরের জিনিসগুলি ভালোই ছিল সব
হঠাৎ তারা উচ্চৈঃস্বরে তুল্‌ল কলরব।
খুন্তি, হাতা, হাঁড়ি, কড়াই, সবাই মেতে উঠে
ফূর্তি-ভরে নৃত্য কোরে মরছে শুধু ছুটে।
হঠাৎ এ কী! সবাই দেখি মিলছে এক ঠাঁই
ফন্দি ক'রে পাখীর রূপ ধরবে, বুঝি তাই!
সাড়াঁশিটা ষণ্ডা বড়, উঠল ভারী খেপে
দৌড়ে এসে হাঁড়ির পেট ধরল ক'সে চেপে।
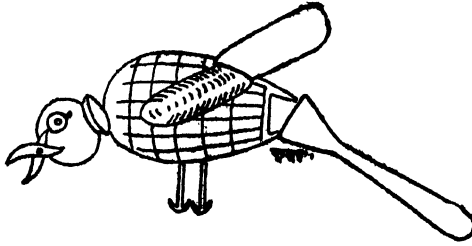
হাঁড়ির মুখ লাগল এসে কুলোখানার গায়
খুন্তি এসে কামড়ে ধরে পিছন হতে তায়।
ডালের কাঁটা লাগ্‌ল নীচে পায়ের রূপ ধ'রে
ডানার মত ছুরির ঢঙ্‌ কুলোর গায়ে চড়ে।
উল্‌টো কাপ হাঁড়ির গায়ে লাগ্‌ল, যেন চোখ—
সবার মাঝে সংক্রামিত পক্ষী হবার রোগ।
ঠোঁট সাড়াশি; হাঁড়ির মাথা; খুন্তি হলো লেজ।
এমন পাখী ঠুন্‌কো নয়, অসীম তার তেজ।
উড়বে পাখী, ঘুরবে পাখী খোকাখুকুর কাছে:
দুধ খাবে না, বুট খাবে না, অরুচি তার মাছে।
জল দিলে সে নাইবে শুধু, গাইবে চাঁছা গান
এমন পাখী কেউ মেরো না, করবে তবে মান
মনের দুঃখে রান্না ঘরে আবার যাবে ফিরে
পাখীর বেশ হারিয়ে যাবে খুন্তি হাতার ভিড়ে॥

মেঠুড়ে

ক্রিকেট : ইংলণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

লর্ডস মাঠে ইংলণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ায় অস্ট্রেলিয়া ১—০ খেলায় এগিয়ে আছে।

ওল্ড স্ট্রাফোর্ড টেস্টে অস্ট্রেলিয়া যেমন সর্ববিভাগে প্রাধান্যের পরিচয় দিয়েছিল, লর্ডসে ইংলণ্ড তেমন দিয়েছে পাল্টা প্রাধান্যের পরিচয়। বলা যেতে পারে, বরুণদেবের জন্যেই অস্ট্রেলিয়া হারতে হারতে বেঁচে গেছে। বৃষ্টি না হলে এ খেলায় হয়তো অস্ট্রেলিয়া পরাজয়ের হাত থেকে রেহাই পেত না।

লর্ডসে এই খেলাটায় রেকর্ড অর্থ সংগৃহীত হয়েছে। যে অর্থ আজ পর্যন্ত কোনো টেস্টেই সংগৃহীত হয়নি। লর্ডসের হিসেবে দর্শকও ছিল রেকর্ড সংখ্যক।

বৃষ্টির মধ্যে ক্রিকেট খেলতে অস্ট্রেলিয়া মোটেই অভ্যস্ত নয়। তাই ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসের বিরুদ্ধে তাঁদের শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় মিলেছে। ফলো অন করতে হয়েছে। তবে ফলো অনের পর তাঁরা যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন তা অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য। প্রথম টেস্টে ইংলণ্ডের পক্ষে যাঁরা খেলেছিলেন তাঁদের মধ্যে থেকে ডেনিস এমিস, কেন হিগস ও বব্ বারবারকে বাদ দিয়ে কলিন মিলবার্ণ, কেন ব্যারিংটন ও ডেভিস ব্রাউনকে দলভুক্ত করে ইংলণ্ডের নির্বাচকরা যে ভালো কাজ করেছেন তা বলা যায়। কারণ, বৃষ্টি-ভেজা উইকেটেও তাঁরা ৭ উইকেটে ৩৫১ রান করে ইনিংস ডিক্লেয়ার করেছেন, অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ করেছেন মাত্র ৭৮ রানে, ফলো অন করিয়ে ১২৭ রানের মধ্যে দখল করেছেন অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের চারটে উইকেট।

প্রথম দিন মধ্যাহ্ন-ভোজের সময় পর্যন্ত খেলায় ইংলণ্ড ১ উইকেট হারিয়ে ৫৩ রান তোলে। তার পরই প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হয়—খেলা আর হয় না। ইংলণ্ডের ১০ রানের মাথায় ওপেনিং ব্যাটসম্যান জন এডরিচ আউট হয়ে গেলেও অপর ওপেনিং ব্যাটসম্যান জিওফ বয়কটের সঙ্গে কলিন মিলবার্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ইংলণ্ডের বড় রানের ভিত্তি তৈরী করেন। দ্বিতীয় দিন ইংলণ্ডের দ্বিতীয় উইকেট পড়ে ১৪২ রানের মাথায় এবং দ্বিতীয় দিনের শেষে ইংলণ্ডের ৫ উইকেটে ৩১৪ রান ওঠে। তৃতীয় দিন মাত্র ৫৮ মিনিটের

খেলায় আর দুটো উইকেট হারিয়ে ৩৭ রান যোগ অর্থাৎ তৃতীয় দিনের শেষে ইংলণ্ডের ৭ উইকেটে ৩৫১ রান।

চতুর্থ দিন ইংলণ্ড আর ব্যাট করে না। শুরু হয় অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং বিপর্যয়। অধিনায়ক লরির শূন্য রানে বিদায়, কাউপার ৮ রানে আউট, ইয়ান রেডপাথ ৪, পাল সিহান ৬, এমনি করে মোট ৭৮ রানে ইনিংস শেষ। ফলো অনের পর অস্ট্রেলিয়া অত্যন্ত সতর্কতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাট করতে থাকে। চা পানের সময় কোনো উইকেট না হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে ২৬ রান এবং দিনের শেষে বিনা উইকেটে ৫০ রান। ডেভিড ব্রাউন ও ব্যারী নাইটের মারাত্মক বলের জন্যেই অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে এই বিপর্যয়। দ্বিতীয় ইনিংসেও তাঁদের বলে সমান ধার ছিল, কিন্তু সে ধারকে ব্যাটের বিক্রমে ভোঁতা করেছিলেন লরি ও রেডপাথ। শেষ দিন অষ্ট্রেলিয়া ৪ উইকেটে ১২৭ রান সংগ্রহের পর খেলার ওপর যবনিকা পড়ে।

এই খেলায় ইংলণ্ডের অধিনায়ক কলিন কাউড্রে ক্যাচ ধরার কৃতিত্বে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন। টেস্ট খেলায় ক্যাচ ধরায় বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন ওয়ালী হ্যামণ্ড। তাঁর ক্যাচের সংখ্যা ছিল ১১০। কাউড্রে সে সংখ্যা পার করেন (১১২)।

লর্ডসে ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার এই সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ছিল দু দেশের দ্বিশততম ক্রিকেট টেস্ট। দু দেশের দুশটা টেস্টের ভেতর এখন জয়-পরাজয়ের হিসেবে অষ্ট্রেলিয়া পনেরটা জয়ে এগিয়ে আছে। তাদের জয়ের সংখ্যা ৮০, ইংলণ্ডের ৬৪। ৫৫টা টেস্টের ফলাফল অমীমাংসিত। এই খেলাটাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে অষ্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্যার রবার্ট মেঞ্জিস একটা স্বর্ণমুদ্রা দান করেছিনে টস করার জন্যে। স্বর্ণমুদ্রাটায় ছিল ১৮৮০ সালের ছাপ, অর্থাৎ যে বছর থেকে ইংলণ্ডে টেস্ট খেলা সুরু হয়। মুদ্রাটা পরবর্তী তিনটে টেস্টে ব্যবহারের পর লর্ডসের লং রুমের সংগ্রহশালায় দর্শনীয় দ্রব্য হিসেবে থাকবে।

প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগ

প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগ অনিশ্চতার জালে জড়িয়ে পড়েছিল। সিঙ্গল লীগ, লীগ-কাম-নট আউট, সিঙ্গল লীগের পর শীর্ষস্থান অধিকারী প্রথম চারটে দলের ভেতর ডাবল লীগ এবং প্রথম চারটে দলের ভেতর সিঙ্গল লীগে চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ধারণের প্রশ্ন নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনার পর শেষে বি. এন. আর-এর শেষোক্ত প্রস্তাব আই. এফ. এ. পরিচালকমণ্ডলীর ৬ জনের সভায় গৃহীত হয়। গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে: এবার প্রথম ডিভিসনের পনেরটা দল প্রথমে একটা করে ম্যাচ খেলবে। এই খেলার পর

শীর্ষস্থানের অধিকারী প্রথম চারটে দল চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের জন্তে আবার লীগ প্রথায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। চতুর্দলীয় লীগে প্রথম স্থান অধিকারীই হবে চ্যাম্পিয়ন। সিদ্ধান্তটা শুধু এ বছরের জন্মেই। এবং প্রথম ডিভিসনের বিভিন্ন দলগুলো এই প্রস্তাব মেনে নেওয়ায় প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগ ৮ই জুন ১৯৬৮ থেকে শুরু হয়েছে।

প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের খেলা আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার ময়দান প্রায় জমজমাট। সব দলই আসরে নেমেছে, বিভিন্ন দলের শক্তি-সামর্থ্যেরও একটা আন্দাজ পাওয়া গেছে। তবু খেলোয়াড়দের নৈপুণ্যগত উৎকর্ষ অনুযায়ী দলগত খেলার মধ্যে তফাত অনেক। তুলনামূলক বিচারে প্রতিষ্ঠিত দলের চেয়ে মাঝারি শক্তির দলগুলোই ভালো খেলছে। তাদের খেলায় দৃঢ়তা ও আন্তরিকতার পরিচয় আমরা এর মধ্যেই পেয়েছি।

মোহনবাগান প্রথম খেলায় জর্জ টেলিগ্রাফকে ৬—২ গোলে এবং দ্বিতীয় খেলায় হাওড়া ইউনিয়নকে ৫—১ গোলে সহজেই হারিয়ে দেয়। মোহনবাগানের নাইম হাওড়ার বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিকও করেছেন তবু দুটো খেলায় মোহনবাগানের তিনটে গোল রক্ষণভাগের ভুল খেলা বা দুর্বলতারই পরিচয়। তৃতীয় খেলায় ইস্টার্ণ রেলের সঙ্গেও তারা ভালো খেলতে পারেনি। অস্পষ্ট আলোর জন্তে এগার মিনিট আগে খেলা বন্ধ হয়ে না গেলে ইষ্টার্ণ রেলের কাছ থেকে মোহনবাগান পুরো পয়েন্ট পেতো কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

ইস্টবেঙ্গল দলের চারটে জয়ের ভেতর উয়াড়ি ও রাজস্থানের বিরুদ্ধে তিনটে করে গোল করলেও ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখে দর্শকরা খুশি হননি। কালীঘাট ও এরিয়ানের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের জয় তো রীতিমত কষ্টার্জিত।

সাদাতুল্লার হ্যাটট্রিক সমেত গতবারের অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ন মহমেডান স্পোর্টিং প্রথম খেলায় জর্জ টেলিগ্রাফকে ৪—১ গোলে ও দ্বিতীয় খেলায় বাটা দলকে ২—০ গোলে হারিয়ে তৃতীয় খেলায় হাওড়া ইউনিয়নের কাছে প্রথম একটা গোল খায়। পরে অবশ্য গোল শোধ করে ২—১ গোলে এগিয়ে যায়, কিন্তু মেঘলা আকাশের অস্পষ্ট আলোর জন্তে খেলা পাঁচ মিনিট আগেই বন্ধ হয়ে যায়।

বি. এন. আর দলের সূচনা ভালোই হয়েছিল। প্রথম খেলাতেই জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে ছ-গোল, কিন্তু দ্বিতীয় খেলাতে খিদিরপুরের বিরুদ্ধে কোনো রকমে ১—০ গোলে জয়। কালীঘাটের বিরুদ্ধে ২—০ গোলে জয়ও কিছুটা ভাগ্যের সহায়তা। তার পরের খেলাতেই উয়াড়ির কাছে ২—৩ গোলে হার।

বাজিকর

১। এমন একটি জিনিসের নাম করো যার একমাত্র মালিক তুমি, অথচ তোমার কাছ থেকে চুরি না করে, ধার না করে, এমন কি কিনেও না নিয়ে তোমার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলে জিনিসটা তোমার চেয়ে অনেক বেশী ব্যবহার করে। বলো তো জিনিসটির নাম কি ?—

শ্রীকৃষ্ণা বসু

২। তিন অক্ষর যুক্ত করে হয় তার নাম,
হেথা-হোথা পাইলেও অরণ্যে ধাম।
শেষ অক্ষর দিয়ে বাদ তুলে রাখ তূণে
মাঝের অক্ষর বাদ দিলে খুঁজে পাবে দিনে।—

শ্রীচিত্ত মাইতি

৩। এমন কি মাছ আছে, যার পেট কেটে দিলে পাখী হয়ে যায় ?—

শ্রীআশীষ মুখোপাধ্যায়

জ্যৈষ্ঠ মাসের ধাঁধার উত্তর

১। **জোড়-বিজোড় :** জোড়া আছে—মাথা গোল লাঠি, মাঝখানে কালো গোল—দুদিকে পাপড়ি, কালো বৃত্তের মধ্যে সাদা অর্ধবৃত্ত, বড় কালো বৃত্ত, চতুর্ভুজের মধ্যে বৃত্ত, আয়ত ক্ষেত্রের মধ্যে বৃত্ত, ষ্ট্যাণ্ডের সঙ্গে গোলাকার আয়না, রিভেট, ষ্ট্যাণ্ডের উপর বাটি, লাট্টু। জোড়া নেই—বৃত্তের মধ্যে চতুর্ভুজ ও ত্রিভুজ, একটা আয়তের মধ্যে দুটো গোল চিহ্ন, চতুর্ভুজের মধ্যে স্প্রিং, লাইট, ছোট কালো কৌটা, কালো বৃত্তের মধ্যে সাদা কৌটা, কালো ছোট ফিতে, বৃত্তের মধ্যে বৃত্ত।

২। **শব্দ সাজানোর ধাঁধা—**

(১)	কমল	(২)	সরোজ	(৩)	গোলাম	(৪)	গগন
	মরাল		রোদন		লাগাম		গভীর
	ললনা		জনক		মমতা		নরক
(৫)	সাধক	(৬)	তামাক	(৭)	পুস্তক	(৮)	বোতল
	ধবল		মাকাল		স্তম্ভিত		তলব
	কলস		কলম		কতক		লবণ

তোমাদের যখন লিখছি তখন কোলকাতা শহরে দু'টি বড় ঘটনা। প্রথমটি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র বিক্ষোভ, ব্যাপারটি দুঃখের ও মর্মান্তিক সন্দেহ নেই। আশা করি এ খবর বিস্তৃতভাবে সংবাদপত্র মারফৎ তোমরা জেনেছ। প্রায় প্রতিটি পরীক্ষার সময় এরকম ঘটনা ঘটছে। এর অবসান কি ছাত্রদের হাতেই নয়? এর লজ্জা ও দুঃখ সকলের—বিশেষ করে দেশের জনসমাজের। এই দুঃখজনক ঘটনা পুনঃপুনঃ না ঘটুক এই কথাই তোমাদের বার বার বলি। দ্বিতীয় ঘটনা—জলস্রোত। আমাদের জীবনে ঠিক এ ধরণের বৃষ্টি বা জলমগ্ন কোলকাতা কখনও প্রত্যক্ষ করিনি। তিনটি দিন বহু বিঘ্ন ও বিপদের মধ্যে দিয়ে কেটেছে। কোলকাতা জলের মধ্যে ডুবে ছিল এবং মানুষ, যানবাহন, খাদ্য সবকিছু বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। অনেক জীবন ও সম্পত্তি নাশও হয়ে গেছে। জলময়ী কোলকাতাকে যারা প্রত্যক্ষ করেছে, তারাই শুধু এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে।

তোমরা পড়বে—

"একপারে উদয়গিরি, অপর পারে ললিতগিরি, মধ্যে স্বচ্ছসলিলা কল্লোলিনী বিরূপা নদী। নীল বারি রাশি লইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে। গিরিশিখরদ্বয়কে আরোহণ করিলে নিম্নে সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ শোভিত, ধান্য বা হরিৎক্ষেত্র চিত্রিত পৃথিবী অতিশয় মনোমোহিনী দেখা যায়—শিশু যেমন মার কোলে উঠিলে মা'কে সর্বাঙ্গসুন্দরী দেখে, মনুষ্য-পর্বতারোহণ করিয়া পৃথিবী দর্শন করিলে সেইরূপ দেখে। উদয়গিরি (বর্তমানে আলতিগিরি) বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু ললিতগিরি (বর্তমানে নালতিগিরি) বৃক্ষশূন্য প্রস্তরময়। এককালে ইহার শিখর ও সানুদেশ অট্টালিকা, স্তূপ এবং বৌদ্ধ-মন্দিরাদিতে শোভিত ছিল। এখন শোভার মধ্যে শিখরদেশে চন্দনবৃক্ষ আর মৃত্তিকাপ্রোথিত ভগ্নগৃহ বিশিষ্ট প্রস্তর, ইষ্টক বা মনোমুগ্ধকর প্রস্তরগঠিত মূর্তিরাশি। তাহার দুই চারিটা কলিকাতার বড় বড় ইমারতের ভিতর থাকিলে কলিকাতার শোভা হইত।··· আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিতেছি। সেই ললিতগিরি আমার চিরকাল মনে থাকিবে।

চারিদিকে যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র, মাতা বসুমতীর অঙ্গে বহু যোজন বিস্তৃতা পীতাম্বরী শাটী। তাহার উপর মাতার অলঙ্কারস্বরূপ তালবৃক্ষশ্রেণী—সহস্র সহস্র, তারপর সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ, সরল সুপত্র, শোভাময়। মধ্যে নীল সলিলা বিরূপা, নীলপীত পুষ্পময় হরিৎক্ষেত্র মধ্য দিয়া বহিতেছে—সুকোমল গালিচার উপর কে নদী আঁকিয়া দিয়াছে। তা যাক—চারিপাশে মৃত মহাত্মাদের মহীয়সী কীর্তি। পাথর এমন করিয়া কে পালিশ করিয়াছিল, এমন করিয়া বিনা বন্ধনে গাঁথিয়াছিল, আর এই প্রস্তরমূর্তি সকল কে ক্ষোদিয়াছিল, এই দিব্য পুষ্পমাল্যাভরণ ভূষিত বিকম্পিত চেলাঞ্চল প্রবৃদ্ধ সৌন্দর্য। সর্বাঙ্গসুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্তিমান সম্মিলনস্বরূপ পুরুষমূর্তি যাহারা গড়িয়াছে তাহারা কি হিন্দু?...এই ললিতগিরির পদতলে বিরূপাতীরে গিরির শরীর মধ্যে হস্তিগুম্ফা নামে এক গুহা ছিল। গুহা ছিল বলিতেছি কেন? পর্বতের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কি আবার লোপ পায়? কাল বিগুণ হইলে সবই লোপ পায়। গুহাও আর নাই, ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, স্তম্ভসকল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তলদেশে ঘাস গজাইতেছে।...কিন্তু গুহাটা বড় সুন্দর ছিল। পর্বতাঙ্গ হইতে ক্ষোদিত স্তম্ভ, প্রাকার প্রভৃতি বড় রমণীয় ছিল। চারিদিকে অপূর্ব প্রস্তরে ক্ষোদিত নরমূর্তিসকল শোভা করিত। তাহারই দুই-চারিটা আজিও আছে। কিন্তু ছাতা পড়িয়াছে, রঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছে, কাহারও নাক ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও হাত ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে।...গুহা সম্পূর্ণ ছিল। তাহার ভিতর পরম যোগী মহাত্মা গঙ্গাধর স্বামী বাস করতেন।”...

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের ‘সীতারাম’ উপন্যাস তোমরা পড়বে—এইটুকু শুধু তার উদয়গিরির বর্ণনামাত্র।

চিঠির উত্তর—

রঞ্জনা ভট্টাচার্য, বর্ধমান; চৈতালী, আসানসোল; (চিঠিপত্রের মধ্যে কিছু জিজ্ঞাসা না থাকলে উত্তরে বিলম্ব ঘটে, কিংবা হয়ত আমাদের হাতে শেষ পর্যন্ত পড়েনি—রাগ না করে আবার লিখো)। শুক্তিধারা রায়, কোন্নগর; অনুরাধা শেঠ, উত্তরপাড়া; সুচরিতা ও সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কোলকাতা; মুনাই, বুনাই, যাদবপুর; রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, টি, রোড, কোলকাতা; কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, শিবপুর; (উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে পাশের খবর শুনে খুব প্রীত হচ্ছি। সকলের জন্য ভালবাসা রইল।

তোমাদের—মধুদি’

এক মাস 'আরটেক'-এ (কৃষ্ণসাগর তীরে)
ছুটি কাটাবার ছবি-আঁকা প্রতিযোগিতা

প্রিয় ছেলেমেয়েরা,

তোমরা হয়ত জানো ১৯৬৪ সালে 'সোভিয়েত ল্যাণ্ড' পত্রিকা প্রতি বছর চাচা নেহরুর জন্মদিনে সোভিয়েত-ভারত বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠতর করার জন্য একটি চিত্র-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন।

অন্যান্য বছরের মত বর্তমান ১৯৬৮ সালেও এই প্রতিযোগিতার জন্য তোমাদের কাছ থেকে হাতে আঁকা ছবি আহ্বান করা হচ্ছে।

ছবির বিষয়বস্তু হচ্ছে : 'কোন একটি ভারতীয় উৎসবে সোভিয়েত বন্ধুদের সঙ্গে।' উৎসবাদি সাধারণতঃ বন্ধুদের সঙ্গেই সবচেয়ে বেশী উপভোগ করা যায়। তোমরা কি কোনদিন কোন সোভিয়েত বন্ধুদের সঙ্গে তোমার দেশের কোন মেলায় উৎসবে গিয়েছ? যদি তোমরা নাও গিয়ে থাক, তাহলেও তোমরা সহজেই কল্পনা করে নিতে পারবে, কোন উৎসবে তাদের সঙ্গ তোমাদের কাছে এবং তোমাদের সঙ্গ তাদের কাছে বলতে কি বোঝায়। এই উৎসবের মধ্যে প্রচুর উত্তেজনার জিনিস থাকবে এবং এই উৎসবের আবহাওয়ার মধ্যে তোমরা তাদের এবং তারা তোমাদের নিকটতর হবে। তোমাদের ছবিতে এই ধরণের আনন্দমুখর অভিব্যক্তি তোমরা প্রকাশ করতে পারো।

এই প্রতিযোগিতায় ১০ থেকে ১৩ বছরের সকল ছেলেমেয়েই যোগ দিতে পারবে। যারা এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে পুরস্কার পাবে, তারা এক মাস কৃষ্ণসাগরের ধারে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে 'আরটেক' নামক জায়গায়, সোভিয়েত দেশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে 'পাওনিয়ার্স ক্যাম্পে' কাটিয়ে আসতে পারবে তাদের অতিথি হিসাবে।

ছবি পাঠাবার শেষ তারিখ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮

ছবি পাঠাবার বা অন্য কোন বিষয় জানাবার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করতে হবে।

কোন ছবিই ফেরত দেওয়া সম্ভব হবে না।

SOVIET LAND NEHRU AWARD COMMITTEE

25, Barakhamba Road, New Delhi-1

শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

সম্পাদক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার মূল্য : ০·৫০ পয়সা

ডান দিকে
ভুবনেশ্বর মন্দির

নাচে
তোরনা মুক্তেশ্বরের মন্দির
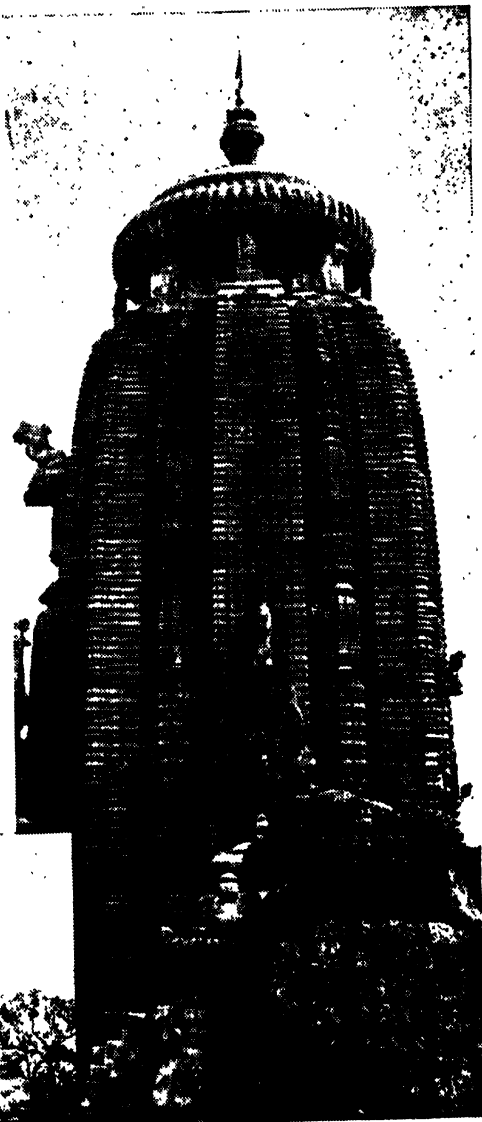
॥ আলোকচিত্র : শ্রীমতি দীপালি সেনগুপ্তা

✲ ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র ✲

৪৯শ বর্ষ] ভাদ্র : ১৩৭৫ [৫ম সংখ্যা

ষ্টীমার-পার্টি

শ্রীদেড়কড়ি শর্ম্মা

বহুদিন পরে এবার মোদের ষ্টীমার-পার্টি হবে—
এই সংবাদে পুলকিত হোলো যত ছেলে-বুড়ো সবে।
দলে দলে এসে নাম লিখাইল উৎসাহী সভ্যেরা,
চাঁদা উঠে গেল—সকল হিসাব হয়ে গেল চুল-চেরা।
খাদ্য-খাদক-তালিকাও হোলো, সবে লেগে গেল কাজে,
সাড়া পড়ে গেল বালকবৃদ্ধবনিতার মনো-মাঝে।
হোলো 'লরী' ভাড়া, উঠিল তাহাতে সকলে সদলবলে,
চাঁদপাল ঘাট অভিমুখে 'লরী' অতি সত্বর চলে।
সাজ-সাজ-রব প'ড়ে গেল, সবে নামিয়া ছুটিল ঘাটে,
ষ্টীমারে উঠিয়া মহা উৎসাহে বুঝি বা গগন ফাটে।
বাষ্পীয় পোত ছুটিয়া চলিল নদীর উপর দিয়া,
দ্বিপ্রহরের শীতল পবনে স্নিগ্ধ হইল হিয়া।

গঙ্গা-নদীর পশ্চিম কূল বারাণসী-সমতুল—
মঠে-মন্দিরে বাগান-বাড়িতে ছেয়ে আছে বিলকুল।
পূর্ব তীরেতে রয়েছে জুড়িয়া মহানগরীর শোভা,
পরমহংস সাধনা-তীর্থ অপরূপ মনোলোভা।
তিনটি বিরাট সেতু পার হ'তে ঘণ্টা তিনেক কাটে,
হালিশহরের কাছাকাছি এসে ষ্টীমার লাগিল ঘাটে।
নামিল রসদ-সংগ্রহ তরে স্বেচ্ছাসেবক গণে,
ক্ষুধায় কাতর যাত্রীর দল—এ কথা পড়িল মনে।
যদিও হয়েছে কিছু জলযোগ মন্দ মধুর বায়ে—
কলা ও কমলা, রুটি আর ডিম, বিস্কুট এবং চায়ে.
তবু সারাদিন পড়েনি কাহারো উদরে অন্ন-কণা—
তাইতো সকলে বুঝি ক্ষণে ক্ষণে হইতেছে আনমনা।
এমন সময় শুভ-সংবাদ আসে পাক-গৃহ হ'তে —
সতরঞ্চি ও কলা-পাতা পেতে বসে যাও কোন মতে।
মৎস্য এবং মাংসের ঝোল, অন্ন পড়িল পাতে,
অমৃতের মত আস্বাদ তা'র লাগে বুঝি রসনাতে।
মোদের ষ্টীমার ফিরিয়া চলিল এবার ঘরের পানে
ভাঁটার সলিলে ত্বরিত গতিতে নদীর স্রোতের টানে।
সূর্য তখন নামিতেছে পাটে, আকাশ সিঁদুর-মাখা,
মধুর দৃশ্য প্রকৃতির পটে ছবির মতন আঁকা।
তটের আঘাতে কুলু কুলু জল করিতেছে কানাকানি,
প্রকৃতির মুখ আঁধারে ঢাকিল অবগুণ্ঠন টানি।
ষ্টীমার ছাড়িয়া ফিরিলাম ঘরে সবারে জানায়ে প্রীতি,
যাত্রা মোদের শেষ হোলো আজি—রহিল মধুর স্মৃতি।

মজার গল্প

শ্রীসুধা চক্রবর্তী

মাটির ঘর, খড়ের চাল আর সুন্দর নিকানো-পোঁছান মাটির দাওয়া,—মাটির উঠান, এই ছিল আগে সারা বাংলায় বাঙালীর বাসস্থান।

এতে নাক সিঁটকোনা যেন। ধনী-দরিদ্র-ব্রাহ্মণ, কায়স্থ সকলেই আগে এরা এই গৃহেই থাকত।

তাতে মানহানি হ'ত না কারও। অবশ্য রাজা-মহারাজা বা তাঁদের কাছাকাছি যে জমিদার সম্প্রদায় ছিলেন, তাঁদের বাড়ীগুলো অনেক সময়ই হ'ত পাকা। অর্থাৎ ইঁট ও চুন-সুরকীর গাঁথুনি।

আর পাঁচ-সাততলা বাড়ীর কথা তো তখন ছিল স্বপ্নেরও অগোচর। যাক, বাড়ী ঘরের কথা ছেড়ে দিই। এবার বলি, এর যারা বাসিন্দা ছিল সেই সরল, অমায়িক ও তেজস্বী বাঙ্গালীর কথা।

আমাদের এই কলকাতা থেকে বেশী দূরে না, খুবই কাছাকাছি একটা গ্রাম জয়নগর আর মজিলপুর।

এই গ্রামে ছোট্ট একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মাটির কুটীরে থাকতেন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্র কাজ করতেন কলকাতার কোন অফিসে।

তাই তিনি কলকাতাতেই থাকতেন। তবে ছুটি-ছাটায় মাঝে মাঝে বাড়ী যেতেন। ব্রাহ্মণ দেশের বাড়ীতে পুত্রবধূ আর তার একমাত্র পুত্রকে নিয়ে বাস করতেন। ব্রাহ্মণ দরিদ্র হলে কি হবে অতিশয় তেজস্বী, পণ্ডিত আর হিন্দুধর্মের সমস্ত আচার-বিচারে একান্ত বিশ্বাসী ছিলেন। প্রত্যহ প্রত্যুষে তিনি অতিশয় নিষ্ঠা-সহকারে গৃহদেবতার পূজা করতেন, তারপর স্নান-আহ্নিক করে নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে পুত্রবধূ পরিবেশিত অন্ন গ্রহণ করতেন। এই অন্ন গ্রহণের সময় তাঁর নিয়ম ছিল কাউকেই স্পর্শ করতেন না, কখনও কদাচিৎ যদি কাউকে ছুঁয়ে ফেলতেন, তাহলে আচমন করে উঠে পড়তেন ; সেদিন তাঁর আর অন্ন গ্রহণ করা ভাগ্যে ঘটে উঠত না।

ব্রাহ্মণ ক্রমশঃ বুড়ো হয়ে পড়লেন, চোখে দেখেন না।

পুত্রবধূও একা মানুষ, নানা রকম কাজে ব্যাপৃত থাকেন। শ্বশুরের আহারের সময় ঠিকমত তদারক করতে পারতেন না। তাই ছোট্ট পাঁচ বছরের পুত্রকে একটা বেতের ছড়ি হাতে শ্বশুরের পাতের পাশে বসিয়ে দিয়ে যেতেন—কাক, বিড়াল বা অন্য কোন উপদ্রব-কারী জন্তুদের তাড়িয়ে দেবার জন্য। ব্রাহ্মণের পাতের পাশে বাটিতে বাটিতে পুত্রবধূর সযত্নে রান্না বহুবিধ ব্যঞ্জন থাকত।

এর মধ্যে একদিন একটা বিড়াল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পাত থেকে বেশ বড় একটা মাছের মুড়ো নিয়ে পালিয়ে যাবার জন্য পুত্রবধূ ছেলেকে খুব বকে শ্বশুরকেও অনুরোধ করেছিলেন, "বাবা খেতে বসে তো আপনি কথা বলেন না, নইলে মাঝে মাঝে সাড়াশব্দ করলে বিড়ালগুলো একটু ভয় পেত।" শ্বশুর মৃদু হাস্য করে বলেছিলেন, "মা, তুমি দুঃখ করো না, খাওয়ার জন্য এ নিয়ম ভঙ্গ করতে পারি না।"

এর কয়েক দিন পরেই হঠাৎ শ্বশুরের চীৎকারে বধূ রান্নাঘরের অসমাপ্ত কাজ ফেলে ছুটে এলেন, "কি হয়েছে বাবা?"

"দেখতো মা কার যেন হাতের ছোঁয়া আমার হাতে লাগল।" উত্তরে বললেন তিনি।

বধূ অবাক হয়ে চারপাশে তাকিয়ে বললেন, "কই কেউ তো কোথাও নেই বাবা?"

"উঁহু, কে আমার পাতে হাত দিয়েছিল।" হঠাৎ বধূর নজর পড়ল পুত্রর দিকে। বিড়াল-মারা ছড়িটা পড়ে আছে মাটিতে আর কচি-হাতখানি দই-ভাত মাখা। ঠাকুর্দার বিড়াল তাড়াতে তাড়াতে শিশু আর লোভ সামলাতে পারেনি, ছোট্ট হাত বাড়িয়ে এক মুটো দই-ভাত তুলে নিয়েছে নিজে খাবে বলে।

রাগে মায়ের মাথা জ্বলে গেল। চীৎকার করে বলে উঠলেন, "দেখুন, দেখুন আপনার নাতির কাণ্ড-কারখানা!" স্নিগ্ধ হাসিতে মুখ ভরিয়ে দাদু বললেন, "দাও, দাও, দই-মাখা ভাত ক'টা ওকেই খেতে দাও। মেরো না যেন মা, বাচ্চা ছেলে ওর কোন দোষ নেই।"

মাতা পুত্রের উপর অতন্ত ক্রুদ্ধ হলেন, কিন্তু শ্বশুরের নিষেধের জন্য কোন দণ্ড দিতে পারলেন না, শুধু রোষ-কষায়িত লোচনে নীরবে পুত্রের দিকে চেয়ে রইলেন।

এই শিশুটি কে জান? ইনি প্রাতঃস্মরণীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়। যিনি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ সব জয় করে একদিন বাংলার একজন তেজস্বী সন্তান হয়ে উঠেছিলেন।

বাংলার নারী সমাজ যাঁর কাছে একান্ত ঋণী। তাঁদের শিক্ষার জন্য, সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এই মহান্ নেতা ব্রাহ্মসমাজের পরিবর্ধনে অনেক কিছুই করে গিয়েছেন। ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুল ও ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল তাঁর অনেক চেষ্টার ফল। বালীগঞ্জে শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজ স্থাপন করে তার প্রতি ব্রাহ্মসমাজ আজ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে ধন্য হয়েছে।

তাঁর নিজের লেখা আত্মজীবনীটি বাল্যের এইরূপ শিশুসুলভ বহু মধুর কাহিনীতে সমৃদ্ধ। তোমরা বড় হয়ে সে বইটি পড়ে আরও এইরূপ আনন্দের বহু খোরাক সংগ্রহ করবে।

অন্নের জন্যে

(নাটক)

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ঘোষ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

চতুর্থ দৃশ্য

(লাগ্‌লাগপুরের মন্ত্রীর খাশ দপ্তর। ঘরের মাঝামাঝি তক্তপোষে ফরাস পাতা—তাকিয়া, গুড়গুড়ি, পানের থালা ইত্যাদি। কাছেই এক পাশে একটা ছোট, নিচু চৌকি, তার উপরে কাগজ, কলম, দোয়াত, শীলমোহর। নীচে কলমচির বসবার আসন।)

(মন্ত্রী এবং তাঁর পিছনে কলমচির প্রবেশ)

মন্ত্রী : (প্রচণ্ড গলা খাঁখারি দিয়ে) : এঁ হেঁ হেঁ···এঁ·· হেঁ কড়া জবাব! কড়া! হেঁ হেঁ···এক্কেবারে কড় কড় করে বেজে উঠবে কাড়ানাকাড়া! টের পাবেন বাছাধনেরা!··· এঁ হেঁ হেঁ!···ওহে। কোথায় রইলে আবার তুমি?

কলমচি : (মন্ত্রীর সামনে গিয়ে) : আজ্ঞে, এই তো রয়েচি।

মন্ত্রী : ও! এসেছ? আচ্ছা, আচ্ছা, বসো। হ্যাঁ, লেখো দেখি এবারে। খুব শক্ত করে ধরো দেখি কলমটা। শক্ত জবাব লিখতে হবে। কড়া জবাব!···দেখিয়ে দিচ্চি বাছাধনদের! নুনের ছিটে পড়বে কাটকাটপুরের কাটা ঘায়ে! এঁ হেঁ হেঁ! ···আচ্ছা, লেখো লেখো।

কলমচি : আজ্ঞে, আরম্ভ করবো কোন্‌খান থেকে?···ঐ নুনের ছিটে থেকে?···

মন্ত্রী : (ধমক দিয়ে) : ধুত্তোর! তুমি একটা গজমূর্খ! একটা হস্তিমূর্খ! এই নাও কাটকাটপুরের চিঠি। আর এই ধরো, আমাদের জবাব! দেখ, পড়ে দেখ। এক্কেবারে···যাকে বলে, মুখের মত জবাব! এঁ হেঁ হেঁ···চিঠি আমরাও লিখতে জানি! কি বল হে! হ্যাঁ···নাও, লিখে ফেল। খসড়াটা দেখে দেখে লেখো। দেখো, ভুলটুল না হয়। আমি এক্ষুণি আসছি। (মন্ত্রীর প্রস্থান)

(কলমচি খুব মন দিয়ে কাট্‌কাট্‌পুরের চিঠিটা পড়লো। তারপর লিখতে লাগলো। লেখা হয়ে গেলে চিঠিতে শীলমোহর লাগালো। ভাঁজ করে একটা খামে পুরলো। খামের উপরে নাম ঠিকানা লিখলো।)

(মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ)

মন্ত্রী : কৈ? হয়েছে?···আচ্ছা, দাও চিঠিটা দেখি। আঃ, দাও তাড়াতাড়ি ··

(চিঠি নিয়ে চলে গেলেন। কলমচি বসে রইল। একটু পরেই দুম্‌দুম্‌ করে পা ফেলে সেনাপতির প্রবেশ। হাতে চিঠি।)

সেনাপতি : (কোনও দিকে না তাকিয়েই) : এই…কে আছিস ? নাঃ…কোনও ব্যাটার সাড়া নেই ! সব পালিয়েছে…এ ই কে আছিস ?

কলমচি : (উঠে দাঁড়িয়ে, সেনাপতির একটু কাছে গিয়ে, ভয়ে ভয়ে) : এজ্ঞে, এই যে আমি,…আমি…

সেনাপতি : (তাকিয়ে দেখে) : আরে নাঃ ! তোমাকে ডাকচে কে ? তোমাকে দিয়ে কী হবে ?…

কলমচি : এজ্ঞে না, কিছু হবে না ! এজ্ঞে ডেকে আনবো…এই আমাদের…আমাদের…

সেনাপতি : (হঠাৎ ধমক দিয়ে) : হ্যাঁ…হ্যা ! তাই ডেকে আনো না !…যাও না ! দাঁড়িয়ে রইলে কেন আবার হাঁ করে ?…যাও, যাও…শীগগির ! তাড়াতাড়ি ঝট্‌পট্ …যাও যাও… (কলমচিকে ধাক্কা। ছিট্‌কে বেরিয়ে যেতে যেতে—)

কলমচি : এজ্ঞে …এই যে…গে…লু…ম…

(সেনাপতি অস্থির হয়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন। কলমচি এক দৌবারিককে নিয়ে প্রবেশ করলো।)

কলমচি : যা ! যা না এগিয়ে ! দেখছিস না, ফুটছেন টগবগ করে ! যা…যা…

(ধক্কা দিয়ে দৌবারিককে দিল ঠেলে সেনাপতির দিকে)

দৌবারিক : ওরে বাবা রে !…এই প্রণাম হই আজ্ঞে !

সেনাপতি : দেরি নয় ! দেরি নয় ! মুহূর্ত দেরি নয় আর ! তলোয়ারে তোলো ঝঙ্কার। দেখবো আস্পর্ধা তোমার কাট্‌কাটপুর ! যায় কত দূর ! লাগুক লড়াই একবার। দেখে নেবো তলোয়ারে কার কত ধার।…হ্যাঁ, শোনো ! এই নাও চিঠি। চলে যাও সোজা—কাট্‌কাটপুরে। সিধে রাজদরবারে। দাও এই চিঠি আমাদের। ফিরে এসো ঝটপট। তারপর…তারপর সাত দিন শুধু সাত দিন ! কেটে যাক সাত দিন। চাইনে জবাব। (খাপ থেকে তলোয়ার বার করে) জবাব পৌঁছে দেবো রক্তের অক্ষরে !…যাও, যাও…যাও তুমি। ছুটে যাও…যাও ধেয়ে যাও ঝটপট ! অসহ্য ! অসহ্য এই আস্পর্ধা ওদের !

(সেনাপতির সবেগে প্রস্থান)

দৌবারিক : (চিঠিটা হাতে নিয়ে) বা…ব্বাঃ ! ইস্পাতের টুকরো একখানা ! আমার মুণ্ডুটাই বুঝি দেয় সাবাড় করে ! বাব্বাঃ ! লড়াই লড়াই করে ক্ষেপে গিয়েছেন একেবারে ! বা…ব্বা !

পটক্ষেপ

পঞ্চম দৃশ্য

(কাটকাটপুরের রাজসভা। রাজা বসে আছেন সিংহাসনে। এক পাশে, কিছুটা সামনের দিকে বসে আছেন মন্ত্রী। দাঁড়িয়ে আছেন সেনাপতি, দৌবারিক, সৈনিক, প্রতিহারী ইত্যাদি। অন্য পাশে বসে আছেন রাণী, জনকয়েক সহচরী, তাদের থালায় সাজা পান, লবঙ্গ, এলাচ, দারচিনি,, জৈত্রী, জাফরাণ কেশর, ফুলের মালা, সরবতের গ্লাস—ধুনুচি থেকে উঠছে ধূপের ধোঁয়া।)

(প্রতিহারীর প্রবেশ : আভূমি নত হয়ে প্রণাম)

প্রতিহারী : মহারাজ ! বিদেশী পত্রবাহক।

রাজা : মন্ত্রী !

মন্ত্রী : সেনাপতি !

সেনাপতি : প্রতিহারী !

প্রতিহারী : আজ্ঞে !

সেনাপতি : নিয়ে এসো তাকে—এইখানে, এই দরবারে।

প্রতিহরী : যে আজ্ঞে !

(প্রতিহারীর প্রস্থান এবং পত্রবাহককে নিয়ে পুনরায় প্রবেশ। পত্রবাহক তার চিঠিটা জামার ভিতর থেকে ধীরে ধীরে বার করলো এবং আভূমি নত হয়ে অভিবাদন জানিয়ে বললো—)

পত্রবাহক : শ্রীলশ্রীযুক্তস্য মহামহা মহিমার্ণবস্য কাটকাটপুরস্য রাজাধিরাজস্য জয় জয় জয়স্তু !

সেনাপতি : পত্রবাহক, তোমার পত্রদাতা কে বটেন ?

পত্রবাহক : আজ্ঞ, লাগ্‌লাগ্‌পুরের রাজাধিরাজ।

সেনাপতি : উত্তম। কৈ সে পত্র ?

পত্রবাহক : আজ্ঞে, এই যে।

(চিঠিটা সেনাপতির হাতে দিল)

সেনাপতি (চিঠিটা নিয়ে) : মন্ত্রী মহাশয় ! (চিঠিটা দিলেন)

মন্ত্রী (চিঠিটা নিয়ে) : মহারাজ ! (চিঠিটা দিলেন)

চিঠিটা পড়তে পড়তে রাজা চোখ পাকাচ্ছেন, গোঁপ পাকাচ্ছেন। গুরু গম্ভীর আওয়াজে হঠাৎ ডেকে উঠলেন : মন্ত্রী !

চিঠিটা মন্ত্রীকে দিলেন। মন্ত্রী গম্ভীর মুখে সেটা পড়লেন। বললেন : সেনাপতি ! (সেনাপতি হাত বাড়িয়ে নিলেন চিঠিটা। পড়তে পড়তে ক্রমশঃ উত্তেজিত হতে লাগলেন। মাঝে মাঝে তলোয়ারে হাত দিতে থাকলেন)

সেনাপতি : আর নয় ! আর নয় দেরি ! তলোয়ারে তোল ঝঙ্কার। রণসাজ ! রণসাজে সাজো সবে। মহারাজ ! আদেশ ! করুন আদেশ মহারাজ ! তারপর কত বল ধরে ঐ লাগলাগপুর !

রাজা : ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর সেনাপতি। ধৈর্য ধর। হয়োনা অস্থির, ব্যাকুল, চঞ্চল!

সেনাপতি : ধৈর্য! ধৈর্য! ওহ!···মহারাজ, অসহ্য—অসহ্য এ অপমান! মহারাজ—

রাণী : মহারাজ!

রাজা : বল রাণী, কী তোমার প্রার্থনা?

রাণী : মহারাজ, ভয়ে বলি, কি নির্ভয়ে বলি?

রাজা : নির্ভয়ে বল রাণী, নির্ভয়ে বল।

রাণী : চিঠিটা একবার পড়ে শোনাতে আদেশ করুন মহারাজ।

রাজা : অবশ্য। নিশ্চয়। তুমি যখন বলছো, রাণী! মন্ত্রী!

মন্ত্রী : সেনাপতি!

সেনাপতি দিলেন চিঠিটা মন্ত্রীকে। মন্ত্রী সেটা পাঠ করলেন :

শ্রীলশ্রীযুক্তস্য মহামহা মহিমার্ণবস্য কাটকাটপুরস্য রাজাধিরাজস্য বরাবরেষু—

জানিতে পারিলাম হুড়মুড় পাহাড় হইতে আপনি দুইশত হাতী ধরাইয়াছেন। হায়-হুতাশির মাঠে আপনার অশ্বারোহী সৈন্যদের তাঁবু পড়িয়াছে। আর, চার পাঁচ শত চর্মকার নাকি আপনারা আনাইয়াছেন ঢাকঢোলপুর হইতে। এই সবের কারণ কী, এক সপ্তাহের মধ্যে যদি না জানান তাহা হইলে—

সেনাপতি : তার মানে? অর্থাৎ অর্থটা কী?

মন্ত্রী : এঁ হেঁ···এই···অর্থটা একটু অস্পষ্টই বটে। যদিচ ইঙ্গিতটা একটু·· এই গিয়ে···

সেনাপতি : অত্যন্ত সুস্পষ্ট! মন্ত্রী মহাশয়, বৃথা ব্যাখ্যা করবার ব্যর্থ চেষ্টা করবেন না। নিষ্প্রয়োজন। মহারাজের আদেশ চাই! আদেশ করুন, মহারাজ!

রাজা : দিলাম আদেশ!

পটক্ষেপ

(অতঃপর দুই রাজ্যের গজারোহী, অশ্বারোহী, রক্ষী, পদাতিক সব সেজেগুজে, হাতিয়ার নিয়ে তৈরি হয়ে চললো যুদ্ধক্ষেত্রে। দুই দল জমায়েৎ হলো কান্নাহাসি নদীর দুই তীরে, মুখোমুখী। দুই রাজ পরিবারের লোকজন এবং রাণীরাও সঙ্গে এসেছেন। সাবেকী রীতি। পরের দিন সকাল হতে না হতে বাজবে শাখ, তুরী ভেরী। বাজবে কাড়ানাকাড়া, বাজবে ভেঁপু, জগঝম্প। সুরু হয়ে যাবে ভীষণ-লড়াই।)

লাগলাগ্‌পুর কাছে : (সমবেত কণ্ঠে)

"ঘরের পাশে শত্রু আছে
লাফিয়ে ঘাড়ে পড়বো কী?"
"হাঁ জী, জোয়ান, হাঁ হাঁ জী!"

কাটকাটপুর কাছে : (সমবেত কণ্ঠে)

"ভয় দেখাচ্ছ চোখ পাকিয়ে!
পটল-তোলা করবো কী?"
"হাঁ জী জোয়ান, হাঁ হাঁ জী!"

নানা রকম আওয়াজ। চড়া, ঝন্‌ঝন্। দুমদাম্। ফটফট ফটাস্।

ষষ্ঠ দৃশ্য

যুদ্ধশিবির (লাগলাগপুর)

(নৈশ ভোজের পর পান চিবুতে চিবুতে লাগলাগপুরের রাজা ও রাণীর প্রবেশ : রাণীর হাতে পানর কৌটো)

রাজা-রাণী চিঠি পড়ছেন আর গালে পান ঠুসছেন

রাণী : মহারাজ, লড়াই শুরু হবে কাল সাকাল থেকেই ?

রাজা : নির্ঘাত। ভোর হতে না হতেই।

রাণী : কিন্তু কি নিয়ে এই যুদ্ধ মহারাজ ?

রাজা : কেন ? কাটকাটপুরের সেই চিঠি! (এক খিলি পান গালে ঠাসলেন।)

রাণী : কিন্তু চিঠির শেষ কথাটা তো শেষ হয়নি মহারাজ! সুতরাং মানেটাও—(একটা পান মুখে দিলেন)

রাজা : আহা, কথাটা শেষ হয়নি বলেই তো মানেটা স্পষ্ট হয়ে গেল, বুঝলেনা মহারাণী ?

(পান ঠাসলেন মুখে)

রাণী : না মহারাজ ! ঠিক বুঝলাম না তো !

রাজা : তা হলে কী তোমার ইচ্ছে, মহারাণী ?

রাণী : মহারাজ, মন্ত্রীমশাইকে একটিবার—

রাজা : উত্তম। তুমি যখন বলছ রাণী ! তবে তাই হোক।

পটক্ষেপ

যুদ্ধশিবির—কাটকাটপুর

(নৈশ ভোজের পর পান চিবুতে চিবুতে কাটকাটপুরের রাজা ও রাণীর প্রবেশ। রাণীর হাতে পানের ডিবে)

রাজা : কাল সাকাল হতে না হতেই লড়াই হচ্চে শুরু জানো তো রাণী ?

রাণী : জানি মহারাজ। কিন্তু কেন এই যুদ্ধ, মহারাজ ?

রাজা : কেন ? ওদের···মানে, লাগলাগপুরের সেই ভয়ঙ্কর চিঠিটা। মনে নেই ? (পান ঠাসলেন মুখে)

রাণী : আছে মহারাজ ! কিন্তু—ভয়ঙ্কর তো নয় !

রাজা : নয় ? ভয়ঙ্কর নয় ?···আচ্ছা বেশ ! কিন্তু বিদ্‌ঘুটে তো ? আচ্ছা, তা হলেই হলো। লড়াই লাগাবার পক্ষে এ-ই যথেষ্ট ! (মুখে পান ঠাসলেন)

রাণী : একটা নিবেদন আছে, মহারাজ ! ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি ?

রাজা : নির্ভয়ে বল রাণী। নির্ভয়ে বল।

রাণী : চিঠিটার মানেটা একবার—

রাজা : মানে ? মানে তো বোঝাই গেল ! স্পষ্ট !

রাণী : ঠিক বোঝা গিয়েছিল কি মহারাজ ?

রাজা : আচ্ছা বেশ ! তা তোমার কী ইচ্ছে, মহারাণী ? (একটা পান মুখে ঠাসলেন)

রাণী : মন্ত্রী মহাশয়কে একবারটি যদি—

রাজা : আচ্ছা বেশ ! তুমি যখন বলছ, রানী, তাই হোক।

পটক্ষেপ

সপ্তম দৃশ্য

(কান্নাহাসি নদীবক্ষে, পানসী নৌকাতে দুই রাজ্যের দুই মন্ত্রী—সঙ্গে দুইজন কলমচিও)

লাগলাগ মন্ত্রী : তা দেখুন মন্ত্রীমশাই, এই মাঝ-নদীতে ময়ূরপঙ্খী নৌকোয় বসে পরামর্শ করবার পরামর্শটা আপনি বেশ ভালোই দিয়েছেন।

কাটকাট মন্ত্রী : কিন্তু মনে রাখবেন, নদীটির নাম কান্নাহাসি। দেখবেন, ভরাডুবি না হয় !

(হো-হো, হা-হা করে হেসে উঠলেন দু'জনেই। দু'জনেই প্রায় এক সঙ্গে বলে উঠলেন) : "তা যা বলেছেন···খাশা বলেছেন ভাই, বেশ, বেশ !" সঙ্গে সঙ্গে হাসি।

কাটকাট মন্ত্রী : আচ্ছা—আমাদের চিঠির প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আপনারা পাল্টা প্রশ্ন করে পাঠালেন কেন, বলুন তো ?

লাগলাগ মন্ত্রী :—বুঝলেন না? সমান ভঙ্গীতে লিখে আগে তো রাজমর্যাদা রক্ষা করা চাই?·· প্রশ্নের জবাব তো কবেই লেখা হয়ে গিয়েছে। এতক্ষণে হয়তো পৌঁছেও গিয়েছে আপনাদের রাজদপ্তরে। কিন্তু আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন না যে বড়?

কাটকাট মন্ত্র : (একটু হেসে) আমাদের আসল জবাবও আপনাদের খাস দপ্তরে পৌঁছে গিয়েছে হয়তো এতদিনে।

(হঠাৎ দুই মন্ত্রী দুই দিক থেকে ফিরে এসে, একেবারে মুখোমুখী হয়ে প্রায় একই সঙ্গে প্রশ্ন করলেন) : কী লিখেছিলেন? কী লিখেছিলেন?"

লাগলাগ মন্ত্রী : লিখেছিলাম—বুনো শূয়োর আর বুনো হাতীর উৎপাত থেকে প্রজাদের ফসল রক্ষার জন্যে ঐ দুশমন পাহাড় বরাবর লম্বা, একটানা একটা শক্ত লোহার বেড়া দেবার আয়োজন করছি আমরা। কিন্তু—আপনি, আপনারা?

কাটকাট মন্ত্রী : আমরা? মানে, আমাদের মহারাজা দীর্ঘ দিনের জন্যে যাবেন তীর্থ ভ্রমণে। রাণীমা'রাও সঙ্গে যাচ্ছেন। তারি আয়োজন উদ্যোগ করছি আমরা। কোথও হাতীর রাস্তা, কোথাও ঘোড়ার। আর সঙ্গে ভালো জল নেবার জন্যে দরকার অনেকগুলি মশক।····এই আর কি।

(দুই মন্ত্রীতে তখন গলাগলি। দু'জনার মুখেই এক কথা) : "তাই তো! হে-হে-হে তাই তো! আমি বলি, তাই তো!" (আর কেবল হাসি, হাসি, হাসি।)

লাগলাগ মন্ত্রী : (হঠাৎ হাসি থামিয়ে) আ··চ্ছা আপনাদের চিঠির শেষ কথাটা শেষ করেন নি কেন?

কাটকাট মন্ত্রী : এ্যাঁ! কী বললেন? শেষ করেনি? সে কি! আচ্ছা দেখছি। ওহে কলমচি, এদিকে এসো তো দেখি! চিঠির শেষ কথাটা লিখে শেষ করোনি কেন?

দুই মন্ত্রীতে তখন কেবল হাসি আর হাসি।

কাটকাট-কলমচি : আজ্ঞে—এই, কি করবো বলুন? দোয়াতের কালি ফুরিয়ে গিয়েছিল যে!

লাগলাগ-মন্ত্রী : আচ্ছা !...আর, তোমার ? তোমার কি হয়েছিল ?

লাগলাগ-কলমচি : আজ্ঞে—এই—কিনা কাটকাটপুর থেকে লাগলাগপুর কম কিসে ? ওদের মত চিঠি কি আমরাও লিখতে জানি না ? ঠিক ওদের মুখের মত জবাব আমিও লিখে দিয়েছি শেষ লাইনে।

দুই মন্ত্রী : (প্রায় এক সঙ্গে) "ওঃ! দেখেছেন ভাই কাণ্ডটা একবার, এঁ্যা ? কী কাণ্ড, কী কাণ্ড! এঁ্যা, দেখুন তো দেখি! ছি ছি!"

(গলাগলি আর হাসি দু'জনে মিলে।)

পটক্ষেপ

যুদ্ধশিবিরের বাইরে

(লাগ্‌লাগ্‌পুরের রাজা ও রাণীর প্রবেশ। খুব হাসিখুসি ভাব। রাজার হাতে ফুলের গুচ্ছ, রাণীর হাতে পানের ডিবে।'

লাগলাগ রাজা : বুঝেছ রাণী, অল্পের জন্যে সব রক্ষা পেলো। কী কাণ্ডটাই হতে যাচ্ছিল! (পান খেলেন)

লাগলাগ রাণী : সত্যি মহারাজ! কী কাণ্ড হতে যাচ্ছিল! (পান মুখে দিলেন)

(কাটকাটপুরের রাজা ও রাণীর প্রবেশ দু'জনেই খুব খুশি।)

কাটকাট রাণী : মহারাজ, কী ভয়ানক কাণ্ডটাই না হতে যাচ্ছিল! (পান ঠাসলেন মুখে)

রাজা : সত্যি রাণী! মিছিমিছি কতগুলি প্রাণ নষ্ট হতো! যাক, অল্পের জন্যে সব বেঁচে গেল!

(দুই পক্ষের রাণীর কিশরীরা এলো পানের থালা, ফুলের মালা নিয়ে। দুই রাজা, দুই রাণী এসে দাঁড়ালেন কাছাকাছি। দুই রাজা থালা থেকে পান তুলে নিয়ে খেলেন। দুই রাণী হেসে হেসে বললেন):

কাটকাট : এসো ভাই, তোমায় মালা পরিয়ে দিই।

লাগলাগ : গলায় গলায় আমাদের ভাব যেন বজায় থাকে ভাই।

(দুই রাণী দুই রাণীর গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। দুই রাজা কাছে এসে বললেন):

লাগলাগ : বাঃ! বাঃ! খাশা! চমৎকার!

কাটকাট: আমরাই কম যাবো কেন? আসুন মহারাজ, আমরাও মালা বদল করি হাঃ হাঃ।

লাগলাগ: নিশ্চয়, নিশ্চয়! সে কি আর বলতে! আসুন, আসুন। হা হা হা!

(দু'জনেই মালা পরালেন দু'জনকে)

দুইদিক থেকে দুই মন্ত্রীর প্রবেশ।

লাগলাগ মন্ত্রী: যাক্! অন্নের জন্যে সব রক্ষা পেলো, বুঝেছেন?

কাটকাট মন্ত্রী: যা বলেছেন মন্ত্রীমশাই! ভাগ্যিস আপনি ছিলেন।

লাগলাগ মন্ত্রী: আরে, ভরাডুবি তো হতেই যাচ্ছিল...কান্নাহাসি নদীতে আপনি না থাকলে।

(দুই দিক দিয়ে দুই সেনাপতির প্রবেশ: দুই কলমচি আর দুই সৈন্য)

কাটকাট সেনাপতি: যাক্, বেঁচে গেল ওরা—অন্নের জন্যে।

লাগলাগ সেনাপতি: পাশাপাশি বসবাস যখন, তখন মিলেমিশে থাকাটাই কি ভালো নয়?

কাটকাট কলমচি: একটি কলমের খোঁচায়—বুঝেছ? দিয়েছিলাম সব একেবারে—হেঁ হেঁ—

লাগলাগ কলমচি: থামো। খোঁচাটা আগে লাগিয়েছিল কে শুনি?

কাটকাট সৈন্য: বুঝলি রে বেটা! খুব বেঁচে গেলি এ যাত্রা!

লাগলাগ সৈন্য: হেঁ হেঁ—বেঁচে গেলি, বল্—অন্নের জন্যে!

যবনিকা

খুশি

শ্রীপ্রণবকান্তি দাশগুপ্ত

খুশি! খুশি! খুশি!
ঘুঙুর পায়ে লেজ ঝুলিয়ে
নাচছে দেখো পুষি!
কুট্‌স করে পায়েতে তার
কামড়ে দিল পিঁপি।
তুতুন সোনা ফেললো খুলে
দুধের শিশির ছিপি।

॥ দক্ষিণমেরু অঞ্চলে সীলদের কথা ॥

দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে নিউজিল্যাণ্ডের বরফাকীর্ণ 'স্কট বেস'-এ প্রায় চার জাতের সীল মাছদের দেখা যায়। তাদের মধ্যে কারবিয়েটার, রস, লিওপার্ড ও উইডেল সীলরা প্রসিদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে এই উইডেল সীলরাই ভূখণ্ডের কাছাকাছি দক্ষিণ মেরুর সমুদ্র অঞ্চলে, তাদের শক্ত ও ধারাল দাঁত দিয়ে বরফের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে সারা বছর বসবাস করে থাকে। এখানেই তারা বাচ্চা পাড়ে এবং তাদের লালনপালন করে। এখান থেকেই বাচ্চারা সমুদ্রের জলে সাঁতরাতে শেখে। তাদের মায়েরা সম্ভবতঃ এই সময় তাদের বাচ্চাদের একবার করে প্রতিদিনই জিজ্ঞাসা করে, 'তোমরা কি আজকের ভোরে তোমাদের হাতটা একবার জলে ধুয়ে নিয়েছ?'

প্রধানতঃ স্কট বেস-এর 'ম্যাকমুরডো সাউণ্ড' জায়গাটিতেই হাজার হাজার উইডেল সীলদের বসবাস। আমেরিকান ও নিউজিল্যাণ্ডের জীববিজ্ঞানবিদরা এদের চরিত্র নিয়ে যত্নসহকারে অনেক গবেষণা করেছেন। এর মধ্যে তাঁরা এও আবিষ্কার করেছেন যে, উইডেল সীলরা খাদ্যের সন্ধানে মাছেদের আস্তানায় প্রায় ১৫ হাজার ফিট পর্যন্ত সমুদ্রের গভীরে নেবে যেতে পারে।

আগামী আশ্বিন-সংখ্যা মৌচাকের পূজা-সংখ্যা

আগামী আশ্বিন-সংখ্যা আমাদের পূজা-সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হবে। নানা ধরনের লেখায় ও ছবিতে এই সংখ্যাটি হবে সবার সেরা। বহু খ্যাতনামা লেখকদের লেখার সঙ্গে এই সংখ্যা থেকে একটি সম্পূর্ণ রোমাঞ্চকর ডিটেকটিভ উপন্যাস প্রকাশিত হবে চিত্রসহ।

শ্রীনির্মল সরকারের

হররতনের টেক্কা

আকারে এই সংখ্যা সাধারণ সংখ্যার চেয়ে অনেক বড় হলেও এই সংখ্যার

[illegible]

বাঘের বিয়ে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

একবার এক বাঘের শখ হ'ল—বিয়ে করবে।

বাঘ বিয়ে করবে, কিন্তু মেয়ে কই? বিয়ের কনে যোগাড় না হলে বিয়ে হবে কি করে?

চারিদিকে 'খোঁজ' 'খোঁজ' রব পড়ে গেল। হাতী ছুটল, ভালুক ছুটল, বাঁদর ছুটল—সকলে মেয়ের খোঁজে ছুটল। কিন্তু তেমন মেয়ে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। যদি বা দু'একটা পওয়া গেল, বাঘের আবার দেখে পছন্দ হ'ল না।

শেষে এক শিয়াল মেয়ের খোঁজ নিয়ে এল। বনের কাছে এক কাঠুরিয়া থাকত—তারই মেয়ে। মেয়েটি দেখতে-শুনতে যেমনি সুন্দরী, তেম্‌নি কাজের। রান্নাবান্না থেকে শুরু করে সব কাজই সে জানত।

শিয়ালের মুখে সব শুনে বাঘ বলল—মেয়ের খোঁজ তো দিলে ভাগনে, আমারও হয়তো পছন্দ হবে, কিন্তু কাঠুরে কি তার মেয়ের সঙ্গে আমার মতো একটা বাঘের বিয়ে দেবে?

শিয়াল বলল—দেবে, না দেবে—সে পরে দেখা-যাবে। আগে একদিন চলুন, কাঠুরের মেয়ে দেখে আসি। তোমার পছন্দ হলে, কাঠুরেকে বিয়ের কথা বলা হবে। যদি সে মেয়ে দিতে না চায়, তার ঘাড় মট্‌কে দিয়ে মেয়েটাকে উঠিয়ে নিয়ে চলে আসবে। তারপর দিন দেখে একদিন বনের মধ্যে ঘটা করে তোমাদের বিয়ে সেরে নিও। মন্ত্র-তন্ত্র যা পড়তে হয়—আমি পড়িয়ে দেব।

এরপর দু'দিন বাদে একদিনের ঘটনা। কাঠুরিয়া সেদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে ঘরের দরজা খুলে চম্‌কে উঠল—সেই বাঘ আর শিয়াল দরজার সামনে বসে! ভয়ে কাঠুরিয়া থরথর করে কাঁপতে লাগল। সে কি কাঁপুনি! মনে হ'ল যেন, একশটা লেপ তার গায়ে চাপালেও তার কাঁপুনি থামবে না।

বাঘ তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল—আমাকে দেখে অত ভয় পাচ্ছো কেন? আমি তোমাকে মারতেও আসিনি, ধরতেও আসিনি। একটা কাজে তোমার কাছে এসেছি।

কাঠুরিয়া তাড়াতাড়ি ঘর হতে দু'টো মোড়া বের করে তাদের বসতে দিয়ে বলল—বেশ, বলুন, কি কাজে আপনি আমার কাছে এসেছেন?

বাঘ বলল—আচ্ছা, সে কথা পরে হবে। আগে তোমার মেয়েকে একবার আমরা দেখতে চাই. তাকে ডেকে নিয়ে এসো।

বেচারা কাঠুরিয়া কি আর করে—ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে ফিরে এলো।

মেয়ে দেখে বাঘের খুব পছন্দ। শিয়াল মিথ্যে কিছু তাকে বলেনি, মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী! বাঘ বলল—কাঠুরে তোমার মেয়ে দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি তাকে বিয়ে করতে চাই। তুমি কি তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে রাজী আছ?

কাঠুরিয়ার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। কি সর্বনেশে কথা! তার মেয়ের সঙ্গে বাঘের বিয়ে! ওই বিচ্ছিরি চেহারা, ভয়ংকর জন্তুটার সঙ্গে তার ফুলের মতো মেয়েটার কখনো বিয়ে হতে পারে! তাছাড়া বাঘকে কি বিশ্বাস আছে? হয়তো খিদে পেলে কোনদিন তার মেয়েকে মেরে খেয়েই ফেলবে!

কাঠুরিয়া যখন এরকম নানা চিন্তা-ভাবনা করছে, মেয়েটি ফস্ করে বলে উঠল—আমি তোমাকে বিয়ে করতে রাজী আছি, বাঘ। তবে, তোমাকে আমার কথা মতো চলতে হবে। আর বিয়ে হবে আমাদের বাড়ীতে এবং আমাদের খুশি মতো।

বাঘ খুশি হয়ে বলল—তুমি যা বলবে, তাই হবে। তোমার কথা মতো চলব। তোমার কথা ছাড়া কোন কাজই হবে না।

কাঠুরিয়ার মেয়ে বলল—তোমার কথা শুনে খুশি হলাম। আমি রাজী আছি, তুমি বিয়ের দিন ঠিক কর।

বাঘের ফুরতি দেখে কে। নাচবে, না গাইবে—যেন ঠিক করতেই পারছে না! কাঠুরিয়ার মেয়েকে দেখার পর থেকেই বিয়ের জন্য তার মন ছট্ফট্ করছিল। সুযোগ পেয়ে তাই বলল—দিন ঠিক করার কি আছে? শুভ কাজ, যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই ভাল। কাল সকালেই আমাদের বিয়েটা সেরে ফেলা উচিত।

কাঠুরিয়ার মেয়ে শুনে একটু হাসলো। কথার মোড় ঘুরিয়ে বলল—তোমরা বাড়িতে এলে, বিয়ের কথা হ'ল, অথচ ঘরে তেমন কিছু নেই যে তোমাদের খেতে দি। আমার বড় লজ্জা করছে। তোমরা কিছু না খেয়ে গেলে আমার মন খারাপ হবে। যদি তুমি একটু কষ্ট করে কিছু চাল-ডাল বাজার থেকে এনে দিতে, তবে যা-করে হোক ডাল-ভাত রেঁধেও তোমাদের খাওয়াতে পারতাম।

বাঘ বলল—তুমি কিছু ভেবো না। আমাকে থলে দাও, আমি এখুনি বাজার করে ফিরে আসছি। তবে, হ্যাঁ, বিয়ের কথা যেন ভুলে যেও না। কাল সকালে আমাদের বিয়ে—মনে রেখো।

বাঘ শিয়ালকে সঙ্গে নিয়ে বাজার করতে গেল। বাজারে পৌঁছিয়ে এক দোকানে ঢুকে থলে ভরে চাল-ডাল কিনল। দোকানদার দাম চাইলে, বাঘ চেঁচামেচি করে উঠল। টাকা!· টাকা কোথায় তার যে জিনিসের দাম দেবে! বাঘ রাগে তার ঘাড় মটকে দিল। দোকানের লোকেরা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। চারিদিক থেকে লাঠিসোঁটা হাতে বহু লোক ছুটে এল। তারা সকলে মিলে বাঘকে দমাদম পিটোতে লাগল। তাই দেখে শিয়াল লেজ গুটিয়ে দে ছুট! মার খেয়ে বাঘ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, কাতরাতে-কাতরাতে কাঠুরিয়ার বাড়ি ফিরে এল।

তাকে দেখে কাঠুরিয়ার মেয়ের মনে মনে বড় হাসি পেল। কোন রকমে হাসি চেপে বলল—কি হ'ল, ফিরে এলে যে?

বাঘ গোঙাতে-গোঙাতে জবাব দিল—পথে চলতে-চলতে হঠাৎ পা মচকে বেকায়দায় পড়ে গিয়ে কোমরে বড় ব্যথা পেয়েছি। তাই ফিরে এলাম, বাজারে যাওয়া হ'ল না। দুঃখ কোরো না। বিয়েটা হয়ে যাক, আমি রোজ তোমাকে ঝোলা ভরে বাজার করে এনে দেব। তুমি আমাকে রান্না করে খাওয়াবে। শিয়াল চলে গিয়েছে। শরীরটা বিশেষ ভালো নেই, আমি কিছু খাব-না। তবে আজ এখানেই থেকে যাব, কোমরের ব্যথা নিয়ে আর নড়তে পারছি না।

কাঠুরিয়ার মেয়ে বলল—বেশ তো, আমি তোমাকে ঘরে বিছানা করে দিচ্ছি, তুমি শুয়ে পড়।

বাঘ বাধা দিয়ে বলল—না, না, বিছানা লাগবে না। ঘরের ভিতরেও আমি শুতে

পারব না। বাইরেই মাটির মেঝেতে এখানে দিব্যি আরামে শুয়ে থাকব। কোন অসুবিধে হবে না। আজকের দিনটা আমাকে বিশ্রাম নিতে হবে। মনে আছে তো—কাল সকালে আমাদের বিয়ে? সব যোগাড় থাকে যেন। কাল খুব ভোরে আমাকে ডেকে দিও।

বাঘ যেখানে বসেছিল, সেখানেই আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল। সারা শরীরে ব্যথা, কোমর টন্‌টন্ করছে, মাথা বন্‌বন্ করে ঘুরছে—জ্বর এসে গেল তার। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হ'ল, বিকেল গড়িয়ে রাত নামল। বাঘ উঠল না, খেল না, শুয়ে শুয়ে কেবল কাতরাতে লাগল।

পরের দিন সকালে কাঠুরিয়ার মেয়ে তার ঘুম ভাঙিয়ে বলল—ওঠ, বেলা হয়েছে। আজ যে আমাদের বিয়ে। তুমি তাড়াতাড়ি চান করে কাপড় পরে তৈরী হয়ে নাও। আমাদের নিয়ম আছে—বিয়ের আগে চান করে দেহ ও মন শুদ্ধ করে নিতে হবে।

বাঘের গায়ের ব্যথা তখনও যায়নি। ধীরে ধীরে উঠে বসে বলল—এখানে জল কোথায় যে, চান করব? কাছাকাছি কোন নদী বা পুকুর আছে বলে তো মনে হচ্ছে না?

তুমি আমার সঙ্গে এসো,—বলে তাকে কুয়ার পাড়ে নিয়ে এসে কাঠুরিয়ার মেয়ে বলল—যাও কূপে নেমে চান করে এসো।

তার কথা শুনে বাঘের দু'চোখ ছানাবড়া! অবাক হয়ে বোকার মতো তার মুখের দিকে চেয়ে থাকল।

কাঠুরিয়ার মেয়ে হেসে বলল—ওঃ! কুয়াতে নামতে ভয় হচ্ছে বুঝি? আচ্ছা দাঁড়াও,—বলে ঘর থেকে একটা মোটা লম্বা দড়ি নিয়ে এল। দড়ির এক মাথা কুয়ার পাশের পেয়ারা গাছের সঙ্গে বেঁধে দিল, আর এক মাথা দিয়ে ফাঁস তৈরী করে বাঘের গলায় পরিয়ে বলল—এবার আর কোন ভয় নেই, তুমি নিশ্চিন্ত মনে কূপের ভিতরে লাফিয়ে পড়। চান সারা হলে, আমরা তোমাকে টেনে তুলব।

বোকা বাঘ কাঠুরিয়ার মেয়ের রূপ দেখে ভুলে গিয়েছিল। সে যে তাকে মারবার জন্য মনে মনে ফন্দি এঁটেছে, বাঘ তা বুঝতে পারল না। বরং ভাবল—কাঠুরিয়ার মেয়ের কথা না শুনলে, তার খুশি মতো না চললে, সে রাগ করবে, বিগড়ে গিয়ে বিয়ে ভেস্তে দেবে। তার মুখের কথায় বিশ্বাস করে বাঘ কুয়ার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাঠুরিয়ার মেয়েও সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকে দড়ি কেটে দিল। জলে পড়ে বাঘ হাবুডুবু খেতে লাগল, অনেক চেষ্টা করেও উপরে উঠতে পারল না। কুয়ার নীচে জল খেতে খেতে পেট ফুলে ঢাক হয়ে বাঘ মরে গেল। তার বিয়ের সাধ জন্মের মতো মিটে গেল।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

"পুলিশ? কই? কোয়েলী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গটগট করে সামনে এগিয়ে গিয়ে সেই মোটা লোকটার গায়ে খুব জোরে চিমটি কেটে বলল, "আর ধরতে আসবে আমাদের?"

"উ হুঁ হুঁ হুঁ, ওরে বাবা—" মোটা লোকটা যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠে বলল, "এ খোঁকি, তুমি ডাকু আছ?"

"তুমি কে?"

"আমি চুলাই ঠাকুর, হাকিম সাহেবের কোঠিতে আমি রাতে পাহারা দি—তোমরা আমার নাম জান না?"

কোয়েলী বলল, "না, আমরা কি এখানে থাকি যে-নাম জানব ?"

চুলাই ঠাকুর জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কোন্ বাড়ির খোঁকি আছ?"

"আমাদের বাড়ি কলকাতা।"

"হুঁ?" হো হো করে হেসে উঠল চুলাই ঠাকুর। তারপর বললে, "ঝুট বাত।"

কোয়েলী রাগ করে চুলাই ঠাকুরকে আর একবার চিমটি কাটতে যাচ্ছিল,—কিন্তু পাপিয়া তার হাত টেনে রেখে জিজ্ঞেস করল, "হাকিম সাহেবের বাড়ি কোনটা?"

সে বাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল পাপিয়া আর কোয়েলী, সেদিকে আঙুল তুলে চুলাই ঠাকুর বলল, "ওই কোঠি আছে।"

"আমরা ওই বাড়িতে যাচ্ছি, তুমি আমাদের নিয়ে যাবে?" পাপিয়া খুব নরম করে বলল চুলাই ঠাকুরকে।

"হাঁ, আমি নিয়ে যাব—" কোয়েলীর দিকে তাকিয়ে চুলাই ঠাকুর হাসল, "এ ডাকু খোঁকি যদি হাকিম সাহেবকেও এই রকম চিমটি মারে তবে সাহেব ওকে জেলখানায় বন্ধ করে রাখবে আমি বলে দিলাম।"

"না না, ও চিমটি কাটবে না।"

পাপিয়ার কথা শুনে চুলাই ঠাকুর ওদের দু-জনের সঙ্গে বেশ জোরে জোরে হাঁটতে লাগল।

হাকিম সাহেবের বাড়ির সামনে যে বাগান তা অনেক বড়—এদিক থেকে শেষ দেখা যায় না। তিনটে গেট আছে। প্রথম গেটের ওপর ছোট ছোট নীল ফুলের ঝাড়।

এখন হালকা রোদ উঠেছে। বাগানের ঘাস আর পাতারা চিকচিক করছে সূর্যের আলোয়। শালিক পাখি চিড়িক-চিড়িক করছে।

গেট খুলে চুলাই ঠাকুর বলল, "যাও খোঁকি।"

"তুমি যাবে না?"

"আমি এখন ঘর যাব—ঘুমাব।"

গেটের ভেতরে ঢুকতে ভয় হচ্ছিল পাপিয়ার, সে বলল, "আমি যে চিনি না, আমার ভয় লাগছে—"

"পুপুদিদি—" খুব জোরে ঠিক তখন কোয়েলী ডাকল অনেক দূর থেকে।

পাপিয়া দেখল কোয়েলী হাকিম সাহেবের বাড়ির বারান্দায় একজনের কোলে উটে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। আরে, পাপিয়া ভাল করে তাকিয়ে দেখল, উনি যে বাবা। ওমা, বাবা কত ছোট হয়ে গেছে—রণুদাদার চেয়ে ছোট—তাদের পাশের বাড়ির বড়দা ছোড়দার চেয়ে ছোট। বাবা হাফ প্যান্ট পরেছে। পাপিয়ার হাসি পেল। চুলাই ঠাকুরকে ফেলে এক ছুটে সে তার ছোট্ট বাবার কাছে চলে এল।

বেশী সময় কোয়েলীকে কোলে নিয়ে বাবা দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, পাপিয়া কাছে আসতেই তাকে নামিয়ে দিয়ে ভয়ে-ভয়ে চারপাশে তাকিয়ে খুব আস্তে জিজ্ঞেস করল, "তোরা কেমন করে এখানে এলি?"

"রণুদাদা প্লেনে করে নিয়ে এল"—বাবাকে ছোট্ট হয়ে যেতে দেখে খুব মজা লাগছিল পাপিয়ার, সে হাসতে হাসতে বলল, "বাবা, তুমি হাফ প্যান্ট পরেছ—তুমি রণুদাদার চেয়েও ছোট হয়ে গেছ, মা এখন তোমাকে দেখলে চিনতেই পারবে না।"

পাপিয়ার কথা শুনে এখন কোয়েলী বাবাকে চিনতে পারল—বুঝল যে সে কার কোলে উঠেছিল। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে পাপিয়া যখন দীঘি থেকে একটা পানকৌড়ি ধরে আনবার কথা ভাবতে ভাবতে অন্য দিকে তাকিয়েছিল, তখন লম্বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে একজন ডাকছিল কোয়েলীকে, এই সুন্দর বাড়ির ভেতর ঢোকবার ইচ্ছায় সে ছুটে চলে এসেছিল। কোয়েলী যে বাবারই কোলে উঠেছিল তা সে জানত না।

"বাবা, ও বাবা"—কোয়েলী বাবার হাত টানতে টানতে খুব জোরে এখন বলে উঠল, "তুমি এমন ছোট্ট হয়ে গেলে কেমন করে—বড় পিসীমার অ্যালবামে তোমার যে ছবি আছে ঠিক সেই রকম?"

"তোর জন্যেই তো—" পাপিয়া বলল, "রণুদাদার প্লেনে বুড়োর সেই যন্ত্রটা ঘুরিয়ে দিয়েছিলি, মনে নেই?"

"হুঁ।"

বাড়ি যেমন সুন্দর, যেমন বড়—পাপিয়ার মনে হ'ল এখানে যারা থাকে তারাও তেমন সুন্দর। অনেক মানুষ যে এখানে আছে তা সে এর মধ্যেই বুঝতে পেরেছিল। একটা বুড়ো মতন লোক বাগানে কাজ করছে, ও মালী। ট্রে হাতে নিয়ে আর একজন তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল, সে মুখু। বাবা বলে, খানসামা। গেটের কাছে ঘোরাঘুরি করছে দু-জন চাপরাশী. অম্বিকা আর সরবক্স। একজন শাড়ি রোদে মেলে দিচ্ছে, ও আয়া।

পাপিয়া বাগানে অনেক ফুল আর ফলের গাছ দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল, "ও বাবা, এ বাড়িটা কার?"

বাবা হেসে বলল, "আমাদের।"

পাপিয়া বাবার কথা বিশ্বাস করল না। বাবা নিশ্চয়ই তার সঙ্গে মজা করছে। এত বড় বাড়ি যদি তাদের হয়—এমন সুন্দর বাগান, এত গাছপালা, এই বারান্দা, ওই দীঘি আর এত লোকজন তাহলে এখন বাবা পাপিয়া কোয়েলী আর মাকে নিয়ে ছোট একটা ফ্ল্যাটে থাকে কেন! সেখানে বারান্দা নেই, খেলবার কোন জায়গা নেই, সারাদিন ঘরের মধ্যে বসে বসে কান্না পেয়ে যায়।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে পাপিয়াও হাসল, "কখখনো এ বাড়ি আমাদের না—"

"বিশ্বাস করছিস না"—বাবা গেটের দিকে তাকিয়ে খুব জোরে ডাকল, "সরবক্স—" আর সে কাছে এগিয়ে আসতেই হেঁকে বলল, "এদের বলে দাও তো এ বাড়িটা আমাদের কিনা।"

"হ্যাঁ, আপনাদেরই তো মেজবাবু।"

সরবন্নর কথা শুনে খুব খুশী হ'ল পাপিয়া। বাড়িটা তাহলে তাদেরই। আর আজ থেকে কোয়েলী আর সে-ও এখানে থাকবে। পাপিয়া কোয়েলীর হাত ধরে টানল, "কী মজা!"

"পুপুদিদি, বাবার আর একটা নাম মেজবাবু, জানিস?"

"বাবা যে মেজ ছেলে, মাকে কতবার বলেছে, শুনিস নি"—লম্বা বারান্দা ধরে আর একদিকে বাবা হেঁটে যাচ্ছিল খুব আস্তে আস্তে, পাপিয়া কোয়েলীও যাচ্ছিল সঙ্গে। যেতে যেতে পাপিয়া বলল, "বাবা, তোমার বন্দুকটা কই?"

"আছে, মার খাটের তলায়, নিয়ে আসব?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আনো—"

কিন্তু বাবা বন্দুক আনতে যেতে পারল না। যে-ই দু-পা বাড়িয়েছে অমনি একজন এসে তাকে খুব বকতে থাকল, "সকাল থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এখনো মুখ ধুসনি—লেখাপড়া নেই? সারাদিন শুধু টৈ টৈ টৈ টৈ—"

বাবা একটুও ভয় না পেয়ে বলল, "বেশ করছি, মাষ্টারমশাই রোজ মনিং ওয়ার্ক করতে বলেছে—"

বাবাকে যে এমন করে কেউ বকতে পারে তা পাপিয়া আর কোয়েলী ভাবতে পারেনি। ওরা ভয় পাচ্ছিল, মজাও পাচ্ছিল। কোয়েলী খুব আস্তে জিজ্ঞেস করল, "কে রে পুপুদিদি?"

যে বাবাকে বকছিল, পাপিয়া তাকে দেখছিল এক মনে। কী সুন্দর দেখতে! মেমেদের মতন ফরসা রঙ, বড় বড় চোখ! পাপিয়ার মনে হ'ল এমন একটা ছবি যেন টাঙান আছে তাদের কলকাতার বাড়ির শোবার ঘরে। এখন পাপিয়া তাকে চিনতে পারল, আর তার পেছনে এসে হাত টানতে টানতে ডাকল, "দিদা, ও দিদা—"

সে একটু আগে রাগ করে বাবাকে বকছিল, এখন সে পাপিয়ার ডাক শুনে তার দিকে তাকিয়ে খুব মিষ্টি করে হেসে বলল, "ওমা, তোমরা কে গো?"

"আমার নাম পাপিয়া, এর নাম কোয়েলী—"

"ওমা, তাই নাকি? এসো, এসো—আমার কোলে এস—" দিদা বাবার দিকে ফিরে আবার তাকে বকবার মতন করে বলল, "বোকা ছেলে, এরা এসেছে আমাকে বলিসনি কেন এতক্ষণ? চল, তোমাদের দাদুর কাছে নিয়ে যাই—"

পাপিয়া আর কোয়েলীকে কোলে তুলে নিয়েছে দিদা, আস্তে আস্তে লম্বা বারান্দা [illegible] দিকে। অনেক রোদ উঠেছে এখন। সাদা গেটের পাশে

কাঁটা তারের ওপর লতায়-পাতায় প্রজাপতির ভিজে পাখা ঝলমল করছে। এমন সময় খুব জোরে ট্রেনের বাঁশি বেজে উঠল আর একটু পরেই ঝিক-ঝিক-ঝিক শব্দ হ'ল। পাপিয়ার মনে পড়ল পিসীদের গল্প বলবার সময় বাবা একদিন ওদের বলেছিল তাদের বাড়ীর খুব কাছেই রেল স্টেশন।

পাপিয়া মেমসাহেবের মতন দিদাকে জিজ্ঞেস করল, "ও দিদা, পিসীমারা কোথায় ?"

দিদা হেসে বলল, "ওরা তো কলকাতায় থাকে, ইস্কুলে পড়ে কিনা। তোমরা ঠিক সময় এসে পড়েছ, আজই ওরা এসে পৌছবে—এখন পুজোর ছুটি আরম্ভ হ'ল তো।"

বাবা পাপিয়াকে এসব বলেছিল অনেক দিন আগে। কে জানে পিসীরা যখন আসবে, তখন চারপাশ চুপচাপ হয়ে যাবে, একটি মানুষ থাকবে না রাস্তায়—তখন দীঘির জলে চাঁদের ছায়া পড়বে, নিঃশব্দে পাপড়ি মেলতে থাকবে এক-একটি লাল আর সাদা পদ্মফুল। সেই সময় পাপিয়া জানে, শুধু বাবার চোখে ঘুম আসবে না, বাবা কান পেতে থাকবে ট্রেনের শব্দ শোনবার জন্যে। পিসীরা আসবে শেষ রাতের ট্রেনে। তিন পিসীই খেলনা নিয়ে আসবে বাবার জন্যে।

দিদার কোলে চড়ে যেতে যেতেই কোয়েলীকে আদর করবার ইচ্ছে হ'ল পাপিয়ার— প্লেনের বুড়োর সেই যন্ত্রটা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে সে ভালই করেছে। বাবা যেমন ছোট্ট হয়ে গেছে, পিসীমারাও তেমন হয়ে যাবে। এবার পাপিয়া আর কোয়েলী পিসীদের সব খেলনা নিয়ে নেবে বাবার কাছ থেকে। সে ভাবছিল, কখন রাত হবে—কখন ট্রেনের শব্দ শুনতে পাবে ও। আজ বাবার মতন পাপিয়াও সারা রাত জেগে থাকবে।

ওই যে দাদু চোখে চশমা। একটা বড় চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছে। দিদার কোলে চড়ে কোয়েলী আর পাপিয়া দূর থেকে দাদুকে দেখতে পেল। দাদু কিন্তু মোটেই দিদার মতন সুন্দর দেখতে নয়। পাপিয়ার বেশ ভয় করতে লাগল।

"এই দেখ, কাদের এনেছি"—পাপিয়া আর কোয়েলীকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে দাদুর সামনে দাঁড়িয়া দিদা হেসে বলল, "বল তো এরা কে ?"

"কে ?" খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলল দাদু, চশমা মুছতে মুছতে কোয়েলীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

দাদুকে দেখতে দেখতে খুব রেগে যাচ্ছিল কোয়েলী। একদিন ইস্কুলে না গিয়ে ছোটদের বন্দুক হাতে নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক দূরে পালিয়ে গিয়েছিল বাবা—সারা দুপুর পাখি শিকার করবার চেষ্টা করে বাড়ি ফিরে এসেছিল সন্ধ্যেবেলা। দিদা নাকি বাবার জন্যে সেদিন খুব কেঁদেছিল। অম্বিকা, সরবজ্ঞ—এরা কেউ বাবাকে কোথাও খুঁজে পায়নি। সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরতেই দাদু একটা বেত দিয়ে বাবাকে খুব মেরেছিল সেদিন। (ক্রমশঃ)

ইংক ইলিউশন

যাদুকর শ্রীশচীন্দ্রলাল দে

প্রদর্শনভঙ্গী : যাদুকর এক গ্লাস কালো কালি নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করলেন। কোন একজন দর্শককে সাদা কাগজে তাঁর নাম সহি করালেন ; তারপর ঐ সহি করা কাগজের টুকরোটা ঐ কালি-ভর্তি গ্লাসে ডুবিয়ে দেখালেন যে, ওর আধখানায় কালি লেগে কালো ছোপ পড়েছে। এখন একটা ড্রপার দিয়ে গ্লাস থেকে সামান্য কালি তুলে দর্শকদের দেখালেন। না কোন চালাকি করা নেই, সত্যিই কালো কালি। এবার যাদুকর ম্যাজিকের মন্ত্র পড়ে গ্লাস থেকে পাতলা সিল্কের রুমাল, নানা রকম বাহারী ফুল, বল, রিবনস্, ছোট পেন, মোমবাতি ইত্যাদি বের করে দেখালেন (১নং চিত্র) দর্শকদের।

পরিশেষে যাদুকর একটা বড় প্লেটে গ্লাসের কালো কালি ঢেলে দিলেন (২নং চিত্র)। সম্পূর্ণ শূন্য গ্লাসটি একজন সহকারী গ্রীনরুমে নিয়ে গেলেন। অপর একজন সহকারী প্লেটে ঢালা কালি দর্শকদের পরীক্ষা করাতে লাগলেন। এইভাবে খেলাটির পরিসমাপ্তি ঘটল।

১নং চিত্র
কি ভাবে কালি-পূর্ণ গ্লাস থেকে রুমাল বের করা হচ্ছে।

২নং চিত্র
এইভাবে প্লেটে কালি ঢেলে দেওয়া হচ্ছে।

প্রয়োজন : একটি বড় এবং একটি ছোট কাঁচের গ্লাস, কাঁচজোড়া দেওয়া আঠা, একটি প্লেট, কিছু কালো কালি, পাতলা সিল্কের রুমাল, বাহারী ফুল ইত্যাদি।

কৌশল : এর মূল কৌশল রয়েছে কাঁচের গ্লাসে। ৩নং চিত্রে মূল-কৌশল সুন্দর-ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথমে কাঁচ জোড়া আঠা দিয়ে ছোট কাঁচের গ্লাসটাকে বড় কাঁচের গ্লাসের মধ্যে বসাতে হবে এমনভাবে যাতে তলায় ওটা আটকে যায়। এখন ছোট এবং বড় কাঁচের গ্লাসের মাঝখানে যে সামান্য পরিমাণ শূন্য-স্থান রয়েছে, ওটা ড্রপারের

সাহায্যে গায় কালো কালি দিয়ে পূর্ণ করতে হবে। কালো কালি যেন ছোট গ্লাসের ভেতরে না পড়ে—সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করতে হবে। এই অবস্থায় ছোট গ্লাসের মধ্যে পাতলা সিল্কের রুমাল, বাহারী ফুল প্রভৃতি রাখতে হবে।

৩নং চিত্র

বড় গ্লাসের মধ্যে ছোট গ্লাস বসান হয়েছে এবং ছোট গ্লাসরে মধ্যে ফুল, রুমাল প্রভৃতি রাখা হয়েছে।

দূর হতে কিছুই বুঝতে পারা যাবে না। প্রদর্শন-ভঙ্গীতে যেভাবে বলা হয়েছে, সেইভাবে দর্শকদের পরীক্ষা করিয়ে প্রমাণ করতে হবে, তরল কালো কালি ছাড়া গ্লাসে আর কিছুই নেই। তারপরের অংশ সহজ ১নং চিত্রের মত ছোট গ্লাস থেকে লুকোনো জিনিসগুলো বের করে দেখাতে হবে। পরিশেষে গ্লাসের কালি প্লেটে ঢালতে হবে। এখানে সামান্য কৌশল করে কালি ঢালতে হবে, যাতে গ্লাসের মুখ (Mouth) দর্শকরা দেখতে না পান এবং প্লেটে আগে থেকেই কিছু পরিষ্কার জল রাখতে হবে। ফলে প্লেটে কালি ঢাললে কালির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। এতে করে দর্শকরা কোন সন্দেহ করতে পারবেন না। যখন প্লেটের কালি পরীক্ষা করতে দর্শক ব্যস্ত, এই অবসরে সহকারী কৌশল-যুক্ত গ্লাসটা নিয়ে প্রস্থান করবেন। এইভাবে খেলাটার পরিসমাপ্তি ঘটবে।

॥ শরৎচন্দ্র ॥

শ্রীনৃপেন আকুলি

তোমার মনের মুকুরে দেখেছ অযুত মনের ছবি,
অমর কমলে তারি আলো ছায়া মূর্ত করেছ সবি।
পুতুলের মত চিরকাল যারা জীবনের খেলাঘরে,
নানা অবিচার নীরবে স্বীকার করেছ বুকের 'পরে।
যারা নিপীড়নে, লাঞ্ছনা-ভারে ক্ষীণ হ'ল দিনে-দিন ;
নিঃশেষে যারা সব ঢেলে দিয়ে হয়েছে সহায় হীন।
পদে পদে যারা নিয়ত শুধুই পেয়েছ প্রবঞ্চনা,
নয়নের জলে প্রাণের মূল্য পেলেনা একটি কণা।
সারা সমাজের দরবারে তুমি তুলছ তাদের দাবী ;
মানবিকতার দেউলে খুলেছ রুদ্ধ দ্বারের চাবি।
জীবন-শিল্পী, দরদি-সাধক, ব্যথার কাব্যকার ;
পেলে ভারতীর হাতে তুলে দেওয়া যশের মুক্তাহার।
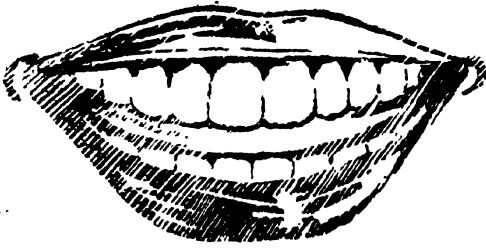
দন্ত-মুক্তা

শ্রীশিশির নিয়োগী

*

বিশ্ব-স্বাস্থ্যসংস্থা (W. H. O.) একবার একটা সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছিল যে স্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে দাঁতের রোগটাই হয় বেশী। দাঁতের অসুখ এমন একটা অসুখ যেটা সম্বন্ধে তোমরা অনেকেই সচেতন নও। দাঁতে পোকা লেগে গেলে বা দাঁত চুষলে দাঁতের গোড়া থেকে রক্ত বেরুলেও তোমরা গরজ ক'রে বাবা-মাকে জানাও না। পরে যখন দাঁতে অসহ্য যন্ত্রণা হয় বা মাড়ি ফোলে, তখন না ব'লে থাকতে পারো না। দাঁতের রোগ চেপে থাকতে থাকতে অনেক সময় রোগ এমন অবস্থায় গিয়ে দাঁড়ায় যে, তখন দাঁতের রোগ সারানো কোন ডাক্তারের সাধ্যের মধ্যে থাকে না। একটা একটা ক'রে দাঁত নড়বে আর পড়বে। তারপর কুড়িতেই বুড়ো-বুড়ী হয়ে ব'সে থাকবে!

দাঁতের অসুখের আক্রমণ থেকে কিভাবে বাঁচা যায়—তা নিয়ে অনেক গবেষণাই হয়েছে ও হচ্ছে। তবে সবাই একটি বিষয়ে একমত যে, দাঁতের রোগ থেকে বাঁচবার প্রথম উপায় হ'ল সব সময়ের জন্য মুখটাকে পরিষ্কার রাখতে হবে। এমন খাবার খেতে হবে এবং সেই খাবার খেয়ে এমন ভাবে মুখ ধুতে হবে যাতে খাবারের কোন কুঁচো অংশই যেন দাঁতের ফাঁকে থেকে না যায়। খাবার-দাবারের মধ্যে কিছু খাবার অন্ততঃ এমন হবে যেন চিবিয়ে খেতে হয়, যাতে খাবার সময় মাড়িতে বেশ চাপ পড়ে এবং মাড়ি শক্ত হয়।

খাবার জলে ফ্লুরাইডের (Fluoride) পরিমাণ কম থাকলে সেই জল খেলে দাঁতে পোকা ধরবার (Dental Carles) সম্ভাবনা থাকে বেশী। আবার জলে ফ্লুরাইড বেশী থাকলে দাঁতে ফ্লুরোসিস্ (Fluorosis) হয় এবং দাঁতের মাথাগুলো কাচের মত ভেঙে যেতে থাকে।

আমেরিকার মত সুসভ্য দেশেও দাঁতে পোকা লাগা লোকের সংখ্যা—দশ কোটির মত, আড়াই কোটি লোকে মাড়ির যন্ত্রণায় ভোগে, দু কোটিরও বেশী লোকের মুখে একটিও দাঁত নেই, এই অবস্থা! বারো লক্ষ লোক ফ্লুরোসিসে ভুগছে, খারাপ দাঁতের জন্য বছরে তেইশ হাজার লোক—মুখের ক্যানসার রোগে পড়ে। শুনে তোমাদের নিশ্চয়ই আতঙ্ক হচ্ছে। আতঙ্কিত হবার মতই ব্যাপার। এখন থেকেই দাঁতের যত্ন নাও—দাঁত কেমন আছে,

কোন রকম খারাপের দিকে যাচ্ছে কিনা এসব দেখাবার জন্যে বছরে অন্ততঃ একবার দু'বার সময় করে ডাক্তারের কাছে যাও।

ছোটদের মধ্যে দাঁতের পোকা লাগা, ক্ষয়ে যাওয়া ও দাঁত উঠবার সময়ে কোন কারণে বেঁকে যাওয়া এসব গুলোই হ'ল দাঁতের ব্যাধি। অনেকের আবার দেরিতে দাঁত ওঠে—এটাও এক ধরণের অসুখই বলতে পারা যায়। মাড়ির রোগটা এশিয়া ও আফ্রিকান দেশগুলিতেই বেশী। বলা হয়ে থাকে যে, কোন্ দেশ কতোটা উন্নতি করেছে তার একটা মাপকাঠি হ'ল সেখানকার লোকে কতোটা পরিমাণ চিনি খায়। আবার এটাও দেখা গেছে যে, যারা যতো বেশী চিনি জাতীয় মিষ্টি খেতে অভ্যস্ত, তাদের দাঁতের অবস্থা ততই খারাপ। তাই উন্নত দেশে বিশেষ ক'রে শহর অঞ্চলে যেখানে লোকে চিনি বেশী খায়, তাদের দাঁতের রোগও বেশী।

আমাদের দেশে দাঁতের রোগ কেন এত বেশী তার কারণ মোটামুটি এইগুলি—

(ক) আমাদের দেশে কি শহরে কি গ্রামাঞ্চলে দাঁতের ডাক্তারের সংখ্যা কম। ফলে সাধারণ ডাক্তারের কাছে আমরা অন্যান্য সব অসুখের চিকিৎসার জন্য গেলেও দাঁতের দিকটায় ডাক্তাররা তত নজর দেন না।

(খ) তোমরা দাঁতে খুব কনকনে ব্যাথা না হওয়া পর্যন্ত বাবা-মাকে জানাও না। দাঁতের গোড়া ফোলা বা ব্যথা হওয়া ইত্যাদি ব্যাপারগুলোও আমরা সামান্য অসুখ ব'লে উড়িয়ে দিই।

(গ) তোমাদের মধ্যে যাদের বয়স পাঁচ বছরের কম, তাদের দাঁতের চিকিৎসা করা ভীষণ কষ্টকর। আমাদের দেশের ডাক্তাররাও এত ঝঞ্ঝাট নিয়ে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে পারেন না।

চক্ষুরত্নের মত দাঁত ও শরীরের একটি রত্ন। কথায় বলে, "দাঁত থাকতে কেউ দাঁতের মর্যাদা বোঝে না।" শরীরে অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের অসুখ বাসা বাঁধলে দাঁতের যেমন ক্ষতি হয়, তেমনি দাঁত খারাপ থাকলে সেই সুযোগে অন্যান্য অনেক রোগ শরীরকে আক্রমণ করে। প্রত্যেকের তাই আড়াই বছর বয়স থেকে দাঁতের 'প্রকৃত যত্ন' নেয়া দরকার। 'প্রকৃত যত্ন' এই জন্যে বলছি যে, দাঁতের যত্ন করবার প্রক্রিয়াগুলো অনেকে জানেন না। সকালে উঠে একবার দাঁত মাজলেই হ'ল না। দিনে রাত্রে প্রতিবার খাবার পরই ভালো করে কুলকুচা করে দাঁত ধুতে হবে। দরকার হলে দাঁতন বা টুথব্রাস দিয়ে দাঁতের ফাঁকের ময়লাগুলো বার ক'রে আনতে হবে। দাঁতের অসুখ সুরু হবার প্রথম থেকেই বাবা-মাকে জানাবে—ডাক্তার দেখাবার জন্যে। দাঁতের গোড়ায় ব্যথা, শক্ত জিনিস চিবিয়ে খেতে অসুবিধা বা

একটু চোষাতেই দাঁতের গোড়ায় রক্ত চ'লে আসা—এগুলোই হ'ল দাঁত খারাপ হ'তে আরম্ভ হবার লক্ষণ। ছাই বা মাটি দিয়ে কক্ষনো দাঁত মাজবে না, সস্তা মাজন ব্যবহার করবে না, দাঁতন বা টুথব্রাস ব্যবহার করবে। একটা দাঁতন বেশীদিন ব্যবহার করবে না, টুথব্রাস দু'তিন দিন পর পর নুন-জলে চুবিয়ে রেখে বিশুদ্ধ করে নেবে।

শিশুদের দাঁত-বিহীন মুখও দেখতে সুন্দর। কিন্তু এই শিশুরাই যখন বড়ো হয় তখন তাদের মুখে দাঁত না থাকলে হাসিতে মুক্তা ঝরে না। রাজা মশাই বললেন—"ফোক্‌লা দাঁতের হাসি, আমি বড়োই ভালবাসি।" এই শুনে দুয়োরাণী নোড়া দিয়ে নিজের দাঁত ভেঙ্গে রাজার কাছে হাজির হলেন। রাণীকে এই অবস্থায় দেখে রাজা মশাই—মুখ ফিরিয়ে রইলেন। রাণী জানতেন না যে ফোক্‌লা দাঁতের হাসি বলতে রাজা মশাই বাচ্চাদের হাসি বোঝাতে চেয়েছিলেন—দাঁত পড়া তোবড়ানো বুড়োর গালের হাসি নয়।

ভাদ্রে

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

ওই শোন মেঘ ডাকে কড়কড় শব্দে।
বাইরেতে থেকো নাকো পড়ে যাবে জব্দে।
ওরে ব্যাস··· ঝমঝম নামলো যে বৃষ্টি।
ভরে গেল খাল বিল, ভাসবে কি সৃষ্টি?
ভ্যান ভ্যান প্যান প্যান করে কেন মণ্টি?
জাম জামরুল,-এর নিতে চায় কোন্‌টি?
এঁকে বেঁকে বিদ্যুৎ কাল মেঘে খেলছে।
থেকে থেকে শাখাগুলো কে যে ভেঙে ফেলছে!
জলে ভরা আঙিনায় কে ভাসায় নাও রে।
পাঠশালা বসবে না, আর কি-বা চাও রে;
বইটই তুলে রাখ, লেখাপড়া থাক্ সে।
ও পাড়ার মাসীমাকে হাঁক পেড়ে ডাক গে।
কি মজার গল্প যে পারে মাসী বল্‌তে।
একবার শুনলে তা পারবি না ভুলতে।

একটি মানুষের গল্প

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ

গল্পটা আমার এক বন্ধুর মুখে শোনা। হ্যাঁ, বন্ধুই তাঁকে বলব। যদিও বয়সে আমার চাইতে অনেক বছরের বড়। কিন্তু সে-কথা ভুলে গিয়ে তিনি আমার সঙ্গে মিশতেন ঠিক সমবয়সার মতই। নাম তাঁর ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, এ্যাডভোকেট। বাড়ী কেষ্টনগর শহরে। আমার সঙ্গে পরিচয় তাঁর এখানেই। কাজের তাগিদে তখন প্রায়ই দেখা হতো। তাই হৃদ্যতাও গড়ে উঠেছিল তাঁর সঙ্গে খুব। কাজে-অকাজে আমাদের উভয়েরই বাড়ীতে যাতায়াত ছিল। লিখতে পারতেন না, কিন্তু গল্পের আকারে খুব ভাল বলতে পারতেন ধীরেনদা। কখনো তাঁর বাড়ীতে, কখনো কলেজ স্কোয়ারে বসে প্রায়ই আমাদের নানা-রকমের গল্প-গুজব চলতো। আর যে গল্পগুলো তিনি বলতেন, তার বিষয়বস্তুর অধিকাংশই থাকতো আমাদের দেশের যত মনীষী পদবাচ্য মানুষদের নিয়ে। যেমন—স্যার আশুতোষ, রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি। তাছাড়া আরও অনেকের। গল্পগুলো শুনতে বেশ ভাল লাগতো আমার। কারণ এদের সঙ্গে মিশবার সুযোগ আমি কখনো পাইনি। কিন্তু ধীরেনদা পেয়েছিলেন অনেকবার। তাই কাহিনীগুলো তাঁর সবই বাস্তব অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। অতএব সেই অনেকগুলোর মধ্যে আজ একটির কথাই তোমাদের বলব।

এইবার শোন :

ছুটির দিন। আমার বাড়ী মাদরালে যাবার কথা। কিন্তু কি একটা বিশেষ জরুরী কাজের চাপে সেদিন যাওয়া হয়নি। খবরটা ধীরেনদা জানতেন, তাই বিকেল বেলা এসে তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন কলেজ স্কোয়ারে। বেঞ্চের পরে বসে এ-কথা সে-কথার পর, দেশের পরিস্থিতি নিয়ে সেদিন আমাদের আলাপ হচ্ছিল। হঠাৎ তাঁকে একটু উত্তেজিত মনে হলো। বললেন—"আপনাদের রাজ-নীতিটিতি আমি বুঝি না রবিবাবু, কিন্তু মানুষকে বুঝি। তেমনি একটা মানুষেরই গল্প আজ বলছি—সত্যিকারের মানুষ। শুনবেন ? অবশ্য গল্পকার আমি নই। তাই গুছিয়ে হয়তো বলতেও পারব না ভাল করে। তবুও যা:বলব তা সব সত্যি। এতটুকুও বানানো নয়। তাছাড়া, এ-কাহিনী আমার জীবনেরই কাহিনী।"

এ্যাডভোকেট মিঃ বিশ্বাসের চোখে-মুখে একটা অপূর্ব উদ্দীপনা লক্ষ্য করলাম। তিনি বলে যেতে লাগলেন, আর অবাক হয়ে আমি শুনতে লাগলাম তাঁর সেই আত্ম-কাহিনী।

—হ্যাঁ, তা প্রায় বিশ বছর হলো। ভারতবর্ষ তখন সবেমাত্র বিভক্ত হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতীক, জাতীয়-কংগ্রেসের হাতে এসেছে হিন্দুস্থান শাসনের দায়িত্ব। বিভিন্ন বিভাগের [illegible]

ইংরেজী ১৯৪৮ সাল। কলকাতায় হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলে থেকে পড়ি। ইউনিভার্সিটি কলেজের ছাত্র। এম. এ. ক্লাসের সঙ্গে আইনের দ্বিতীয় বার্ষিক তখন চলছে। বয়স প্রায় বাইশ কি তেইশ বছর হবে। বাড়ীতে প্রায়ই যেতাম কিন্তু বিনা-পয়সায় টিকিটের নাম করে বাবার কাছ থেকে যে টাকাটা পেতাম, তা খরচ করতাম সিনেমা আর রেস্তোরাঁয়। কারণ রেলের চেকারকে টিকিট বড় একটা দেখাতে হতো না। তা ছাড়া দলবদ্ধ ছাত্রদের ঝামেলা প্রায়ই তারা এড়িয়ে চলতো।

কিন্তু অঘটন একদিন সত্যিই ঘটলো। ধরা পড়লাম, মোবাইল কোর্টের হাতে। সে এক দুবিষহ অবস্থা। জরিমানা (fine) দিয়েও রেহাই নেই। কেষ্টনগরে বাবার কিছু পরিচিতি ছিল। তাই কথাটা তাঁর কানে তুলে দিতে ওঁদের খুব কষ্ট করতে হলো না।

বাবা মুখে কিছু বললেন না। কেবল একটা মানথলি টিকিট একদিন হাতে দিয়ে বললেন—"তুমি এখন বড় হয়েছ, পয়সা বাঁচাতে গিয়ে বিপথে চলো না। এতে নিজেকেই ছোট করা হবে। ফাঁকিতে একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে, নিজেকেই ঠকতে হবে শেষে।"

কথাগুলো আমার আত্মসম্মানে আঘাত করলো। তাই এ-অপবাদ আমি সহ্য করতে পারলাম না। তৃতীয় শ্রেণীর মানথলি নিয়ে প্রথম শ্রেণীতেই চেপে আমার দক্ষতা প্রমাণ করতে লাগলাম।

এরপর বেশ কিছুদিন চলে গেছে। কলেজের ছুটির পর হোষ্টেল হয়ে সেদিন শেয়ালদা ষ্টেশনে এসে পৌচেছি। ইচ্ছে করেই অপেক্ষা করছি প্লাটফরমের বাইরে। লক্ষ্য করছি গাড়ীটা কখন ছাড়বে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ছাড়বার বাঁশি বেজে উঠলো। তখন ছুটতে ছুটতে গিয়ে লাফ দিয়ে সেই চলন্ত গাড়ীর প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠে পড়লাম।

কামরাটা প্রায় ফাঁকা। উর্দি-পরিহিত একজন আরদালি দাঁড়িয়ে আছে এক কোণে, আর বাইরের দিকে চেয়ে একটা সিটে একজন বৃদ্ধ লোক জবুথবু হয়ে চুপচাপ বসে আছেন। তাঁকে দেখলে মনেই হয় না, যে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। বরং বয়সের চাইতে একটু বেশী বুড়িয়ে যাওয়া তাঁর চেহারা আর বেশভূষা দেখলে, আমার সমগোত্রীয় বলেই সন্দেহ হয় তাঁকে।

আমি দরজার কাছে দাড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাব বলে তৈরী হচ্ছি। এমন সময় সেই বৃদ্ধ আমাকে ইশারা করে ডাকলেন।

এগিয়ে তাঁর কাছে গেলাম—"আমাকে ডাকছেন?"

—"হ্যাঁ তোমাকেই।"

বৃদ্ধ বললেন—"যাবে কোথায়?"

—"কেষ্টনগর।"

—"ও, কী কর তুমি?"

—"আজ্ঞে, পড়ি।"

—"পড়? কোথায়? কী পড়?"

—"ইউনিভার্সিটি কলেজে। এম. এ-র সঙ্গে আইনের দ্বিতীয় বর্ষ।

—"বেশ। কলকাতাতেই থাক, না ডেলি-প্যাসেঞ্জারী কর?"

—"হোষ্টেলে থাকি। মাঝে মাঝে বাড়ীতে যাই।"

—"কিন্তু অমনি করে চলতি গাড়ীতে উঠলে! যদি কোন এ্যাক্সিডেণ্ট হতো?"

—"কী করব বলুন। এটা মিস্ করলে বাড়ী যেতে প্রায় দু'ঘণ্টা দেরি হয়ে যেতো আমার।"

—"মানলাম। না হয় একটু দেরিই হতো। তাবলে কি এমনিভাবে দুর্ঘটনার ঝুঁকি নেওয়া ভাল?—ভাব তো, তোমার মা-বাবা কত আশা নিয়ে তোমাকে মানুষ করছেন, অথচ ইচ্ছে করেই নিজের বিপদ ডেকে এনে তাঁদের মনে ব্যথা দিতে চাও?"

এই প্রশ্নের কোন জবাব খুঁজে পেলাম না। তাছাড়া তাঁর এই সহজ সরল কথাগুলি যেমন দৃঢ়, তেমনি সুদৃঢ় তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে আমি হার মানলাম।

—"নিজের অপরাধ বুঝতে পারছ?"

বৃদ্ধ শুধালেন—"বুঝতে পেরেছ, কোথায় ভুল করেছ তুমি?"

নীরবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

—"আচ্ছা, বসো।"

বৃদ্ধ বললেন—"ইউনিভার্সিটি কলেজে পড়। ডঃ নাগকে চেনো?"

—"আজ্ঞে, ডঃ নাগকে চেনেন আপনি?"

—"হ্যাঁ, চিনি বৈকি।"

বৃদ্ধ একটু মৃদু হেসে বললেন—"প্রফেসর সান্যালকে জানো না?"

—"হ্যাঁ, জানি!"

বৃদ্ধ যেন আপন মনেই বললেন—"বিলেতী আইন পড়ান। তা-বেশ।"

মনে মনে আমি বিস্মিত হচ্ছি।…কে এই বৃদ্ধ? কিন্তু জিগ্যেস্ করতে ঠিক সাহস পাচ্ছি না।

হঠাৎ কথার মোড় ঘরালেন তিনি—"টিকিট কেটেছ? দেখি তোমার টিকিটটা।"

যন্ত্রচালিতের মত আমার মানথলিটা তাঁর হাতে তুলে দিলাম। কাচুমাচু হয়ে বললাম—"ছুটে এসে ধরেছি, স্যার। তাই থার্ড ক্লাস না পেয়ে, তাড়াতাড়িতে ফার্স্টক্লাসে…"

তাছাড়া, পয়সাও ফাঁকি দিতে চাইছ রেল-কোম্পানীকে! উঁহু, এ-সব তো ভালো কথা নয়।"

মানথলি থেকে মুখটা উঁচু করে বললেন বৃদ্ধ।

গাড়ী ততক্ষণে নৈহাটিতে থেমেছে। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—"আপনি বসুন। আমি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় এক্ষুনি চলে যাচ্ছি।"

—"না না, বসো।"

বৃদ্ধ যেন আদেশ করে বললেন—"ভয় নেই। চেকার ডেকে তোমাকে ধরিয়ে দেব না।"

অথচ আমার অবস্থা তখন পালাই পালাই! উর্দি-পরা সেই লোকটার দিকে তাকাতেই দেখলাম, আমার দিকে চেয়ে সে মিটি মিটি হাসছে। বড়ই অপ্রস্তুত হলাম তার কাছে—তবুও পালাতে পারলাম না।

—"আচ্ছা, লেখা-পড়া শিখে তুমি জীবনে কী হতে চাও বল তো?"

কথার মোড় এবার অন্যদিকে ঘুরিয়ে বৃদ্ধ প্রশ্ন করলেন।

আমি বললাম—"বাবার ইচ্ছে, ল-টা পাস করে বিলেত যাই।"

—"আর তোমার ইচ্ছে?"

—"ভালো করে পাস করলেও মেডিক্যাল কলেজে যদি সিট পাই, আমি ডাক্তারী পড়ব।"

—"সে কী গো! পড়ছ আইন, অথচ ডাক্তার হতে চাও?"

—"আজ্ঞে, আমি বিজ্ঞানেরই ছাত্র। কেবল বাবার কথায়"…

—"বুঝলাম, কিন্তু সবই তো 'যদির' কথা বলছ। মনের দৃঢ়তা নেই কেন, ইয়ংম্যান (young man?) দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে পড়াশুনা করবে। হয়তো ডাক্তারই হবে তুমি। তবে সৎ হতে হবে তোমাকে। মানুষকে সেবা করার ভার নেবে, দায়িত্ব নেবে তাদের জীবন-মরণের! অথচ কৃপণতা থাকলে তো সেখানে চলবে না। তাছাড়া, আর একটা কথাও তোমাদের বলি—কাজ কতটুকু ছোট কিংবা কতটুকু বড়, তার মাপ নিয়ে কখনো মাথা ঘামাবে না। কোন কাজেই ফাঁকি দেবে না কখনো। দেখবে—ডাক্তার কিংবা উকিল যাই হও, জীবনে তুমি সফল হবেই। যদি পার, বুড়ো মানুষটির এই কথা-গুলো মনে রেখো।"

মনে মনে আমি এবার মরিয়া হয়ে উঠেছি। প্রশ্ন করলাম তাঁকে—"আপনি কে? আপনার পরিচয় পেতে পারি?"

বৃদ্ধ এবার হাসলেন—"পরিচয়? বুড়ো-মানুষের আবার পরিচয় কি? তবে!…"

আমি বললাম—"দেবেন না আপনার পরিচয়? আপনাকে তো কথা দিয়েছি, সৎ হবার আন্তরিক চেষ্টা আমি নিশ্চয় করব।"

—"খুব ভালো।"

উত্তর দিলেন এবার বৃদ্ধ—"পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে জানো?"

সানন্দে উত্তর দিলাম—"হ্যাঁ, ডক্টর ঘোষ।"

—"তাকে দেখেছ কখনো?"

—"চাক্ষুস দেখিনি। তবে, খবরের কাগজে তাঁর ছবি দেখেছি।"

—"আমি সেই প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।"

পরিচয় পেয়ে খুব আনন্দ হলো। কিযে করব, তা সহসা ঠিক করতে পারলাম না। ফ্যাল-ফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে চেয়ে। এরই মধ্যে ভাবলাম, ছদ্মবেশে তাহলে ময়দার-কলে গিয়ে ইনিই তেঁতুলের বীজ আবিষ্কার করেছিলেন! যা নিয়ে কতদিন হোস্টেলে বসে বন্ধুরা মিলে আলোচনাও করেছি।

এরপর আর বিলম্ব করলাম না। টপ্ করে একটা প্রণাম করে ফেললাম তাঁর পায়ে।...এত অমায়িক, এত সাধারণ মানুষ যে ডঃ ঘোষ, তা কখনো ভাবিনি!

ডঃ ঘোষ বললেন—"তুমি তো কেষ্টনগর যাবে? আমি নামব রাণাঘাট। আর বেশী দেরি নেই।"

বাঙ্ক থেকে ইশারায় সুটকেশটা নামাতে বললেন আরদালিকে। একটু আগেই তৈরী হতে লাগলেন।

গাড়ীটা এবার রাণাঘাট ষ্টেশনে এসে থামলো। ধীরে ধীরে নেমে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে তাঁর আরদালিটিও। পিছনে পিছনে নেমে আমিও পরের কামরা তৃতীয় শ্রেণীতে গিয়ে উঠলাম।

যাবার সময় পেছন ফিরে একবার তাকালো সেই আরদালিটা। এবারও সে তেমনি করেই হাসলো। কিন্তু বড় মিষ্টি লাগলো সে-হাসিটা।

এরপর অবশ্য একটা অটোগ্রাফের কথা আমার মনে পড়েছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী—ডঃ ঘোষ তখন দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছেন।

এইখানে মিঃ বিশ্বাস তাঁর কাহিনীর ছেদ টানলেন। একটুক্ষণ পরে জিগ্যেস্ করলেন—"ভালো লাগলো?"

তার উত্তরে সেদিন কী বলেছিলাম তা আজ আর মনে পড়ছে না। তবে, আজ প্রায় সাত-আট মাস হলো ধীরেনদা মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর কথা আর গল্পগুলো আজও মনে পড়ে আমার—প্রায়ই পড়ে!

—১—

টেনিস

বিশ্ব টেনিসের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় পাঁচটা বিষয়ের ভেতর শুধু মিক্সড ডাবলসের পুরস্কার ছাড়া পুরুষদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস—চারটে বিষয়ের বিজয়ীর পুরস্কারই পেশাদার খেলোয়াড়রা লাভ করেছেন। পুরুষ বিভাগের চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার পেশাদার খেলোয়াড় রড লেভার, যিনি অ্যামেচার জীবনে ১৯৬১ ও ১৯৬২ সালে পরপর দু'বছর চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছিলেন আর অ্যামেচার হিসেবে গত দু'বছরের মহিলা চ্যাম্পিয়ন আমেরিকার মিসেস বিলি জিন কিং এবার উইম্বলডন বিজয়িনী হয়েছেন পেশাদার খেলোয়াড় হিসেবে। সুতরাং রড লেভার মোট তিনবার এবং মিসেস কিং পরপর তিনবার উইম্বলডন জয় করলেন। উইম্বলডন বিজয়ী প্রকৃত অর্থেই বিশ্ব টেনিসের এক নম্বর খেলোয়াড়। শুধু শ্রেষ্ঠ সম্মানই নয়, সম্মানের সঙ্গে আর্থিক পুরস্কারও। পুরুষ বিভাগের বিজয়ী রড লেভার পেয়েছেন দু'হাজার পাউণ্ড। আরো পঁচিশ হাজার পাউণ্ড পাবার সম্ভাবনা তাঁর আছে। মহিলা চ্যাম্পিয়ন মিসেস কিং পেয়েছেন ৭৫০ পাউণ্ড।

উইম্বলডনে এবার ভারতীয় খেলোয়াড়রা বিশেষ সুবিধে করতে পারেন নি। কৃষ্ণন ও জয়দীপ মুখার্জি দু'জনকেই প্রথম রাউণ্ডে বাছাই খেলোয়াড়ের সম্মুখীন হতে হয়। প্রেমজিতলালকে প্রথমেই খেলতে হয়েছে মিশরের চ্যাম্পিয়ন তরুণ খেলোয়াড় এল. সফির সঙ্গে। প্রথম খেলাতেই পাঞ্চো গমালিসের কাছে কৃষ্ণনকে ৬-২, ৬-৪ ও ৬-৩ গেমে হার স্বীকার করতে হয়। জয়দীপকে লুই হোডের সম্মুখীন হয়ে ৬-৩, ৬-৪ ও ৬-২ গেমে হার স্বীকার করতে হয়েছে। এল, সফির কাছে প্রথম খেলায় প্রেমজিতলালের পরাজয় কিছুটা অপ্রত্যাশিত। তবে খেলাটা চার সেট পর্যন্ত চলেছিল।

দর্শক-ঠাসা মাঝ কোর্টে প্রথম ওপেন উইম্বলডনের ফাইনাল খেলা উৎকর্ষের বিচারে কোনো উত্তেজনা জাগাতে পারেনি। মাত্র এক ঘণ্টায় ভেতর বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ

ক্রিকেট

এবার ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া ছু'দেশের টেস্ট ম্যাচের অ্যাসেজ থেকে গেলো অস্ট্রেলিয়ার কাছে। প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া জিতেছিল, তারপর তিনটে টেস্ট পর পর শেষ হয়েছিল, অমীমাংসিতভাবে। পঞ্চম বা শেষ টেস্ট ম্যাচে ইংলণ্ড যদি জেতে তাহলেও ইংলণ্ডের অ্যাসেজ ফিরে পাবার কোনো আশা নেই।

তৃতীয় টেস্টে ছু'দলেরই অধিনায়ক আহত হয়েছিলেন। কলিন কাউড্রের জায়গায় অনেক দিন পর ইংলণ্ডের পক্ষে খেলতে নেমেছিলেন ডেক্সটার। কিন্তু তিনি বিশেষ স্নবিধে করতে পরেন নি। চতুর্থ টেস্টে প্রথম ব্যাট করার স্নযোগে অস্ট্রেলিয়া তুলেছিল ৩১৫ রান। অল্পের জন্যে সেঞ্চুরী করতে পারেন নি রেডপাথ। প্রত্যুত্তরে ইংলণ্ডের ইনিংস শেষ হয় ৩০২ রানের মাথায়। দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া করে ৩১২ রান। আর খেলার শেষে ইংলণ্ডের ৪ উইকেটের বিনিময়ে ওঠে ২৩০ রান। ফলে চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

ফুটবল

প্রায় ছু'মাস কলকাতার ময়দানে প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের খেলাগুলো চলছে। লীগের খেলা এখন প্রায় শেষের মুখে। মোহনবাগান শক্তিহীন জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে ছ-টা গোল দিয়েও ছুটো গোল খেয়েছে। শক্তিহীন হাওড়া ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পাঁচটা গোল করে খেয়েছে একটা গোল। হাওড়া ইউনিয়ন ইস্টবেঙ্গলের কাছে তিনটে গোল খেয়ে ছুটো গোল করেছে। মহমেডান স্পোর্টিং, জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে চারটে গোল করে একটা গোল খেয়েছে। ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের খেলায় হয়েছে পাঁচটা গোল। তা ছাড়া ছোট দলের খেলোয়াড়রা বড় দলের বিরুদ্ধে গোল করার সহজ স্নযোগ পেয়েও কত যে গোল করতে পারেনি তার হিসেব নেই।

বিশ্ব অলিম্পিক : হকি

মেক্সিকোর বিশ্ব অলিম্পিক শুরু হতে মাস আড়াই বাকী। অলিম্পিকে ভারতের যোগদান নিশ্চিত হলেও দলের কাঠামো এখনো অনিশ্চিত। একমাত্র হকি ছাড়া খেলাধূলোর কোনো বিষয়ে ভারতের মান বিশ্ব মানের কাছাকাছিও নয়, কিন্তু বিশ্ব অলিম্পিকের আদর্শ অনুযায়ী জয়লাভ বড় কথা নয়, অংশ গ্রহণ বড় কথা।

পাতিয়ালার অনুশীলন শিবিরে খেলোয়াড়দের গুণাগুণের নিরিখে প্রাথমিকভাবে সাতাশ জন এখন জলন্ধরের শিক্ষা-শিবিরে। এখানে আর একবার বাছাইয়ের পর নির্বাচিত

খেলোয়াড়রা অনুশীলন করবেন লাভডেন ক্যাম্পে। সেখান থেকে ইউরোপ যাত্রা এবং ইউরোপের কয়েকটা দেশে কয়েকটা খেলার পর মেক্সিকোর অলিম্পিক অঙ্গনে উপস্থিত হবেন। ভারতীয় হকি দল অলিম্পিকে জয়ী হয়ে ফিরে আসুন এই আমাদের কামনা।

বিশ্ব ফুটবল

বিশ্ব অলিম্পিকের দু'বছর পরে মেক্সিকোতে আর একটা বড় খেলা শুরু হবে। অর্থাৎ 'জুলেস রিমেট কাপ' বা বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার জন্যে ইতিমধ্যে দেশে দেশে প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে গেছে। ১৯৬৯ সালের ভেতর শেষ করতে হবে প্রাথমিক পর্যায়ের খেলা। তারপর ষোলটা দেশকে নিয়ে মেক্সিকোতে মূল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে এবার একাত্তরটা দেশ যোগ দিয়েছে। ইউরোপের তিরিশটা দেশের ভেতর থেকে আটটা (ইংলণ্ড বাদে), দক্ষিণ আমেরিকার দশটা দেশের মধ্যে থেকে তিনটে, মধ্য ও উত্তর আমেরিকার বারোটা দেশের মধ্যে থেকে একটা (মেক্সিকো বাদে), এশিয়া ও ওশিয়ানিয়ার আটটা দেশের মধ্যে থেকে একটা একটা এবং আফ্রিকার এগারোটা দেশের মধ্যে থেকে একটা দেশ মূল প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পাবে। প্রাথমিক পর্যায়ে খেলার তালিকা অনুযায়ী প্রতি দেশকে নিজেদের দেশে এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর দেশে গিয়ে খেলতে হবে। এশিয়া ও ওশিয়ানিয়া থেকে আটটা দেশ নাম দিলেও শেষ পর্যন্ত ক'টা দেশ প্রাথমিক পর্যায়ে খেলবে বলা শক্ত। গতবার এশিয়ার আঠারোটা দেশের ভেতর মাত্র উত্তর কোরিয়াই শেষ পর্যন্ত খেলেছিল এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জয়ের সুবাদে মূল প্রতিযোগিতায় খেলার অধিকার পেয়েছিল।

চুটকি

কোন একটি স্কুলে 'সাধারণ জ্ঞান' পড়ার পিরিয়ডে শিক্ষক এসে সকল ছাত্রদের সম্বোধন করে বললেন, আজ তোমাদের পড়ার পর তোমরা ভবিষ্যতে লেখাপড়া শিখে কে কি হতে চাও সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করব এবং তোমরা সঠিক উত্তর দেবে।

ছাত্ররা উৎসাহিত হয়ে কেউ বললে, আমি হব ডাক্তার; কেউ বললে, আমি হব উকিল; কেউ ইঞ্জিনীয়ার হব বললে।

একজন ছাত্র বললে, আমি স্যার শ্রেফ্ কেরানী হয়ে অফিসের কাজ না করে, স্ট্রাইক করব, ঘেরাও করব আর বসে বসে প্রতি মাসে মাইনে নেব।

—শ্রীঅজিতকুমার ভট্টাচার্য

পদান্তরে ধাঁধা

শ্রীবিনয় বাগচী

১। নীচে চতুর্দশপদী ছন্দের কয়েক সারি পদ্য দেয়া আছে। এদের প্রতি সারির শূন্য স্থান দুটি এমন শব্দ দিয়ে পূর্ণ করতে হবে, যাতে প্রতি ক্ষেত্রেই একটি বিশেষ্য পদ হলে অন্যটি বিশেষণ পদ হয়।

—যাহা কিছু করেছি—,
—যাহা কিছু করিব—।
—জন আমি এক আছে মোর—,
—কেন কর তাই নহি কিন্তু—,
—কিবা কেন তুমি হও বল— ?
—করে মোরে কর—।
—এ যাহা আছে তাই—,
—জানেন যিনি তিনি—।
—আছে যাহে বলে তা—,
—নাহিক যার কি করে সে— ?
—হয়েছে যাহা তাহাই—,
—যিনিই হন তাঁরই—।
—আছি আমি করি—,
—পত্রিকা কিন্তু বন্ধ হয়—।

নীচে দু'সারি নমুনা দেয়া হল ; এবার আর বুঝতে অসুবিধা হবে না,—কি বল ?

শ্রদ্ধা তাঁকে কর সদা যিনিই **শ্রদ্ধেয়**,
অগ্নিসম্পর্কিত যাহা তাহাই **আগ্নেয়**।

২। এমন একটি দুই অক্ষরের শব্দ বার করো যার অন্ত দুটি প্রতিশব্দের প্রথম অক্ষর মিলিয়ে সেই শব্দটি হয়।

৩। এমন একটি শব্দের নাম বার করো যার প্রথমার্ধে তারই প্রতিশব্দ হয়।

(উত্তর আগামীবার বেরুবে)
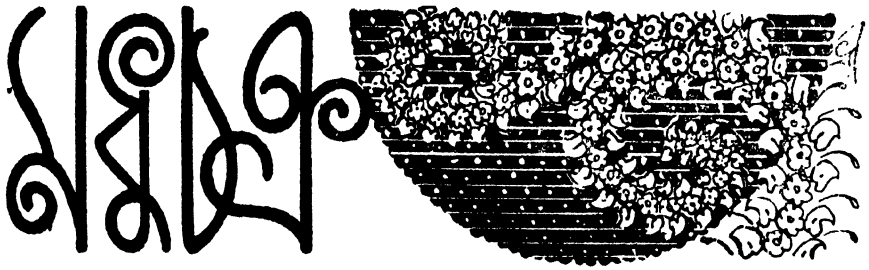
কোলকাতার সাম্প্রতিক খবরের মধ্যে জলপ্লাবন একটি প্রধান ঘটনা। তিন দফা জলস্রোতে অবশ্য মহানগরী সাময়িক বিপন্ন হলেও কাটিয়ে উঠলো। কিন্তু বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে যে সব বন্যার খবর আসছে তা মোটেই আনন্দের নয়। দেশে দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারীর তাণ্ডব লেগেই আছে, তারপর আছে বিক্ষোভ। ধর্মঘট তো প্রতিদিনের বিষয়বস্তু হয়েছে—কি অফিস-কাছারি, কি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, কোনো ক্ষেত্রেই কোনো আশাপ্রদ কিছু নেই। প্রতিদিন প্রভাতে সংবাদপত্রে হাত দিতে আশঙ্কা হয়—কি দেখবো আর কি জানবো এই হয় প্রধান দুঃশ্চিন্তা, আর হয়ও তাই, একটা আনন্দের একটা আশার খবর থাকে না—শুধু দুঃখ-দুর্দশা ও ক্ষয়-ক্ষতি, অসন্তোষ!

কবে আসবে সেই সুদিন? সুখ-শান্তিতে, মোটা ভাত-কাপড়ে মানুষ স্বস্তি পাবে—দুঃসময় কেটে যাবে?

তবু বলি, তোমরা যারা এসব দেখেই চলেছ তারা নিরাশ হয়ো না। দুঃখের মধ্য দিয়েই আসে সুখ-শান্তি—ধৈর্য ধরে স্থির হয়ে প্রতীক্ষা করতে হবে—শান্ত চিত্তে দৈনন্দিন কাজ ও পড়াশুনা করে যেতে হবে—যাঁর যা পাবার সেই প্রাপ্য সেই সম্মান তাঁদের দিতে হবে।

তোমরা পড়বে—

রাজস্থানের পার্বত্য-প্রদেশের ছোট্ট একটি রাজ্য—নাম তার রূপনগর। ক্ষুদ্র রাজ্য কিন্তু রাজার নাম বিক্রমসিংহ। বিক্রমসিংহের কন্যা চঞ্চলকুমারী। রাজ্যের আর রাজার বেশ শান্তিতে দিন কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু একদিন ছড়িয়ে পড়লো বিপদের আগুন। রাজপুতরা বিপদকে কোনোদিন ভয় পায় না, কিন্তু এবার ভয়ের কারণ ঘটলো। পাহাড়-পর্বত ঘেরা ছোট্ট রাজ্যটিতে নেমে এলো অশান্তির ছায়া।

যা হুকুম, তাকে তক্ষুণি তা পালন করতে হবে—এই ছিল বাদশাহী ফরমান। বিক্রম ছিলেন শোলাঙ্কি বংশের রাজা। রাজ্য ছোট হলেও তাঁর বংশের গৌরব অনেকখানি। সে গৌরব বুঝি আর রক্ষা করা যায় না। বাদশাহ আদেশ জারী করেছেন—রূপনগরের রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করে শোলাঙ্কিদের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করে তুলবেন। আকবর বাদশাহর সময় থেকে রাজপুতদের মোগলদের বিবাহ-সম্পর্ক চালু হয়েছিল। দু'চারজন রাজপুত রাজা ছাড়া প্রায় সবাই বাদশাহের পরিবারের মেয়ে পাঠিয়ে অগৌরব বোধ করতেন না। বিক্রমসিংহ এ প্রস্তাব পছন্দ করুন আর না করুন প্রতিবাদ জানাতে তাঁর সাহস হয়নি। কিন্তু বাদ সাধলেন রাজকুমারী নিজে। চঞ্চলকুমারী জানতেন প্রত্যাখ্যানের ফল রাজ্য এবং রাজবংশের পক্ষে ক্ষতিকর হবে—তবু তিনি এ অগৌরবের থেকে বাঁচতে চাইলেন। সামনা-সামনি যুদ্ধে রূপনগর বাদশাহী সৈন্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না। অনেক ভেবে-চিন্তে উপায় বার করলেন। তাঁর মনে পড়লো রাজপুতানার গৌরব চিতোরের রাণা রাজসিংহের কথা। শিশোদিয় বংশ রাজপুতানার মধ্যমণি—এই বংশের রাণা প্রতাপ পঁচিশ বছর প্রাণপণে মেবারের স্বাধীনতার জন্য সম্রাট আকবরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁরই যোগ্য বংশধর রাজসিংহ। "অনুগ্রহ করিয়া আমার বিপদ শ্রবণ করুন। আমার দুরদৃষ্টক্রমে দিল্লীর বাদশাহ আমার পণিগ্রহণ করিতে মানস করিয়াছেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার সৈন্য আমাকে দিল্লী লইয়া যাইবার জন্য আসিবে। আমি রাজপুত কন্যা ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভবা, কি প্রকারে তাহাদের দাসী হইব? হিমালয়-নন্দিনী হইয়া কি প্রকারে পঙ্কিল তড়াগে মিশাইব? রাজকুমারী হইয়া কি প্রকারে তুর্কী বর্বরের আজ্ঞা-কারিণী হইব। আমি স্থির করিয়াছি এ বিবাহের অগ্রে বিষ-ভোজনে প্রাণত্যাগ করিব।"

রাজসিংহ রূপনগরের বিপদে পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে এলেন। জানতেন এতে অনেক বিপদ, অনেক রক্তক্ষয়—তবু কর্তব্যবোধে সব বিপদের ঝুঁকি তুলে নিলেন নিজের মাথায়। মেবারের সঙ্গে সুরু হলো বাদশাহের লড়াই। পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন যুগে কত লড়াই হয়েছে—কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তার মূলে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদের পরিকল্পনা কিংবা পররাজ্য গ্রাসের আকাঙ্ক্ষা। আক্রমণকারীকে দমন করার জন্য অনেক রাজা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, এমন নজীর ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুঁজলে অনেক পাওয়া যাবে। কিন্তু রাজসিংহ যে প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন বাদশাহী ফৌজের বিরুদ্ধে—তার মূলে ছিল শরণাগতকে আশ্রয় দেবার আকাঙ্ক্ষা। রূপনগরের রাজকন্যার মান-সম্ভ্রমের প্রশ্ন সেদিন তাঁর কাছে ছিল সবচাইতে বড় প্রশ্ন। আদর্শের জন্য বিপদের ঝুঁকি নিতে ইতস্ততঃ করতেন না রাজপুতরা। ইয়োরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগে যখন সামন্ত প্রথার প্রচলন

ছিল, তখন আশ্রয়প্রার্থীদের রক্ষার জন্ম ক্ষতি স্বীকার এমনকি প্রাণদান করতেও কার্পণ্য করতেন না সে যুগের বীরপুরুষরা। তাঁদের চরিত্রের এই মহৎ গুণটি ইয়োরোপের ইতিহাসে 'শিভালরি' বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। আমাদের দেশে এই শিভালরির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন রাজপুতরা আর রাজপুত বীরদের মধ্যে যিনি সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন—তিনি মেবার অধিপতি রাজসিংহ।

বড় হয়ে যখন তোমরা ইতিহাসের বই পড়বে তখন জানতে পারবে রাজপুত মোগলদের সংগ্রাম-কাহিনী, আরো জানতে পারবে যদি পড়ো, বঙ্কিমচন্দ্রের অনবদ্য সৃষ্টি, ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহ'।

তোমাদের সকলের চিঠি পেয়েছি। একান্ত শুভেচ্ছায়—

তোমাদের
মধুদি'

সম্পাদক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার

শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : ০·৫০ পয়সা

শ্রীশ্রীদুর্গা (নেপাল)

ফটো : শ্রীমানসরঞ্জন কর্ণচৌধুরী

❋ ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র ❋
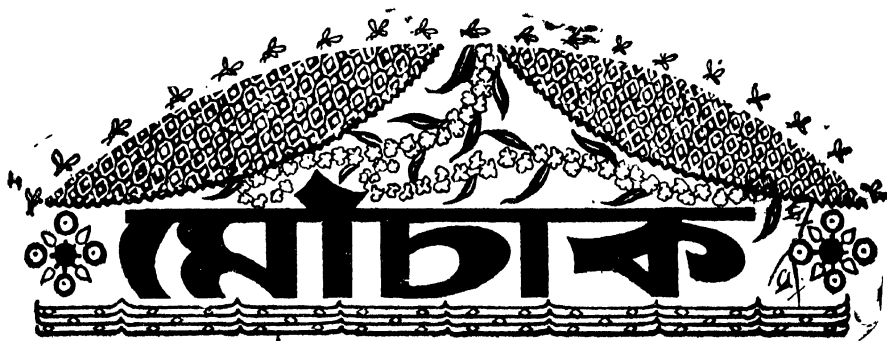
৪৯শ বর্ষ] আশ্বিন : ১৩৭৫ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

মা দুর্গাকে

শ্রীঅবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই চিঠিটা লিখতে আমি চাইছি মা দুর্গাকে।
কেউ কি এটা ফেলে দেবেন কৈলাসেরি ডাকে॥
আর কিছু না লিখছি শুধু সত্যি ঘটেছে যা।
বলছি কত খারাপ লাগে নিত্য জলে ভেজা॥
মাগো তোমার বাপের বাড়ী সব গিয়েছে ভেসে।
জষ্টি থেকে নেমেছে এক বিষ্টি সর্বোনেশে॥
আকাশ কালো ক'রে কেবল অঝোর ধারা ঝরে।
ঝড়ের হাঁকে বাজের ডাকে সবাই ভয়ে মরে॥
এর মাঝে মা কেমন করে আসবে পূজো খেতে।
হাহাকারের সুর এখানে উঠছে দিনে-রেতে॥
কোথায় হবে পূজোর ঘটা করবে কে বা পূজো।

প্রথম ধরো গণাই দাদা এলেন ইঁদুর চেপে।
চাল না খেতে পেয়ে ইঁদুর যাবেই যাবে খেপে ॥
বাহন যদি যায় মা খেপে তবে গণাই দাদা।
একেবারে ভূত হবে যে পার হতে জল কাদা ॥
ত'রপর দেখ লক্ষ্মীদিদি প্যাঁচায় এলে উড়ে।
বিষ্টি জলে প্যাঁচা কি আর বসবে পাখা মুড়ে ॥
নামতে দিদি পারবে নাকো কোথাও ডাঙা পেয়ে।
ফিরতে হবে আকাশ-পথে শূন্যে ধেয়ে ধেয়ে ॥
সরস্বতী দিদির বটে নেইকো অসুবিধে।
হাঁসের পিঠে জল পেরিয়ে পৌঁছে যাবে সিধে ॥
কিন্তু মাগো দাদা-দিদির সঙ্গ নাহি পেলে।
ছোটবোনের কোন আমোদ কখ্‌খনো কি মেলে ॥
কাতুদাদার ময়ুর সেও অনেক মজা পাবে।
জলের দেশে মাছ তো মেলা ডাইনে-বাঁয়ে খাবে ॥
ভয় পাছে সে অনেক গিলে পেট ফাটিয়ে মরে।
তবে দাদার ওড়ার আশা ঘুচবে চিরতরে ॥
মাগো তোমার আছে আবার বাহন সিংগী মামা।
জল পেরোতে পারবে সে কি টেনে হাজার হামা ॥
তখন তুমি পড়বে কি যে বিপদে তাই ভাবি।
সাঁতার দিতে পারবে কি মা অথৈ জলে নাবি ॥
শেষে যে ছাই অসুর আছে তোমার পদতলে।
তুমি সাঁতার দিলেও সে ঠিক তলিয়ে যাবে জলে ॥
তাই বলি মা এ বছরের মতন চেপে থাকো।
বাপের বাড়ী আসার কথা শিকেয় তুলে রাখো ॥
বাঁচতে যদি পাই এ জলে ছোট্ট ক'রে বলি।
আসছে বারে নিও না হয় অনেক পাঁঠা বলি ॥

"বর-পুত্র"

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বড়দের সরস্বতী পুজো হয় বারোয়ারী তলায়, বরাবর যেখানে হয়ে আসছে।

মাঝারি যারা, মোটামুটি কলেজের ছাত্র বা ঐরকম বয়সের, তাদের সবাই না হোক, অনেকে গত তিন বছর থেকে আলাদা মণ্ডপ করে পুজো করছে। নাম রেখেছে "ছাত্র-সংঘ"। ওরা পুজোর থেকে বিসর্জনের ওপর বেশি জোর দিতে চায়; বড়দের তাতে আপত্তি।

গত বছর থেকে আর একটি দল গজিয়েছে। কিছু স্কুলের ওপরের ক্লাসের ছাত্র, বয়েস তেরো-চোদ্দ থেকে ষোল-সতেরোর মধ্যে, তার সঙ্গে কিছু বাইরের ছেলে ঐরকম বয়সের। এ-বেচারিরা পুজোটাই চায়। তার কারণ, ওদের যারা চাঁই—হাবলা, গোকুল, দিনেশ, পটলা, আরও ক'জন—তারা সরস্বতীকে মনে মনে বিদেয় দিয়েছে, আর লোক দেখানো ঘটা করে বিসর্জনের দরকার বোধ করে না। প্রায় সবাই-ই প্রত্যেক ক্লাসে এক বছর করে জিরিয়ে নিয়ে তবে এগুচ্ছে। পটলার দু'বছর হোল। বিসর্জন দিয়েছে অবশ্য বইয়ের চাপ বরদাস্ত করতে না পেরেই। এখন ওরা দেখতে চায় পুজো করলে যদি কোন সুরাহা হয় ফাঁকতালে।

একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, এতে হাসবার কি আছে? চারিদিকেই চলছে, ওরাই বা চালিয়ে দেখবে না কেন? দলের নাম রেখেছে "বর-পুত্র"।

বুদ্ধিটা পটলার। চৌকশ ছেলে; এক পাশ করা ছাড়া চারিদিকেই চৌকশ। পাশ করাটা হোল সমস্ত বছরের শেষে মাত্র একটা দিনের ব্যাপার; ক্লাসটিচার ক্লাসে এসে বললেন—তুমি উঠে গেলে, তুমি রয়ে গেলে; নিশ্চিন্দি। পটলাকে বছরের প্রতিটি দিন এমন সব নতুন নতুন বুদ্ধির মারপ্যাচ নিয়ে থাকতে হয় যে, ঐ একটা দিনের দিকে চেয়ে বসে থাকলে চলে না। অত ক্লাসে ওঠার দিকে মন দিতে গেলে দলের সর্দারি থেকে নেমে আসতে হয়।

পটলা দলের সর্দার।

গত বছর প্রথম বারেই যেমন জমিয়ে ফেলেছিল পুজোটা, ওর সর্দারিতে আস্থাটা সবার আরও বেড়ে গেছে। মাগ্যি-গণ্ডার বাজার, তায় পুজোও একটার জায়গায় তিনটেয় দাঁড়িয়ে গেছে পাড়ার মধ্যে, তবু ফিকির-ফন্দি করে বেশ চাঁদা তুলল। নিজেদের ব্যাণ্ড্ তোয়ের করল ঢাক, খত্তাল আর বিউগল্ দিয়ে। আসরও যা সাজাল তাতে সবার বাহবাই পেল।

এবার একটা নতুন সমস্যা এসে পড়েছে দলের সামনে। প্রত্যেক দলেই মাতব্বরি নিয়ে দু'এক জনের মধ্যে রেষারেষি থাকে, এবার গোকুল দু'একটা ছোটখাট কথায় মতান্তর হওয়ায় নতুন দল গড়বে বলে ভয় দেখিয়েছে। পুজোর আর মাসখানেকও নেই, স্কুলের মাঠের এক দিকে বিকেল বেলায় ওদের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা চলছিল, গৌতম এসে একটা তুড়ি দিয়ে বসতে বসতে বলল—"এবার পুজো শিকেয় তুলে রাখো, বোঝাপড়া করেও কিছু হবে না। ছাত্র সংঘ ছত্রভঙ্গ হয়ে তিন টুকরো হয়ে গিয়ে ত' চাঁদার জন্যে বেরিয়ে পড়েছে, তোমরা বোঝাপড়া করতে করতে ওদিকে সব রস শুষে নেবে।"

মুখ শুকিয়ে গেল সবার।

তবে, বিপদেরও একটা গুণ আছে; অনেক সময় নিজেদের মধ্যেকার গলদগুলো নষ্ট করে দিয়ে বাঁধনটা শক্ত করে দেয় তার সঙ্গে এ কথাটাও রয়েছে যে, এই বয়েসের ছেলেদের—এই রকম দশ, বারো, চোদ্দ সতেরো—এদের যেমন মনকষাকষি হতে দেরি হয় না, তেমনি এক কথাতেই মিটমাটও যায় হয়ে। এতক্ষণ ধরে টানাহিঁচড়ে, মান-অভিমান চলছিল, গৌতমের কথা শুনে সবাই খানিক থ হয়ে বসে থাকার পর পটল মুখ তুলে চাইল গোকুলের দিকে। গোকুলও চেয়েছে, দু'জনের চোখাচোখি হতে পটল শুধু ছোট্ট করে জিজ্ঞেস করল—"কিরে গকা, ডাহা বেইজুত করাবি?"

কেষ্ট বলল—"ওর ইজ্জৎটাই কি বাড়বে? এমন একজোট না হলে শুধু…"

শেষ করবার আগেই গোকুল উঠে প'ড়ে ওদিক থেকে এগিয়ে এসে পটলার ডান হাতটা দু'হাতে ধ'রে ফেলে বলল—"যা বলবি গকাকে।"

দুর্গাপুজোর বারোয়ারী তলার থিয়েটারে ব্রজপাল শাক্তসিংহ হয়ে প্রতাপসিংহ হীরু বাগচিকে যেমন ক'রে বলেছিল। একটু ভাবুক গোছের ছেলেটা; এমনও হতে পারে এই রকম ক'রে ভাব ক'রে ফেলবার জন্যেই ঐরকম ক'রে আলাদা হওয়ার ফ্যাচাংটা তুলেছিল।

সবার হাততালি পড়ে গেল। মিটমাট হয়ে গেল।

এর পর আসোল সমস্যা নিয়ে পড়ল সবাই। গত বছরই চাঁদা আদায় করতে যে হয়রানিটা গেছে, সেটা বেশ মনে আছে সবার। প্রতিযোগিতা মাত্র দুটি দলের সঙ্গে, তার জায়গায় এবার চার-চারটে দল, রেষারেষিতে একেবারে হন্যে হয়ে নামবে চাঁদা আদায়ে। মাঝারি দলেদের অনেক ট্রিক্স্ আছে, চাঁদা না দিলে বাড়িতে হাড় ফেলে দেয়, গাছ কেটে দেয় বাগানের, এরা সেসব পারবে না; সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসল।

সন্ধ্যের পর বেশ খানিকটা রাত পর্যন্ত আলোচনা হোল। তাতে আপাতত এইটুকুই ঠিক হোল যে, কাল সকাল থেকে মুন আদা খেয়ে নেমে পড়তে হবে। এখন যেমন দাঁড়িয়েছে; যারা আগে চাঁদার খাতা নিয়ে পৌঁছুতে পারে।

দিন পাঁচেক পরের কথা। চাঁদার অবস্থা খুবই খারাপ, যদি এই রেটে আদায় হতে থাকে তো পঞ্চাশটা টাকাও ওঠে কিনা বলা যায় না। গত বছরই দেড়শ টাকা খরচ হয়েছিল তার মধ্যে ব্যাণ্ডটা গড়ে তুলতে প্রায় পঞ্চাশ টাকা খরচ হয়। দিনেশের বৌদিদি টেলারিং পাশ, পোশাক সেলাইয়ের খরচটা লাগেনি। এবার ও খরচটা পুরোপুরিই বাঁচবে, তবু সব মিলিয়ে একশ' সওয়াশ' টাকা না তুলতে পারলে, পুজোয় হাত দেওয়াই যাবে না। অথচ তার কোন আশাই নেই।

সবাই স্কুলের মাঠে জড়ো হয়েছে, পটলা আসেনি, তারই অপেক্ষা করছে। এমনি সে না থাকলে কোন সমস্যাই মেটে না, তার ওপর এবার একটা বাড়ি থেকে থোক্ বড় চাঁদাটার আদায়ের ভার ওরই ওপর।

কলোনীতে বছর দুই থেকে একজন ব্যারিষ্টার কলকাতা থেকে এসে বাসা নিয়ে আছেন, নাম মিস্টার এস, গুপ্টা। নিজে আর তাঁর অ্যামেরিকান পত্নী। একটি নাকি ছোট মেয়ে আছে, সে দার্জিলিঙের ওদিকে কোথায় এক কনভেন্টে পড়ে।

ওঁর বাড়ির চাঁদাটা একটা মস্ত বড় ভরসা, কলোনীর ছোট-বড় সব পার্টির। তার কারণটাও একটু নতুন ধরণের। মিষ্টার গুপ্টা নিজে যেমন ঘোর নাস্তিক, মিসিস্ গুপ্টা, ওঁর পত্নী তেমনি দেবদেবীর ভক্ত। নিজে ঠিক দেবদেবীর মূর্তি বা পট রেখে পূজো না করলেও, ঘরে রামকৃষ্ণ দেবের পট আছে, ধূপ-ধুনো দিয়ে দু'বেলা প্রণাম করেন। গত বছর বারোয়ারীতে আর মাঝারিদের পূজোয় একশ' আর পঞ্চাশ টাকা করে চাঁদা দিয়েছিলেন, পটলাদেরও দিয়েছিলেন পঁচিশ।

এবার তিনি দুর্গাপূজোর পরই অ্যামেরিকায় বাপের বাড়ি গেছেন, এখনও ফিরতে মাস দুয়েক দেরি। গুপ্টা সাহেব এমন পাষণ্ড যে কাউকে ঠিকানাটাও দিচ্ছেন না। সব পার্টিই মাথায় হাত দিয়ে বসেছে।

শুধু তাই নয়। ওঁর কাছে পৌছানোও দায়। সকালেই সেই যে মোটরে ক'রে কলকাতায় বেরিয়ে যান, হাইকোর্ট, তারপর ক্লাব এইসব সেরে খানিকটা রাত করেই ফেরেন।

একটু পান-দোষ আছে, তখন দেখা করার মতন অবস্থাও থাকে না, তার ওপর আবার পূজোর-চাঁদার কথা নিয়ে!

আরও একটা মস্ত বড় বাধা একজোড়া এ্যালসেশিয়ান কুকুর।

কুকুর দুটো একেবারে গুপ্টা সাহেবের প্রাণ। স্ত্রীর সঙ্গে অন্তত এক দিক দিয়ে তো মেজাজের ঐ মিল, গুপ্টা সাহেব কুকুর দু'টিকে নিয়ে সংসারে বেঁচে আছেন বলা যায়।

তাদের রাজকীয় ব্যবস্থা। খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ আর বাসস্থানের দিক দিয়ে তো বটেই, তাছাড়া তার তদারকের জন্যে আলাদা লোক মোতায়েন আছে। একটা পুরো হরিজন পরিবারই বলা চলে—বুধন রাম, তার স্ত্রী আর পনের-ষোল বছরের একটি ছেলে, নাম বদ্‌রি। এরা দু'জনে অবশ্য বাইরেও কাজ করে, তবে আউট-হাউসে থাকে সাহেবের, নজর রাখতে হয় কুকুরের ওপর। তাছাড়া বদ্‌রির এলাকায় একটা আলাদা কাজই দেওয়া আছে—রোজ সকাল-বিকালে দু'টি কুকুরকে বাইরে থেকে ঘুরিয়ে আনা; তা প্রায় ঘণ্টাখানেক ধ'রে।

এবার ঐ সমস্যা ; মেমসাহেব নেই, তার ওপর ঐ একজোড়া কুকুর, এক মাইল দূর থেকে ডাক শুনলে বুক কেঁপে ওঠে।

ভরসার মধ্যে, পটলা নিজের হাতে নিয়েছে। স্কুল ছাড়া তাকে কোথাও ফেল করতে দেখেনি কেউ।

কিন্তু পটলাই বা এখন পর্যন্ত কৈ করতে পারল কিছু ? এরা জোটে রোজই এখানে সবাই। পটলা একটু যেন মনমরা হয়েই আসে। তবে এদের প্রশ্নে, (কারুর বা একটু টিটকিরি দিয়েই প্রশ্নে)আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে, বলে—"ঠাট্টা নয় হে, দেখবে, দেখবে ; সবুরে মেওয়া ফলে।"

আজও ঐভাবেই আস্তে আস্তে এল। আজ হাতে একটা কাগজ, আর একটু যেন বেশি মনমরা।

ও এদিক থেকে গেছে, উল্টা দিক থেকে জলধর একটু ত্রস্ত পদেই এসে উপস্থিত হোল, বলল—"ওরে, একটা খবর শুনেছিস পটলা ? গুপ্টা সায়েবের মদ্দা এ্যালসেশিয়ানটা নাকি পাওয়া যাচ্ছে না, পরশু বিকেলে নাকি ছোঁড়াটা নিয়ে বেরিয়েছিল, হঠাৎ হাত ফসকে ·"

"তাই নাকি !!"—বলে সবাই একেবারে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল। হাবুল বলল—"তাহলে তো তোর খুব সুবিধে পটলা। মাদীটার শুনেছি নাকি বাচ্চা হবে, এখন অনেকটা·· "

"বলে যা, বলে যা।"—শুনতে-শুনতে মুখ বেঁকিয়ে উঠল পটলা, বলল—"বাচ্চা হবে, সুতরাং সে এখন একটা ভেঁড়ার সামিল। তাহলে তুই-ই যানা।"

একটু মনমরা হয়ে বসল একধারে ব্যাপারটা জড়িয়ে। আজও কিছু সুবিধে করতে পারেনি, মেজাজটা ভাল নয়, কেউ কিছুক্ষণ আর ঢুকতে সাহস করল না। তারপর দিনেশ বলল—একটু সাহস করে, ওকে বোঝাবার ঢঙে—"রাগ করছিস, কিন্তু এই মোকায় একটু চেষ্টা করলে বোধ হয় ভালো হোত। কে বলতে পারে ? হয়তো কুকুর-হারানোটা মা-সরস্বতীর দয়াই হতে পারে।"

'প্যাণ্টের পকেট থেকে একতাড়া দশটাকার নোট বের করে দিয়ে বললে'

পটলা এবার শুধু মুখটা তুলে তার দিকে একটু চাইল। হয়তো ওর অদ্ভুত কথা শুনেই মুখে একটু হাসিও ফুটল। হাবুল বলল—"হাসছিস হাস, কিন্তু খানিকটা আবার বিশ্বাসও রাখতে হয়।"

পটলা র‍্যাপারের মধ্যে থেকে মুখটা তুলে বললে—"মার অত দয়া তো দুটোকেই হারিয়ে দিলেন না কেন? জোড়া হারিয়ে এটা তো আরও ক্ষেপে থাকবে। কি উপকারই করলেন?"

হারু বলল—"ঠাট্টা না করে একটু দেখলে পারতিস। তোর আবার এটা ফেলের বছর গেল, একটা বছর বাদ দিয়েই স্কুল ফাইন্যাল…"

"জ্বালাস নি হেরো!"—আবার একটু খিঁচিয়ে উঠল পটলা। বলল—"মা সরস্বতী এলে এবার জিজ্ঞেস করিস তো, তিনি নিজে ক'টা-পাস দিয়েছেন।…নে, ওঠ। না হয় মুলতুবি করবি তো কর বসে, আমি উঠলাম।"

ও উঠে পড়তে আর সবাইও উঠে পড়ল। হাবুল বলল—"এবার শীতটাও দিয়েছেন তেমনি; এদিকে এক পয়সা চাঁদার গরমাই নেই।"

চুপ-চাপই এগিয়ে চলল সবাই। মাঠটা প্রায় পেরিয়ে এসেছে, গোকুল বলল—"শুধু শুধু পটলাকে দুষলে চলবে কেন? মার যদি এতই দয়া তো এ্যালসেশিয়ানটাকে না সরিয়ে মেমসাহেবকে আনিয়ে দিতে পারতেন তো। তাঁর পক্ষে আর শক্ত কি ছিল?…তাহলে আমি বলি পটলা, এবছর ছেড়েই দে, দরকার নেই ধাষ্টামোর। আজ পর্যন্ত মোটে সতেরটি টাকা জমেছে আমার হাতে।"

মাথা হেঁট ক'রে চপ্পল টানতে টানতে যাচ্ছিল পটলা, ঘুরে দাঁড়াল। ও দাঁড়াতে

আর সবাইও দাঁড়িয়ে পড়েছে, বলল—"সবুর, সবুর। পটলা ব'সে নেই। একটা মতলব লাগিয়েছে, খেটে গেলে সরস্বতী ছেড়ে দুর্গাপূজো কোর তখন। না খাটে, দু'ঘা করে জুতো মেরে বলিস্ তুই হতভাগা এমন কাজে হাত দিতে গেছলি কেন সবাইকে ডোবাতে?"

এ হচ্ছে পটলার সব চেয়ে জোরের কথা, আত্মবিশ্বাসটা যখন একেবারে সপ্তমে উঠে যায়। বললও একটু বুকটা চিতিয়ে। আর সবাইও বেশ চনমনে হয়ে উঠল, যে-যার বাড়ি যাওয়ার মুখে।

তিনদিন পরের কথা। মাঝে দু'দিন পটলার টিকি দেখা যায়নি, কোথায় আছে কি করছে কিচ্ছু না জানতে পেরে সবাই মুষড়ে গেছে একেবারে। আসে, একত্র হয়, আবার মুখ চুন ক'রে যে-যার বাড়ি চলে যায় একটু গল্প-গুজব করে; বিশেষ ক'রে বড়রা কি করছে তারই চর্চা।

আজও তাই করছিল, সন্ধ্যে হয়ে গা-ঢাকা হয়ে আসছে এইবার উঠবে, পটলা ছাতিম গাছের ঝোপের তলা দিয়ে বেরিয়ে এল। একলা নয়, সঙ্গে দু'জন। তার মধ্যে একজনকে অনেকে চিনল; গুপ্টা সাহেবের হরিজন চাকরের ছেলে বদ্রি, কুকুর দুটোকে টহল দিতে দেখেছে। সবাই হাঁ ক'রে চেয়ে রইল।

পটলা গটগট ক'রে এসে দলের ঠিক বাইরেতে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে একবার সবার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। গোকুল একবারে ওদিকটায় বসেছিল, তার দিকে চেয়ে একটু থিয়েটারি ভঙ্গিতেই চারটে আঙুলের ইশারা ক'রে বলল—"গোকুল ভাই, একবার এদিকে আসতে হবে।"

গোকুল একটু হতভম্ব হয়েই এসে দাঁড়াতে, প্যান্টের পকেট ভেতর থেকে একতাড়া দশ টাকার নোট বের ক'রে এক দুই তিন করে দশখানা তার হাতে তুলে দিয়ে বলল—"এগুলো হোল হারানো এ্যালসেশিয়ান কুকুর খুঁজে এনে দেওয়ার দরুন।" তারপর আরও পাঁচখানা গুণে দিয়ে বলল—"এগুলো হোল পূজোর চাঁদা এ-বছরের। অবশ্য, সবই চাঁদা হিসেবে জমা হবে।"

গোকুল হচ্ছে এ-বছরের কেশিয়ার, অর্থাৎ কোষাধ্যক্ষ।

এর পর সবার ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করল—"হবে পূজো এতে? পটলা এইটুকুই পারল।"

সবাই অবাক মেরে গিয়েছিল, ও থামলে প্রশ্ন করল জড়াজড়ি করে—"কিন্তু যোগাড় করলি কি করে! কুকুর পেলি কোথায়?···গুপ্টা সায়েবই দিলে টাকা!"

(শেষাংশ ২৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গ্যাস-বেলুন

— শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

জিন্‌তু ডায়েরি লেখে। রোজ নয়, মাঝে মাঝে। ছাপানো ডায়েরির পাতায় নয়। ওর বড় বড় হাতের লেখায় একটু বেশী করে লিখতে গেলে ছাপানো পাতার এক-পাতায় ধরে না—সে এক বিরক্তিকর ব্যাপার—লেখা শেষ না করেই ছেড়ে দিতে হয়। বাবার দেওয়া ছাপানো পকেট ডায়েরিটা তাই এক পাশে সরিয়ে রেখে দিয়েছে। তাতে ধুলো পড়ে গেছে। তার বদলে ও নিয়েছে একটা লাইন-টানা খাতা। তাইতে বড় বড় স্পষ্ট অক্ষরে জিন্‌তু যত খুশী লিখতে পারে, যেখানে খুশী শেষ করতে পারে। আরম্ভের জায়গায় লিখে দেয় তারিখ আর শেষ হয়ে গেলে রুল দিয়ে একটা লাইন টেনে দেয়।

সেদিন ভোরে উঠে মুখটুখ ধোবার আগেই জিন্‌তু ডায়েরির খাতাটা টেনে নিয়ে তার নীচু টেবিলের ধারে গিয়ে বসল। তারপর ২২ অগাষ্ট, ১৩৬৮ লিখে তার তলায় ভেবে ভেবে এই কবিতাটি লিখল :

গ্যাস বেলুন
গ্যাস বেলুন
পৌঁছে গেল আসানসোল
গেলই তো
গেলই তো
বিশ্বাস কি করবে না ?
করতে হবে
করতে হবে
স্বপ্নে আমি দেখেছি যে
দেখেই ছি
দেখেই ছি
হবে না তো মিথ্যে তা
গ্যাস বেলুন
পৌঁছেছে
আসানসোল আসানসোল।

এই তার প্রথম কবিতা।

সেদিনের সেই ২২ অগাষ্টের ডায়েরি শুধু ঐ টুকুই। সেদিন এ ছাড়া আর কিছুই সে লেখেনি।

১৮ অগাষ্ট তাদের কলকাতার বাড়িতে এসেছিলেন জিন্‌তুর মাসী, মেসমশায় আর মাসতুতো ভাই। তিনদিনের জন্যে ওরা এসেছিলেন আসানসোল থেকে। মেসমশায় ঐখানেই কাজ করেন। জিন্‌তু আর তার মাসতুতো ভাই একেবারে এক বয়সী। এর আগে কেউ-কাউকে দেখেনি। কিন্তু ভাব হতে দেরি হল না। আর ভাবও হল তেমনি।

জিন্‌তু বললে—তোমার নাম কি ?

—সুমন্ত্র।

—আমার নাম জিন্‌তু। ভালো নাম জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। সাবান বল করবে আমার সঙ্গে?

সুমন্ত্র চট্ করে উত্তর দিতে পারল না। ভাবল খানিকক্ষণ। সাবান বল যে কি তা সে জানতো না। আর সাবান সম্বন্ধে তার একটা অহেতুক ভীতি ছিল। মা তাকে প্রচুর সাবান মাখিয়ে স্নান করাতেন। আর তাঁরই অত্যুৎসাহের ফলে কখনও কখনও সুমন্ত্রের চোখে সাবানের ছিটে এসে লেগেছে আর সে জ্বালার চোটে উহু উহু করে চেঁচিয়ে তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়েছে। তারপর থেকে সে চোখ বুজে সাবান মাখে। যতক্ষণ না গা থেকে পিচ্ছিল সাবানের শেষ ফেনাটি ধুয়ে যায়, চোখ খুলতে পারে না। এই জন্যে তার সাবানের উপর বিষম ঘৃণা। কেন যে ছোট ছেলেদের শুধু জল দিয়ে স্নান করানো যায় না এ প্রশ্ন সে তার মা-কে অনেকবার করেছে—কোনো সদুত্তর পায়নি।

সুমন্ত্র ভয়ে ভয়ে বলল—সাবান বল? সে আবার কি?

জিন্‌তু তার হাত ধরে বারান্দার দিকে টেনে নিয়ে যেতে-যেতে বলল—এসো দেখিয়ে দিচ্ছি।

জিন্‌তু এই প্রথম নিজের বয়সী সঙ্গী পেল। ও থাকতো একা; নিজের মনে সাবান বল ওড়াতো। ওদের বাড়িতে ছিল একটা চক্-মিলানো উঠোন। ওরা থাকত চারতলায়। নীচের তলাগুলোয় থাকত অন্য ভাড়াটিয়ারা। উঠোনের চারিদিক ঘিরে বারান্দা—তার পিছনে ঘর। জিন্‌তুদের চারতলায় উঠোন ঘিরে চারপাশে চারটে বারান্দা ছিল। জিন্‌তু সেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে সাবান-গোলা জলে নল ডুবিয়ে সাবান-বল ওড়াতো। কলকাতার এই চক্-মিলানো উঠোনগুলো এমন ভাবে তৈরী, যে প্রায় সব সময় উঠোনের নীচের তলা দিয়ে হাওয়ার প্রবাহ ঢুকে উপর দিকে উঠে যায়—যেন একটা মস্ত চোঙার মত। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে। গরমের সময় এই জন্যে এই ধরনের বাড়িগুলি ঠাণ্ডা থাকে। জিন্‌তু তাদের চারতলার বারান্দা থেকে ঝুঁকে সাবান বল ওড়াতো আর দেখত বলগুলো তার নল থেকে ছাড়া পেয়ে কেমন প্রথমে কিছুটা নীচে নেমে তারপর উপর দিকে উড়ে যাচ্ছে। সেই সময় ইচ্ছে করলে তাদের হাতে করে ধরা যেত, কিন্তু জিন্‌তু ধরত না। জানত ধরলে হয় ফেটে যাবে, নয় আধখানা হয়ে হাতে সেঁটে থাকবে। সে বলগুলোকে ভেসে যেতে দিত। আর তাদের উপর রামধনুকের রং অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াত। কখনো কখনো তার মনে হত সাবানের বলগুলো নল থেকে ছাড়া পেয়ে আপনিই যেন বেড়ে যাচ্ছে। চোখের ধাঁধা কিনা কে জানে? কাকাকে জিজ্ঞেস করেছিল একদিন। কাকা যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করেন, কিন্তু কাকাও স্পষ্ট কোনো জবাব দিতে পারেন নি।

বলগুলো কিছুটা উপরে উঠেই তারপর ফেটে যেত। এইটিই দুঃখের কথা। কেন যে সাবানের বুদ্বুদ উড়তে উড়তে অনেক উপরে মেঘের সঙ্গে ভেসে যায় না এ নিয়ে জিন্‌তু অনেক ভেবেছে, কিন্তু কোনো কূল-কিনারা পায়নি। সত্যি বুদ্বুদের জীবন বড় ক্ষণিক। আর একটু টিঁকে থাকলে বেশ হত। অনেকক্ষণ দেখা যেত।

সুমন্ত্রর হাত ধরে বারান্দার ধারে এনে জিন্‌তু বললে—এই দেখ।

সুমন্ত্র দেখলে একটা টুলের উপর দু-বাটি সাবান গোলা জল আর দুটি নল।

জিন্‌তু একটা নল তুলে জলে ডুবিয়ে সুমন্ত্রর হাতে দিয়ে বলল—নাও, ফুঁ দাও। আস্তে কিন্তু, নইলে ফেটে যাবে।

সুমন্ত্র চোখ বুজে ফুঁ দিতে থাকল অত্যন্ত সাবধানে।

জিন্‌তু বললে—ও কি, চোখ বুজলে কেন?

সুমন্ত্র বললে—সাবানের ছিটে চোখে লাগবে না?

জিন্‌তু বললে—আচ্ছা ভীতু তো। এই দেখ আমি কি করে করি।

বলে তার গরম ফুঁ-ভরা একটা মস্ত বল নলের মাথায় দুলিয়ে চট করে একটা ঝাঁকনি দিয়ে হাওয়ায় ছেড়ে দিলে।

সুমন্ত্রর চোখ একেবারে ছানাবড়া।

তারপর একটু অভ্যেস করতেই সে-ও সাবান-বল ওড়ানোর বিদ্যে শিখে ফেললে।

জিনতু বললে—এসো এবার আরেক কায়দা শেখাই।

বলে সে সাবান জলের মধ্যে বুড়বুড়িকরে ফুঁয়ের গুণে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে রাশি রাশি বল সৃষ্টি করে ফেলল। এগুলো ছোট হল বটে, কিন্তু আকাশ ছেয়ে গেল।

সুমন্ত্র এটা অভ্যেস করছে এমন সময় ও-বারান্দা থেকে ডাক এল—সুমু নাইবি আয়। মাসী খাবার দেবে।

সুমন্ত্র জিন্‌তুকে বলল—এবার বাড়ি গিয়ে আমি খুব সাবান-বল ওড়াবো।

জিন্‌তু বলল—তোমাদের বাড়িতে এমনি উঠোন আছে?

—তা তো নেই।

—তবে কি আছে?

—দোতলার একটা বারান্দা আছে রাস্তার উপর। কেন, সেইখান থেকে ওড়াবো!

—তাহলে কিন্তু আকাশে উড়ে যাবে না ভাসতে ভাসতে চলে যাবে। আমি দেখেছি।

—তা হোক। সে-ও তো ভাল।

আবার ডাক এল— কি হল সুমু? আসবিনে?

সুমন্ত্র বললে—মা ডাকছে। আমি চলি।

জিনুতু বলল—তোমার নাম সুমু? বলনি তো।

—ডাক নাম।

—আমিও তোমায় সুমু বলে ডাকব।

বারান্দার এক কোণে জিনুতু আর সুমুর আসন পড়েছিল পাশাপাশি।

জিনতু খেতে-খেতে বললে—আজ কিন্তু সুমু আর আমি এক সঙ্গে শোব।

ওদের দুই মা পরস্পরের দিকে তাকালেন খানিকটা অবাক হয়ে। সুমুর বরাবর মা কিংবা বাবার সঙ্গে শোয়া অভ্যেস। ওদের ধারনা তা নইলে অন্ধকারে ও ভয় পায়। জিনুতুরও তাই। মা-রা ভাবলেন, একদিনের আলাপেই ওরা বড় হয়ে গেল নাকি? যাই হোক, দুই ছেলের বিছানা এক সঙ্গে হল।

সেদিন রাত্রে দুই ভাই বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার আগে কি গল্প করেছিল জানা নেই। তবে পরদিন জানা গেল সুমু আর তার বাবা-মার এক জায়গায় নেমন্তন্ন হয়েছে—প্রায় সারাদিনই সেখানে কাটাতে হবে। অর্থাৎ সেদিন আর দুজনের একসঙ্গে সাবান-বল ওড়ানো বা অন্য কোনো খেলা হবে না।

সুমুর বাবার এক বিশেষ বন্ধুর মেয়ে কি এক পরীক্ষায় চতুর্থ হয়েছে বলে তিনি বন্ধুদের ডেকে পার্টি দিচ্ছেন। সুমুর জিনুতুকে ছেড়ে যাবার একটুও ইচ্ছে হচ্ছিল না—ওদিকে পার্টিতে যাবারও লোভ। মাসীমা একবার বললেন—জিনুতুকেও সঙ্গে নিয়ে গেলে কেমন হয়? মেসমশায় বললেন—বন্ধুটিকে তো চেনো, যে রকম সায়েব, হয়তো খানার টেবিলে প্রত্যেকের চেয়ারের পিঠে নামই লেখা থাকবে সাহেবি কেতায়। কে জানে!

মাসীমা শুনে বললেন—তবে বাপু দরকার নেই। শেষে কি হতে কি হবে!

জিনুতু রয়েই গেল। ওঁরা চলে গেলেন পার্টিতে। জিনুতু সেদিন আর সাবানের বুদ্বুদ ওড়ালো না। তার দুটো জলছবির খাতা ছিল, তাই নিয়ে বসল। সুমন্ত্র ফিরে এলে তাকে দেখাতে হবে। তা ছাড়া সাবান জল গোলার কায়দাটা ওকে শিখিয়ে দিতে হবে। ও তো কিছুই জানে না। কাপড় কাচা সাবান গুলে কোনো লাভ হয় না, বলে দিতে হবে। নলে বল-ই ধরবে না, আকাশে ওড়া তো দূরের কথা। সবচেয়ে ভাল হয় মায়েদের গায়ে মাখার ভালো সাবান দিয়ে। মা-রা আপত্তি করলে বলতে হয়—কতটুকুই বা লাগবে? টেরই পাবে না। এই সব শিখিয়ে দিতে হবে সুমুকে—যাবার আগেই।

নানা চিন্তায় জিনুতুর সারাদিন কেটে গেল।

'তিনখানা দিয়ে বলল—এগুলো তোর, নে ধর।'

সন্ধ্যেবেলা সুমু ছুটতে ছুটতে মহা উৎসাহে যখন উপরে উঠে এল, দেখা গেল তার হাত ভর্তি গ্যাস-ভরা বেলুন—পাঁচ রঙয়ের পাঁচখানা। পার্টি থেকে নিয়ে এসেছে। জিন্তুর হাতে তিনখানা দিয়ে বললে—এগুলো তোর, নে ধর।

সুমু যেমন সাবান-বল দেখে অবাক হয়েছিল, জিন্তু তেমনি গ্যাস-বেলুন দেখে অবাক হল। এমন আশ্চর্য উড়ন্ত খেলনা জিন্তু এর আগে কখনও পায়নি।

সুমু বললে—দেখছিস্ তো এগুলো সাবান বলের মতো ফাটে না। আয়, ঘরের মধ্যে ছেড়ে দেব।

জিন্তু বললে—ছাড়বি কি? উড়ে যাবে যে।

—দূর! কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকে যাবে। সুতো ধরে টানলেই আবার নেমে আসবে।

সারা সন্ধ্যে বেলুনের খেলায় কেটে গেলে তাদের। জিন্তু ভেবেছিল, জলছবির বই দেখাবে, তা আর হল না।

শুতে যাবার আগে জিন্তু বললে—এই, এগুলোকে কাল সকালে ছাদে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেব। দেখব, কত উঁচুতে ওঠে। তোরগুলো তুই ছাড়বি তো?

সুমু বললে—নিশ্চয় ছাড়বো। বেশ মজা হবে।

দুই ভাই যে ঘরে শুয়েছিল তার কড়িকাঠে মাথা দিয়ে গ্যাস-বেলুনরাও ঘুমোতে গিয়েছিল বটে, কিন্তু সকালে দেখা গেল সব ক-টা চুপ্‌সে মেঝেতে নেতিয়ে রয়েছে। তাদের অনেক ধাক্কা-টাক্কা দিল ওরা, কিন্তু আকাশে ওড়বার তাদের আর কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। ধাক্কা খেতে খেতে ক্রমেই যেন তারা আরও চুপ্‌সে যেতে লাগল।

বড় দমে গেল দু-ভাই। বেলুন ওড়ানো হল না; সাবান-বলও করতে ইচ্ছে হল না সেদিন। দু-জনে বারান্দার কোণে গিয়ে বসল। জিন্‌তু তার জলছবির বই দুটো এনেছিল, কিন্তু ছবিও বিশেষ দেখা হল না। গল্পে-গল্পেই কেটে গেল সারাটা দিন। সেইদিনই সন্ধ্যার ট্রেনে সুমুদের আসানসোলে ফিরে যাবার কথা। দু-ভাইয়ের মন বিশেষ ভালো নয়, তাই কোনো খেলাই বিশেষ জমল না।

সন্ধ্যার আগেই সুমুর মা এসেই তাড়া দিলেন—সুমু ওঠ্। বাবা গাড়ী আনতে গেছে। জিন্‌তুর সঙ্গে আবার পূজোর সময় দেখা হচ্ছে রে?

—দেখা হচ্ছে নাকি? কোথায়?

—কেন, ওরা যে পূজোর ছুটিতে আসানসোল আসছে।

—তাই নাকি? কি মজা।

দু-ভাই আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

—ও মা, আসানসোলে গ্যাস-বেলুন পাওয়া যায়? জিন্‌তুর জন্যে কিনে রেখো মা!

—সব সময় তো পাওয়া যায় না বাছা। যাই হোক, তোমার বাবাকে বলে রাখব।

—জিন্‌তু তুই সাবান-বল তৈরী করা শিখেছিস গ্যাস-বেলুন করাটাও শিখে নে না।

—দূর, আমার মনে হয় ও বড় শক্ত। ছোটরা পারে না।

এমন সময় নীচে থেকে ডাক এলো—গাড়ী এসে গেছে।

সুমুরা চলে যেতে জিন্‌তু একলা সেই পাঁচটা চুপ্‌সে যাওয়া বেলুনের পাশে বসে কি যেন ভাবছিল। হয় তো ভাবছিল, সাবান-বল যেমন ফুঁ দিয়ে ওড়ানো যায়, এগুলোকেও ফুঁ দিয়ে ওড়ানো যাবে না কেন?

এমন সময় কাকা ঘরে ঢুকে বললেন—ওগুলো কি রে জিন্‌তু?

জিন্‌তু বললে—দেখুন না কাকা। কাল এগুলো কেমন উড়ছিল, আজ আর উড়তে পারছে না।

কাকা বললেন—ওড়াবি? কাল সকালে আমার ল্যাবরেটারিতে নিয়ে আসিস উড়িয়ে দেব।

—কি করে ওড়াবে কাকা?

—কেন, গ্যাস ভরে!

—তুমি পারবে?

—ঠিক পারব। আসিস্।

কাকা যে ঘরে থাকতেন, তাকে তিনি বলতেন ল্যাবরেটারি। কারণ সেখানে তাঁর

নানারকম টুকিটাকি যন্ত্রপাতি থাকত—ছুতোরের, দপ্তরীর, কামারশালের। আর কাঁচের বোতলে অ্যাসিড, আর কি সব!

পরদিন সকালে জিনতু কাকার ল্যাবরেটারিতে ঢুকে দেখল, কাকা একটা নতুন যন্ত্র এনেছেন—তার মুখে একটা নল লাগানো। যন্ত্রের মধ্যে খানিকটা গুঁড়ো, খানিকটা জলের মত আর অ্যাসিডের মত কি ভরে তিনি জিনতুর হাত থেকে একটা বেলুন নিয়ে নলের মুখে লাগিয়ে ছিপি ঘুরিয়ে দিলেন। অমনি বেলুনটা আস্তে আস্তে ফুলে উঠতে লাগল।

পুরো ফুলে যেতে ছাড়িয়ে নিয়ে তার মুখে সুতো বেঁধে জিনতুর হাতে দিয়ে কাকা বললেন—এই নাও, একটা হল।

জিনতু দেখল বেলুনে দিব্যি টান ধরেছে।

তারপর দেখতে দেখতে পাঁচটা বেলুনেই গ্যাস ভরা হয়ে গেল। তখন কাকা তাঁর বিছানার তলা থেকে এক প্যাকেট রবারের বেলুন বার করলেন। বললেন—এতে পঞ্চাশটা আছে কত চাই তোর? সামনের বাটার দোকান থেকে কিনে নিয়ে এলুম।

যন্ত্রে যা গ্যাস বাকি ছিল সব ভরে দিলেন কাকা আরও গোটা সাতেক বেলুনে।

জিনতু বারোটা বেলুনের বারোটা সুতো আঙুলে জড়িয়ে খুশীতে ঝল্‌মল্‌ করতে করতে ছাদে উঠে গেল।

তারপর সেগুলোকে একসঙ্গে রেলিংয়ের শিকেয় বেঁধে জিনতু উপুড় হয়ে পড়ল সুমুখে চিঠি লিখতে। সুমুকে এই সুখবরটা এখনই দেওয়া দরকার। গ্যাস-বেলুন তৈরীর রহস্য জানা হয়ে গেছে। এখন যত খুশী গ্যাস-বেলুন ফুলিয়ে আকাশে ছেড়ে দেওয়া যায়।

বড় এক টুকরো কাগজে বড় বড় অক্ষরে সুমুকে চিঠি লিখল জিনতু। গ্যাস বেলুনের খবর দিল। তারপর মা-র কাছ থেকে খাম এনে ওদের ঠিকানা জেনে সুমুর নাম-ঠিকানা লিখল। জিনতু জানত নির্ভুল ঠিকানা লিখে দিলে চিঠি ঠিক পেঁাছে যায়। ওই যে রাস্তার ধারে লাল রংয়ের একটা থাম আছে, যার মধ্যে লোকে ঠিকানা-লেখা চিঠি ফেলে, জিনতুকে কে যেন বলেছিল, ওর নীচে দিয়ে চারিদিকে গর্ত চলে গেছে। চিঠিরা ঠিকানা ধরে সেই গর্ত বেয়ে যার যেদিকে যাবার কথা চলে যায়।

জিনতু লিখল—সুমু, তোকে বারোখানা গ্যাস-বেলুন পাঠাচ্ছি। কাকা করে দিয়েছে। কাকা যত খুশী গ্যাস-বেলুন করতে পারে। কেমন করে করতে হয় কাকার কাছে শিখে তোকে শিখিয়ে দেব। ইতি—জিনতু।

লিখে চিঠিটা ঠিকানা-লেখা খামে ভরে বেলুনের সঙ্গে বেঁধে আকাশে ছেড়ে দিল।

ঠিকানা লেখা থাকলে বেলুন যে চিঠি নিয়ে ঠিক-মতো পৌঁছবে এ বিশ্বাস জিনতুর ছিল। মাটির তলা দিয়ে যদি চিঠি যেতে পারে, আকাশ দিয়েই বা যাবে না কেন? বরং আরো সহজে যাবে। কারণ উপর থেকে তো সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়।

বেলুনের গুচ্ছ হুহু করে উঠে হাওয়ার স্রোতে পড়ে দেখতে দেখতে ছোট্টটি হয়ে কোন্ দিকে চলে গেল, রোদের দিকে চেয়ে চেয়ে জিন্‌তু আর দেখতে পেল না।

জিন্‌তুর এই কীর্তির কথা বাবা যখন শুনলেন, তিনি বললেন— চিটিটা আমায় দিলি না কেন? আমি ষ্ট্যাম্প মেরে ডাক বাক্সে দিয়ে আসতুম?

জিন্‌তু বললে—কেন বাবা, আকাশ দিয়ে কি চিঠি যায় না?

বাবা বললেন—শুনিনি কখনও।

জিন্‌তু বললে—আমার মনে হয় যাবে।

বাবা বললেন—কই তুই ষ্ট্যাম্প চেয়ে নিলি না? ষ্ট্যাম্প দিয়েছিস?

—দিয়েছি বই কি। পুরোনো চিঠি থেকে খুসে লাগিয়ে দিয়েছি।

—তবেই হয়েছে! বলে বাবা চলে গেলেন।

জিন্‌তু ভাবল। অনেকক্ষণ ভাবল। বাবা সন্দেহ প্রকাশ করলেন বটে, কিন্তু জিন্‌তুর মনে মনে তখনও বিশ্বাস, এ চিঠি সমুদের আসানসোলের ঠিকানায় ঠিক পৌছবে। সেদিন ২১শে অগাষ্ট।

নানা চিন্তায় জিন্‌তু সেদিন ঘুমোতে গিয়েছিল, আর ২২ অগাষ্ট ভোরবেলা উঠেই লিখেছিল ঐ কবিতাটা। 'গ্যাস বেলুন, গ্যাস বেলুন, পৌঁছে গেল আসানসোল,' ইত্যাদি।

২৫ অগাষ্ট সমুর কাছ থেকে একটা চিঠি পেল জিনতু, তাতে সে লিখেছে, সে জিন্‌তুর চিঠি আর সেই সঙ্গে বারোটা বেলুন পেয়েছে। আর লিখেছে, কেমন করে বেলুন গ্যাস ভরতে হয় সেই বিদ্যেটা পূজোর সময় জিন্‌তুর কাছ থেকে শিখে নেবে।

সমু পেয়েছিল সুন্দর একটি প্যাকেটটা—তার মধ্যে ভাঁজ করা জিন্‌তুর চিঠি আর পাট করে রাখা বারোখানি রবারের বেলুন।

কেমন করে প্যাকেটটা সমুদের বাড়িতে পৌঁচেছিল তা আমরা অবশ্য জানিনা, কিন্তু জিন্‌তুর বিশ্বাস গ্যাস-বেলুনরা ঠিক ঠিকানা খুঁজে সমুদের বাড়িতে আসানসোলে নেমেছিল।

সীমান্তের ঘাঁটি

শ্রীধরেন্দ্রলাল ধর

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সীমান্তের এক পথের মুখে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ ইনেস্‌পেকটার সর্দার আবদুল বারি। এখানকার গোটা দশেক ঘাঁটির সেই কর্তা। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে সীমান্তরক্ষী পাহারাদার বসে আছে। সর্দার মাঝে মাঝে রাত্রে এক ঘাঁটি থেকে আরেক ঘাঁটি ঘুরে বেড়ায়, প্রহরীরা সজাগ আছে কিনা দেখে। এই অঞ্চল দিয়ে রাতে অনেক চোরা চালানের যাওয়া-আসা চলতো, আবদুল আসার পর তা বন্ধ হয়েছে। সৎ ও কর্মঠ পুলিশ অফিসার বলে আবদুলের খ্যাতি আছে।

আজও রাত্রে আবদুল বেরিয়েছে ঘাঁটির পর ঘাঁটি পরিদর্শন করতে। কিন্তু একটি সরু পথের মুখে একটা গাছতলায় এসে সে থমকে দাঁড়িয়েছে। ভাবছে। আজ তার মন বড় চঞ্চল।

বিকালে স্ত্রীর সঙ্গে বচসা হয়ে গেছে। বিবি বলেছে, এই গ্রামের সাত ঘর হিন্দু আজ ওপারে চলে যাবে।

—পাসপোর্ট নেই যাবে কি করে?

—এখানে থাকতে আর তারা সাহস পাচ্ছে না। কবে কে কোথায় খুন হয়ে যাবে ঠিক নেই। ওরা থাকতে ভয় পাচ্ছে।

—পাসপোর্ট না থাকলে যাবে কি করে?

—ঢাকায় গিয়ে পাসপোর্ট আনতে হবে, আর চাইলেই যে পাসপোর্ট পাবে তার কোন কথা নেই। তুমিই তো এখানকার সব তদারক করছ, তুমি ওদের ছেড়ে দেবে।

—আমি বে-আইনী কিছুই করতে পারবো না।

—এর আবার বে-আইনী কি হোল? মানুষগুলো প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, তাদের যেতে দেওয়া বে-আইনী, আর এখানে থেকে তারা যদি খুন হয়, সেইটে হবে আইন-মাফিক?

—তা জানি না, কিন্তু আমি বে-আইনী কিছু করবো না।

—রহমন আজ রাত্রে ওদের সীমান্ত পার করে দেবে কথা দিয়েছে।

রহমন আবদুলের বড় ছেলে, কলেজের ছাত্র।

আবদুল বললো—রহমন এমন কথা দিলে কেন?

—অন্যায় কি করেছে, জানা-চেনা প্রতিবেশী বিপদে পড়েছে তার উপকার করবে না? তাহলে লেখাপড়া শেখা কিসের জন্য!

—রক্ষীদের উপর হুকম আছে, অন্ধকারে কেউ সীমান্ত পার হচ্ছে দেখলেই গুলি চালাবে।

—তুমি তাদের বারণ করো।

—আমি ?

—হ্যাঁ, তুমি নাহলে সে গুলিতে আমরাও জখম হতে পারি। আমিও তো যাবো ওদের মেয়েদের সঙ্গে।

—যা মন চায় করগে, কিন্তু বে-আইনী আমি কিছু করতে পারবো না।

বিরক্ত হয়ে আবদুল বাড়ী থেকে বেড়িয়ে এসেছিল। এখন এই সরু পথটার মুখে এসে আবদুল সেই কথাই ভাবছে। এই পথটাই অনেক বেঁকেচুরে চৌধুরীদের বাগানের পাশ দিয়ে একবারে থানার পাশে এসে পড়েছে, থানাটা পার হতে পারলেই হিন্দুস্থান। যারা চোরা-গোপ্তা সীমান্ত পার হতে চায়, তারা এই পথটাই পছন্দ করে। রহমন সম্ভবতঃ এই পথটা ধরেই আসবে। থানার পাশেই একখানি মাটির ঘর, সেখানে চারজন বন্দুক-ধারী পাহারাদার আছে। প্রথমে হাঁক দেবে তারপরেই গুলি চালাবে। আবদুল চিন্তিত মুখে পথটার শেষ অবধি তাকায়, অমাবস্যার রাত, ভালো করে নজর চলে না।

কোন একসময় আবদুলের খেয়াল হয়, হাত ঘড়িটার পানে তাকায়, রেডিয়াম ডায়েলের ঘড়িতে কাঁটা জলজল করে। রাত দশটা বেজে গেছে। রাত গভীর হয়ে আসছে। ঝিঁঝি পোকার ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। এইবার ওরা এসে পড়বে। ওদের সাড়া পেলেই রক্ষীরা গুমটি থেকে বেরিয়ে আসবে, তখন ?

ওদিকে একটা কালো ছায়া নড়ছে, কে যেন আসছে। একা এই পথে অমন ভাবে এগিয়ে আসছে সাহস তো কম নয়। কোমরের পিস্তলটার উপর হাত রেখে আবদুল এগিয়ে গেল।

ছায়া আরো কাছে এসে পড়লো। বোরখা পরা এক রমণী। আবদুল জিজ্ঞাসা করলো—কে ?

—আমি খাঁ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—কে খাঁসাহেব ?

—ইনেস্‌পেক্টার সাহেব।

আমিই ইনেস্‌পেক্টার।—তুমি কে ? কি চাও ?

রমণী মুখ থেকে বোরখা সরিয়ে ফেললো, আবদুল চিনলো—রমণী তারই বিবি, রহমনের মা। বললো, তুমি এখানে এসেছ ?

—কি করবো ওদের তো পৌছে দিতে হবে। জন্মকালের পড়শীকে একেবারে বিপদের মুখে ছেড়ে দিই কি করে ? কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে যাচ্ছে, আমি সঙ্গে থাকলে তবু একটু ভরসা পাবে।

—তোমরা আমাকে বড় বিপদে ফেললে। পাসপোর্ট নেই আর আমার সামনে দিয়েই ওরা চলে যাবে!

—তুমি দেখতে না পার, সরে যাও, রহমন ওদের নিয়ে চৌধুরীদের বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, আমি খবর দিলেই ওরা আসবে।

'তুমি দেখতে না পার, সরে যাও'…

—তা তো আসবে—আবদুল উত্তেজিত হয়ে উঠলো—কিন্তু উপরওয়ালাদের আমি কি কৈফিয়ৎ দোব?

—কাউকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না, সবার উপরওয়ালা তো খোদাতালা, বিপন্ন মানুষকে রক্ষা করলে তিনি প্রসন্ন হবেন।

—ওসব কথা বইয়ে পড়তে বেশ লাগে, কিন্তু মিলিটারি রাজ্যে ওসব কথা চলে না।

তা তো জানি, জানি বলেই এই জানাচেনা মানুষগুলোকে এদের হাত থেকে বাঁচাতে চাই। তুমি তার বাধা হচ্ছ কেন? এরা আমাদের সাতপুরুষের প্রতিবেশী, আমাদের দেশের লোক, এদের বিপদের দিনে যদি আমরা না দেখি তো কে দেখবে? আমি এখনি গিয়ে ওদের নিয়ে আসছি। তুমি পথ পরিষ্কার রাখো, আর না হয় হুকুম দিও গুলি চালাতে। আমি ও রহমন সামনেই থাকবো, আমরাই আগে মরবো।

বিবি বোরখায় মুখ ঢেকে আর কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়ে ফিরে চললো। আবদুল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত।

সহসা আবদুল নিজেকে সজাগ করে তুললো। তাড়াতাড়ি পা চালালো গুমটি ঘরটির দিকে। চারজন আনসার সেখানে বসেছিল, আবদুলকে দেখেই লাফিয়ে উঠে সেলাম দিল। আবদুল বললো—চল, ওদিকটা একটু দেখে আসি।

চারজন বন্দুক তুলে নিলে। আবদুল থানার পাশ দিয়ে সরু পায়ে চলা পথটা দিয়ে হাঁটতে সুরু করলো। আনসার চারজন তার অনুসরণ করলো।

শ দুয়েক গজ গেলেই গোটা দুই আমগাছ, তারপরেই পর পর অনেকগুলি বাঁশ ঝাড়। বাঁশ ঝাড়ের পাশ দিয়ে যেতে যেতে আবদুল বললো—কতবার লিখেছিলাম এই বাঁশ ঝাড়টা কাটিয়ে এদিকটা পরিষ্কার করতে, তা কর্তাদের হুঁস নেই। এগুলো কাটিয়ে দিলে এ অঞ্চলটা পরিষ্কার হয়ে যায়।

বাঁশ ঝাড়ের পরেই ঝিল। ঝিলের শেষে আরেকটা গুমটি, তার পাশ দিয়ে আরেকটা সরু পায়ে-চলা পথ। আবদুল সদলে সেই গুমটিতে এসে পৌছলো। সেখানেও দু'জন রক্ষী বসেছিল, আবদুলকে দেখেই সেলাম দিল। আবদুল বললো—দু'জন কেন, বাকি দু'জন কোথায়?

একজন জবাব দিল—করিম ও আনদারের জ্বর হয়েছে, ওরা চলে গেছে ঘরে।

—আমায় তো কিছু জানায় নি।

—জানাবে কি করে, ঠকঠক করে কাঁপছিল, আমরাই বললাম—চলে যাও, আমরা বলে দেবো'খন। এদিক থেকে বাড়ীটা কাছে হয়, অতদূরে আর উজিয়ে যাবার দরকার নেই।

আবদুল বললো—কিন্তু এভাবে চললে তো ডিসিপ্লিন থাকে না। আমাকে একবার জানিয়ে যাবে তো? আমি যদি এখন এদিকে না আসতাম তাহলে আমাকে তোমরা কিছু জানাতেই না। এ কাজ ভাল হয়নি।

—তারা ভাল করে চলতে পারছে না হুজুর। ওদিকে আবার অতখানি যায় কি করে।

—তারা যাবে কেন, তোমরা একজন যেতে, দরকার হলে আমি জিপ দিতাম বাড়ী পৌছে দিত।

—আমরা অতটা ভাবিনি হুজুর।

—ভাব্‌বার তো কিছু নেই, ডিউটি না করলে ছুটি নিতে হবে, ওরা ছুটি নেয়নি। বিনা এত্তেলায় চলে যাবার জন্ম ওদের মাইনে কাটা যাবে।

—গরীব লোক হুজুর ?

—চুপ কর, এখানে ডিসিপ্লিনের কথা, গরীব-বড়লোকের কথা নয়।

রক্ষী দু'জন চুপ করে দাড়িয়ে রইল। আবদুল গম্ভীর ভাবে গুমটি ঘরের সামনে পায়চারি করতে লাগলো।

কয়েক মিনিট চুপচাপ কেটে গেল, তারপর আবদুল সঙ্গীদের বললো—চল পরের গুমটিতে যাই।

চারজনকে নিয়ে আবদুল্লা আরো অগ্রসর হলো।

প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে আবদুল ফিরে এলো যথাস্থানে।

পথের পাশে গুমটির সামনে একজন লোক পায়চারি করছিল, আবদুল বললো—কে ?

লোকটি ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে এলো। আবদুল তার মুখের উপর টর্চের আলো ফেললো। সে তারই পুত্র রহমন।

আবদুল বললো—এতো রাত্রে এখানে কি ?

রহমন শান্ত কণ্ঠে বললো—কয়েকজন হিন্দুকে থানা পার করে দিয়ে এলাম। তোমরা এখানে না থাকায় আমার খুব সুবিধা হলো, কোন হাঙ্গামা পোহাতে হলো না।

—কাজটা বে-আইনী হয়েছে, এর মধ্যে বাহাদুরির কিছু নেই।

—বিপন্ন মানুষকে সাহায্য করা কোনকালেই বে-আইনী নয়।

—যে রাজ্যে বাস করবে সেই রাজ্যের আইন মেনে চলতে হবে।

রহমন হাসলো, বললো—ওরা দশটা টাকা দিয়ে গেছে তোমাদের সন্দেশ খাবার জন্ম।

পুত্রের হাতে নোটখানা দেখে আবদুল উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো, বললো—তোমাকে আমি গ্রেপ্তার করে সদরে চালান করবো।

রহমন হাসিমুখেই বললো— আমার অপরাধের প্রমাণ কই ? আমি তোমার সব কথাই অস্বীকার করবো।

—সে আমি জানি এই মিথ্যের জোরেই তো তোমাদের দল এখনও টিঁকে আছে। যেদিন প্রমাণ পাবো সেদিন তোদের সব কটাকে আমি চালান করবো। তোদের পার্টির নাম আমি মুছে দোব এই অঞ্চল থেকে।

রহমন সে কথার কোন জবাব দিলে না, বললো—সে যা হয় পরে দেখা যাবে। এখন এই টাকা দশটা রাখো, ওরা সন্দেশ খাবে।

—ফেলে দাও—আবদুল হুঁঙ্কার দিয়ে উঠলো।

রহমন সে হুঙ্কার গ্রাহ্য করলো না, একজন রক্ষীর কাছে গিয়ে তার জামার পকেটে নোটখানা গুঁজে দিয়ে বললো—তোমরা সন্দেশ খেও, তাড়িও খেতে পারো।

কোন কথার অপেক্ষা না রেখে রহমন চৌধুরীদের বাগানের পথ ধরলো।

আবদুল চুপ করে তাকিয়ে রইল, অন্ধকারে যতক্ষণ তাকে দেখা যায় দেখলো, তারপর ধীরে ধীরে বলে উঠলো—ছেলেদের লেখাপড়া শেখাতে নেই, বাপকে মানতে চায় না।

রক্ষীরা কোন কথা বললো না। গুমটি ঘরের সামনে বেতের মোড়াটা ছিল, তার উপর ঝুপ করে বসে পরলো রহমন। সীমান্তের ওপারে তাকিয়ে পালিয়ে যাওয়া মানুষগুলোকে ঠাহর করতে চেষ্টা করলো। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলো। কোন একসময় আপন মনেই বলে উঠলো, স্বাধীন হবার আগে ভাবতাম দেশের অবস্থা ভাল হবে, এখন দেখছি সবই বিগড়ে গেল—ঘরে-বাইরে কোনখানেই আর আশা করার কিছু নেই।

পাখি, আমার পাখি

শ্রীসুনীল বসু

পাখি পাখি পাখি
করিস নে তুই চালাকি
মিষ্টি বড়ো দুষ্ট বড়ো ছোট্ট তুই ফুর্তি
তোকে দেখে অবাক চোখে আমি যে এক মূর্তি
ইচ্ছে করে মুঠোয় ধরে ওষ্ঠে খাই চুমো
বুকের মধ্যে নিয়ে তোকে বলি এখন ঘুমো
তারপর সেই বিকেল হলে মুক্তি দেব তোকে
পৃথিবীতে সন্ধে হবে ভালবাসার শোকে

পাখি পাখি পাখি
সঙ্গী না থাকার
কি দুঃখু আমার
তুই বুঝিস্ নাকি ?

ডাকটিকেটের মজার কাহিনী

শ্রীরাণা বসু

Hobby কথার আভিধানিক অর্থ হল শখ বা খেয়াল।

মানুষের কত রকমেরই না খেয়াল বা শখ থাকে। কেউ দেশলাইয়ের খোল জমায়, কেউ জীবনের নানা ক্ষেত্রে যশস্বী জনদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে, আবার কেউ বা ডাকটিকেট জমায়।

মানুষের ডাকটিকেট জমানোর খেয়াল কত দিনের পুরনো আমি জানি না। এটুকু জানি ডাকটিকেট জমানোর খেয়াল অনেকেরই আছে এবং অনেক দিন আগে থেকে খেয়ালী মানুষরা তা জমিয়ে আসছে।

কাউকে চিঠি লেখার সময় ডাকটিকেটের রঙবেরঙের ছবিওয়ালা দিকই আমরা খামের ওপর ঠিকানা লিখে আটকে দিই, কিন্তু এই ডাকটিকেটের পেছন দিকটা নিয়ে কত যে মজার মজার ইতিহাস আছে তার দু-একটা সত্যি কাহিনী এখানে তোমাদের কাছে বলছি।

ডাকটিকেটের চলন যখন প্রথম শুরু হয়, তখন কোনো কোন দেশের ডাকবিভাগের কর্মকর্তারা ভয় পেয়েছিলেন, দুষ্টু লোকরা ডাকটিকেট জাল করে বাজারে ছাড়বে না তো? ডাকটিকেট যাতে কেউ জাল করতে না পারে তার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে ডাকবিভাগের কর্মকর্তারা নানা রকমের কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। প্রথম যে সুইডিশ ডাকটিকেট বের হয়, সেই ডাকটিকেটগুলোর পেছন দিকে কালো রঙের ওপর সবুজ রঙ ছাপা থাকতো অথবা কোনো কোনো ডাকটিকেটের পেছন দিকে সবুজ কালিতে আনুক্রমিক এক দুই ইত্যাদি সংখ্যা ছাপা থাকতো।

দেশলাই বাক্সের পেছনে কিংবা বাসের টিকেটের পেছনে কোনো কিছুর বিজ্ঞাপন নিশ্চয়ই তোমরা লক্ষ্য করেছ। যদি দেশলাইয়ের বাক্সর পেছনে অথবা বাসের টিকিটের

পেছনে কোন কিছুর বিজ্ঞাপন ছাপা হয়, তাহলে ডাকটিকেটের পেছনে কোনো কিছুর বিজ্ঞাপন ছাপা হবে এতে আশ্চর্য হবার কী আছে। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে নিউজিল্যাণ্ড পোস্ট-অফিসের কর্মকর্তারা ঠিক করলেন এক পেনি থেকে এক শিলিং দামের সমস্ত ডাকটিকেটের পেছনে যে সাদা জায়গা থাকবে সেখানে কোনো কিছু জিনিসের বিজ্ঞাপন তাঁরা ছাপবেন। ডাকটিকেটের পেছনে বিজ্ঞাপন ছাপা হবে এই খবর যেই ছড়ালো, অমনি নিউজিল্যাণ্ডের বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা ডাকটিকিটের পেছনে নিজের ব্যবসার বিজ্ঞাপন ছাপবার জন্যে ডাক-বিভাগের কর্মকর্তাদের কাছে ছুটোছুটি শুরু করলেন। তাই এই সময়ে (১৮৯২ খ্রীঃ) নিউ-জিল্যাণ্ড ডাকবিভাগ থেকে যেসব ডাকটিকেট ছাড়া হয়েছিল, সে-ডাকটিকেটগুলোর পেছনে চা, কোকো, আচার, চাটনি, সাবান, কাশির ওষুধ ইত্যাদির বিজ্ঞাপন দেখতে পাওয়া যায়। একথা বলাই বাহুল্য এই সব জিনিসের বিজ্ঞাপন ডাকবিভাগের কর্মকর্তারা বিনামূল্যে ছাপেন নি। এর জন্যে বিজ্ঞাপন-দাতাদের বেশ মোটা অর্থ ব্যয় করতে হয়েছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৯১৮ খ্রীঃ) যে-সব ডাকটিকেট ছাপা হয়েছিল, সেই সব ডাকটিকেটের কোনো-কোনোটার পেছন দিক সম্বন্ধে অনেক মজাদার কাহিনী জড়িয়ে আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রুশ দেশে ক্ষুদ্র মুদ্রার বিশেষ টান দেখা দেয়। ক্ষুদ্র মুদ্রার টান মেটাবার জন্যে রুশ সরকার মুদ্রার বদলে পুরু কাগজের ডাকটিকেট ছাপিয়ে বার করেন। এই ডাকটিকেটগুলো ক্ষুদ্র মুদ্রার স্থান গ্রহণ করে এবং রুশীরা মুদ্রা হিসেবেই এই ডাকটিকেট-গুলো দৈনন্দিন টুকিটাকি কেনা-কাটা অথবা ছোটখাটো লেনদেনের ব্যাপারে ব্যবহার করতেন। ডাকটিকেটগুলোর পেছন দিকে মুদ্রার বিভিন্ন মান বা দাম লেখা থাকতো। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশ দেশে ছাপা এক কোপেক দামের একখানা ডাকটিকেটের প্রতিলিপি এই লেখার সঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এই টিকেটের সামনের দিকে জার পিটার দি গ্রেটের প্রতিকৃতি ছাপা ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ফিনল্যাণ্ড, এসথোনিয়া, ল্যাটভিয়া, লুথিয়ানিয়া প্রভৃতি রুশ সরকার শাসিত ব্যাল্টিক দেশগুলো স্বাধীনতা ঘোষণা করে। দেশগুলো স্বাধীন হবার পর ডাকটিকেট বের করার যখন প্রয়োজন হল, তখন দেখা গেল, ডাকটিকেট ছাপার উপযোগী ভালো কাগজ ল্যাটভিয়ার নেই। জার্মানরা যুদ্ধের সময় যে map বা মানচিত্র ব্যবহার করেছিল সেগুলোরই পেছন দিকের সাদা জায়গায় ল্যাটভিয়ানরা তাদের প্রথম ডাকটিকেট ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ছাপে। পরবর্তী বছরে ল্যাটভিয়ার ডাকটিকেটগুলো অব্যবহৃত ব্যাঙ্কনোটের পেছনের সাদা অংশে ছাপা হয়েছিল। তোমাদের বোঝার সুবিধের জন্যে এইরকম ডাকটিকেটের ছবি এই লেখার সঙ্গে ছাপা হল।

যারা ডাকটিকেট সংগ্রহ করে, তাদের কাছে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের সময়ের পিছন দিকে কালো দাগটানা ব্রিটিশ ডাকটিকেটগুলো খুবই আশ্চর্যের। সাড়ে চার পেনি দাম পর্যন্ত এই ধরনের ডাকটিকেটের পেছন দিকে কালো দাগটানা টিকেট নভেম্বর, ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের পর এ ধরনের ডাকটিকেটের বদলে নতুন ডাকটিকেট ছাপা হয়। এই ডাকটিকেটগুলোর সামনের দিকে ফসফর পেন্টের স্বচ্ছ দাগ আছে। এখন ব্রিটেনে নতুন ডাকটিকেটের ব্যবহার থাকলেও বিশ্বের ডাকটিকেট সংগ্রাহকদের কাছে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা ডাকটিকেটের চাহিদা খুব বেশী।
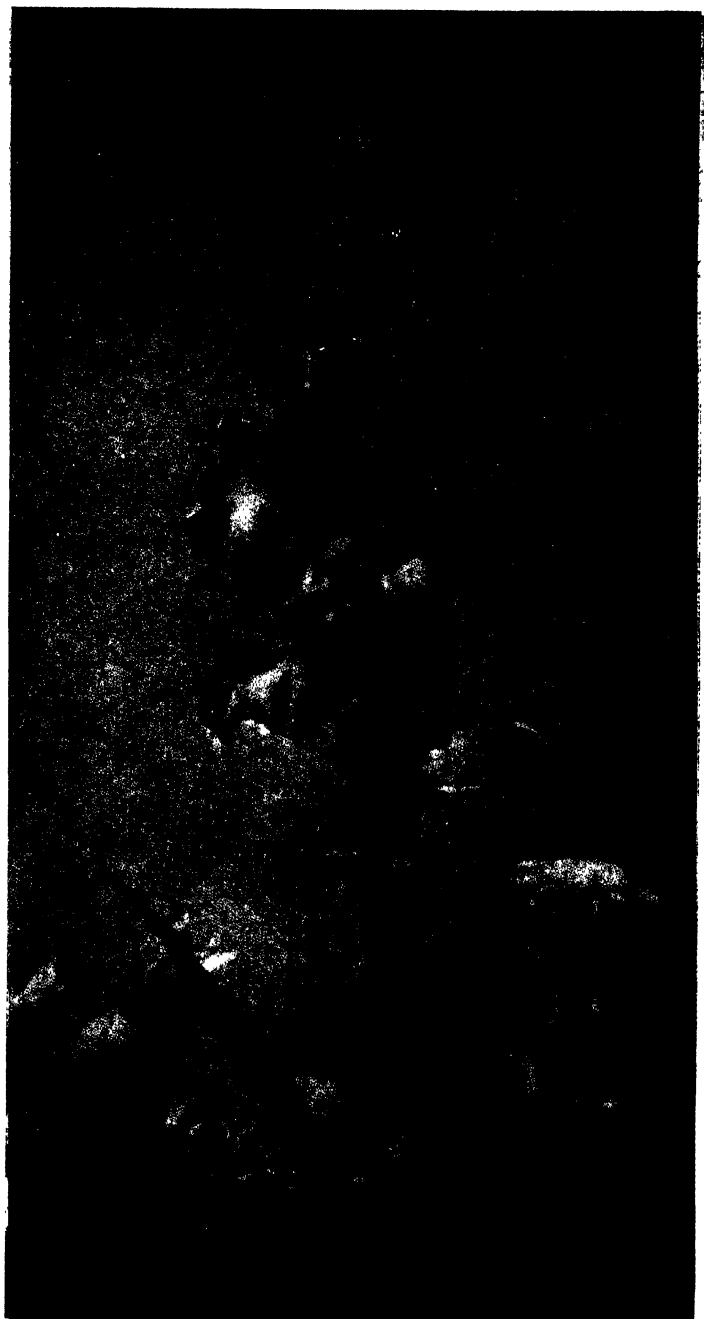
চুহুলিকা আর চৈতালির লেখা গল্প

শ্রীকল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়

বাগানে দাদুর কাজের টেবিলের কাছে তার খাতা নিয়ে এসে চুহুলিকা বলল, 'দাদুভাই, আমি কেমন লিখেছি দেখ।' দাদু পড়ে বললেন, 'বাঃ, বেশ সুন্দর লেখা হয়েছে তো! কিন্তু তাড়াতাড়ি শেষ করে নাও, আজ তো চিড়িয়াখানায় যেতে হবে?'

একটু দূরে ঘাসের উপর সতরঞ্চি পেতে, বই খেলনা ছড়িয়ে, চুহুলিকা আর চৈতালি, দুই বোন বসেছিল, আর দাদু তাঁর কাজের মাঝে মাঝে তাদের উপর চোখ রাখছিলেন। এই হয়েছিল ব্যবস্থা, কারণ দাদুই বলেছিলেন যে চিড়িয়াখানায় যেতে হলে সকাল-সকালই ভালো। দিদিমা আর চুহুলিকার মা'র তাতে অসুবিধা, কিন্তু চুহুলিকা আর 'মণি' দাদুর দিক নেওয়াতে তাঁরা আর 'না' করতে পারেন নি, তবে দাদুকে জব্দ করবার জন্য তাঁরা বলেছিলেন, 'তাহলে কিন্তু বাপু তোমাকে নাতনীদের সামলাতে হবে এখন।' দাদু ভাল করেই জানতেন যে, খোলা জায়গা পেলে তাঁর নাতনীরা নিজেদেরই ভুলিয়ে রাখতে পারে, কাজেই তিনি এক কথায় রাজী হয়েছিলেন। এতে তাঁর কাজেরও বিশেষ অসুবিধা হয়নি, কেবল মাঝে মাঝে চুহুলিকা এসে তার হাতের লেখা বা অঙ্ক দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো।

চৈতালি এতক্ষণ কয়েকটা কাঠি নিয়ে আপন মনে খেলছিলো, হঠাৎ তারও ইচ্ছা হল লেখবার। সে দিদির খাতা আর পেনসিল নিয়ে টানাটানি লাগিয়ে দিল। একটা গোলমাল হচ্ছে দেখে দাদু চুহুলিকাকে বললেন, 'তোমার স্লেট আর পেনসিলটা চৈ কে দাও, তাহলে তোমরা দুজনেই লিখতে পারবে। চুহুলিকার ব্যাপারটা খুব পছন্দ হল না, ছোট বোনকে খুবই ভালবাসলেও পিঠোপিঠি তো? সে বলল, 'আহা, চৈ কি লিখতে জানে নাকি যে স্লেট চাই ওর?' দাদু কিন্তু অনেক বলে-কয়ে, তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে একটা রফা করলেন, খাতায় চুহুলিকা লিখতে লাগলো আর স্লেটে চৈ।

চৈ এতক্ষণ কাঠি নিয়ে খেললেও দিদির উপর নজর ঠিকই রেখেছিল, কারণ দিদি যা করে তারও তাই করা চাই। কাজেই একটু পরে যখন হিজিবিজি কেটে স্লেটে আর জায়গা রইলো না, তখন সে স্লেটটা নিয়ে এলো দাদুকে দেখাতে। দাদু দেখে বললেন, 'বা রে, চৈ তো খুব সুন্দর লিখতে শিখেছে!' এই শুনে চুহলিকা দৌড়ে এসে বলল, 'কৈ দেখি?—ওমা, এই হল লেখা? এতো হিজিবিজি।' দাদু তাড়াতাড়ি দুর্বলের পক্ষ সমর্থন করে বললেন, 'তা পড়তে না জানলে তো হিজিবিজিই মনে হবে। চৈ নিজের ভাষায় খুব সুন্দর একটা গল্প লিখেছে, তুমি পড়তে জানলে বুঝতে ঠিক কথা কিনা।' চুহলিকা তবুও অবিশ্বাসের সুরে বলল, 'তুমি পড়তে পারো ওর লেখা তো পড় না দেখি।' দাদু বললেন, 'তবে শোনো।' এই বলে চৈকে কোলে নিয়ে, চশমা মুছে, স্লেটটা সামনে ধরে বলতে লাগলেন :
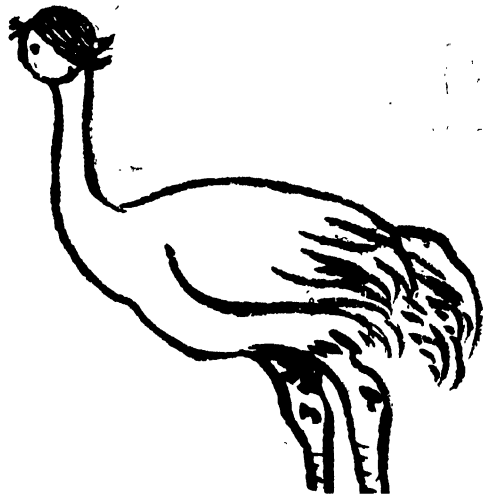
'চুহলিকা একদিন আপন মনে বেড়াতে বেড়াতে কখন যে সোঁদর বনের জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে তার খেয়াল নেই। হঠাৎ যেতে যেতে এক বাঘের ছানার সঙ্গে দেখা, তার হলুদবরণ গা আর তার উপর কালো কালো ডোরা ডোরা দাগ।

'চুহলিকা তো আগে চিড়িয়াখানায় বাঘ দেখেছে, কাজেই তার আর চিনতে দেরি হয় না। কিন্তু জঙ্গলের বাঘ তো তার আগে আর কখনও মানুষ দেখেনি, কাজেই সে চুহলিকাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। তারপর চুহলিকার চারদিকে ঘুরে ঘুরে তাকে সব দিক থেকে ভাল করে দেখে সে জিগেস করল, 'তোমার নাম কি?' চুহলিকা নিজের নাম বলাতে বাঘ জিগেস করল, 'তোমার ডানা নেই, লম্বা ঠোঁট নেই, তুমি কি রকম পাখি?' চুহলিকা বলল, 'আমি পাখি কেন হতে যাবো? আমি মানুষ।' বাঘ বলল, 'আমায় বোকা পেয়েছ নাকি? আমি শুনেছি উটপাখিরা উড়তে পারে না; তুমি নিশ্চয়ই উট-পাখির ছানা, তাই তোমার ডানা নেই আর এখনও তোমার ঠোঁট গজায়নি।'

চুহলিকা বলল, 'বল্লুম না আমি মানুষ? আমার কথা যদি বিশ্বাস না করো তবে

আমি চল্লুম।' এই বলে চুহুলিকা পিছন ফিরে জোরে জোরে চলতে লাগলো। বাঘও দৌড়ে এসে তার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'এ রকম মজার পাখি তো আমি কখনও দেখিনি—ডানা নেই, ঠোঁট নেই, আবার বাঘেদের মতন কথা বলে!' চুহুলিকা বলল, 'বাঘেদের মতন কথা বলে মানে? আমি তো বাংলায় কথা বলছি।' বাঘ জবাব দিল,

'রেডিওতে তাকে প্রায়ই গান গাইতে ডাকত।'—পৃঃ ২৬৫

'আমিও তো বাংলা বলি, তাইতো আমার নাম 'বেঙ্গল টাইগার'।' চুহুলিকা জিগেস করল, 'তবে যে এই মাত্র বললে, আমি বাঘের মতন কথা বলি?' বাঘ বলল, 'বটেই তো। আমি যখন বড় হব তখন তো 'হালুম, হুল্লুম' বলব? তুমিও তো বললে, 'বল্লুম, চল্লুম,' বাঘেদের মতন কথা হ'ল না?'

চুহুলিকাকে পাখি বলাতে তার রাগ হয়েছিল, এখন বাঘের কথায় তার ভীষণ হাসি

পেয়ে গেল। সে বলল, 'তাহলে ঠিক করে বল আমি পাখি না বাঘ?' বাঘ বলল, 'তুমি বাঘ মোটেই নয়, হলে তো তোমার গায়ে আমার মতন দাগ থাকতো। তবে পাখি তুমি নিশ্চয়ই, তা না হলে দু'পায়ে কেউ হাঁটে?'

চুহুলিকা অনেকক্ষণ পথ চলে একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, সে একটু জিরোবার জন্য গাছের একটা নিচু ডালে উঠে বসল। বাঘ মাথা নিচু করে আপন মনে বলতে লাগল, 'তবে বাঘের মতন কথা বলে আর ঠোঁট, ডানা নেই এ রকম পাখি আমি কখনও দেখিনি।'

এই বলে সে মুখ তুলে দেখে চুহুলিকা নেই। এদিক-ওদিক খুঁজে গাছের ডালে চুহুলিকাকে দেখে সে বলল, 'ও বুঝেছি, তুমি নিশ্চয়ই হুলুক বাঁদর, তাই দু-পায়ে হাঁটছিলে, তাই এখন গাছে উঠেছ আর তাই তোমার ল্যাজ নেই!'

চুহুলিকাকে বাঁদর বলা তার ভাল না লাগলেও সে হেসে বলল, 'হুলুক বাঁদর বুঝি বাঘের মতন কথা বলে?' বাঘ তখন খুব মুস্কিলে পড়ে মাথা চুলকোতে লাগল। একটু পরে সে বলল, 'আমার বুদ্ধি বড় কম কিনা তাই আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।'

এই শুনে চুহুলিকার বড় দয়া হল, সে বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে চল, তোমাকে স্কুলে ভর্তি করে দেবো, তাহলে তোমার খুব বুদ্ধি হবে।' বাঘ জিগেস করল, 'স্কুলে ভর্তি মানে কি? তুমি কি স্কুলে ভর্তি হয়েছ?' চুহুলিকা জবাব দিল, 'ওমা, আমি তো আজ দেড় বছর থেকে স্কুলে যাচ্ছি! তুমি আমার সঙ্গে চল, আমাদের বাড়িতে থাকবে আর রোজ বাসে করে আমার সঙ্গে স্কুলে যাবে।'…

এই অবধি বলেই দাদু হঠাৎ থেমে গেলেন। দুই বোনই গল্প শুনছিল নিঃশ্বাস বন্ধ করে। চুহুলিকার তো কথাই নেই, গল্প পেলে সে আর কিছুই চায় না। তবে চৈতালিও আজকাল একটু-আধটু গল্প শোনার মজা বুঝতে আরম্ভ করেছে, গল্প বললেই সে চোখ বড় বড় করে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। অবশ্য কতটা তার সে বুঝতে পারে আর কতটা দিদির দেখাদেখি করে তা সঠিক বলা যায় না।

গল্প থামতেই চুহুলিকা বলল, 'তারপর?' দাদু বললেন, 'আর তো চৈ লেখেনি। যেটুকু লিখেছে আমি শুধু সেইটুকু পড়ে শোনালুম। চুহুলিকা তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে স্লেটটা ভাল করে দেখল, তারপর সেটা উল্টে দিয়ে বলল, 'চৈ, বাকিটা শীগগির লেখো তো এই দিকে।'

চৈ তো খুব খুসী। দাদুর কোলে চেপে বসে, দিদি খোসামোদ করে লিখতে বলছে,

আর চাই কি ? সে পেন্সিল দিয়ে আবার হিজিবিজি কাটতে লাগল, আর দাদুও যেন মন দিয়ে পড়ছেন এই রকম ভঙ্গি করতে লাগলেন। শ্লেটের এ পিঠটাও ভরে যেতেই চুহুলিকা জিগেস করল, 'চৈ, তোমার গল্পটা শেষ হয়ে গেছে ?' চৈ গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়তেই চুহুলিকা বলল, 'পড়ো না দাদুভাই বাকি গল্পটা।' দাদু তখন আবার শ্লেট টেনে বলতে লাগলেন :

'সেই থেকে বাঘ চুহুলিকা আর চৈতালির বাড়িতে থাকতো আর চুহুলিকার সঙ্গে রোজ বাসে করে স্কুলে যেতো। স্কুলে পড়ে তার খুব বুদ্ধি হল; মানুষ কাকে বলে সে শিখলো, সন্দেশ যে দন্ত্য 'স' দিয়ে লিখতে হয় তা শিখলো, আর চেঁচিয়ে কেমন করে 'জন-মনগণ' গাইতে হয় তা শিখলো।'

এই বলে দাদু একটু থামতেই চুহুলিকা বলল, 'তারপর ?' দাদু বললেন, ' তারপর আর কি ? বাঘ খুব ভাল গান গাইতে শিখল, রেডিওতে* তাকে প্রায়ই গান গাইতে ডাকতো আর চুহুলিকা, চৈতালি, মা, বাবা, দাদী সবাই মিলে ঘরে বসে মজা করে তার গান শুনতেন। কিন্তু কেউ যদি সে সময় রেডিওর চাবিটা ভুল দিকে ঘুরিয়ে দিতো তা হলেই বাঘ রেগে গর্জন করে উঠতো।

গল্প শুনে দুই বোন খুব খুসী, আর চুহুলিকা তো তার বোনটির ক্ষমতা দেখে খুবই গর্বিত। সে জিজ্ঞেস করল, 'দাদু ভাই, কী করে চৈ লিখলো গল্পটা ? ও তো এখনও অ, আ জানে না।' এইবার হল দাদুর মুস্কিল। কি জবাব দেবেন ভাবছেন এমন সময় চুহুলিকার মা এসে ডাক দিলেন, 'চল তোমরা শীগগির কাপড় বদলাতে, এখনই চিড়িয়াখানায় যেতে হবে। এই শুনে চুহুলিকা আনন্দে লাফিয়ে উঠে চৈয়ের হাত ধরে মায়ের সঙ্গে বাড়ির ভিতরে চলে গেল, আর দাদুও হাঁপ ছেড়ে তাঁর কাগজপত্র গুছোতে লাগলেন।

* রূপা এণ্ড কোম্পানী থেকে প্রকাশিত লেখকের 'চুহুলিকা' গ্রন্থের ৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
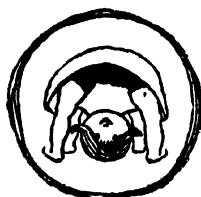
অল্প কথার গল্প

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত

পৃথিবীর উপর অধিকার বেশি কার এ নিয়ে ঘোরতর তর্ক বেধেছে জল আর আগুনের মধ্যে।

আগুন বলছে: আমার অভাবে পৃথিবীটার কি দুর্দশাই না হত! এই-যে ঘরে ঘরে আলো, ধনী-দরিদ্র সকলেরই যত কিছু আরাম, সুখ-সুবিধা, সবই তো আমার দৌলতে? আগুন না থাকলে রান্না-খাওয়ার ব্যবস্থাটা কী হত, শুনি? বলতে গেলে সূর্যের যা কাজ আমারও তাই। অতএব পৃথিবীতে কর্তৃত্বটা আমারই যে বেশি, এতে আর সন্দেহ কী?

মুচকি হেসে জল বলল: এক তরফা খুব তো বলে গেলে। কিন্তু একি একটা কথার মতো কথা হল? আমি যে সেই আদিম যুগ থেকেই পৃথিবীর তিন ভাগ জুড়ে বসে আছি সেটা কি বেমালুম ভুলে গেলে! তোমার তো পাত্তাই ছিল না তখন? নদীতে আমি কুলু-কুলু ধ্বনি করে বয়ে চলি; সমুদ্রে ঢেউ-এর পরে ঢেউ; আবার পাহাড় থেকে যখন আমার জল নামে তখন গর্জন দেখে কে! আরে বাপু, আমার অভাবে এই পৃথিবীর অবস্থাটা কি হত ভেবে দেখেছ? এক এক সময়ে জলের জন্য চারদিকে হাহাকার পড়ে যায়, শোনো নি? মাঠে-ঘাটে জল নেই, শস্য জন্মে না, খাদ্যের অভাব, দুর্ভিক্ষ, স্বাস্থ্য নষ্ট, গাছপালা শুকিয়ে যায়, রুক্ষ চেহারা হয় পৃথিবীর। মনে রেখো, জলের আর এক নাম জীবন।

এ কথায় আগুন তো হেসে লুটোপুটি। বলল: বেশ বলেছ ভাই, বেশ বলেছ। কিন্তু ঐ যে বন্যার তাণ্ডব? ঘর-বাড়ি লোকজন গরু-ছাগল ভেসে তলিয়ে যায় সব; নষ্ট হয় মাঠের শস্য—চারদিকে হাহাকার, দুর্ভিক্ষ, মড়ক আর মৃত্যু! তার বেলা?

—আর তোমার একটিমাত্র স্ফুলিঙ্গ যে ধ্বংসলীলার শুরু করে? ঘর-বাড়ি, বন-জঙ্গল সব কিছু পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়, চিহ্নও রাখে না? সেটা বুঝি দোষের নয়? ও কথা মনে পড়লে তো আমার গা শিউরে ওঠে!

এ ভাবে দু'পক্ষই জোর তর্ক করে চলছে। সেই তর্কে বেলা হল, বাজলো দুপুর। এই সময়ে ওদের তর্কাতর্কি শুনে এগিয়ে এল এক পথচারী।

জিজ্ঞেস করল, হয়েছে কী? এই ভর-দুপুরে তোমরা চেঁচামেচি করছ কেন বল তো?

দু'পক্ষের কথা শুনে পথিক বলল: এই নিয়ে এত কথা কাটাকাটি! কি বিপদ! তোমরা ভাই দু'পক্ষই তো ভাল। দু'এরই ক্ষমতা আছে। তোমরা পৃথিবীর কাজে লাগছ, সেবা করছ, গাছপালা, পশুপক্ষী, মানুষের উপকার করছ। বেশ তো। আর কী চাই? কিন্তু, তা বলে তোমরা যেন কেউ কর্তৃত্ব ফলাতে যেও না। ও কাজটা নিজে নিজে তোমরা কেউ ভাল পারবে না। মাত্রা না ছাড়িয়ে তোমরা বরং যার যার কাজটুকু ঠিক ঠিক করে যাও এবং তাতেই সন্তুষ্ট থাকো। এতে করে পৃথিবীরও মঙ্গল হবে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ

শ্রীঅমরনাথ রায়

সে অতি প্রাচীনকালের কথা।

আমাদের দেশে তখন ছিলেন এক ব্রাহ্মণ ঋষি। তাঁর ছিলেন দুই স্ত্রী। তাঁদের এক-জন ছিলেন ব্রাহ্মণকন্যা, অপরজন শূদ্রা। দুই স্ত্রীরই একটি করে ছেলে হলো। সুন্দর ফুটফুটে ছেলে। ধীরে ধীরে তারা বড় হতে লাগলো। তাদের শিক্ষার সময়ও ঘনিয়ে এলো।

সেকালের শিক্ষা ছিল ভিন্ন ধরনের। যজ্ঞস্থলে বসে ঋষিরা শিক্ষা দিতেন। এই ঋষির ছেলেদেরও তাই তাদের মায়েরা পাঠিয়ে দিলেন যজ্ঞস্থলে—তাদের বাবার কাছে। ঋষি কিন্তু তাঁর ব্রাহ্মণ স্ত্রী ছেলেটিকেই যত্নসহকারে শিক্ষা দিতে লাগলেন। শূদ্রা স্ত্রীর ছেলেকে শিক্ষা দেওয়া তো দূরের কথা—দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলেন।

ছোট ছেলে।

অনেক আশা নিয়ে সে গিয়েছিল বিদ্যাশিক্ষা করতে। কিন্তু আশা ভঙ্গ হওয়ায় সে মনে বড় ব্যথা পেলো। মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে সে ফিরে এলো তার শূদ্রা মায়ের কাছে। এসে বল্ল: মা, বাবা আমাকে চিনেও যেন চিনলেন না তাড়িয়ে দিলেন। এখন আমার শিক্ষার কি ব্যবস্থা হবে তাহলে ?

'কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলো তার শূদ্রা মায়ের কাছে।'

মা বল্লেন: কি আর করব বাবা, সবই তোমার ভাগ্য। নইলে জ্ঞানী ঋষি পিতা হয়েও সন্তানকে অগ্রাহ্য করবেন কেন? যাক্‌গে। আমি তো শূদ্রা অর্থাৎ পৃথিবীর কন্যা। অতএব আমার মা বসুন্ধরাকে ডেকে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি।—এই না বলে ঋষিপত্নী কাতরভাবে ও ভক্তিভরে মাতা বসুন্ধরাকে ডাকতে লাগলেন।

সন্তানের ডাকে মা কি সাড়া না দিয়ে পারেন।

তিনি এসে বল্লেন: তোর কোন ভয় নেই মা। আমি তোর ছেলের

শিক্ষার ভার নেব। সব জ্ঞানই তো আমার মধ্যে আছে। তোর ছেলেকে দে আমার হাতে। আমি তাকে সুপণ্ডিত করে দেব।

ঋষিপত্নী এই কথা শুনে নিশ্চিন্ত হলেন। তিনি মাতা বসুন্ধরার কাছে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর ছেলেকে। যথাসময়ে সেই ছেলে সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে ফিরে এলেন মায়ের কাছে। তারপর রচনা করলেন ঋগ্বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ব্রাহ্মণ'। তিনি শূদ্রা অর্থাৎ ইতরার ছেলে। তাই নিজের নাম রাখলেন ঐতরেয়। তখন থেকে তাঁর রচিত গ্রন্থ 'ঐতয়ের ব্রাহ্মণ' নামে পরিচিত হলো। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ একখানি অমূল্যগ্রন্থ। ঐ গ্রন্থরচনার মাধ্যমে তিনি নিজের পাণ্ডিত্যকে প্রমাণ করলেন। সেই সঙ্গে পিতার অপমানেরও প্রতিশোধ নিলেন।

ড়িরা কথা কয়

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

আমারও ফুল, আমরাও ফুল—
ফুল হতে সব রাজী;
সকাল বেলায় যেমন দেখি
ফুল ভরা সব সাজি।

হাসি-খেলি আমরা সদাই,
দুঃখীজনে আমরা হাসাই,
ফুলঝুরিতে আগুন ছড়াই
ছেড়ে আতস বাজি;
আমরাও ফুল, আমরাও ফুল
ফুল হতে সব রাজী।

গন্ধে রঙে মনোলোভা,
আমরাই তো দেশের শোভা;
মোদের বাঁচা-মরা দেশের লাগি
সকল স্বার্থ ত্যজি;
আমরাও ফুল, আমরাও ফুল
ফুল হতে সব রাজী।

সুদখোরের সাজা

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়

এক দেশে এক কৃপণ ছিল। তার একজন বিশ্বাসী চাকর ছিল, নাম ধর্মদাস। ধর্মদাস মনিব-বাড়ীতে দিনরাত খাটত, ভোর পাঁচটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত তার কাজের কামাই ছিল না। কিন্তু কৃপণ মনিব তাকে এক পয়সাও মাইনে দিত না। শুধু খেতে-পরতে দিত।

তিন বছর ধর্মদাস এমনি একটানা কাজ করলে। শেষে ভাবলে, মাইনে ছাড়া আমি আর একটা দিনও কাজ করব না। এই ভেবে সে মনিবকে গিয়ে বললে, তিন বছর আপনার বাড়িতে এক নাগাড়ে কাজ করলাম, এবার দিন কয়েকের জন্যে ছুটি দিন, আমি বাড়ি যাব। আর এই তিন বছরে যা মাইনে পাওনা হয়েছে তাও মিটিয়ে দিন।

কৃপণ তখন বাক্স থেকে মাত্র তিনটি টাকা বের করে ধর্মদাসকে দিয়ে বললে, বছরে এক টাকা হিসেবে তিন বছরে তোমার পাওনা হয় তিন টাকা। এই নাও। আমার কাছে অধর্ম পাবে না।

ধর্মদাস একটা টাকার মুখ কখনও দেখেনি, নগদ তিন-তিনটে টাকা হাতে পেয়ে, সে খুব খুশি হয়ে উঠল। ভাবলে, অন্য কোথাও কাজ করলে নিশ্চয়ই আরো বেশি রোজগার করতে পারব। যাক্, আপাতত আমি তো বেশ বড়লোক, দিন কতক দেশ-বিদেশ ঘুরে আমোদ-আহ্লাদ করে নিই।

এই ঠিক করে একটা ছোট থলেতে টাকা তিনটে পুরে সে মনিব-বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

এ-পথ সে-পথ ঘুরে একদিন সে একটা মাঠের ওপর দিয়ে আপন মনে গান গাইতে গাইতে চলেছে, এমন সময় এক দাড়িওয়ালা বামনের সঙ্গে তার দেখা। বামন তাকে বললে, কি হে ভায়া, খুব যে খুশি মনে চলেছ। বলি খুশির কারণটা কী?

ধর্মদাস বললে, খুশি না হয়ে গোমড়ামুখোই বা থাকব কেন? আমার স্বাস্থ্য ভালো, শরীরে অসুখবিসুখ নেই, টাকার দিক থেকেও আমি ধনী, আমার দুঃখটা কিসের?

বামন জিজ্ঞেস করলে, তুমি ধনী? কত টাকা তোমার কাছে আছে? ধর্মদাস বললে, তিন টাকা।

বামন মনে মনে হাসল, কিন্তু তা প্রকাশ করলে না। মুখটি বেজার করে বললে, আমি ভাই ভারী দুঃখী, ভারী গরিব। তিনদিন হল পেটে একটাও দানা পড়েনি। তোমার ঐ টাকা ক'টা আমায় দাও না, খেয়ে বাঁচি।

বামনের কথা শুনে ধর্মদাসের মনে করুণা হল। আহা বেচারী, তিনদিন না খেয়ে আছে! সে তখুনি তাকে টাকা তিনটি দিয়ে দিলে।

বামন বললে, গরিবের প্রতি তোমার এমনি দয়া দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। শুধু-হাতে আমি ঐ টাকা নেব না। প্রতিদানে তোমাকেও কিছু দেব। তিনটি টাকার জন্যে তোমার মনের তিনটি ইচ্ছে আমি পুরণ করব। এইবার ভেবেচিন্তে বল, কী তোমার ইচ্ছে।

ধর্মদাস বললে, আমার প্রথম ইচ্ছে—আপনি আমায় এমন একটি তীর-ধনুক দিন যা দিয়ে আমি যা-কিছু শিকার করব তাই যেন মাটিতে পড়ে। দ্বিতীয় ইচ্ছে—এমন একটি বেহালা আমায় দিন যার বাজনা শুনে সবাই যেন সঙ্গে সঙ্গে নাচতে থাকে। আর শেষ ইচ্ছে—সবাইকে আমি যেন আমার মতে মত দিইয়ে রাজী করাতে পারি।

বামন বললে, বেশ, তুমি যা যা চেয়েছ তাই পাবে

এই বলে বামন মাটিতে দুটো টোকা দিতেই সেখানে একটা তীর-ধনুক আর বেহালা এসে হাজির হল। বামন সেই জিনিস দুটো ধর্মদাসকে দিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

ধর্মদাসের আনন্দ তখন দেখে কে? সে তখন আরো গলা চড়িয়ে গান গাইতে গাইতে পথ চলতে লাগল। কিছুদূর যেতেই এক সুদখোর মহাজনের সঙ্গে দেখা হল। পাশেই একটা গাছের ওপর একটা 'বউ কথা কও' পাখি ভারী মিষ্টি সুরে ডাকছিল, আর সুদখোরটি মুগ্ধ হয়ে সেই দিকে তাকিয়েছিল। পাখির গান নয়—পাখিটার ওপরেই ছিল তার লোভ। ধনুক-হাতে ধর্মদাসকে আসতে দেখে সেই মহাজন তাকে বললে, দেখ, তুমি যদি প্রাণে না মেরে শুধু একটু জখম করে ঐ পাখিটাকে গাছ থেকে মাটিতে নামিয়ে দিতে পার তো তোমাকে আমি অনেক টাকা দেব। পাখিটার জন্যে ভাবনা নেই, আমি অনেক ভালো ওষুধ জানি, তাই দিয়ে পরে আমি ওটাকে সারিয়ে নেব।

রাজী হয়ে ধর্মদাস যেই পাখিটাকে নিশানা করে তীর ছুড়লে, অমনি সেটা ধুপ করে গাছতলার একটা ঝোপের ভেতর পড়ল। মহাজন তখন পাখিটাকে ঝোপের ভেতর থেকে তুলে নিতে নিতে ভাবলে, পাখিটাকে পেয়ে গেছি, এখন টাকা না দিলে ও-লোকটা আমার আর কী করবে? দেব না ওকে টাকা। এই মতলব করে ঝোপের ভেতর দিয়ে পা-য় পা-য় সে পালাতে লাগল।

ধর্মদাস দেখলে, লোকটার মতলব ভালো না, সে পালাবার চেষ্টা করছে, তখুনি সে তার বেহালাটি তুলে নিয়ে বাজাতে শুরু করল। আর যাবে কোথা! যেই না সেই বাজনা শোনা, অমনি সুদখোরটার নাচ পেয়ে গেল। সে সেই ঝোপের কাঁটাবনের ভেতরেই ধেই ধেই নাচ শুরু করে দিলে।

'হাকিম নাচছে, উকিল নাচছে, পেশকার নাচছে'…। পৃষ্ঠা ২৭৩

তিড়িং তিড়িং করে সে কী নাচ! নাচতে নাচতে তার পা ব্যথা হয়ে গেল। জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেল। সর্বাঙ্গ ছড়ে ঝুঁজিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। কিন্তু সেই উদ্দাম নাচ আর থামেনা।

নাচতে নাচতেই সুদখোর লোকটা কাকুতি-মিনতি করতে লাগল, ও মশাই, দয়া করে বাজনা থামান। আমি আপনার কী করেছি যে, আমায় এমন সাজা দিচ্ছেন?

ধর্মদাস বললে, তুমি সুদখোর মহাজন, লোকের গলায় পা দিয়ে টাকা আদায় কর, কত গেরস্তের সর্বনাশ কর, আজ আবার আমাকে ফাঁকি দেবার মতলবে ছিলে। তুমি কী করনি তাই বল!

এই বলে সে তার বাজনার জোর আরো বাড়িয়ে দিলে। সুদখোর তখন আরো জলদে নাচতে লাগল। দুন, চৌদুন—বাজনার মাত্রা যত বাড়ছে, নাচার মাত্রাও ততই বাড়ছে। শেষে ক্লান্ত হয়ে সুদখোর মাটিতে পড়ে গেল। তবু কি রেহাই আছে? মাটিতেই গড়াগড়ি দিয়ে সে নাচতে লাগল।

সেই মহাজনটার সঙ্গে থলিতে ছিল একশো টাকা। এক গরিব গেরস্তকে ঠকিয়ে সে ঐ টাকা পেয়েছিল। ধর্মদাস বললে, তোমার ঐ থলেতে যত টাকা আছে—সব দাও, তবে আমি বাজনা থামাব।

সুদখোর বললে, ওরে বাবা, মরে যাব তাহলে, একশো টাকা আছে, ও-টাকা দিতে গেলে মরে যাব। তুমি দশটি টাকা নিয়ে আমায় রেহাই দাও।

ধর্মদাস বললে, তাহলে বাজনার মাত্রা আরো চড়ালাম।

সুদখোরের অবস্থা তখন কাহিল হয়ে এসেছে। ভাঙা গলায় সে বললে, আচ্ছা

পঁচিশ টাকা নাও। তাও না? আচ্ছা—পঞ্চাশ। ওরে বাবা, তাও না? আচ্ছা—প চাত্তর নাও, বাজনা থামাও।

কিন্তু যখন সে দেখলে পুরো একশো টাকা না পেলে ধর্মদাস বাজনা থামাবে না, তখন বাধ্য হয়েই থলের সব টাকা তাকে দিতে হল।

ধর্মদাসও বেহালা থামিয়ে টাকা নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হল।

সুদখোর লোকটা কিন্তু বাড়ি গেল না। তখনো তার গা থেকে রক্ত পড়ছিল, আর গায়ের জ্বালায় সে ছটফট করছিল। কিন্তু তার চেয়েও বেশি যন্ত্রণা হচ্ছিল টাকার জন্যে। হায় হায় হায়! নগদ একশোটা টাকা! বাড়ি না গিয়ে সে সোজা চলে গেল আদালতে। হাকিমের কাছে নালিশ করলে, এক জোচ্চোর আমাকে মেরে-ধরে আমার বহু টাকা ডাকাতি করে নিয়ে গেছে। এই দেখুন হুজুর জামা-কাপড় ছিড়ে দিয়েছে, এই দেখুন সারা গায়ে মারের দাগ, এখনো রক্ত পড়ছে। হুজুর, আপনি এর বিচার করুন।

হাকিম তখন আসামীকে ধরে আনার জন্যে সেপাই-পেয়েদা পাঠিয়ে দিলেন। তারা ধর্মদাসকে ধরে নিয়ে এল।

সুদখোর তখন ধর্মদাসকে দেখিয়ে বললে, হুজুর, এই লোকটাই আসামী। এই ডাকাতটাই মেরে-ধরে আমার সব টাকা কেড়ে নিয়েছে।

হাকিম ধর্মদাসকে বললেন, তোমার কী বলবার আছে বল।

ধর্মদাস বললে, হুজুর, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। এই লোকটাই আমার বেহলা বাজনা শুনে খুশি হয়ে একশো টাকা দিয়েছে।

কিন্তু হাকিম ধর্মদাসের এই কথায় বিশ্বাস করলেন না। বললেন, বেহালা শোনার জন্যে শখ করে কেউ অত টাকা দেয় না। বিশেষত, লোকটি সুদের কারবারী, টাকা জমানোই ওর পেশা। ওরকমভাবে অতগুলো টাকা সে খরচ করতে পারে না। তার ওপর লোকটির সারা গায়ে মারের দাগ রয়েছে, এখনো তার গা থেকে রক্ত পড়ছে। সুতরাং তুমিই দোষী, আর এই অপরাধের জন্যে তোমাকে ফাঁসির হুকুম দিলাম।

ধর্মদাস বললে, হুজুর আমার একটি প্রার্থনা আছে।

হাকিম বললেন, ফাঁসির হুকুম ফিরিয়ে নেওয়া ছাড়া তোমার আর সব আরজিই আমি মঞ্জুর করব।

ধর্মদাস বললে, না হুজুর, আমার প্রাণ আমি ফিরে চাই নে। আমি কেবল এই বেহালাটি একবার বাজাতে চাই।

একথা শুনেই সুদখোর চেঁচিয়ে উঠল, না না হুজুর অমন কাজও করবেন না, ওর বাজনা কখনো শুনবেন না।

কিন্তু বামনের দেওয়া তৃতীয় বরের ফলে ধর্মদাস ইচ্ছা করবা মাত্রই বিচারক তার প্রার্থনায় রাজী হলেন। বললেন, না-না, তুমি বাজাও।

ধর্মদাস বাজনা শুরু করল। ব্যস্, আর যাবে কোথা! সেই বাজনা শোনবামাত্র হুকিম থেকে শুরু করে আদালতে যত লোক ছিল সবাই ধেই ধেই করে নাচতে লাগল। এমন দৃশ্য কেউ কখনো দেখেনি। হাকিম নাচছে, উকিল নাচছে, পেশকার নাচছে কেরনী নাচছে, পেয়াদা নাচছে, সেপাই নাচছে, সান্ত্রী নাচছে, যারা মামলা করতে এসেছিল তার পর্যন্ত নাচছে। সুদখোরও বাদ গেল না, সেও নাচতে লাগল; নাচতে লাগল চিৎকার করতে লাগল, মরে গেলাম—হুজুর, বেহালা থামাতে বলুন।

কিন্তু হুজুর আর বলবেন কী? তিনিও তখন ধিতাং ধিতাং করে নাচছেন। তবু তারই মধ্যে তিনি কোন রকমে একবার বললেন, ধর্মদাস দোহাই তোমার বাজনা থামাও।

ধর্মদাস বললে, যতক্ষণ আমার ফাঁসির হুকুম ফিরিয়ে না নেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ এই বাজনা থামবে না।

হাকিম বললেন, বেশ, তোমার ফাঁসির হুকুম রদ করা হল।

ধর্মদাস বাজনা না থামিয়েই সেই দুষ্টু সুদখোরকে বললে, এইবার তুমি বল তো ভায়া, এই একশো টাকা তুমি কেমন করে পেয়েছ, আর এ টাকা আমার কাছেই বা এল কী করে?

সুদখোরের তখন প্রাণ যায় যায় অবস্থা। বাধ্য হয়েই হাকিমের সামনে সে তার দোষ কবুল করলে। বললে, হ্যাঁ, এ টাকা আমি একজনকে ঠকিয়েই পেয়েছি। তাছাড়া এ টাকা ধর্মত ধর্মদাসেরই প্রাপ্য, কারণ আমার একটা কাজ সে করে দিয়েছিল, আর সেজন্য ওকে আমি টাকা দেব বলেছিলাম।

এইবার ধর্মদাস তার বাজনা থামালে। সঙ্গে সঙ্গেই সকলের নাচ থেমে গেল। হাকিম তখন চুরি আর প্রতারণার অপরাধে সুদখোরের কারাদণ্ডের হুকুম দিলেন।

আর ধর্মদাস টাকার থলে কাঁধে ফেলে, তীর-ধনুক আর বেহালাটি নিয়ে গুন্‌গুন্ করে গান গাইতে গাইতে মনের আনন্দে বাড়ি চলে গেল।*

* গ্রামের গল্প হইতে

অগত্যা

শ্রীমনোজিৎ বসু

অঘোর ঘুমে ঘুমিয়ে ছিলেন খিল্‌কাপুরের রাজা,
দুপুর-রাতে হঠাৎ জেগে বলেন, "খাব ভাজা
ইলিশমাছের পেটি এবং নলেন গুড়ের পায়েস।
জল্‌দি আনো, মহারানী! একটু করি আয়েশ।"
কথা শুনে বাজ যেন হায় পড়লো রানীর মাথে;
বলেন, "এখন পাচ্ছি কোথায় ইলিশ দুপুর-রাতে?
পায়েস রাঁধাও এখন কি আর সহজ কথা, বলো!
লক্ষ্মীটি আর গোল করো না, শুতে এবার চলো।"

রেগে-আগুন তেলে-বেগুন রাজা বলেন, "রানী!
কোথায় এখন মিলবে ইলিশ আমি কী তার জানি?
পায়েস রাঁধা সহজ কিনা তুমিই ভালো জানো!
মোদ্দা কথা, রাজার হুকুম, জল্‌দি ক'রে আনো।"
হুকুম শুনে ভয়ে ভয়ে রান্নাঘরে ছুটে—
পায়েস রাঁধেন কষ্টে রানী পুড়িয়ে গোবর-ঘুঁটে।
রাজার চাকর নদী থেকে আনলে ইলিশ তাজা
কেটেকুটে তার সে পেটি করেন রানী ভাজা।

কিন্তু শোবার ঘরে ফিরে রানী অবাক্ ভারি,
দেখেন রাজা ঘুমিয়ে আছেন, নাক ডাকছে তাঁর-ই।
অঘোর ঘুমে ঘুমোন রাজা, রানী ডাকেন কত—
তবু রাজার ঘুম ভাঙে না, প'ড়ে মড়ার মতো!
অগত্যা আর কী যে করেন তখন মহারানী
মাছের থালা পায়েস-বাটি নিলেন কাছে টানি'।
নিজেই তখন রাত-দুপুরে খেলেন ক'রে আয়েশ
ইলিশ মাছের পেটি-ভাজা, নলেন গুড়ের পায়েস॥

অহিংসা

শ্রীনির্মলেন্দু
রায়চৌধুরী

আমাদের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর নাম তোমরা সকলে নিশ্চয়ই শুনেছো। আমাদের স্বাধীনতা লাভের পিছনে তাঁর অসীম অবদানের কথাও তোমরা সকলে কমবেশী জান।

গান্ধীজী ছিলেন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা। কিন্তু মজার কথা, সেই দীর্ঘ সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ নেতা হয়েও তিনি ছিলেন অহিংসার অনন্যসাধারণ পূজারী। তাই গান্ধীজীর সংগ্রাম হিংসাত্মক ছিল না—ছিল অহিংসার। এ জন্য সারা বিশ্বে আজও তাঁর খ্যাতির অন্ত নেই।—এ কথাও হয়তো-বা তোমরা কেউ কেউ জান।

যিনি ছিলেন এতোবড়ো একজন নেতা, ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশের কাণ্ডারী, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ, ছেলেবেলায় কিন্তু তিনি অত্যন্ত ভীতু এবং লাজুক প্রকৃতির ছিলেন। মা'র 'আঁচল-ধরা' ছেলে নামেও তাঁকে কম ঠাট্টা-বিদ্রূপ সইতে হয়নি।

তাঁর সেই ছেলেবেলাকার একটি ছোট্ট গল্প তোমাদের বলছি—

তখন গান্ধীজীর কতই-বা বয়স হবে। নিতান্তই বালক। বাড়ির অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে বালক গান্ধীজীও তাঁদের মাকে ঘিরে বসে গল্প শুনতেন। প্রায় রোজ-ই এমনিভাবে তাঁরা মা'র মুখ থেকে নানা গল্প শুনতেন।

সেদিনও মা আসর জমিয়ে এক মজার গল্প বলছিলেন। ছেলেমেয়েরা তন্ময় হয়ে শুনছিলো, গান্ধীজীও।

হঠাৎ কোথা থেকে সেই সময় একটা বিরাট কাঁকড়াবিছে ধীরে ধীরে গল্পের আসরের দিকে এগিয়ে আসে। কাঁকড়াবিছেটির আগমন মা'র নজর এড়ায় না। কিন্তু তিনি থামেন না। সেটির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে গল্প বলে চলেন।

শ্রোতাদের মধ্যে আর কেউ সেটিকে লক্ষ্য করে নি। কিন্তু এক সময় গান্ধীজী হঠাৎ জীবটিকে দেখে আঁৎকে ওঠেন। ভয়ে কাঠ হয়ে যান তিনি। গল্প আর শুনবেন কি? জড়োসড়ো হয়ে গান্ধীজী আস্তে আস্তে মা'র পেছন দিকে সরতে থাকেন কিন্তু দূরে গিয়েও স্বস্তি পান না।

ততক্ষণে বিছাটি মা'র একদম কাছে এসে যায়। বালক গান্ধীজী এবার প্রাণপ্রতিম মা'র আসন্ন বিপদের কথা উপলব্ধি করে চঞ্চল হয়ে ওঠেন। মুখে কিছু প্রকাশ করবার তখন তাঁর শক্তি কোথায়? অসহায়ভাবে তিনি মা'র দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

গান্ধীজীর এবার অবাক হবার পালা। তিনি লক্ষ্য করেন,—কাঁকড়াবিছেটি মা'র কোলের কাছে পৌছলেও তিনি গল্প বলা বন্ধ করেন না এবং কিছুমাত্র বিচলিতও হন না।

'শাড়ীর আঁচলটি বিছাটির সামনে বিছিয়ে দেন।'

গল্প বলতে-বলতেই মা তাঁর শাড়ীর আঁচলটি বিছাটির সামনে বিছিয়ে দেন। বিছাটি আস্তে আস্তে সেই আঁচল বেয়ে কিছুটা উঠতেই মা আঁচলটি গুটিয়ে নিয়ে জানালার কাছে গিয়ে বাইরে সেটিকে ছুঁড়ে ফেলে দেন। তারপর নির্বিকারভাবে তিনি আবার তাঁর জায়গায় ফিরে আসেন।

মা'র কাণ্ড দেখে গান্ধীজী স্তম্ভিত হন। ভেবে তাঁর বিস্ময়ের সীমা থাকে না—এমন একটি মারাত্মক জীবকে হাতের মুঠোয় পেয়েও মা সেটিকে প্রাণে মারলেন না!

ঘটনাটি গান্ধীজীর মনে এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। এই ছোট্ট ঘটনাটিকে কেন্দ্র করেই বালক গান্ধীজীর কোমল মনে অহিংসার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। এবং উত্তরকালে তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অহিংসার পূজারী বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

মেড়ারামের আনন্দ

শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

মগজে বুদ্ধি আছে কি না আছে
কাজে তা যায় না বোঝা!
গড্‌ডল তাই বলে আমাদের
অথবা গাড়ল—সোজা।
মেষ বলে কেউ শুদ্ধ ভাষায়,
চল্‌তিতে বলে ভেড়া।
বোকামিতে নাকি পাঁঠার চেয়েও
উঁচুতে আমরা, মেড়া!
কোনো একজন যেদিকে এগোয়
তারই পিছে চলি সবে।

কেউই ভাবি না—কোন্‌খানে গিয়ে
চলা তার শেষ হবে।
সুমুখেরটার কপালেতে যদি
থাকে অঘটন লিখা
পিছনেরও সব গাড়লেরও তাই
চলি তো গড্‌ডলিকা।
লোকে বলে মেড়া, তবু ভেবে খুশী
নইতো আমরা একা!
মানুষেরও মাঝে পাই আমাদের
বহু সাঙাতের দেখা।

সাপের দুঃখ

শ্রীমতী বেলা দে

ঐ দূরের প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছটি, ডালপালা, নাতিপুতি নিয়ে বেশ সুখে বাস করছে যুগ যুগ ধরে! তারই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শেকড়ের পাশে মাটিতে গর্ত করে বাস করে আর একজন। কে জানো সে? সে এক বিষধর সাপ। অশ্বত্থের নাতি-পুতিরা বলে এ কি পাপ! অশ্বত্থ বলে যাক্ যাক্—আমার আশ্রয়ে সকলেই বাস করুক। অশ্বত্থ যেমন উদার—সাপ তেমনি অনুদার। অশ্বত্থ যেমন প্রশান্ত—সাপ তেমনি অশান্ত। অশ্বত্থ যেমন মাটির উপর ডালপালা ছড়িয়ে দিয়ে আকাশের সঙ্গে বাতাসের সঙ্গে প্রাণীদের সঙ্গে মিতালী করছে, সাপ তেমনি নিজের দেহটাকে ছোট্ট করে, কুণ্ডলী পাকিয়ে গুঁড়িশুঁড়ি মেরে গর্তের মধ্যে করছে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি। কারণ সকলের সঙ্গে যে তার আড়ি। অশ্বত্থের সঙ্গে সাপের কিন্তু ভাব আছে নিতান্ত মন্দ নয়। কী আর করবে প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া করে—তাই আছে কোনোরকমে। সাপ যখন গর্ত থেকে বার হয়—সাদা, হলুদ, লাল কত রকমের কাটা কাটা দাগ দেহের উপর। সে যখন ফণা উঁচু করে নাচতে থাকে, সারা দেহটা যখন কেঁপে কেঁপে দুলতে থাকে, তাকে কিন্তু তখন সত্যিই সুন্দর দেখায়। না বাপু, যত ভালই দেখাক্ সাপ বড় নিষ্ঠুর। অতি খল, অতি ছল, অতি কুটিল। শুধু শুধু কোন কারণ নেই, সেদিন সেই রাখাল ছেলেটাকে এক ছোবলে গিলে শেষ করলে! কেন রে বাপু সে তো তোর কিছু ক্ষতি করেনি? সাপের স্বভাবটাই এমন খল—তাই কেউ ওকে দেখতে

পারে না। দেখ না, আমার কচি কচি পাতাগুলো ওর নিঃশ্বাসের বিষে শুকিয়ে গেল। নাতিপুতিরা রাগ করে, তবু কখনো কিছু বলে না অশ্বত্থ। আমারই আশ্রয়ে থেকে আমারই ক্ষতি করা! কি বিশ্রী স্বভাব! রোজই অশ্বত্থ আপন মনে গজ্‌গজ্‌ করে।

সাপ আগে যদিও বা গর্তে থেকে বার হোত, আজকাল আর বার হতে চায় না। সাপ ভাবে ছি ছি কি লজ্জার কথা—যার আশ্রয়ে আছি, তারই কিনা ক্ষতি করছি! আহা! অশ্বত্থ কি সুখী! সকলে ওকে কত ভালবাসে! বৃষ্টি জল দিয়ে ও তৃষ্ণা মেটাচ্ছে, গ্রামের মেয়েরা হাটের পথে ওকে জল দিয়ে আদর করে যাচ্ছে, আর ও আস্তে আস্তে পাতা নড়িয়ে ওর ধন্যবাদ জানাচ্ছে। সত্যিই ও সুখী!

অশ্বত্থ আগে কিছু বলত না, এখন কিন্তু প্রায়ই রাগ করে সাপকে শক্ত শক্ত কথা বলে অপমান করে, শাপের খলতা ওর অসহ্য মনে হয়। আর কেনই বা না হবে বলুন? সাপের ভয়ে কেউ ওর গাছের ত্রিসীমায় আসতে চায় না। সবাই বলে, যাস্‌নে ওখানে সাপের বাসা আছে। অশ্বত্থের বড় দুঃখ মানুষ তার সঙ্গ ত্যাগ করেছে। ঐ যে বললুম সেই রাখাল ছেলেটাকে ছোবল মারার কথা—আহা বিষের যাতনায় ছেলেটা কি ছট্‌ফট্‌ না করতে লাগল—সারা দেহটা নীল হয়ে গেল। ওর মার সে কি বুকফাটা কান্না! এতটুকু একটা ছেলেকে ছোবল মেরে পালিয়ে গেল পাছে ওর আত্মীয়স্বজন মারতে আসে। হুঃ! তোমার যা সাহস তা তো দেখেছি, সঙ্গে সঙ্গে গর্তে লুকিয়ে পড়লে। অশ্বত্থ বললো—লজ্জা করলো না তোমার? সাপ বললো—লজ্জা হয়নি এ কথা তোমায় কি করে জানাব? একটু মাত্র ছোবল দিতেই যে ছেলেটা মরে যাবে তা কি জানতাম? ওরা যে আমাকে রোজ রোজ খোঁচা দেয়—আমার ল্যাজটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে! কে আমাকে তার জন্যে সহানুভূতি দেখাবে বল? অশ্বত্থ বললো—কে আবার সহানুভূতি জানাবে? রাখাল ছেলেরা যখন গাছের ডালপালা ধরে নিষ্ঠুরভাবে নাড়া দেয়, আমার ডালপালা ভেঙে পড়ে, আমার তখন কষ্ট হয় না? কিন্তু কি করব ওরা ছেলেমানুষ তাতেই যদি আনন্দ পায়, তাই পাক্‌।

সাপ বলে—তুমি যে ভাই মানুষের ক্ষমতার কাছে অক্ষম। তোমার তো এমন অস্ত্র নেই যা দিয়ে তুমি তার প্রতিশোধ নেবে। অশ্বত্থ গর্জে ওঠে বলে—ছি ছি! প্রতিশোধের কথা তুলো না—আমি চাই, মানুষ পশুপক্ষীর সেবা করতে। ওতেই যে আমার আনন্দ। দিতে পারার যে কত আনন্দ তা তোমার মত খল প্রাণী তার কি বুঝবে? দূর পথ হেঁটে, ক্লান্ত পথিক যখন আমার ছায়ায় বসে বিশ্রাম করে তখন আমার কত আনন্দ হয়। মনে হয় তবু তো কিছু উপকার হলো। কিন্তু বন্ধু, তুমি আমাকে ঐটুকু আনন্দ থেকে বঞ্চিত করছো সে কথা যেন মনে থাকে। সাপ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে—আমি তোমার আনন্দ থেকে তোমাকে বঞ্চিত করেছি কি রকম? অশ্বত্থ বলে—কেন তারা আসবে? সবাই জেনে ফেলেছে কাছেই যে তোমার বাসা—আর তুমি তো যে সে প্রাণী নও—একেবারে অতি কুটিল, বিষধর প্রাণী। সাপ দুঃখের সঙ্গে বলে—আমার দাঁতে

যে বিষ আছে সে কি আমার অপরাধ? আমাকে যখন কেউ আক্রমণ করতে আসে আমি ফণা তুলে ভয় দেখাতে যাই, আত্মরক্ষার জন্যে ছোবল দিয়ে থাকি, তাইতেই প্রাণীরা মারা যাবে তা আমি ভাবতে পারি না ভাই। কাউকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্য আমার নেই।

অশ্বত্থ জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা বল তো, শুধুমাত্র ছোবল দিয়ে তোমার কি লাভ হয়? বাঘ, সিংহ, নিজের ক্ষিদের জ্বালা মেটাবার জন্য রক্তমাংস সব খায়। কিন্তু তুমি তো সব কিছু খাও না, শুধু একটু দাঁত বসিয়ে দিয়ে বিষ ঝেড়ে তোমার কি লাভ হয়? নিজের লাভ কিছু নেই, পরেরও ক্ষতি হয় এই জন্যেই তোমাকে খল বলা হয়।

আমি প্রাণপণ চেষ্টা করি সরে থাকতে, সহজে কাউকে আঘাত করি না। আমি যখন চুপচাপ পড়ে থাকি, পাখীগুলো পর্যন্ত সরু ঠোঁটের আঘাত করে যায়—মানুষ আসে লাঠি নিয়ে তেড়ে। আমি এতদিন চুপ করেই ছিলুম, কিন্তু মানুষের অত্যাচারে মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হয়ে উঠি। তোমার কত সুবিধে, তুমি লোকালয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছ। সকলে তোমায় কত ভালবাসে—হিন্দুরা তোমার পায়ে মাথা ঠেকায় প্রণাম জানায় দেবতা জ্ঞানে। আর আমি ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে শীতের দুপুরে একটু রোদ পোয়াতে এসেছি, এমন সময় রাখাল ছেলের দল পাথর নুড়ি নিয়ে আমায় লক্ষ্য করে মারলে—তাই তো সেদিন সামনে ঐ রাখাল ছেলেটাকে পেয়ে এক ছোবল মেরেছিলাম। কি করবো বল? আমায় তো আত্মরক্ষা করতে হবে? অশ্বত্থ বললো—অনেক সহ্য করার পর তুমি আঘাত কর এ কথা আমি বিশ্বাস করি না—তুমি অতি খল, ছল খুঁজে বেড়াও। সাপ বললো—তুমি আমাকে বিদ্রূপ করছো বন্ধু? তুমি জানো এ জগতে আমার সহ্যশক্তি কতখানি? এ জগতে আমার কে আছে বল? বুকে হেঁটে চলি এ যে কতবড় অপমান কি করে বলব? এ আমার অভিশপ্ত জীবন! প্রকৃতি তোমাকে সুন্দর করেছে—মানুষের উপযোগী করে সৃষ্টি করেছে তাই তোমার এত গর্ব। তোমার দ্বারা মানুষের উপকার হয় বলেই তোমাকে তারা এত বড় করেছে। অশ্বত্থ বলে—কেন, তোমার দ্বারা কি মানুষের কোনো উপকার হয় না? সাপ বলে—হ্যাঁ হয় বৈকি, আমার চামড়ায় তাদের উপকার হয়। সারা জীবন আমাকে বুকে হেঁটে চলতে হয়, মাথা নীচু করে থাকতে হয়—মাথা আমার নত হয়েই আছে। দৈবাৎ যদি সেই নত মাথা উঁচু হল, তবে কত চেষ্টা হয় সেই মাথায় আঘাত করতে। যারা যত দুঃখ কষ্ট পায়, যারা যত সহ্য করে যায়, যারা যত মাথা নত করে থাকে, সবাই ভাবে তাদের কোনো ক্ষমতা নেই। এখানেই তারা ভুল করে। যারা অত্যাচারিত, অবনমিত তারা যখন গর্জে ওঠে, তারা যখন মাথা উঁচু করে তোলে, সেই মাথা কাউকে আঘাত না করে নত হয় না। কে আমাকে দাঁতে বিষ দিয়েছে, নিঃশ্বাসে বিষ দিয়েছে, কে আমাকে বুকে হাঁটতে বাধ্য করেছে? আমার এই অভিশপ্ত জীবনের জন্যে তোমার কি দুঃখ হয় না? কে বলেছে দুঃখ হয় না? মাথা নীচু করে বুকে যে হেঁটে চলবে সে কি কখনো মাথা তুলবে না, তার কি আঘাত করা সাজে না? সে বুকে হাঁটার অপমান ভোলবার জন্যে আমার দাঁতে হয় তো বিষ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমি বিষ চাই না, কাউকে আঘাতও করতে চাই না। এই যে মাটির সঙ্গে মিশে জড়সড় হয়ে বুকে হেঁটে চলা জীবন আমার, এর জন্য কি তোমার দুঃখ হয় না? তাই বলছি ভাই অশ্বত্থ গাছ, তুমি আমায় ঘৃণা করো না, তোমার আশ্রয়ে যেন আমি বেঁচে থাকতে পারি এই আশীর্বাদ কর বন্ধু!…

স্বর্ণ-খুন্তি সংবাদ

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

রুলটানা শেষ করে সবে গোটা গোটা করে হাতের লেখা লিখতে যাচ্ছি, জানলার বাইরে ঝুনুদার মুখ ভেসে উঠিল—'স্—দুয়োর খোল।'

ঝুনুদার মুখ উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছিল, ভয়ে ভয়ে আমি পেছনে তাকলাম।

পাশ বালিশ আঁকড়ে মা শুয়ে আছে। একটু আগে পাখাটা হাতেই ছিল—কখন যেন খসে পড়ে গেছে পাশে। অর্থাৎ নির্ঘাৎ ঘুমিয়ে পড়েছে মা।

পা টিপে টিপে গিয়ে খিলটা খুলে ফেললাম। আস্তে আস্তে দরজা ফাঁক করে বেরিয়ে এলাম বাইরে।

ঝুনুদা একখানা হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলো সিঁড়ির ঘরে, আমি বললাম—'কিন্তু ঝুনুদা'—

'চুপ' কোন কথা না—যেন মাথায় কি ভীষণ একটা প্ল্যান খেলে গিয়েছে। এই ভাবে বলল, 'মনুকে ডাকতে পারিস?'

'বাঃ, ও যে জ্যেঠিমার ঘরে শুয়ে আছে।'

'দূর বোকা, তাতে কি হয়েছে—উৎসাহে ঝুনুদার চোখগুলো একেবারে গোল গোল পাস্তুয়া, বললে— 'মা তো ঘুমুলেই ব্যাস—তুই এক কাজ কর'—

'না ঝুনুদা, আমি বাবা পারবো না—আমার বুক টিপটিপ করছিল, জেঠিমা একবার জানতে পারলে'—

ভুরু কুঁচকে ঝুনুদা বললে—'পারবি না? বেশ তাহলে আর হলো না।'

'কি হলো না?'

'গুপ্তধন।'

'গুপ্তধন'—আমি লাফিয়ে উঠেছি। হেমেন রায়ের বই পড়ে তখন গুপ্তধন কাকে বলে জানতে একটুও বাকি নেই। বললাম—কোথায় গুপ্তধন?'

'কাছেই, আমাদের বাগানে!'

'বাগানে!' বেশী জোর দিতে গিয়ে আমার গলা প্রায় চিঁচিঁ করে উঠিল। কিন্তু অবিশ্বাসের কিছু নেই। গুপ্তধন যে এইসব নোংরা জায়গাতেই থাকে এ আমার খুব জানা হয়ে গিয়েছে। ঝুনুদা বলছিল, 'সেই জন্যই তো এখন তোকে ডাকলাম। সবাই ঘুমুচ্ছে এখন, দুপুর বেলা—কেউ টের পাবে না।'

'কিন্তু'—আমি বললাম, 'গুপ্তধন উদ্ধার করতে হলে তো গোপন সব নক্সা থাকে, সে সব না পেলে'—

'এখনও পাইনি নাকি'—পকেট থেকে কি একটা তুলে ধরল ঝুনুদা, মুখে বিজয়ীর হাসি, বললে, 'এখন দেখাবো না, মনুকে ডাক।'

বুকের ভেতর টিপটিপ করতে লাগলো। কিন্তু এমন সুযোগ ছাড়া যায় না। তাছাড়া, ঝুনুদা যখন গুপ্তধনের নক্সা পেয়েছে—তখন ও আমাদের প্রায় হাতেই এসে গিয়েছে।

আসলে ঝুনুদা ছিল আমাদের কাছে এক কল্পলোকের দেবতা। আমি যখন স্কুল নিয়ে খাতায় দাগ টানি, মনু দুলে দুলে দ্বিতীয় ভাগ মুখস্থ করে, তখন ঝুনুদা জিওমেট্রি বাক্স খুলে কি কঠিন কঠিন সব ছবি আঁকে। ঝুনুদার জন্যে সব করতে পারি আমি। এতো সামান্য কাজ।

আস্তে আস্তে দুয়ার ঠেললাম। এক পাশে কাকীমা, আর একপাশে জ্যেঠিমা। মধ্যিখানে মনু শুয়ে। ঘুমিয়ে পড়লো নাকি? ভাল করে উঁকি মেরে দেখলাম। উঁচু, চোখের পাতা টিপটিপ করছে। পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিলাম। ধড়মড় করে লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, আমি মুখে আঙুল দিয়ে ইশারা করলাম—'চুপ, আয়—'

মনুকে দেখেই ঝুনুদার মুখে হাসি এসেছে, 'আয় আয়—এই দেখ নক্সা। আমরা গুপ্তধন উদ্ধার করতে যাবো।'

'কই দেখি'—মনু একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লো কাগজের ওপর। এমনি সাদা কাগজ—কিন্তু ধুলো বালি লেগে আছে অনেক। মনু বললে, 'এ লেখাটা যেন অনেকটা তোমার মতন'—

'দূর বোকা'— ঝুনুদা ধমকে উঠল, 'খুব বুদ্ধি তোর যা হোক, একরকম লেখা হতে নেই বুঝি দু'জনের'—

আমি পড়ছিলাম, ওতে লেখা ছিল—'জামরুল গাছ থেকে দশ হাত। তারপর বাঁ দিকে ঘুরিয়া পনের হাত। সেখানে যে দুটো লিচু গাছ রহিয়াছে তাহার তলায়।'

আমি পড়ে মাথা তুলতে ঝুনুদা বললে, 'কি রে বুঝলি কিছু?' বললাম, 'কিন্তু ঝুনুদা, কোন সংকেত করে লেখেনি তো—একেবারে সহজ করে'—

'থাম বাপু'—ঝুনুদা ঝংকার দিয়ে উঠল, 'সব নক্সাই কি কঠিন করে লেখা থাকে নাকি? আয় আয় যাবি তো আয়।'

বাগান মানে প'ড়ো বাগান। ছ'মাসে ন'মাসে একদিন যাওয়া হয়। ঝোপে-ঝাড়ে ভর্তি হয়ে আছে। বাড়ীর গুরুজনরা জেগে থাকলে বাগানে যাওয়া নিষেধ। সেই ভয় তো ছিলই, তারপর গুপ্তধন পাওয়ার লোভ। উত্তেজনায় আমার সর্বাঙ্গ থরথর করছিল। হাতে একটা লাঠি নিয়ে ঝুনুদা সবচেয়ে আগে। মধ্যে মনু ফ্রক বাঁচাতে বাঁচাতে যাচ্ছে—

আর শেষকালে আমি একটা পাটকাটি দিয়ে আশেপাশে আলতো করে বাড়ি মারতে মারতে যাচ্ছিলাম।

অবশেষে জামরুল গাছ পাওয়া গেল। এখন সমস্যা, কোন দিকে দশ হাত। ঝুনুদা বললে, 'আমার মনে হয় রাস্তার দিকেই হবে—এদিকে আয়। নে পল্টু,—দশ হাত মাপ।'

মাপতে মাপতে আনন্দে আমার ভেতরটা নাচ্ছিল, বললাম—'কি পাওয়া যাবে বলো তো ঝুনুদা'—

'সেকি বলা যায়'—

'আর যদি যখ-টখ থাকে—' আমার গলা শুকিয়ে আসছিল।

'ভীতু কোথাকার— আমি আছি না'—পরম নির্ভীকের মত ঝুনুদা বললে, 'দেখ, লেখা আছে বাঁ দিকে ঘুরিয়ে পনের হাত।'

বাঁ দিকে ঘোরা হ'ল। ঝুনুদা বললে, 'নে মনু, মাপ।'

প্রথম একটু আপত্তি করলেও শেষটায় মনু রাজী হয়ে গেল।

'এই তো লিচু গাছ—' ঝুনুদার মুখে সেই বিজয়ীর হাসি, 'এইখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে সেই গুপ্তধন।'

মধ্যে একটা জায়গায় মাটি ঝুরঝুর করছিল, যেন এইমাত্র খোঁড়া হয়েছে। সেইখানে এগিয়ে গিয়ে আমি হাত দিয়ে মাটি সরাতে লাগলাম। একটু পরেই আমার হাতে কি একটা ঠেকলো। ঝুনুদা লাফিয়ে এসে বললে—'কি রে, মোহর?'

তুলে ফেললাম ওপরে, কিন্তু একি? বললাম, 'ঝুনুদা, মোহর-টোহর তো নয়, এ যে একটা খুন্তি!'

'খুন্তি!!' পরম বিস্ময়ে সেটা হাতে তুলে নিয়েই ঝুনুদা বলে উঠল—'এ নিশ্চয়ই সোনার খুন্তি।'

'সোনার খুন্তি!' আমরা দু'জনেই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে পেছনে তাকিয়ে আমাদের হয়ে গেছে!…

আর কেউ না, স্বয়ং জ্যেঠিমা। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। বললেন—'চলে আয় এখানে, আয়।'

আমরা বলির পশুর মত কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে গেলাম। পেছনে ঝুনুদা। জ্যেঠিমা আবার হুংকার ছাড়লেন—'সারা দুপুর চোখে ঘুম নেই—ও সাপের বনে কেন গিয়েছিলি?'

চোখটা ছিল আমার দিকে, তাই ফিসফিস করে বললাম, 'জ্যেঠিমা, গুপ্তধন'—

'গুপ্তধন!'

'আর কেউ না স্বয়ং জ্যেঠিমা।'

'হুঁ, আমরা পেয়েছি—'একটু সাহস পেলাম আমি, 'এই দ্যাখোনা সোনার খুন্তি!'

'সোনার খুন্তি'—জ্যেঠিমার মুখ চোখ আরও ভয়াবহ হয়ে উঠল, 'বুঝেছি—সব ওই বুড়ো ধাড়ির কীর্তি। এই, আমার রান্না ঘরের খুন্তিকে তোকে বাইরে নিয়ে যেতে বলেছে, উঁ?'

'বা, আমি তো'— কিন্তু ঝুনুদার কথা শুনলে তো?

ততক্ষণে জ্যেঠিমা ঝুনুদার কান চেপে ধরেছেন—'বদমাস ছেলে কোথাকার—নিজে তো বাঁদরামি করবেই, সঙ্গে সঙ্গে এগুলোকেও—যা ঘরে ঢোক।'

ঘরে ঢুকিয়ে শিকল তুলে দিলেন জ্যেঠিমা। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোরা আবার হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন, আয়—শুবি আয়।'

একপাশে মা, একপাশে জ্যেঠিমা। মধ্যিখানে আমরা দু'জন।

অনেকক্ষণ পরে মনু আমার দিকে ফিরে হাসল, আমি বললাম—'ওটা তাহলে—'

মনু ফিসফিস করে বললে, 'সোনার খুন্তি নয়।' কিন্তু ততক্ষণে মার হাতে পাখা নড়ে উঠেছে, আমি মুখে আঙুল দিলাম। দু'জনেই মুখ টিপে হেসে উঠলাম।

নীতি-কথা

কামিনী রায়

"পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি, এ জীবন মন সকলি দাও
তার মত সুখ কোথাও কি আছে? আপনার কথা ভুলিয়া যাও।"

সবার চেয়ে বড়

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী

বড় হতে
চাই যে আমি

বেড়ে উঠতে চাই !

মাকে আমার
দেখব,

ভালোবাসব
সর্বদাই !

ধেড়ে ছেলেদের
দেখে নেব,

এইসা দেব মার !

টের পাবে যে বাছাধনরা
আমায় কানমলার !

বাবার মত
চাকরি করে
আনব টাকা খুব !
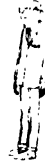
লাটসায়েবের
মতন বাড়ি
গড়ব হুবহুব !

অনেক বড়
হয়ে···

অনেক লোকের
প্রতিপালক,

শেষে তখন
চাইব ফিরে···

ফের হতে সেই বালক !

*

* বিখ্যাত বিদেশী কার্টুনিস্ট ফিপারের রেখাচিত্র অনুসরণে লেখা ।

প্রতিশোধ

শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

বসন্ত একেবারে শেষ বেঞ্চে। আধময়লা পোশাক, খোঁচা খোঁচা চুল। চোখের দিকে দেখলেই বোঝা যায় তাতে বুদ্ধির বিন্দুমাত্র ছাপ নেই। ক্লাসের ভাল ছেলেরা তার সঙ্গে ভুলেও কথা বলে না। অনেকেই টিটকারি দেয়। টিটকারি দেয় তার নাম নিয়ে।

তার নাম রতন। বিধবা মায়ের একটি মাত্র সন্তান। বাপকে ভাল করে চোখেও দেখেনি। মা পরের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করে, অবসর সময়ে ঘুঁটে দিয়ে, ঘুঁটে বিক্রি করে সংসার চালায়, ছেলের লেখাপড়ার খরচ দেয়।

প্রথম প্রথম ছেলের জন্য কোন খরচ লাগত না। সব ফ্রি ছিল, কিন্তু দু'দুবার ফেল করাতে তার এই সুযোগ বন্ধ হয়ে গেল। শুধু গরীব হলেই তো আর হবে না, সেই সঙ্গে মেধাবীও হতে হবে। তবেই ইস্কুল মাইনে মাপ করতে পারে।

হেডমাষ্টার রতনকে একান্তে ডেকে অনেক বুঝিয়েছেন। ভাল করে লেখাপড়া কর, যদি মায়ের দুঃখ ঘোচাতে চাও, নিজের উন্নতি চাও। তোমার মায়ের দুঃখ তুমি বুঝতে পার না?

মাথা হেঁট করে রতন বলেছে, কি করব বলুন স্যার, কিছুতেই আমার পড়া মাথায় ঢোকে না। অনেক চেষ্টা তো করি।

এ একটা কথাই নয়। পরিশ্রম আর অধ্যবসায় এ দুটো থাকলে সব বাধা জয় করা যায়। তুমি পড়ায় আরো মনোযোগ দাও।

এটা সত্যি কথা রতন লেখাপড়ায় ফাঁকি দেয় না। খুব ভোরে উঠে দুলে দুলে পড়ে স্নান করতে যাবার আগে পর্যন্ত। রাত্রে বিশেষ পড়তে পারে না। রাত্রে পড়তে হলে আলো চাই। হ্যারিকেন কিংবা প্রদীপ? দুটোতেই তেলের প্রয়োজন। তেলের খরচ জুগিয়ে ওঠা দরিদ্র মায়ের পক্ষে যে সম্ভব নয়, সেটা রতন ভাল করেই জানে।

চাঁদিনী রাতে তার একটু সুবিধা; অন্য দিন তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ে।

স্কুল থেকে ফিরে বিকাল বেলা রতন পড়তে বসতে পারত, কিন্তু তা সে পারে না। তার জীবনের একমাত্র নেশা ফুটবল খেলা। এ খেলার জন্য তিন গাঁ থেকে তার ডাক আসে। স্কুলের টিমের সে নামকরা ফরোয়ার্ড। তার পায়ে বল এলে বিপক্ষ দলের গোলরক্ষক মনে মনে ইস্টদেবতার নাম জপ করে। পেনাল্টি সীমানার মধ্যে বল পেলে তো কথাই নেই। সেই বল বিপক্ষের গোলের জালে আটকাবেই। কামানের গোলার মতনই তীর বেগ, কুশলী গোলন্দাজের মতন অব্যর্থ লক্ষ্য। লেখাপড়ায় যেমন রতনের স্থান শেষ বেঞ্চে, ফুটবল খেলায় তেমনই তার স্থান প্রথম সারিতে।

যেদিন রতনের স্কুলের সঙ্গে অন্য স্কুলের খেলা থাকে, সেদিন সকাল থেকে রতনের তোয়াজের অন্ত থাকে না। হেডমাষ্টার থেকে শুরু করে অন্য মাষ্টাররা সবাই রতনের সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

বাবা রতন, স্কুলের মানটা রেখ। অন্ততঃ গোটা দুয়েক গোল নসীপুরের স্কুলকে দিতেই হবে। সংস্কৃতের হরিভূষণবাবু যিনি শব্দরূপ না পারলে রতনকে বেঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখেন সারাটা পিরিয়ড, তিনিও কাছে এসে বলেন, বেশ বিচক্ষণতার সঙ্গে খেলবে রতন। প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করে জয়লক্ষ্মী করায়ত্ব করতেই হবে।

দু'একজন ভাল ছেলে, সচরাচর যারা কাছেও ঘেঁষে না, তারাও উপদেশ দেয়, দেখিস রতনা, নিজের গোলে যেন স্যুট করে বসিস নি। বেশী কায়দা দেখবার দরকার নেই, বল পেলেই গোলে মেরে দিবি।

রতন কোন কথা বলে না। মাথা হেঁট করে চুপচাপ শোনে। মনে মনে কেবল ভাবে তার ফুটবল খেলার সব কৃতিত্বটুকু যদি লেখাপড়ার ব্যাপারে দেখাতে পারত। এমন যদি সম্ভব হ'ত খেলার শক্তি আর উদ্দীপনা নিয়োগ করতে পারত পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে। খেলার মাঠের ফরোয়ার্ড নয়, ক্লাসে পড়ার বিষয়ে ফরোয়ার্ড।

রতনের মাও বলে, বলটল খেলে কি স্বর্গলাভ হবে। তার চেয়ে মানুষ হবার চেষ্টা কর, মানুষের মতন মানুষ।

রতন কি করে সকলকে বোঝাবে, লেখাপড়া শেখার জন্য সে তো প্রাণপণ চেষ্টা করে কিন্তু কিছুতেই যে মাথায় কিছু ঢোকে না।

যখন রতনের ফ্রি সিপ কাটা গেল, তখন সে হেডমাষ্টারের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কি হবে স্যার। মাইনে দিয়ে পড়া তো আমার সাধ্যের বাইরে। কি করে আমি পড়াশোনা চালাব।

হেডমাষ্টারও বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। বলেছিলেন, কি করি বল তো? পরীক্ষায় ফেল করলে ফ্রি সিপ রাখার তো আর নিয়ম নেই। আর তুমি সব বিষয়ে এত কম নম্বর পেয়েছ, তোমাকে পাশ করিয়ে দেবারও তো কোন উপায় নেই!

তা হলে? বিরসমুখে রতন দাঁড়িয়ে রইল।

লেখাপড়ায় খারাপ হলেও, রতনের ওপর শিক্ষকরা বিশেষ বিরূপ ছিলেন না, কারণ সে শান্ত, নিরীহ প্রকৃতির। শিক্ষকদের সমীহ করত। ক্লাসে পড়াশোনাতেও অমনোযোগী ছিল না। দোষের মধ্যে তার মেধা ছিল না। অনেক চেষ্টা সত্বেও লেখাপড়া সে আয়ত্ব করতে পারত না। তা ছাড়া, ফুটবলের ব্যাপারেও তার একটা প্রতিপত্তি ছিল। তার

জন্যই এই মদনচক হাইস্কুলের এত নাম। বছর বছর সবাইকে হারিয়ে শীল্ড নিয়ে আসে।

শেষকালে ঠিক হল, রতনের পড়ার খরচের অর্ধেক মাষ্টাররা চাঁদা করে দেবে, বাকি অর্ধেক তার মাকে দিতে হবে।

রতনের মায়ের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। দেহের রক্তপাত করে যেটুকু রোজগার করে, তাতে মায়েপোয়ের কোন রকমে গ্রাসাচ্ছাদন চলে, এর ওপর যদি রতনের পড়ার খরচের কিছুটা বহন করতে হয় তাহলেই তো সর্বনাশ। তার চেয়ে লেখাপড়া করে দরকার নেই, রতন একটা চাকরিবাকরি করুক।

কিন্তু পাড়াগাঁয়ে রতনের আর কি চাকরি জুটবে! জন-মজুরের কাজ কিংবা গরুর রাখালী। এত ক্লাস পর্যন্ত পড়ে রতনের পক্ষে এসব কাজ করাও মুস্কিল।

আর দুটো বছর কোন রকমে দেখি মা, রতন কাকুতি-মিনতি করল, এর মধ্যে আমি পুকুর থেকে শাকপাতা তুলে, গাছের দু'একটা ফলপাকড় নিয়ে না হয় গঞ্জের হাটে গিয়ে বসব। যা দু'পয়সা রোজগার হয়।

কিন্তু তাতেও বিশেষ সুরাহা হ'ল না।

সেই বছর মদনচক স্কুলের ছেলেরা প্রথম ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিচ্ছে। গোটা বারো ছেলে গঞ্জে যাবে পরীক্ষা দিতে, তার মধ্যে হেডমাষ্টারের ছেলে নন্দকিশোরই সেরা। সবাই আশা করছে নন্দকিশোর পরীক্ষায় খুব ভাল করবে। প্রথম দশজনের মধ্যে হওয়াও বিচিত্র নয়। হেডমাষ্টার নিজে আর অন্য সব মাষ্টাররা নন্দর জন্য প্রাণপণ খাটছেন।

টেষ্ট পরীক্ষা শেষ। আর স্কুল যাবার দরকার নেই। শেষদিনে এই বারোজন ছাত্রকে বিদায় সম্বর্ধনা দেওয়া হল। বলা যায় না, এদের মধ্যে দু'একজন হয়তো অকৃতকার্য হয়ে এই স্কুলে ফিরেও আসতে পারে। তবু, অন্য ক্লাসের ছাত্রদের তরফ থেকে মঙ্গল কামনাই করা হল।

সভার শেষে সবাই যখন বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, তখন রতন এসে দাঁড়াল নন্দর পাশে।

বিকালে পল্টনের মাঠে ফুটবল খেলা আছে। মদনচক হাই স্কুলের সঙ্গে গৌরীপুর বয়েজ হোম-এর। খবর এসেছে গৌরীপুর শহর থেকে অন্যায়ভাবে নাকি গোটা তিনেক ছেলে এনেছে। দু'জন ব্যাক, একজন গোলরক্ষক।

রতন বেপরোয়া। যত জাঁদরেল খেলোয়াড়ই আসুক, তার কাছে নিস্তার নেই। সুবিধামত বল যদি তার পায়ে আসে, তাহলে গোল অবধারিত। কোন বাধা তাকে বিচলিত করতে পারবে না। খেলার ব্যাপারে শরীর ঠিক রাখছিল বলে রতন ছাত্রদের বিদায়-সভায় আসতে পারেনি।

সে নন্দর একটা হাত ধরে বলল, আমার শুভেচ্ছা নিও। তোমার পরীক্ষার ফল ভাল হবেই।

নন্দ বিরক্তিভরে হাতটা সরিয়ে দিল।

তোমার মতন ওঁচা ছেলের অভিনন্দনে আমার দরকার নেই। পরীক্ষা দেবার সময় যেন তোমার মতন অপয়া ছেলের মুখ না দেখতে হয়।

ধারে-কাছে শিক্ষকরা কেউ ছিলেন না। সমবেত ছাত্রের দল উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল।

রতনের সারা মুখ অপমানে বেদনায় কালো হয়ে গেল।

নন্দ লেখাপড়ায় ভাল ছেলে হলে হবে কি, ভীষণ দাম্ভিক। ক্লাসের চলনসই অন্য ছেলেদের সঙ্গে ভাল করে কথাই বলে না। রতনের দিকে তো ফিরেও চায় না।

ঠিক এই সময় হেডমাষ্টার এসে দাঁড়ালেন। রতনের দিকে চেয়ে বললেন, এই যে এসে গেছ। আর আধ ঘণ্টা বাকি। চল আমরা মাঠের দিকে রওনা হই। তারপর সমবেত অন্য ছেলেদের বললেন, তোমরা তো আর কিছুদিন পরেই স্কুল ছেড়ে চলে যাচ্ছ, চল সবাই ম্যাচটা দেখে যাবে। ফাইন্যাল ম্যাচ।

সবাই পণ্টনের মাঠের দিকে চলতে শুরু করল।

ম্যাচ শুরু হ'ল। গৌরীপুর স্কুলের খেলোয়াড়রা বলের চেয়ে মানুষের দিকেই নজর দিল বেশী। সম্ভবতঃ রতনের ক্রীড়ানৈপুণ্যের কথা তারা আগেই শুনেছিল, জনতিনেক খেলোয়াড় রতনের সঙ্গে সঙ্গে রইল। প্রায় তাকে ঘিরে।

তার মধ্যেই রতন অসাধ্যসাধন করল। ক্ষিপ্রগতিতে সব বাধা কাটিয়ে বল নিয়ে ছুটল। বলে যেন আঠা মাখানো। রতনের পায়ের সঙ্গে সেটা আটকে রইল। দু'জন ব্যাককে হতভম্ব করে, গোলরক্ষককে পাশ কাটিয়ে, কামানের গোলার মতন দুর্ধর্ষ এক সট দু'মিনিট ধরে জাল থরথর করে কেঁপে উঠল।

গোল খেয়ে গৌরীপুর স্কুলও মরীয়া। বিশ্রীভাবে আক্রমণ শুরু করল। রেফারী দু'দুবার ফাউল দিল গৌরীপুরের বিরুদ্ধে। একবার একেবারে গৌরীপুরের গোল এলাকার মধ্যেই বিশ্রী কাণ্ড। রতন বল নিয়ে ছুটে আসছিল। গৌরীপুরের একজন ব্যাক বেগতিক দেখে সোজা রতনের পেটে ঘুষি চালাল।

সঙ্গে সঙ্গে রেফারির বাঁশী। পেনাল্টি।

রতনের মুখ দেখে মনে হল তার বেশ লেগেছে, কিন্তু সে সামলে নিল।

রতনই গোলকিক করার জন্য দাঁড়াল। বিপরীত দিকে গোলের মধ্যে শুধু গোলরক্ষক।

থমথমে নিস্তব্ধতা। এবারে অব্যর্থ একটা গোল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একদিকে গৌরীপুর স্কুলের অন্য দিকে মদনচকের ছেলেরা প্রায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছে।

বলে পা ঠেকাতে গিয়েই রতন থেমে গেল। ছেলেদের মধ্যে চীৎকার; একটু দূর থেকেও একটা কোলাহল ভেসে এল। রতন চমকে মুখ ফিরিয়ে দেখল, মাঠের মধ্যে দিয়ে কোণাকুণি ভাবে বিরাট সাইজের একটা কুকুর ছুটে আসছে। তার রক্তাভ দুটি চোখ, জিভটা ঝুলে পড়েছে।

'নন্দ দুটো হাত দিয়ে রতনের রক্তাপ্লুত দেহটাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল।' পৃষ্ঠা ২৯০

দূর থেকে লোকরা চেঁচাল, পালাও, পালাও, পাগলা কুকুর। সবাই যে যেদিকে পারল ছুটতে লাগল। ছত্রভঙ্গ হয়ে।

হঠাৎ রতন দেখল, নন্দ প্রাণপণে ছুটছে আর তার পিছন পিছন কুকুরটা বিদ্যুৎবেগে দৌড়াচ্ছে। সর্বনাশ, বল ফেলে রতন প্রাণপণ শক্তিতে সেই দিকে ছুটল।

কুকুরটা নন্দকে যখন প্রায় ধরার মুখে, তখন রতন সজোরে কুকুরটাকে একটা লাথি মারল, সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা নন্দকে ছেড়ে রতনের ওপর লাফিয়ে পড়ল।

হেডমাষ্টার, অন্য শিক্ষকেরা আর ছেলের দল যখন ইট, লাঠি হাতে রতনের কাছে গিয়ে পৌছাল, তখন কুকুরটা পালিয়েছে, কিন্তু রতনকে চেনবার উপায় নেই।

সমস্ত শরীরে দংশনের দাগ। রক্তে সব ভেসে গিয়েছে।

হেডমাষ্টার তাড়াতাড়ি রতনের মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে বললেন, একি করলি রতন, তুই একি করলি!

শক্তি নেই, তাও রতন ম্লান হাসল। ক্ষীণকণ্ঠে বলল, আমি তো ওঁচা ছেলে স্যর, আমি গেলে কোন ক্ষতি হবে না, কিন্তু নন্দ ইস্কুলের গৌরব, তাকে বাঁচতেই হবে। স্কুলের, গ্রামের মুখোজ্জ্বল করার জন্য তার বাঁচা দরকার।

রতন আর কথা বলতে পারেনি। বিস্ফারিত চোখ মেলে একবার শুধু নন্দকে খুঁজেছিল।

নন্দ দুটো হাত দিয়ে রতনের রক্তাপ্লুত দেহটা জড়িয়ে ধরে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠছিল।

যে অন্যায় সে করেছে, তার প্রতিকারের জন্য তাকে অনেক চোখের জল ফেলতে হবে। লাস্ট বয় তার কঠিন ব্যবহারের এভাবে প্রতিশোধ নেবে, ফার্স্ট বয় সেটা ভাবতেও পারেনি।

শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত

ভূত দেখেছিস? দেখিসনি তো!
নামেই অমন হোসনে ভীত।
আচ্ছা, দাঁড়া, বুঝিয়ে তোকে
দিচ্ছি যেন দেখবি চোখে।
দেখেছিস কি হুতোমছানা,
উটপাখিরই মতো? না-না—
খেঁকশেয়ালের আদল কিছু,
ভোঁদড় হলে একটু নীচু
যেমনটি হয়, তার ওপরে
ভাঁটার মতো চক্ষু ঘোরে।
পা দুটো ঠিক টেলিগ্রাফের
পোস্ট তবে তার অধিক ঘের।

আঙুলগুলো অক্টোপাশ
ধরে যদি সর্বনাশ
অক্টোপাশ কি? শুশুক—থুড়ি,
কাঁকড়ারই এক পূর্বসূরী।
প্রতিটি দাঁত ঠিক ভোজালি,
'খাব, খাব' করছে খালি।
লকলকে জিভ হাওয়ায় দোলে
ছুঁলেই সটান মৃত্যুকোলে।
বুঝলি কিছু? ঢুকল মাথায়?
এমন ছাত্র ঠেঙানোই দায়!
মাথাতে তোর গোবর পোরা,
পিটিয়ে গাধা হয় না ঘোড়া!

খুশির শরতে

শ্রীঅতীন মজুমদার

বর্ষা-মেয়ের এক ঘেয়ে ঐ ঘ্যানর ঘ্যানর কান্না
শরৎ এসে থামিয়ে হেসে ঝরায় খুসির পান্না।

ঝিল্‌মিলে ঐ রোদ্দুরেতে
আকাশ-ধরা উঠ্‌ল মেতে,
দোয়েল শ্যামা আনন্দে তাই ধর্‌ল এমন গান না,—
যে গান শুনেই ছুট্টে এল গোম্‌ড়ামুখী আন্না।

ক্ষেস্তি-ভূতি আস্‌ল সবাই,
বললে—চ' বনভোজনে যাই,
আন্না তাদের সঙ্গ নিল—করতে সে যে রান্না।

তাইনা দেখে খোকনও যায়,
ডাক্‌লে চাকর জোর ধমকায়,
ধমক খেয়ে ভেবে আকুল চাকর গিরীশ মান্না
হলো কি যে খোকাবাবুর স্কুল যেতে চান না।

এদিকে মা বসে ভাবেন
খোকার বাবা অফিস যাবেন,—
বেলা বয়ে যায় তবু যে কেন এসে খান না।

খোকার বাবা ওদিকেতে
ভাবেন খুশির এ-দিনটিতে
একঘেয়ে কাজ ভাল লাগে?—তাই অফিসে যান না,
চুপি চুপি বাইরে পালান,—কিচ্ছুটি জানান না।

('বর-পুত্র'র শেষাংশ ২৪৪ পৃষ্ঠার পর)

পটলা বলল—"সব কথা বলা চলবে না ভাই। সাঁটে বলছি, বুঝে নিতে হবে। আর, মা-সরস্বতীর দিব্যি, প্রকাশ করবে না কেউ। ভেবে দেখলাম, একমাত্র উপায়, কুকুর হারানো—গুপ্টা সায়েব পুরস্কার ঘোষণা করবেই কাগজে—তারপর সেটাকে এনে আবার ভালো মানুষের মতন ওর কাছে পৌঁছে দিয়ে পুরস্কারটি হাতানো। মনটা খুবই খারাপ যাচ্ছিল, বিজ্ঞাপন আর বেরোয় না, তারপরে কালকের "স্টেট্‌স্‌ম্যানে" দেখি বেরিয়ে গেছে : এই ধরণের কুকুর—কীপারের হাত ফসকে পালিয়ে গেছে—এই নামে সাড়া দেয়—(ওর নামটা হচ্ছে টাইগার) এই ঠিকানায় এনে পৌঁছে দিলে একশত টাকা পুরস্কার।—এ-পুরস্কার আর পটলা ছাড়া নেয় কার সাধ্যি? হারানো জায়গা, মানে বরানগরে এই আমার মাসতুতো ভাই জ্যোতিদার বাড়ি থেকে এনে, এই খানিক আগে উপস্থিত গুপ্টা সায়েবের বাসায়—'স্যার, এই কি আপনার কুকুর টাইগার?'—একেবারে ড্যাম গ্ল্যাড!—'কি ক'রে কোথা থেকে আনলে?' ফাঁকতালে মার একটু খাতির জমিয়ে দিলাম, ঘোর নাস্তিক তো, বললাম—বিজ্ঞাপন দেখে মনটা বড় খারাপ হয়েছিল, আপনার শখের কুকুর—তাইতেই মা-সরস্বতী স্বপ্নাদেশ দিলেন, ওমুক জায়গায় যা, পেয়ে যাবি।—পুরস্কার, তার ওপর এই পঞ্চাশ টাকা চাঁদা।

প্রশংসার একটা গুঞ্জন উঠল—"পাস তোর বাঁধা পটলা, দেখে নিস···মা যদি নেহাৎ বেইমানি না করেন···এ বছর কেন, ফাইনালেও···উঃ, কী এক চাল চেলেছিস রে!"

সন্দেহও। দিনেশ বলল—"কিন্তু, বেরিয়ে যাবে না কথাটা?" পটলা বলল—"দুটি মাস তোমরা চেপে থাকো। গুপ্টা সায়েবের বালিগঞ্জের বাড়ি কমপ্লীট হয়ে এলো, মেমসায়েব এসে গেলে সেখানেই উঠে যাবে। সেখান থেকেই ফি বছর তোমাদের এই পঞ্চাশটাকা করে চাঁদা এসে পৌঁছুবে।"

"বরাবর দিয়ে যাবে!!"—কয়েকজনই একসঙ্গে বলে উঠল। পটলা বলল—"একেবারে ভিজে গেছে, তবে আর বলছি কি! স্বপ্নাদেশের কথা শুনে—"ইজ ইট ট্রু!"—বলে সেই যে হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে রইল, আর কথা বেরোয় না। টেনেও রয়েছে সে। "···হ্যাঁ, গোকুল, বদ্রিভাইকে দশটা টাকা ওর মধ্যে থেকে।···না, না, জ্যোতিদাকে কিছু দিতে হবে না তা'হলে—কী যে ভালবাসল আমায়! বললেন—"চ, বরপুত্র-সংঘের সবার সঙ্গে আলাপ করে আসি।···ওঁর একটি বিচ চাই, মাদীটার বাচ্চা হলে—কুকুরের ভয়ানক শখ কিনা! তা, সে-ব্যবস্থা বদ্রিভাই করবে আমাদের হ'য়ে। বড্ড এক-কথার মানুষ হে!"

—কাছে টেনে এনে পিঠে হাত রাখল। গোকুল নোটটা বের করে দিতে সবার হাততালি পড়ে জায়গাটা চকিত হয়ে উঠল।

হরতনের ডাকে অরিন্দম এলাহাবাদ পর্যন্ত তার পিছনে ধাওয়া করেছিল। কিন্তু বিশেষ লাভ হয়নি। দলের দু'একজন লোক ধরা পড়ল বটে, কিন্তু তাতে কি? আসল কর্তা যে কে তাই খোঁজ করা হ'ল না এ পর্যন্ত। মাঝ থেকে তাকে দিনকতক বিছানায় শুয়ে ডাক্তারদের দেওয়া একাগদা ওষুধ খেতে হ'ল। জখম তার বেশ হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অতগুলো নামজাদা গুণ্ডার সঙ্গে খালি-হাতে লড়াই করার দুঃসাহস একমাত্র অরিন্দম মুখার্জীরই আছে। আর শুধু সাহস কেন প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ধৈর্য, সহ্যশক্তি প্রভৃতি গুণের সমাবেশের জন্যেই তার এত সুনাম আর চাহিদা, ডিপার্টমেন্টের লোকেরা তাকে শুধু ভালবাসে না, দস্তুরমত শ্রদ্ধাও করে থাকে।

বিছানায় শুয়ে নভেল পড়তে অরিন্দমের খুব ভাল লাগে। কিন্তু বিপদ এসেছে তার অন্যদিক দিয়ে। কাকাতুয়া মিঠুর চীৎকার আর পরেশের খবরদারী তাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। আধঘণ্টা অন্তর পরেশ তাকে যে পরিমাণ ওষুধ গেলাচ্ছে, তাতে দুপুরের খাবার খাওয়ার মত পেটে জায়গা থাকবে কিনা এবার সন্দেহ জাগছে তার মনে।

নিন, ট্যাবলেটটা খান এবার। জলের গ্লাস নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে পরেশ।

খাব না, মাথা নাড়ল অরিন্দম। তুই কি আমার পেটে ওষুধের ফ্যাক্টরি তৈরী করবি?

পেটে আবার ফ্যাক্টরি হয় নাকি, কি যে বলেন! বড় জোর ব্যথা হতে পারে।

আমার বদলে তুই ট্যাবলেটগুলো খা, তাহলে বুঝবি।

আপনার পায়ের ঘাটা এখনও রয়েছে, আপনি ওষুধ না খেলে ডাক্তারবাবুকে ইন্‌জেকসন দিতে বলতে হবে! পরেশের অসাধ্য কিছু নেই, ডাক্তারকে বলে ইন্‌জেকসন দেওয়ালেই তো চিত্তির! অরিন্দম ছুরি বা গুলির সামনে যেতে রাজী, কিন্তু ইন্‌জেকসন সূঁচকে তার দারুণ ভয়। কোন্ এক কুক্ষণে এ সংবাদটা সে পরেশকে বলে ফেলেছিল, সেই থেকে এটা তার হাতের অস্ত্র হয়ে গিয়েছে। কথায় কথায় পরেশ ভয় দেখায় তাকে।

. দে সব ট্যাবলেটগুলিই একসঙ্গে খেয়েনি। রাগ করে বলল অরিন্দম।

তা কি করে হবে?

হবে না?

না, তা'হলে তো ঐ হতভাগা পাখীটাকে একসঙ্গে পরদিনের খাবার খাইয়ে দিলেই হাঙ্গামা মিটে যেত।

আবার মিঠু কি করলে?

করেনি, তবে বলেছে। আপনি যতদিন এলাহাবাদে ছিলেন ততদিন আমাকে হরদম গাল দিয়েছে।

ও তুই বাড়িয়ে বলছিস্।

বাড়িয়ে বলছি? আপনি তো চিরকালই ঐ হতভাগাকে ভালবাসেন।

আর তুই।—

কি বলেন বাবু, দিনরাত আমায় গালাগাল দেবে আর ওকে আমি ভালবাসব?

তা'হলে ওকে অত যত্ন করে খেতে দিস্ কেন?

তা কি করব, তা না হলে যে মরে যাবে। আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেল পরেশ।

এলাহাবাদের ঘটনার পর শুধু অরিন্দম নয়, হরতনের দলের বেশ কয়েকজন লোকও শয্যাশায়ী হয়ে রয়েছে। একজন লোক শুধু হাতে বিনা অস্ত্রে কি করে এতগুলো লোককে ঘায়েল করতে পারে, একথা ভেবে দলের অনেকেই আশ্চয হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, ওই লোকটার জন্যে এলাহাবাদের ঘাঁটি পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে হয়েছে। কিন্তু হরতনের দল কখনও চুপ করে বসে থাকে না। একটা সামান্য বাঙালী তাদের এভাবে হয়রান করে যাবে আর তারা মুখ বুজে সহ্য করবে, এটা হরতনের দল কখনও করেনি।

খিদিরপুর ডক এলাকার বস্তি। অসংখ্য মাটির বাড়ী আর নোংরা গলি। ধোঁয়া, ধূলো আর ময়লা ছড়ান-চতুর্দিকে। কাঁচা নর্দমাতে মুরগীগুলো খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে। রেডিও বাজছে সামনের কফিখানাতে। অনেক লোকের ভিড়। কফিখানাটা ছাড়িয়ে ডান দিকে বেঁকলেই সামসুলের মনোহারীর দোকান। তার পিছনের দিকে গণপৎ সাউ-এর সাবানের কারখানা। বেশ বড় জায়গাটা। টিনের শেড আর পাঁচিল দিয়ে ঘেরা চতুর্দিক। বড় বড় লোহার কড়াই, তাতে তেল আর কসটিক জ্বাল দেওয়া হয়। এক একটা চুল্লিতে ঐ বিরাট কড়াগুলো বসিয়ে সাবানের মালমশলা তৈরী করা হয়। গণপৎ সাউ এই কারখানার মালিক। একটা সাইনবোর্ড টাঙান আছে দরজার সামনে। তাতে লেখা রয়েছে, "অল হোয়াইট সোপ ফ্যাক্টরি"।

গণপৎ কারখানার ভেতরে বসে আছে একটা টুলের উপর। সামনে একটা ভাঙা টেবিল।

রাম রাম সাউজী—একটা লোক ঢুকল ভেতরে।

কি খবর রে বিল্লু? সাউজী পিট পিট করে তাকাল তার দিকে।

সাবুন দেবেন আজ?

হ্যাঁ, আর দশ মিনিট পর। ঘড়িটা দেখে বলল সাউজী।

আর কিছু? জিজ্ঞেস করল বিল্লু।

রাত সাতটার সময় এখানে আসবি।

কেন বলত? কৌতূহল হ'ল বিল্লুর।

কেনর জবাব নেই, হুকুম আছে আসবি--ব্যাস। হাত দুটো ছাড়িয়ে বসল গণপৎ সাউ।

ঠিক দশ মিনিট পরে একটা লম্বা, কাপড় কাচা সাবান বিল্লুর হাতে দিল গণপৎ। বলল, যাও, আমার কাজ আজ শেষ।

বিল্লু সাবানটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। অনেক ঘুরে সে পার্ক সার্কাস সিনেমাটার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর পকেট থেকে একটা টিকিট বার করে, গেট দিয়ে ঢুকে পড়ল সিনেমার মধ্যে। ম্যাটিনি শো আর একটু পরেই শুরু হবে। হলের মধ্যে দারুণ চীৎকার। পান, সিগারেট, লেমনেড, বাদাম বিক্রী চলছে অনবরত। বিল্লু পাশের সীটের দিকে নজর দিল। তার ডান দিকের সীট তখনও খালি। ফার্ষ্ট এবং সেকেণ্ড বেল পড়ল। হলটা অন্ধকার হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। পাশের সীট তখনও খালি। ছবি শুরু হয়ে গেল। বাহাদুর এসে গিয়েছে, ছবি দারুণ জমে উঠেছে, এমন সময় বিল্লু দেখল, তার ডান দিকের খালি সীটে একজন এসে বসেছে। লোকটা একটা সিগারেটের প্যাকেট তার দিকে এগিয়ে দিল। সিগারেটের প্যাকেটটা ধরে বসে রইল বিল্লু। ইণ্টারভেল না হলে সে সিগারেটের ব্রাণ্ডটা ঠিক দেখতে পাবে না। ব্রাণ্ড না দেখে সে কিছুই করবে না। ছবি সমানে চলেছে; দারুণ জমে উঠেছে এবার। বাহাদুর এক লাফে তিনতলা থেকে মাটিতে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর রক্ষে নেই। দর্শকরা দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। হাততালি দিচ্ছে তারা চটাপট করে। এমন সময় ইণ্টারভ্যাল হ'ল। আলো জ্বলে উঠল চতুর্দিকে। পান-বিড়ি-সিগারেট; হাঁকা আরম্ভ হয়ে গেল বিচিত্র স্বরে। এবার বিল্লু সিগারেটের প্যাকেটটা দেখল ভাল করে। হ্যাঁ, কাঁচি সিগারেটের প্যাকেটই বটে। এবার পাশের লোকের

দিকে তাকাল সে। লোকটাকে কোনদিন দেখেনি বিল্লু। লোকটা কথা বলল ভাঙা গলায়, 'লেবুর সরবত খাবেন ?

কমলা না মুসম্বি, জিজ্ঞেস করল বিল্লু।

না পাতিলেবুর, বলল লোকটা।

এবার সাবানটা তার হাতে দিয়ে দিল বিল্লু। শুধু কাঁচি সিগারেটের পাকেট দিলে হবে না! কথাগুলো অবিকল না বলতে পারলে তাকে সাবান দিতে পারবে না বিল্লু। এইটেই ছিল তার ওপর নির্দেশ।

সন্ধ্যে সাতটার সময় গণপৎ সাউ-এর সাবানের কারখানায় এক এক করে চারজন ঢুকল। ভাঙা টেবিলের চারধারে পাঁচটা টুল রাখা আছে। গণপৎ গিয়ে একটাতে বসল। বিল্লু ছাড়া, সিনেমার লোকটাও হাজির হয়েছে। আর দুটো লোক চোখে কাল চশমা পরে বসেছে দু'পাশে। কালো চশমাধারী একজন বলল, সাউজী, এলাহাবাদের খবর শুনেছ ?

হ্যাঁ, কিন্তু তাতে কি হয়েছে, ঘাবড়াবার কি আছে ?

না, তা নেই, তবে খুব সাবধানে চলতে হবে আমাদের।

সে তোমায় বলতে হবে না, অল হোয়াইট সাবান সব ফরসা করে দেবে। গণপৎ সাউর হাসিতে ভুঁড়ি দুলে উঠল।

বিল্লু, সাবানটা ঠিক দিয়েছ ? মহান্তি, তুমি বিল্লুর সাবান নিয়ে কি করলে ?

আমি সাবান নিয়ে তিলজলার লণ্ড্রীতে দিয়ে এসেছি।

কোন্ লণ্ড্রী ?

(ক্রমশঃ)

গল্প তো নয়

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

গল্প তো নয়—সত্যি এ,
এক ছিল সেই দত্যি যে!
সেবার কবে দেওঘরে
দত্যি দিল খুন করে
তিনশো প্রাণী এক সাথে
একটা চড়েই এক প্রাতে।

ব্যাপার বড় তুচ্ছ নয়,
এই লোককেই সবার ভয়।
খবর ত্বরিত যায় চলে,
পুলিস আসে দমকলে।
তিনশো প্রাণীর লাশ কোথায় ?
কেউ তা খুঁজে পায় না হায়!

গদু চক্কোত্তির গল্প

শ্রীপ্রফুল্ল রায়

গদু চক্কোত্তিকে তখনও আমি দেখিনি। তবে নামটা জানতাম। ঢাকা জেলায় এমন কেউ ছিল না যে তার নাম জানত না। দুটো করে কান যাদের আছে গদু চক্কোত্তির কথা না শুনে তাদের উপায় ছিল না।

গদু চক্কোত্তির কীর্তি-কাহিনী এত লোকের কাছে এত বার করে শুনেছি যে না দেখলেও মনে মনে তার একটা ছবি পর্যন্ত এঁকে ফেলেছিলাম। তিন মনী জালার মতন একটা পেটের ওপর বেলের মতন ছোট মুণ্ডু বসানো; সেই মুণ্ডুটায় মস্ত এক মুখ আর খুদে খুদে দুটো চোখ ছাড়া কিচ্ছু নেই; সেই চোখ দুটো আবার সব সময় লোভে চকচক করছে আর সার্চ লাইটের মতন বাঁই বাঁই করে এদিক-সেদিক ঘুরে লুচি-সন্দেশ-মাছ-মাংস খুঁজছে। গদু চক্কোত্তির এমন চেহারা আমার মাথায় কেমন করে এসেছিল বলতে পারব না। খুব সম্ভব মহাভারতের বক রাক্ষস এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছিল।

সেই বয়েসে ইতিহাস বইতে আলেকজাণ্ডারের কথা, রাণা প্রতাপের কথা, নেপোলিয়নের কথা পড়ে ফেলেছি। তার আগে রাম-লক্ষ্মণের গল্প পড়েছি, ভীম-অর্জুন দ্রোণ-কর্ণের গল্প পড়েছি।

কেন জানি না, ছেলেবেলায় গদু চক্কোত্তিকে ইতিহাসের বাঘা বাঘা বীরদের সঙ্গে এক সারিতে বসাতে আমার ভাল লাগত। তবে ভীম-অর্জুনদের সঙ্গে গদু চক্কোত্তির সামান্য একটু তফাত ছিল।

ইতিহাসের বীরেরা যুদ্ধ করতেন অন্য দেশের সঙ্গে; তরোয়াল চালিয়ে শত্রুর ধড় থেকে কচাকচ মুণ্ডু নামিয়ে দিতেন; চারদিকে রক্তের নদী বয়ে যেত। গদু চক্কোত্তিও যুদ্ধ করত কিন্তু তাতে এক ফোঁটা রক্ত পড়ত না। তার যুদ্ধ কোন মানুষের বিরুদ্ধে নয়; লুচি-মাংস-পোলাও-কালিয়া—এ সবের সঙ্গে। যত ভাল ভাল খাবার আছে সেগুলো ধ্বংস করতেই নাকি তার পৃথিবীতে আসা।

গদু চক্কোত্তির আসল নাম গদাধর চক্রবর্তী। ভেঙে-চুরে-কয়ে 'গদাধর' কেমন করে 'গদু'তে দাঁড়িয়েছিল, অত-শত জানি না; ভাষা নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁরাই শুধু বলতে পারবেন। তবে এটুকু জানি নিজের নাম সার্থক করতে কোনদিন গদা ধরেনি গদু, চিরকাল দই-সন্দেশ-বাবড়ি ইত্যাদি ধরেছে।

গদু চক্কোত্তির কেউ ছিল না। ছেলে-মেয়ে-ভাই-বোন-বউ-মা-বাপ, কেউ না। সংসারে সে একেবারে একা। বাড়িঘর বলতে, ঠিকানা বলতে তার কিচ্ছু ছিল না। যখন যেখানে যেত সেইটেই তার ঠিকানা।

আগেকার দিনে রাজা-রাজড়ারা হাতী-ঘোড়া সাজিয়ে সৈন্যসামন্ত নিয়ে দিগ্বিজয়ে বেরুতেন। গদু চক্কোত্তিও বেরুত; তার সঙ্গে অবশ্য লোকজন থাকত না, ঢাল-তরোয়াল থাকত না, হাতী-ঘোড়াও না। একাই দিগ্বিজয়ে যেত সে। সরঞ্জামের ভেতর থাকত গোটাকতক হজমী গুলি আর কৃষ্ণচতুর্মুখ লবণ, কিন্তু সে সব কেউ কোনদিন তাকে ব্যবহার করতে ভাখেনি।

গদু চক্কোত্তির ঘ্রাণশক্তি নাকি সঙ্ঘাতিক। আমার ছোট মামা বলত, 'পনের মাইল দূর থেকে ও লুচিভাজার গন্ধ পায়।'

খুব একটা মিথ্যে বলত না ছোট মামা। বাতাসে গন্ধ শুঁকেই বোধ হয় ভোজ বাড়ির খবর পেয়ে যেত গদু চক্কোত্তি এবং যথাসময়ে হাজিরা দিয়ে বলত, 'যুদ্ধং দেহি'।

'যুদ্ধং দেহি' ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলা দরকার।

ঢাকা জেলায় খাইয়ে লোকের তো অভাব ছিল না। একেক জায়গায় একেক জন নামডাকওলা 'ঔদরিক' ছিল। তাদের 'চ্যালেঞ্জ' জানাত গদু চক্কোত্তি। শুরু হয়ে যেত সম্মুখ সমর। কিন্তু গদু চক্কোত্তির সঙ্গে পারবে কে? কিছুক্ষণ লড়াই চালিয়ে লড়নেওলারা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাত।

এখনকার মতন সে আমলে রেশন কার্ড হয়নি। ভোজ বাড়িতে পঞ্চাশ জনের বেশি খাওয়ানো চলবে না; এমন আইনও চালু হয়নি। নেমন্তন্নের কার্ডের তলায় লিখে দিতে হত না, 'অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী সামান্য জলযোগের ব্যবস্থা হইয়াছে।' তা ছাড়া দেশটাও ছিল পূর্ব বাঙলা—তখনও সেটা পাকিস্তান হয়নি। সেখানে মাছ-দুধ-দই-ক্ষীরের স্রোত বয়ে যেত। কাজেই ভোজ বাড়িতে একজন বাড়তি লোক এসে যদি খেয়ে যায় তাতে কেউ রাগ করত না বরং খুশীই হত। তার ওপর গদু চক্কোত্তির মতন খাইয়ে লোক যদি হয় তা হলে তো কথাই নেই; বাড়ির কর্তা স্বয়ং কাছে দাঁড়িয়ে খাওয়াত; আদর আপ্যায়নের ঘটাটা হত কিছু বেশিই।

ঢাকা জেলা তো আর একটুখানি জায়গা নয়। এখানে-ওখানে প্রত্যেক দিন ভোজ লেগেই আছে। বিয়ে-পৈতে-অন্নপ্রাশন-শ্রাদ্ধ ভোজের কারণ কি এক-আধটা?

সারা বছর শুধু বাতাসে গন্ধ শুঁকে শুঁকে বিনা নেমন্তন্নে বাড়িতে হানা দিয়ে বেড়াত গদু চক্কোত্তি। হানা দেবার কথাটা বোধ হয় ঠিক হল না, খাবার ব্যাপারে ঢাকা জেলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াত।

আমাদের জেলার খাইয়েদের দলে গদু চক্কোত্তি ছিল রাজ চক্রবর্তী; বর্গকরা সব তার প্রজার মতন।

এ হেন গন্থু চক্কোত্তিকে দেখবার বড় সাধ ছিল ছেলেবেলা থেকে। আলেকজাণ্ডার, রাণা প্রতাপ কিংবা নেপোলিয়ন—যাঁদের কথা ইতিহাসের বইতে পড়েছি—তাঁদের তো আর দেখবার উপায় নেই। অনেক কাল আগেই তাঁরা গত হয়েছেন। কিন্তু গন্থু চক্কোত্তি তো আছে; এই জেলাতেই সে ঘুর ঘুর করছে অথচ দেখার সুযোগ পাচ্ছি না। এমনই কপাল, আমাদের বাড়িতে না হলেও গ্রামের অন্য বাড়িতেও এক-আধটা বিয়ে কি পৈতে লাগছিল না। লাগলেও গন্থু চক্কোত্তিকে দেখা যেত।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত মনস্কামনা পূর্ণ হল। আমাদের বাড়িতেই বিয়ে লাগল—আমারই সেজ মামার বিয়ে।

বৌভাতের দিন ভোরবেলা থেকে ছটফট করছি, কখন গন্থু চক্কোত্তি আসে, কখন গন্থু চক্কোত্তি আসে। সকাল গেল, দুপুর গেল, সন্ধ্যে গেল, রাতও অনেকটা হল কিন্তু গন্থু চক্কোত্তি আর আসে না। ছোট মামা বলেছিল, পনের মাইলের ভেতর থাকলে সে লুচি ভাজার গন্ধ পায়। তবে কি সে পনের মাইলের বাইরে আছে? আমি বড্ড হতাশ হয়ে পড়লাম।

এদিকে আসন পাতা হয়ে গেছে; পাতাও পড়েছে; নুন-লেবু-লঙ্কা দেওয়া হয়েছে; মাটির গেলাসে জল দেওয়া হয়েছে। নিমন্ত্রিতেরা একে একে আসনে এসে বসছে। যারা পরিবেশন করবে, কোমরে গামছা বেঁধে লুচির ঝুড়ি, পটল ভাজার থালা, আলু-কপির তরকারির বালতি নিয়ে প্রস্তুত। ঠিক এইসময় 'যুদ্ধং দেহি' বলে গন্থু চক্কোত্তি হাজির।

আমার ওপর জল দেবার ভার ছিল, পেতলের 'জগ' নিয়ে একধারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। 'যুদ্ধং দেহি' শব্দটায় গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল: এত দিনে তবে ইচ্ছে পূরণ হল!

গন্থু চক্কোত্তির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি; বিস্ময় যেন আমার কাটছে না। কিন্তু এ কে? আমি মনে মনে যে ছবি কল্পনা করেছিলাম তার সঙ্গে গন্থু চক্কোত্তির সত্যিকার চেহারাটা তো মিলছে না। বরং তার উল্টোটাই দেখছি।

রোগা চিমসে চামচিকের মতন চেহারা; আখমাড়াই কলে ফেলে শরীর থেকে সব রস যেন তার বার করে নেওয়া হয়েছে। পরনে খাটো ধুতি; কোমরে নয়, বুকের কাছে কাপড়ের বাঁধন। জামা-গেঞ্জি-ফতুয়া কিছু নেই, গলার কাছে আধময়লা একখানা চাদর পাকিয়ে রাখা হয়েছে; খালি পা দুটো ধুলোয় মাখা। এত যার খাওয়ার নামডাক তার চেহারা এমনটি হতে পারে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ভেবে পাচ্ছিলাম না এত এত পোলাও, এত এত মাংস আর লুচি এই দেহের ভেতর সে রাখে কোথায়!

যাই হোক গন্থু চক্কোত্তি আসতে সাড়া পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধোবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হল, তারপর এনে বসানো হল ভোজের আসরে।

আমাদের ওদিকে সব চাইতে বিখ্যাত খাইয়ে ছিল বুধাই পাল। যুদ্ধ যখন ঘোষণা করেছে তখন তো আর এমনি এমনি বিনি প্রতিযোগিতায় গদু চক্কোত্তিকে ছেড়ে দেওয়া যায় না; তাতে গ্রামের অপমান। কাজেই বুধাই পালকে আমাদের সেনাপতি করে তার মুখোমুখি আসনে বসানো হল। তারপর শুরু হল লড়াই।

নিমন্ত্রিতেরা খাবে কি, এমন একখানা মজার যুদ্ধ দেখতে চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়াল।

শুধু পটল ভাজা দিয়েই পঞ্চাশখানা লুচি খেল গদু চক্কোত্তি; বুধাই পাল পাল্লা দিলে। ডাল দিয়ে গদু চক্কোত্তি খেলে সত্তরখানা লুচি; বুধাই পালও তা-ই খেলে। আলু-কপির তরকারি দিয়ে একশ খানা লুচি উধাও করে দিলে গদু; বুধাই পাল পিছু হটলে না বটে কিন্তু মুখ-চোখ কেমন কেমন যেন করতে লাগল।

একটা ব্যাপারে খুব মজা লাগছিল; খাচ্ছে আর পনের কুড়ি মিনিট পর পর কাপড়ের বাঁধন বুকের কাছ থেকে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে পেটের দিকে নামাচ্ছে গদু চক্কোত্তি।

ছোট মামা বললে, যে পর্যন্ত ভর্তি হচ্ছে কাপড়ের বাঁধন সেই পর্যন্ত নামাচ্ছে।

আলু-কপির তরকারির পর এল মাছ। খেতে খেতে এক কাণ্ড করে ফেলল বুধাই পাল। হঠাৎ সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে দুই হাত জোড় করে বললে, 'প্রভু খাইয়ে বলে জাঁক (গর্ব) ছিল, আপনি আমার দর্প চূর্ন করলেন।' বলে কোনরকমে উঠে একজনের কাঁধে ভর দিয়ে বাড়ি চলে গেল।

এর পরও শ খানেক লুচি খেলে গদু চক্কোত্তি; মাছ খেলে পঁয়তাল্লিশ টুকরো, মাংস সের খানেক, দই সের দেড়েক, রসগোল্লা খান ষাটেক, সন্দেশ চল্লিশখানা, ক্ষীর পোয়া তিনেক। সব খাবার পর বললে, 'রাবড়ি কই?'

বড় মামা মুখ কাচুমাচু করে বললেন, 'ওটা তো করা হয়নি।'

'সে কি, আমার পেটের ভেতর রাবড়ির জন্যে একটা খোল যে খালি রয়েছে।'

ছোট মামা ফোড়ন কাটলে, 'ঐ খোপটা না হয় রসগোল্লা দিয়ে 'ফিল্ আপ' করুন।'

'অগত্যা।'

আরো খান তিরিসেক রসগোল্লা খেয়ে তবে উঠলে গদু চক্কোত্তি।

আমার বড় মামা ছিলেন পেট রোগা লোক; গাঁদাল পাতার ঝোল আর শুক্তো ছাড়া তাঁর পেটে কিছু সইত না। নিজে খেতে পারতেন না, কিন্তু খাওয়াতে ভালবাসতেন। সেদিনই বড় মামা গদু চক্কোত্তিকে অনুরোধ করলেন, মাসে একবার করে এসে যেন চাট্টি ডালভাত খেয়ে যান। গদু এক কথায় রাজী। প্রতি মাসেই সে আসত। যাতায়াতের ফলে আমাদের সঙ্গে তার খুব খাতির হয়ে গিয়েছিল। (আগামী মাসে সমাপ্য)

সম্পাদক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার

শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : ০·৫০ পয়সা
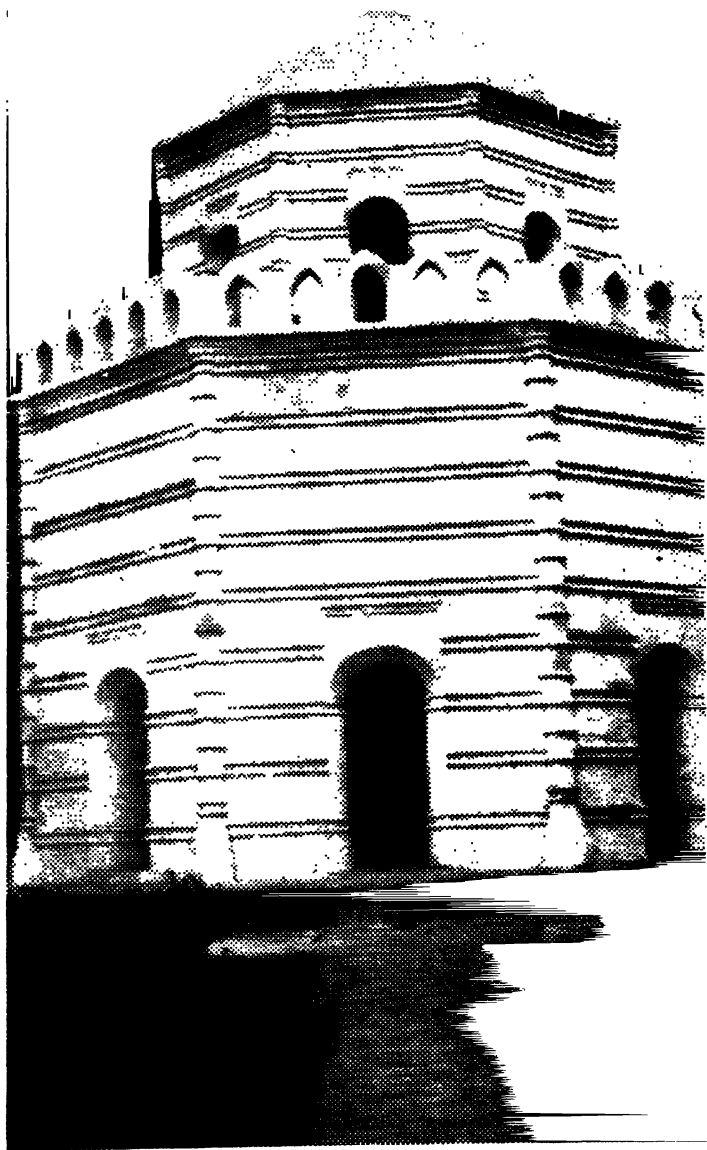
জব চার্নকের সমাধিভবন

✻ ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র ✻

৪৯শ বর্ষ] কার্তিক : ১৩৭৫ [৭ম সংখ্যা

পল্লী ভ্রমণ

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু

ক্যাঁচোর-কোঁচোর-কোঁচোৎ-কোঁচ্,
চলে গরুর গাড়ি রে।
কোথায় চলে? ছ্যাদ্‌লাপুরের
হোঁদলা খুড়োর বাড়ি রে।
কে বসেছে ছইয়ের ভেতর—
চিন্‌তে যে না পারি রে।
তিলে ঘুঘু ডাকছে গাছে,
কুমোর গড়ে হাঁড়ি রে।
মুখুজ্যেদের ছেলেটি—
নয়কো ঢোঁড়া-হেলেটি।
'বাবুই' ব'লে সবাই ডাকে,
বালিগঞ্জে সুখে থাকে।

খবরটা নেই লুকোনো,
গ্রাম দেখেনি কখনো।
মা বললো 'বেড়িয়ে আয়।'
তাই সে পাড়া-গাঁয়ে যায়।

হোঁদলা কাকা দেখেই বলে—
এস বাবুই সোনা রে!
টেরেলিনের ওপর থেকে
হাড় যাচ্ছে গোনা রে।
সকাল-বিকেল খাবে চায়ে
মিশিয়ে গরুর চোনা রে।
দুপুর বেলায় খাবে দিচুর
ছ' আঙুলের ঠোনা রে।
শুনেই বাবুই চ'টে লাল।
কাকীর রান্না বেজায় ঝাল।
রাতে ঘুমোয় একলা ঘরে;
খড়ের চালা দুলছে ঝড়ে।
গাব গাছেতে ভুতুম ডাকে;
ভয়ে বাবুই কুঁকড়ে থাকে;
শিয়াল-ঝিঁঝির কোরাস্ শুনে,
রাত কাটালো প্রহর গুণে।

সকাল বেলায় ঘুমের মাঝে
দরজা ঠ্যালে কাকী রে;
কাকার মেয়ে গন্না-কাটা
সুরটা বেজায় নাকী রে।
এঁদো ডোবায় নাইল বাবুই,
জ্বর আসতে বাকি রে।
গেঞ্জি গায়ে মারল দৌড়
চায়ের কাপটা রাখি রে।

শুভ্রা লণ্ড্রী।

তার মালিককে চেন?

হ্যাঁ, মুখে বসন্তের দাগ আর বাঁ হাতের কড়ে আঙুল কাটা।

বেশ, এবার তোমরা চলে যাও, সাউজীর সঙ্গে আমার অন্য কথা আছে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সবাই চলে গেলে লোকটা চোখের কাল চশমাটা খুলে ফেলল। তারপর বলল, সাউজী, আমায় চিনতে পার ?

হঠাৎ সাউজীর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তবুও বলল, না, ঠিক চিনতে পারছি না।

এবার পকেট থেকে বাঁ হাতটা বার করে সাউজীর সামনে লোকটা ধরল। তার কড়ে আঙুল একেবারেই নেই।

লতিফ ! কিন্তু মুখে বসন্তের দাগ কোথায় ? অস্পষ্টস্বরে বলল সাউজী।

বসন্তর দাগ করতে আমার দুমিনিট সময় লাগে সাউজী, আর তুলতে এক মিনিট। কিন্তু তুমি আমায় দেখে অত ভয় পেয়ে গেলে কেন !

লতিফকে ভয় করে না, এমন লোক কলকাতায় জন্মেছে বলে আমার মনে হয় না।

জন্মেছে সাউজী, এই কলকাতা শহরেই জন্মেছে।

কে সে ?

পুলিশের অরিন্দম মুখার্জী, যার জন্যে এলাহাবাদের আড্ডা তুলতে হ'ল। তার সঙ্গে এবার মোকাবিলা করব বলেই কলকাতায় এসেছি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল গণপত সাউ। তারপর বলল, আমি ভেবেছি সাবানের ওজন বুঝি কম হয়েছে।

না, তা হয় নি, হ'লে তোমারই বিপদ হত।

তুমি কবে কলকাতায় এলে ? এবার অন্য কথা পাড়ল সাউজী।

দিন পাঁচেক হবে, উত্তর দিল লতিফ, তিলজলার লণ্ড্রী খোলার ভার ছিল যার ওপর এসে দেখি সে গায়েব। কি ব্যাপার বুঝলাম না, শেষে নিজেই খুলে নিলাম। ছোট্টু কোথায় গেল তাই ভাবছি। আমি চলি সাউজী। বিল্লু জানে না আমি এখানে এসেছি, আর কাউকে জানিওনা যেন।

কতদিন থাকবে? জিজ্ঞেস করল সাউজী।

তা কি করে বলব, কর্তা যা হুকুম করবে তাই হবে!

আচ্ছা লতিফ তুমি কখনও কর্তাকে দেখেছ?

আরে সর্বনাশ, সাউজী ওকথা মুখে আনবে না, তাহ'লে জান চলে যাবে, কর্তাকে কেউ কোনদিন দেখে নি।

কথাটা ঠিক, কর্তা অর্থাৎ হরতনের দেখা আজ পর্যন্ত কেউ পায় নি। নানা উপায়ে বিভিন্ন লোকের কাছে খবর পাঠান হয়। যেমন, সেদিন সকালে ব্যায়ামের পরই অরিন্দম তার টেলিফোনটা বাজতে শুনল। এসময় তাকে কেউ বিরক্ত করে না। দস্তুরমত চটে উঠল সে।

হ্যালো, ফোনটা ধরে বলল অরিন্দম।

হ্যালো, অরিন্দমবাবু কথা বলছেন?

হ্যাঁ, আপনি কে?

পরিচয় পরে হবে; আমি খুব বিপদে পড়েছি।

কি বিপদ?

একটা চিঠি পেয়েছি তাতে একটা হরতনের ছাপ। তারা আমার কাছে দু'লক্ষ টাকা চাইছে।

আপনি কে না জানলে কিছু বলতে পারব না।

আপনি হরতনকে চেনেন?

না।

কিছুদিন আগে এলাহাবাদে গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

এবার আর কষ্ট করে অতদূর যেতে হবে না, বাড়ীতেই হরতন আপনার সঙ্গে দেখা করবে।

কে আপনি? চীৎকার করে উঠল অরিন্দম!

একটা অট্টহাসির আওয়াজ শোনা গেল। তারপর উত্তর এল—আমিই হরতন। লাইনটা কেটে গেল।

একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল অরিন্দম। লোকটাকে সনাক্ত করার মত কোন কিছুই নেই। শুধু গলার স্বরে একজনকে চেনা সম্ভব হবে না। তবে হরতন যে কলকাতায় রয়েছে এটা জেনে আশান্বিত হ'ল অরিন্দম।

বাবু, টেবিলে খাবার দিয়েছি। পরেশ এসে দাঁড়িয়েছে কোন এক ফাঁকে।

হ্যাঁ যাচ্ছি। যাওয়ার কিন্তু কোন লক্ষণই দেখা গেল না। পরেশও তাই দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।

কি হ'ল, তুই দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন, জিজ্ঞেস করল অরিন্দম।

আবার আপনাকে কোথাও যেতে হবে নিশ্চয়, বলল পরেশ।

তুই কি করে জানলি ?

কোন শক্ত কাজের ভার এসে পড়লে আপনার মুখটা অন্য রকম হয়ে যায়।

কি রকম! হেসে ফেলল অরিন্দম।

মুখের ভাবটা যেন শক্ত মত হয়ে যায়, দেখলে তখন ভয় করে।

তুই ঠিক বলেছিস পরেশ, আবার একটা শক্ত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছি।

এখনও আপনার পায়ের ঘাটা শুকোয়নি বাবু। কি দিয়ে পা বেঁধেছিল ওরা ?

নাইলনের দড়ি দিয়ে।

হাতের ঘা সেরে গিয়েছে কিন্তু পায়েরটা এখনও সারছে না। হাত আর পা দুটো ভালভাবে নিরীক্ষণ করল অরিন্দম।

আর দেরী করল না সে, তাড়াতাড়ি খাবার টেবিলে গিয়ে বসল। তা না হ'লে পরেশের হাত থেকে নিস্তার নেই, একথা অরিন্দম জানে। খেতে খেতে সে হরতনের কথাই ভাবতে লাগল। দুর্জয় সাহস আছে লোকটার, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। তা না হ'লে কলকাতার বুকে বসে তাকেই টেলিফোন করে জানাল তার উপস্থিতির কথা! আটঘাট বেঁধে সে নিশ্চয় এসেছে। অর্থবল বা লোকবলের অভাব নেই তার এটা বেশ বোঝা যায়। খাওয়া শেষ হ'লে নরেনবাবুকে ডায়াল করল অরিন্দম।

হ্যালো, নরেনবাবু, আমি অরিন্দম কথা বলছি।

কি খবর অরিন্দম, তোমার ঘায়ের অবস্থা কেমন ?

ভাল, তবে আর একটা ঘা হয়েছে।

বল কি, আবার কোথায় ঘা হ'ল ?

এবার মনে।

কিছু বুঝলাম না অরিন্দম। স্পষ্ট করে বল বাপু, তোমার হেঁয়ালি আমি বুঝি না!

হরতন টেলিফোনে শাসিয়েছে।

কলকাতায় হরতন! তুমি নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছ দিনের বেলায়।

না আমার হরতন বলেই মনে হচ্ছে, উত্তর দিল অরিন্দম, সে বলেছে বাড়ীতে এসেই দেখা করবে।

তাহ'লে তোমার বাড়ীতে আর্মি গার্ড পাঠান দরকার।

কোন লাভ নেই নরেনবাবু, বলল অরিন্দম, আমিত দিনরাত্তির বাড়ীতে বসে থাকব না। আর তাছাড়া একটা তুচ্ছ গুণ্ডার দলকে ভয় পেলে চলবে কি করে!

তুচ্ছ বললে ভুল করবে অরিন্দম। হরতনের জাল বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। তাকে ভয় করে না এমন লোক বিরল।

বিরল হ'তে পারে, তবে দু'একজন আছে নরেনবাবু। তার মধ্যে একজনের নাম অরিন্দম মুখার্জী।

তোমার সাহস দেখে খুশী হলাম। যাই হোক, আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখো।

অনেক আশ্বাসবাণী শোনাবার পর নরেনবাবু ফোনটা রাখলেন শেষ পর্যন্ত!

ফোনটা রাখার পরই কাকাতুয়ার চীৎকার শুনতে পেল অরিন্দম।

যাও, নিকাল যাও, বলছে মিঠু স্পষ্ট স্বরে। এই বুলিটা পরেশই তাকে শিখিয়েছে। কোন অচেনা লোক এলে একথাটা মিঠু বার বার বলতে থাকে।

কাকে চাই? এবার পরেশের গলা শুনতে পেল অরিন্দম।

আমি টেলিফোন অফিস থেকে আসছি। উত্তর দিল লোকটা।

ড্রয়ারের ভেতর থেকে রিভলবারটা বার করল অরিন্দম। তারপর দেয়ালের গা ঘেঁষে একটু একটু করে এগোতে লাগল। টেলিফোন তার চালু রয়েছে সুতরাং অফিস থেকে শুধু শুধু লোক আসবে না। হরতন এসেছে তার ঘরে। লোকটার সামনে দাঁড়াল অরিন্দম। হ্যাংলা, শুঁটকো চেহারা। একটা খাকী প্যান্ট আর সার্ট পরনে।

(ক্রমশঃ)

কালো আর ধলো

শ্রীশিশির নিয়োগী

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন "কালো আর ধলো বাহিরে কেবল, ভিতরে সবাই সমান রাঙা।" কিন্তু পৃথিবীর তথাকথিত সভ্য দেশের মানুষ যাদের গায়ের রঙ সাদা তারা কিন্তু এটা মনে প্রাণে মেনে নিতে পারছে না। সাদা কালোর বিবাদ চলেছে তাই যুগ যুগ ধরে—কিছুদিন আগে আমেরিকার নিগ্রো নায়ক মার্টিন লুথার কিং সাদা কালোর লড়াইএ প্রাণ হারালেন।

পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে গায়ের রঙের হিসাবে চারভাগে ভাগ করা যায়। শ্বেতকায় সাহেবরা, তামাটে রংএর ভারতীয় ও তাদের সমগোত্রীয়েরা, পীত বা হলুদ রংএর চীনা—মংগোলীয় শ্রেণীর মানুষেরা এবং কালো অর্থাৎ নিগ্রো ও তৎসম সম্প্রদায়ের লোকেরা।

ইউরোপীয় সাহেবরা সাদা চামড়ার বড়াই করলে কি হবে—তারা যদি তাদের ইতিহাসের কয়েক লক্ষ বছর আগে ফিরে যেতে পারে দেখবে যে তাদের পূর্বপুরুষ কৃষ্ণ বর্ণ, গায়ে লোমওয়ালা 'হোমোনিড'দের সংগে বর্তমান কালের কৃষ্ণকায় মানুষদের পূর্বপুরুষদের কোন তফাৎ ছিল না—তারা একই ছিলো। তারা সবাই ভূমধ্য সাগরের কাছাকাছি বা উত্তর আফ্রিকার কতকগুলি অঞ্চলে এক সংগেই থাকতো—পরে যে যার মত নানা দিকে চলে যায়; এদের মধ্যে যারা উত্তরে ইউরোপ অঞ্চলে চলে গিয়ে আস্তানা বেঁধেছিল তারা ভবিষ্যৎকালে সাদা চামড়া সাহেব হ'য়েছে।

মানুষের চামড়ার মধ্যে এক ধরনের রং থাকে—ঘোর কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের চামড়ায় থাকে 'মেলানিন', পীতবর্ণ লোকের চামড়ায় থাকে কেরাটিন এবং এই দুই রং মিলে তৈরী হয় বাদামী বা তামাটে মানুষের চামড়ার রং। সাদা মানুষদের চামড়ায় মেলানিনের পরিমাণ খুব কম থাকে। চামড়ায় মেলানিন বেশী থাকলে সূর্য্যের মধ্যের আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি শরীরে ঢুকতে পারেনা সহজে। এই রশ্মি শরীরের মধ্যে ভিটামিন-ডি উৎপন্নে সাহায্য করে। সাদা চামড়া মানুষেরা তাই ভিটামিন-ডি এর অভাবে খুব কমই পড়ে। তাই তারা হাড়ের অপুষ্টি রোগ যেমন বাঁকা পা, মোচড়ানো শিরদাঁড়া এই সব রোগে কম ভোগে। বাচ্চাদের রিকেটিও কম হয়। কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রোরা এই সব রোগে বেশী ভোগে। আবার শ্বেতকায় সাহেবদের মত—শরীরের মধ্যে ভিটামিন-ডি এর বাড়াবাড়ির দরুন ধমনীর মধ্যে ক্যালসিয়াম জমে যাওয়া বা শরীরের মধ্যে পাথুরী হওয়া এই সব রোগে নিগ্রোরা কম ভোগে।

সাধারণ খাদ্যের মধ্যে ভিটামিন-ডি থাকেনা কড মাছের লিভারে ভিটামিন-ডি থাকে।

দৈনিক একজন লোকের শরীরে ১ লক্ষ ইউনিট ভিটামিন-ডি দরকার। গরম দেশে একজন নিগ্রো খোলা আকাশের নীচে কাজ করলে সূর্য্যের আলোর মাধ্যমে দিনে ৮ লক্ষ ইউনিট ভিটামিন-ডি শরীরে তৈরী করতে পারে। কিন্তু চামড়ার মধ্যে মেলানিন থাকার ফলে তা সম্ভব হয় না। কৃষ্ণকায় লোকে সূর্য্যের আলোর শতকরা ১৮ ভাগও শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাতে পারে না অথচ ইউরোপীয়রা শতকরা ৬৪ ভাগ রশ্মি শরীরের মধ্যে নিয়ে নেয়। অবশ্য বেশী রশ্মি শরীরে নেবার কুফলও যথেষ্ট।

পূর্বপুরুষরা উত্তর আফ্রিকা বা ভূমধ্য সাগরের কাছাকাছি গরম অঞ্চলে বাস ক'রে গায়ের রং পুড়িয়ে ফেললেও তাদের বংশধরদের মধ্যে যারা ঠাণ্ডা দেশে গিয়ে বসবাস সুরু করে দিল তারা সূর্য্যরশ্মির অভাবের জন্য 'রিকেট' নামে একধরণের মৃদু অসুখের কবলে পড়ায় চামড়ার রং ক্রমে ক্রমে সাদা হ'য়ে গিয়েছিল। অথচ এসকিমোরা আরও ঠাণ্ডা দেশে বাস করেও গায়ের রং মোটামুটি বাদামী রেখেছে। অবশ্য এরা মাছের ও মাছের লিভারের তেল খায়। যার ফলে রিকেট রোগে আক্রান্ত হয়না।

বছরের বিভিন্ন সময়ে আকাশে সূর্য্যের অবস্থান ও সূর্য্যরশ্মির তারতম্যের ফলে একই জায়গার মানুষের চামড়ায় অর্থাৎ গায়ের রং কম বেশী কালো হয় বিভিন্ন ঋতুতে। শীতের দিনে মানুষ ফ্যাকাসে দেখায়—গরমের দিনে শরীরের কালোটা কুচকুচে হয় বেশী—। ককেশাসদের নাকি শীতের দিনে দেখলে ফর্সা সাহেব মনে হয়, আবার সেই সাহেবরাই গরমকালে পুনর্মূষিক কৃষ্ণকায় ককেশাস হ'য়ে দেখা দেয়।

প্রসাধন করে গায়ের রং এর পরিবর্তন আনা যায় না—প্রলেপন দেয়া যায় মাত্র। বরং অতিমাত্রায় সাবান পাউডার মুখে বা গায়ে লাগালে উল্টো ফলটাই ফলে। অনেকে বলেন সাবানের মধ্যেকার কেমিক্যালগুলি চামড়ার রং কে ফর্সা করার বদলে কালোই ক'রে দেয় বেশী। নোনা জলে গায়ের রং যেটা কালো হয় সেটা অস্থায়ী।

গায়ের রং নিয়ে মাথা খারাপ করার কিছু নেই—ক'রেও কিছু লাভ হয় না।

গদু চক্কোত্তির গল্প

শ্রীপ্রফুল্ল রায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

নৌকো ডুবি হয়ে স্রোতে ভাসতে ভাসতে মাইল কুড়ি দূরের এক চরে গিয়ে যখন ভিড়লাম তখন প্রাণটা কোন রকমে টিকে আছে।

দিন দুই পর একটু সুস্থ হলে চরের লোকেরা আমাদের বাড়ি পৌঁছে দিলে; বাড়িতে তখন কান্নাকাটি পড়ে গেছে।

বড়মামা ছোটমামাকে খুব মারলেন, আমাকে বকলেন। দিদিমা আমাকে বললেন, 'আর একটা দিনও তোমাকে রাখব না। কোনদিন বেঘোরে মরে থাকবে, সারা জীবনের জন্যে আমি দোষী হয়ে থাকব। তার চাইতে যাদের ছেলে তাদের কাছে গিয়েই থাকো।'

সেজ মামা বললেন, 'কি শয়তান ছেলে বাবা, বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে নিশ্চিন্ত থাকি। আর ওদিকে জানলার গরাদ খুলে বেরিয়ে যায়!'

আমাদের বাইরে যাবার কায়দাটা যে সবাই ধরে ফেলেছে তা বলার বোধ হয় দরকার নেই।

যাই হোক ছোটমামাকে ছেড়ে কলকাতায় যাবার কথায় চোখে জল এসে গেল; অনেক কাঁদলাম। কিন্তু দিদিমা অটল। তিনি আমাকে পাঠাবেনই।

কলকাতায় তো যাব? সঙ্গে করে নিয়ে যাবে কে? বড়মামা, মেজমামা জমিদারির কাজে ব্যস্ত। সেজমামা ঢাকায় চাকরি করেন, তাঁর ছুটি নেই। বাকি রইল ছোটমামা; তার ভরসায় তো আর পাঠানো যায় না।

কী করা যায়, কী করা যায়—সবাই যখন ভাবছেন এমন সময় গদু চক্কোত্তি এসে হাজির। দিদিমা তাকে ধরে বসলেন। সব শুনে গদু বললে, ভাড়ার টাকা আর পথের খাওয়া-খরচ দিলে সে আমাকে দিয়ে আসতে রাজী।

দিদিমা বললেন, 'কি আশ্চর্য্য, খরচ নিশ্চয়ই দেব। না দিলে তুমি যাবে কেন?

পরের দিনই আমরা কলকাতা রওনা হলাম। মামা বাড়ি থেকে নৌকোয় করে প্রথমে আসতে হয় মুন্সীগঞ্জে, সেখান থেকে স্টীমারে গোয়ালন্দ, গোয়ালন্দ থেকে ট্রেনে কলকাতা।

আসার সময় দিদিমা পাঁচ সের ফিনফিনে ভালো, চিঁড়ে, দু সের ক্ষীর, তিরিশটা বড় বড় অমৃতসাগর কলা, দু সের পাটালী গুড় আর সের দেড়েক মাথা সন্দেশ দিয়ে

দিয়েছিলেন। গোয়ালন্দ পৌঁছুতে পৌঁছুতেই তা শেষ হয়ে গেল। এর ভেতর আমি পেয়েছি মাত্র দুটো কলা, চার মুঠো চিড়ে, একটুখানি সন্দেশ আর এক চিমটি ক্ষীর। বাকিটার গতি কী হয়েছে নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলতে হবে না।

আগেই আমার সঙ্গে খাতির হয়েছিল। গোয়ালন্দে আসতে আসতে প্রাণের অনেক কথা বলেছে গদু চক্কোত্তি। কোথায় কোন ভোজের আসরে ক'সের ক্ষীর খেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল, কোথায় একবার খাওয়া শেষ হবার পর আঁচিয়ে এসে সবার অনুরোধে আবার গোড়া থেকে বেগুন ভাজা দিয়ে শুরু করে দই মিষ্টি পর্যন্ত খেয়েছিল ইত্যাদি ইত্যাদি সব গল্প।

আরো একটা প্রাণের কথা বলেছে গদু চক্কোত্তি, 'জানিস নান্টু, পৃথিবীতে শেষ ইলিশ মাছটা, শেষ পাঁঠাটা বেঁচে থাকতে আমি মরতে চাই না।'

যাই হোক গোয়ালন্দে নেমেই গদু চক্কোত্তি বললে, 'বড্ড খিদে পেয়ে গেল রে নান্টু; কি করা যায় বল্ দিকি ?'

অতগুলো চিড়ে-কলা-ক্ষীর-সন্দেশ ধ্বংস করার পরও খিদে পেতে পারে, এ যেন ভাবা যায় না। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

কি বলতে যাচ্ছিল গদু চক্কোত্তি, বলা হল না। গোয়ালন্দে রেল লাইনের ধার ঘেঁষে সারি সারি অনেক হোটেল ছিল সে সময়। রেল বা স্টীমার থেকে কেউ নামলেই হয়, হোটেলের দালালেরা একেবারে ছেঁকে ধরত, আমাদেরও তারা ধরলে।

সবাই যে যার হোটেলের গুণ জাহির করতে ব্যস্ত। কার হোটেলে কত পদ রান্না হয়, কত ভাল রান্না হয় গড়গড়িয়ে পদ্য পড়ার মতন দালালগুলো বলে যেতে লাগল আর সমানে হাত ধরে টানাটানি শুরু করলে।

গদু চক্কোত্তি বললে, 'ট্রেনের তো এখনও দেরি আছে। পেটটা জ্বলছে রে নান্টু; চল্ চাট্টি খেয়ে নি। সেই কলকাতায় পৌঁছুবার আগে তো আর ভাত জুটবে না।'

আমি চুপ করে রইলাম।

সবাইকে তাড়িয়ে একটা দালালকে রাখলে গদু চক্কোত্তি। বললে, 'তোমার হোটেলে কি কি রান্না হয়েছে শুনি ?'

দালাল বললে, 'আজ্ঞে বাবু, এখন ইলিশ মাছের দিন। ইলিশ মাছ ভাজা, ইলিশ মাছ ভাতে, ইলিশ মাছের ঝোল, ঝাল, অম্বল। শেষ পাতে দই; ভাতটা হচ্ছে খাঁটি বালাম চালের। পাতা, মাটির গেলাস আর লেবু 'ফিরিতে' (ফ্রী)।'

'ভাল। তা খরচ খরচা কি রকম পড়বে ?'

'খাচ্ছে আর তারিফ করছে গদু চক্কোত্তি।'

'আজ্ঞে বাবু পেট চুক্তি একেক জনের চার আনা করে।'

'পেট চুক্তিটা কী ব্যাপার?'

'আজ্ঞে যত ভাত আর যত মাছ খেতে পারেন সব ঐ চার আনাতেই হবে।'

গদু চক্কোত্তির চোখ চকচকিয়ে উঠল, 'ঠিক তো? পরে আবার বেশি চাইবে না?'

'না বাবু' দালালটা বললে, 'সারা গোয়ালন্দে যত হোটেল আছে সব জায়গায় ঐ এক রেট।'

'বেশ। কিন্তু বাবু একটা কথা, সারা রাত স্টীমারে এসেছি; একটুও ঘুম হয় নি। চান করতে পারলে শরীরটা ঝরঝরে লাগত।'

'আমাদের হোটেলে চানের ব্যবস্থা আছে। আসুন, আসুন—'

'চল।'

খুব আদর করে আমাদের নিয়ে চলেছে দালালটা। কিন্তু সে তো জানে না হোটেলের কি সর্বনাশ ঘটাতে চলেছে!

একটু পরেই হোটেলে পৌঁছে গেলাম। টিনের চাল, বাঁশের বেড়া আর সিমেন্টের মেঝে। সামনে সাইন বোর্ডে লেখা:

'পবিত্র হিন্দু হোটেল
ভদ্র মহোদয়দিগের খাইবার বন্দোবস্ত আছে।
মহিলাদিগেরও ব্যবস্থা আছে।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।'

হোটেলে গিয়েই চান সারা হল। তারপর পাশাপাশি আসনে আমাকে নিয়ে খেতে বসল গদু চক্কোত্তি।

এ জাতীয় হোটেল যেমন হয়, মেঝেতে সারি সারি আসনে খাবার ব্যবস্থা।

একধারে তক্তপোষের ওপর ম্যানেজার বসে আছে ; তার সামনে ক্যাশ বাক্স। খদ্দেররা খেয়ে তার কাছে পয়সা দিয়ে চলে যাচ্ছে।

ম্যানেজারের চোখ দুটো গোল গোল ; থলথলে খালি গা ; কালো কুচকুচে রঙ ; মাথায় প্রচুর তেল ঢেলে চুলগুলোকে খানিক হেলিয়ে দেওয়া হয়েছে ; ডান কানে সোনার মাকড়ি। এর চোখকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব।

আমরা যখন খেতে বসলাম তখন আরো ক'জন খাচ্ছে। আমাদের সামনে কলার পাতায় ধবধবে সাদা ভাত, দু-খানা করে ইলিশ মাছ ভাজা আর দু-খানা করে ঝোলের মাছ দিয়ে গেল ঠাকুর। আমি পাতে হাত দিতে যাব, গদু চক্কোত্তি বললে, 'উঁহু-উঁহু, হাত দিস নে। তুই ছেলেমানুষ, অতগুলো মাছ খেলে পেট ছাড়বে ; শেষে রাস্তায় তোমায় নিয়ে বিপদে পড়ি আর কি।' বলেই ছোঁ মেরে এক টুকরো ভাজা আর এক টুকরো ঝোলের মাছ আমার ভাগ থেকে নিজের পাতে নিয়ে গেল। তারপর শুরু হল খাওয়া।

ভাত আনতে আনতে ঠাকুর ছাখে মাছ শেষ করে বসে আছে গদু চক্কোত্তি ; মাছ নিয়ে ফিরে এসে ছাখে ভাত উধাও।

খাচ্ছে আর তারিফ করছে গদু চক্কোত্তি। ম্যানেজারকে ডেকে মাথা নেড়ে নেড়ে বলছে, 'ম্যানেজার, বেশ রান্না হয়েছে। চমৎকার।'

আগেই বলেছি, খেতে খেতে পনের কুড়ি মিনিট পর পর কাপড়ের বাঁধন বুকের কাছ থেকে কোমরের দিকে নামিয়ে আনে গদু চক্কোত্তি ; বাঁধনটা নাভি থেকে এক ইঞ্চি নামলে তার খাওয়া শেষ হয়।

খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে হ্যাঁচকা টানে বাঁধন নীচের দিকে নামাচ্ছে গদু চক্কোত্তি।

ওদিকে খাওয়ার বহর দেখে ম্যানেজারের নোয়ানো চুল সজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে উঠেছে ; চোখ দুটো পানতুয়ার মতন গোল্লা পাকিয়েছে। ঠাকুরটা যতবার ভাত আর মাছ আনতে ছোটাছুটি করছে তাতে পঁচিশ মাইলের একটা ম্যারাথন রেস শেষ করতে পারত। অন্য খদ্দের যারা খাচ্ছিল, খাওয়া ভুলে কান পর্যন্ত হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

ম্যানেজার হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলে, 'বাবু, লাইনে কলকাতার ট্রেন দিয়েছে। একটু পরেই কিন্তু ছেড়ে দেবে।

অন্য খদ্দেররা পড়ি মরি করে ছুটলে। গদু চক্কোত্তি কিন্তু অবিচলিত। শান্ত গলায় বললে, 'ছাড়ুক। আজ না হয় নাই গেলাম, কালই কলকাতায় যাব।'

চালাকিটা কাজে লাগল না দেখে মুখখানা প্যাঁচার মতন করে বসে রইল ম্যানেজার।

আরো কিছুক্ষণ খাওয়ার পর ঠাকুর বললে, 'আর ভাত নেই। নতুন হাঁড়ি চেপেছে, ভাত হতে দেরি হবে।'

গজু চক্কোত্তি বললে, 'তা হোক ; আমি ততক্ষণ বসি। নাভি পর্যন্ত বাঁধন নেমেছে ; আরো এক ইঞ্চি না নামলে আমি উঠতে পারব না। গুরুর বারণ।'

যতক্ষণ না ভাত হল ততক্ষণ শুকনো কড়কড়ে হাতে বসে বসে ম্যানেজারের সঙ্গে রাজ্যের গল্প করে গেল গজু চক্কোত্তি। সে একাই বকলে ; ম্যানেজার শুধু হুঁ-হাঁ করে গেল। ম্যানেজারের মুখ দেখে মনে হল তার মাথায় বাজ ভেঙে পড়েছে।

নতুন করে ভাত নামবার পর আবার খাওয়া শুরু হল। পুরো সাড়ে তিন সের চালের ভাত আর একশ' বিরানব্বুই টুকরো মাছ খাবার পর কাপড়ের বাঁধন শেষ ইঞ্চিটা নামল। লম্বা ঢেকুর তুলে আঁচিয়ে এল গজু চক্কোত্তি তারপর ট্যাঁক থেকে একটা আধুলি বার করে ম্যানেজারের দিকে ছুড়ে দিল। আধুলির বদলে দুটো চড় কষালে ম্যানেজার বুঝি বেশি খুশী হত।

পয়সা চুকোবার পর আমাকে দেখিয়ে গজু চক্কোত্তি ম্যানেজারকে বললে, 'এই ছোঁড়াটাকে কলকাতায় ওর মা-বাপের কাছে রেখে আসি। ফেরবার পথে ভাবছি তোমার এখানে দু-চার দিন থেকে যাব। তোমার ঠাকুর রাঁধে বড় ভাল।'

শুনতে শুনতে হঠাৎ দু হাত জোড় করে ম্যানেজার বললে, 'দু-চার দিন কেন কর্তা, পুরো একমাসই থাকবেন। আমি তক্তপোষ দেব, মশারি দেব, বিছানা-বালিশ দেব, থাকবার ঘর দেব। কিন্তু খাওয়াটা কর্তা ঐ হোটেলে।' সামনের একটা হোটেল দেখিয়ে দিলে সে। আবার বললে, 'ঐ হোটেলটা নতুন হয়ে আমার একটু অসুবিধে করেছে ; এক মাসে যদি তুলে দিয়ে যেতে পারেন আমার বড্ড উপকার হয়।'

মুচকি হেসে বরদানের মতন হাত বাড়িয়ে গজু চক্কোত্তি বললে, 'তাই হবে।'

পরে শুনেছি আমাকে কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে সেই হোটেলটা তুলে দিয়ে গিয়েছিল গজু চক্কোত্তি। এক মাস লাগে নি ; সাত দিনেই কাজ চুকিয়ে ফেলেছিল।

আমার মতে গজু চক্কোত্তির এটাই শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

মিঠুন

শ্রীবিকাশ বসু

বড়মাসিমাকে দেখে মিঠুন অবাক হয়ে গিয়েছিল। এই বড়মাসিমা। তার মায়ের চেয়ে কোথায় বড় হবেন, তা নয় মাথায় বড়মাসিমা মায়ের চেয়ে অন্ততঃ তিন ইঞ্চি ছোট। বড়মাসিমা আসবেন শুনে থেকে অবধি সে ভেবেছে মাথায় বড়মাসিমা অন্ততঃ মায়ের চেয়ে তিন ইঞ্চি লম্বা তো হবেনই। তিন ইঞ্চি, কারণ তার ছোট বোন বিবির চেয়ে সে নিজে তিন ইঞ্চি বেশি লম্বা। আবার বিবির ছোট তিতির বিবির চেয়ে তিন ইঞ্চি খাটো।

মা বলেছিলেন, মিঠুন, বড়মাসিমাকে প্রণাম করো।

বড়মাসিমা ছোটখাটো মানুষ হলেও মিঠুন তাঁকে চুপ করে একটা প্রণাম করে দেয়াল ঘেঁষে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল।

মা বলেছিলেন, বড়দি, ছেলেটার লেখাপড়ায় একটুও মন নেই। তুমি ওকে আশীর্বাদ করো। তোমার মত যেন ওর লেখাপড়ায় মাথা হয়।

মিঠুন এর আগে বড়মাসিমাকে আর দেখেনি। শুধু মায়ের মুখে গল্প শুনেছিল তার বড়মাসি নাকি পড়াশুনোয় খুব ভালো ছিলেন। স্কুলে-কলেজে বরাবর বৃত্তি পেয়েছিলেন।

বড়মাসিমা কয়েকটা দিন মিঠুনদের বাড়িতে কাটিয়ে তাঁর শ্বশুরবাড়ি জামালপুরে চলে গেলেন। যাবার আগে তিনি নিশ্চয়ই মিঠুনকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করে গিয়েছিলেন।

কেন না তিনি চলে যাবার পর থেকেই দেখা গেল মিঠুন লেখাপড়ায় আশ্চর্যরকম ভালো হয়ে গেছে, পরীক্ষায় খুব ভালো ফল করছে।

এখন তো সে প্রায়ই তার বাবাকে পরীক্ষা করে এবং সে পরীক্ষায় তার বাবা প্রায়ই ফেল করেন।

মিঠুনের সঙ্গে তার বাবা পারবেন কেন? রামায়ণ মহাভারত সে খুঁটিয়ে পড়েছে। 'সাত্যকী ধৃষ্টদ্যুম্নের কে হয়'? এ জাতীয় প্রশ্ন করলে বাবা একেবারে শূন্য পেয়ে যান। তা ছাড়া বাংলাটা সে বেশ ভালোই শিখেছে। রাজশেখর বসুর বাংলা অভিধান 'চলন্তিকা' তার মুখস্থ। তার বাবা হয়ত বললেন, পরশুদিন আমরা চিড়িয়াখানায় যাবো।

মিঠুন তৎক্ষণাৎ তার বাবার ভুল সংশোধন করে দিয়ে বলে, 'পরশু দিন' আবার কি বলো 'পরশু'। সংস্কৃত 'পরশ্ব' শব্দ থেকে কথাটা এসেছে।

বাবা হয়তো বললেন, ঐ হ'ল। পরশু যা, পরশু দিনও তাই।

মিঠুন তখুনি বলে উঠবে, তাহলে 'কাল দিন' বলো না কেন?

বাবার এবার হার মানা ছাড়া উপায় নেই। তিনি হাসতে হাসতে বলবেন, আচ্ছা বাবা তোর কথাই ঠিক। পরশু আমরা চিড়িয়াখানায় যাবো। এবার হয়েছে?

মিঠুন এবারেও বলবে, না হয়নি। চিঁড়িয়াখানা নয়, চিড়িয়াখানা। চিড়িয়া মানে পাখি। আর চিড়িয়া বলে কোন শব্দ নেই। অভিধানে (অন্ততঃ রাজশেখর বসুর অভিধানে) কোন্ শব্দ আছে না আছে মিঠুনের তা জানা আছে।

প্রথম আলাপেই মিঠুন তার পিসতুতো বোন সবিতাকে বলেছিল, কে তোমার নাম রেখেছিল?

সবিতা বলল, কেন? আমার ন'কাকু।

মিঠুন বলল, তোমার ন'কাকা কিছু জানেন না। 'সবিতা' মেয়েদের নাম রাখা ঠিক নয়। ওটা পুংলিঙ্গ শব্দ, মানে সূর্য। তুমি কি পুরুষ?

মিঠুন সবিতাকে আরও অনেক কিছু বলতে যাচ্ছিল। বলতে যাচ্ছিল যে, পিতৃ থেকে যেমন পিতা, সবিতৃ থেকে তেমনি সবিতা। সবিতার স্ত্রীলিঙ্গে 'সবিত্রী', সাবিত্রী নয় কিন্তু। এই সব।

কিন্তু তার আগেই সবিতা তার ন'কাকুর অসম্মানে কেঁদে কেটে একেবারে একাকার। নিজের নামটাকে এমনভাবে কেউ নস্যাৎ করে দিলে কার না কান্না পায়। অনেক দিন পর্যন্ত সবিতা মিঠুনের সঙ্গে কথা বলেনি। তারপর অবশ্য তাদের মধ্যে একটা রফা হয়ে যায়। সবিতা মেনে নেয়, বেশ আমি পুরুষ আছি, আছি। তোমার মত মেয়ে নই যে ঘরে বসে মেয়েদের মত শুধু বই পড়ব। দস্তুরমত খেলাধুলো করি।

মিঠুন হয়ত একটু বেশি বই পড়ে। সেটা কি অন্যায়? সে হয়তো অনেকের চেয়ে বেশি জানে। সেটা কি তার অপরাধ?

বাবা একদিন ছোটবোন তিতিরকে গল্প বলছিলেন। সীতাকে হারিয়ে রাম-লক্ষ্মণ তো শোকে একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়ল।

মিঠুন একটু দূরে জানালার ওপর বসে গল্পের বই পড়ছিল। সে এখন আর তিতিরের মত গল্প শোনে না, মোটা মোটা গল্পের বই পড়ে। সে বই থেকে মুখ না তুলেই বাবাকে বলল, মুহ্যমান নয়, শোকে মোহ্যমান বলো। মুহ্যমান কথাটা ভুল। 'চলন্তিকা' খোলো। চলন্তিকা খোলো।

মিঠুনের বাবা বললেন, পারি না বাবা তোর মত টিকিধারী পণ্ডিতের সঙ্গে! সব সময় কি শুদ্ধ করে কথা বলা যায় নাকি?

মিঠুনের মায়ের কিন্তু খুব আনন্দ। তিনি বলেন, দিয়েছে তো হারিয়ে। সেদিন

ঠাকুরপোকেও হারিয়ে দিয়েছিল।

সেদিন ছোটকা তিতিরকে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করে খুব ক্রেডিট নিচ্ছিল। মিঠুন ভাবল, দাঁড়াও, ছোটকাকে ঠকাতে হবে। সে নিজেই একটা ধাঁধা বানিয়ে ছোটকাকে বলল, আচ্ছা বলো তো ছোটকা, কোন কাকা জলে ভর্তি ?

ছোটকা আকাশ পাতাল অনেক ভাবলেন। রাঙাকাকা, ন'কাকা, ফুলকাকা, কালোকাকা, কুচোকাকা। নাঃ, কোন কাকাই জলে ভর্তি নয়। ছোটকাকা নিজে তো ননই।

মিঠুন বলল, কি ছোটকা, পারলে না তো। টিটিকাকা। টিটিকাকা হচ্ছে হ্রদ। দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে আছে।

ছোটকা বললেন, ও হ্যাঁ হ্যাঁ। মনে পড়েছে বটে। ওঃ সেই কোনকালে পড়েছি।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। তিতির হাততালি দিয়ে উঠল, ছোটকা হেরো, ছোটকা হেরো।

এই বিপদে ছোটকা আর কী করবেন। লজেন্স দিয়ে তিনি তিতিরের মুখ বন্ধ করলেন। মুখের মধ্যে লজেন্স থাকায় তিতির আর সেদিন ছোটকার কলঙ্ক প্রচার করতে পারেনি।

মিঠুনকে নিয়ে মায়ের খুব গর্ব। তিনি ভাবেন অথচ এই মিঠুন এই সেদিনও কী বোকা ছিল।

তখন মিঠুনের ঠাকুমা বেঁচে। মিঠুনের মা ও ছোটকাকিমা গ্রীষ্মকালের বিকেলে ছাদে বেড়াচ্ছিলেন। মায়ের হাত ধরে ছিল মিঠুন আর তিতির ছিল ছোটকাকিমার কোলে। তিতির তখন খুব ছোট।

গ্রীষ্মকালের বিকেলে মিঠুনদের ছাদটা খুব সুন্দর হয়। দক্ষিণের আম বাগানের মধ্যে দিয়ে নরম হাওয়া আসে। ছাদের ওপর গন্ধরাজের একটা ডাল ঝুঁকে পড়েছে। ছোট বাগান থেকে কাঁঠালি চাঁপারও গন্ধ আসে।

বেড়াতে বেড়াতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এলে মিঠুনের মা ছোটকাকিমাকে বললেন, আর নয় ছোট। এর পরে ছাদ থেকে নামলে মায়ের বকুনি খাব। মায়ের অর্থাৎ মিঠুনের ঠাকুমার।

বকুনি খাবার কথা শুনে মিঠুনও বায়না ধরল, মা, আমি বকুনি খাবো।

মা ও ছোটকাকিমা প্রথমে হাসলেন তারপর বললেন, আচ্ছা খাবি' অখন। এখন নিচে চলো।

মা ও ছোটকাকিমা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগলেন আর মিঠুনও কাঁদতে লাগল, মা, আমি বকুনি খাবো।

মা রেগে বললেন, হ্যা হ্যা খাবি। এখন নামত।

'ছোটকাকা তাড়াতাড়ি তিতির মুখে একটি লজেন্স দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিলেন।'

ছোটকাকিমা বললেন, বকুনি খেতে যে কী মিষ্টি তোকে কী বলব মিঠুন।

বকুনি খাবার জন্য মিঠুনের কান্না বেড়েই চলল। এখুনি তাকে বকুনি কিনে দিতে হবে।

মিঠুনরা যখন সিড়ি দিয়ে নিচে নেমেছেন, ঠিক সময় উঠোনে ছানাবড়ার ঝাকা নিয়ে এক ফেরি-অলা হাজির।

ছোটকাকিমা বুদ্ধি করে বললেন, ঐ তো বকুনি এসে গেছে। দাও তো একটাকার।

ফেরিঅলা এক টাকার ছানাবড়া ওজন করে দিল। মা একটা ছানাবড়ার আধখানা ভেঙে মিঠুনের হাতে দিয়ে বললেন, নে, বকুনি খা।

মিঠুন খেয়ে দেখল ছোটকাকিমার কথা মিথ্যে নয়। বকুনি খেতে খুবই মিষ্টি।

সেই থেকে মিঠুনদের বাড়িতে ছানাবড়ার নাম বকুনি। ছানাবড়া কেউ বলে না ওদের বাড়িতে। বাড়িতে অতিথি এলে মা বলেন, দু'টাকার বকুনি কিনে আন না ঠাকুরপো। ছোটকাকা তৎক্ষণাৎ দু'টাকার ছানাবড়া কিনে এনে হাজির করে।

আজ আবার অনেক দিন পরে বড় মাসিমা তাদের বাড়িতে এসেছেন। উপলক্ষ হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষায় মিঠুন বৃত্তি পেয়েছে। বাড়িতে উৎসব পড়ে গেছে।

মিঠুন মাথা নিচু করে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। বড় মাসিমা যদিও মাথায় আর বাড়েন নি, মায়ের চেয়ে তিন ইঞ্চি ছোটই আছেন, তবু মিঠুনের আজ তাঁকে বড়ই লাগছে।

মা মিঠুনকে বললেন, যা এক্ষুনি পাঁচ টাকার বকুনি কিনে নিয়ে আয়।

বড় মাসিমা মিঠুনকে আদর করে বললেন, কি রে তুই এখনো বকুনি খাস?

অক্সিজেনের কথা

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

হাওয়ায় যে অক্সিজেন ভেসে বেড়ায় তা আমরা কেউ দেখতে না পেলেও কে না জানি আমরা অক্সিজেনের দৌলতেই নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছি। পৃথিবীর জলে স্থলে যেখানেই যাও সেখানেই তোমাদের অক্সিজেন দরকার। সমুদ্রের তলায় ডুব দেবে, অক্সিজেনের সিলিণ্ডার থেকে অক্সিজেন তোমার ডুবুরীর পোষাকের ভেতর শরীরটার যেমন দরকার, তেমনই অক্সিজেনের দরকার যদি তুমি পাহাড়ে চড়ার দুঃসাহসিক অভিযানে নাম লেখাও।

তোমাদের মধ্যে যারা বিজ্ঞানের ছাত্র ছাত্রী তারা নিশ্চয় কোন টেস্টটিউবে সোডিয়াম পারঅক্সাইড কিছুটা নিয়ে কয়েক ফোঁটা জল দিয়ে অক্সিজেন গ্যাস তৈরী করেও থাকবে। অক্সিজেন নিয়ে নানা মজার মজার পরীক্ষা করা যেতে পারে। সেই সব পরীক্ষার কথাই এখন শোনা যাক।

অক্সিজেন বায়বীয় পদার্থ, কিন্তু এই বায়বীয় পদার্থটিকে তরল পদার্থে রূপান্তরিত করা যায় বিজ্ঞানাগারে। আর এই তরল অক্সিজেন কিন্তু নাড়াচাড়া করা মোটেই সুবিধের নয়। তরল অক্সিজেনের তাপাঙ্ক হল শূন্য তাপের তিনশ ডিগ্রী নীচে, তার অর্থ এই তরল অক্সিজেন এত ঠাণ্ডা যে কোন কিছু এতে পড়লে তা জমে থাকে। ধর একটা ফুল তুমি এই তরল অক্সিজেনের জারের মধ্যে ফেলে দিয়ে একটু পরে ফুলটা তুলে টেবিলে রাখতে গেলে। উহুঁ অবাক হয়ো না মোটে, তোমার হাত থেকে পড়ে ফুলটা নিশ্চিত কাচের মত টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে।

বিজ্ঞানাগারে সাধারণ বাতাসকে ঠাণ্ডা করে প্রচণ্ড চাপে তরল অবস্থায় আনা হয়। সেই তরল বায়ুতে থাকে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন। নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন সেই তরল বায়ু থেকে আংশিক বাষ্পীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে পৃথক করা হয়। কম খরচায় অক্সিজেন তৈরী করার এটিই প্রচলিত পন্থা।

তোমরা অনেকেই জান অক্সিজেন নিজে জ্বলে না, অপরকে জ্বালায়। তাই শুধু অক্সিজেনের ভেতর আগুন দিলে কোন ভয় নেই কিন্তু অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন মিশিয়ে আগুন দাও, যে ছোটখাটো বিস্ফোরণ হবে তাতেই তোমাদের ভয় ধরে যাবে।

যারা হাতে কলমে অক্সিজেন তৈরী করেছ, তারা দেখে থাকবে একটা জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি নিভিয়ে দিয়ে কাঠিটা আগুনের ফুলকি সুদ্ধ অক্সিজেন ভর্তি টেষ্ট টিউবের ভেতর ধরলে কাঠিটি জ্বলতে থাকবে কিন্তু টেষ্ট টিউবের বাইরে যেই আনবে কাঠিটা, অমনি তা নিবে যাবে।

তরল অক্সিজেনও এমনি অপরকে জ্বালার কাজে সাহায্য করে থাকে। এক টুকরো তুলো নীল আকাশের মত টলটলে রঙের তরল অক্সিজেনের ভেতর ডুবিয়ে এনে জেলে দাও, আতস বাজীর মত উজ্জ্বল হয়ে তুলোটা জ্বলবে কিন্তু যত চেষ্টাই কর তরল অক্সিজেনকে তুমি জ্বালাতে পারবে না।

তরল অক্সিজেনের আরও কিছু চমৎকার ক্ষমতা আছে। তোমরা ষ্টীম ইঞ্জিনের মডেল দেখে থাকবে। এখন ষ্টীম ইঞ্জিনের বয়লারে যদি জলের বদলে তরল অক্সিজেন পুরে দাও তাহলে ইঞ্জিনটা ষ্টীমের বদলে তরল অক্সিজেন থেকে উদ্ভূত বাষ্পের চাপে চালু হয়ে যাবে।

তরল অক্সিজেন সব সময় টগবগ করে ফোটে, আর ক্রমশঃ বাষ্প হয়ে উড়ে যেতে থাকে, তাই এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই কি বল?

তোমরা পেরেক ঠুকতে লোহার হাতুড়ী খুঁজবে নিশ্চয়। কিন্তু এমন একটা হাতুড়ী নিয়ে আসা হল, যার মুণ্ডুটা পারদের ছাঁচে তৈরী আর তরল অক্সিজেনে ডুবিয়ে শক্ত করে নেওয়া হয়েছে, আর যদি সেই হাতুড়ীটাই দিয়ে বিজ্ঞানের মাষ্টারমশায় ছোট ছোট পেরেক দিব্যি পুঁতে ফেলেন কাঠের ভেতরে, তাহলেও কি অবাক হবে না তোমরা!

আগেই বলেছি বাতাস থেকে তরল অক্সিজেন বিশ্লেষণ করে আনা সহজ, তাই তরল অক্সিজেনই বিজ্ঞানাগারে প্রথমে তৈরী করা হয়। তা ছাড়া ছোট ছোট জার ভর্তি এই তরল অক্সিজেন এক জায়গা থেকে এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া কত সহজ ভাব। তবে মজাদার পরীক্ষা করার জন্মেই অক্সিজেন দরকার হয় না। কারখানায় গ্যাস ওয়েল্ডিংএর জন্যে অক্সিঅ্যাসিটিলিন বার্ণারের প্রয়োজনে প্রচুর অক্সিজেন গ্যাস দরকার হয়। তা ছাড়া চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে সরবরাহ দরকার অক্সিজেনের। এই তরল অক্সিজেন থেকে বাষ্পাকারে অক্সিজেন তৈরী করে সিলিণ্ডারে ভরা হয়। এক ফোঁটা তরল অক্সিজেন তৈরী করে ৮৫০ গুণ বেশী অক্সিজেন গ্যাস। আর তরল অক্সিজেন দ্রুত বাষ্পাকারে উড়ে যাবার জন্যে যখন ছটফট করছে, তখন তাদের গ্যাস করে মুক্তি দেওয়াই ত ভালো।

কৌতুক-কণা

শুভেন্দুর একজন বন্ধু দীর্ঘদিন বিদেশে থাকার পর, হঠাৎ একদিন শুভেন্দুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় কথায় কথায় তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁরে শুভেন্দু ১৯৬৭ সালের কোন্ দিনটি সবচেয়ে তোর ভাল গিছলো রে?'

উত্তরে শুভেন্দু বললে, '২২শে এপ্রিল।'

বন্ধুটি প্রশ্ন করলে, 'কেন?'

শুভেন্দু বললে, 'সে দিনটি আমি দু'বেলা ভাত খেতে পেয়েছিলুম দীর্ঘদিনের পর।'

শ্রীভাস্কর সেন

দীনু খুড়োর দৈব-শক্তি

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

যতীন বাবুর ম্যাজিকের গল্প শুনেছিলাম দীনুখুড়োরই মুখে। তিনি বলতেন, "ম্যাজিক অনেকের দেখেছি বটে, কিন্তু যতীন বাবুর মতো ম্যাজিশিয়ান বাংলা দেশে আর জন্মায়নি।"

আমরা বলেছিলাম, "একদিন আমাদের ওঁর ম্যাজিক দেখাবেন, খুড়ো?"

"এখন আর কি দেখবি? উনি যে ম্যাজিক দেখানো ছেড়ে দিয়েছেন পঁয়ত্রিশ বছর হল।"

"তাতে কি হয়েছে, খুড়ো? হাতী মরলেও লাখ টাকা। ম্যাজিক একবার শিখলে কি আর কেউ ভোলে?"

খুড়ো বলেছিলেন "বেশ, উনি কখনো কলকাতায় এলে দেখাব।"

যতীন বাবু দু'দিনের জন্তে কলকাতায় এসে দীনুখুড়োর বাড়িতেই উঠলেন। দীনুখুড়ো বললেন, "যতীন বাবু পরশু ভোরবেলা চলে যাবেন। কাল বিকেলে তোরা হালদার মশায়ের বৈঠকখানায় তাসখেলার আড্ডায় আসিস, ওঁকে বলব তাসের ম্যাজিক দেখাতে।"

আমরা যথাকালে হালদার মশায়ের ফরাস-বিছানো বৈঠকখানায় সমবেত হলাম। দীনুখুড়োর সঙ্গে এলেন ম্যাজিশিয়ান যতীন বাবু। বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে, তবু লম্বা চওড়া শরীরটি বেশ শক্ত, আর মুখে হাসি লেগেই আছে।

সেদিন তাস খেলা লাটে উঠল, সবাই ম্যাজিক দেখবার নেশায় মেতে উঠলেন। মাত্র এক প্যাকেট ধার করা তাস নিয়ে যে এমন তাকলাগানো ম্যাজিক দেখানো সম্ভব, তা আমাদের জানা ছিল না। আমরা ম্যাজিশিয়ান যতীন বাবুকে বার বার জব্দ করবার চেষ্টা করতে গিয়ে বার বার জব্দ হতে লাগলাম। ঘণ্টাখানেক এভাবে আমাদের শুধু তাসের ম্যাজিক দেখিয়েই মাতিয়ে রেখে তারপর তিনি বললেন, "এতক্ষণ আপনারা আমার কয়েকটা সাধারণ খেলা দেখলেন। এবার আপনারা দেখবেন একটি অসাধারণ খেলা—দীনুখুড়োর দৈব শক্তি।"

শুনে দীনুখুড়োই যেন চমকে উঠলেন সব চাইতে বেশী। বললেন, "দৈবশক্তি আমি কোথায় পাব, যতীন বাবু?"

যতীন বাবু বললেন, "দৈবশক্তি আপনার মধ্যেই ঘুমিয়ে আছে। আমি শুধু জাগিয়ে দেব।" বলে দীনুখুড়োর কপালে খুব আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিলেন কয়েকবার—হিপনোটাইজ করার মতো।

"এবার কি করব আমি?" শুধালেন দীনুখুড়ো।

যতীন বাবু বললেন, "এঁরা এই প্যাকেটের বাহান্নখানা তাসের ভেতর যে কোনো এক-খানা তাস বেছে আপনাকে দেখাবেন। আপনি এখানে বসে ঐ তাসটির চেহারা মনে মনে ভাবতে থাকবেন। আপনার সেই ভাবনা চলে যাবে দীনুখুড়ীর মনে; তিনি বাড়িতে বসে বসে ঠিক টের পেয়ে যাবেন আপনি কি তাস ভাবছেন।"

বাড়ির কর্তা হালদার মশাই বললেন, "দীনুখুড়ী ঠিক টের পেলেন কিনা, কি করে আমরা বুঝব?"

"দীনুখুড়ীকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন।" বললেন যতীন বাবু।

আমরা যতীন বাবুকে ঘরের এক কোণে বসিয়ে রেখে উল্টো দিকের কোণে দীনু-খুড়োকে বসালাম, তারপর অনেক বাছাবাছি করে তাঁর হাতে তুলে দিলাম ইস্কাপনের নওলা। উল্টো দিকের কোণ থেকে যতীন বাবু বললেন, "দীনুখুড়ো তাসটা দেখে ফোনে দীনুখুড়ীকে ধরে দিন, তারপর এঁরা কেউ দীনুখুড়ীকে প্রশ্ন করুন।"

হালদার মশাইর ফোনটা ছিল বৈঠকখানাতেই। দীনুখুড়ো রিসিভারটা তুলে নম্বরটা ডায়াল করে রিসিভার কানে লাগিয়ে একবার কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন: "হ্যালো!" একটু অপেক্ষা করে তারপর আরেকবার: "হ্যালো!" বলেই ফোনটা দিয়ে দিলেন হালদার মশাইর হাতে। বললেন, "নিন। গিন্নী ফোন ধরেছেন।"

হালদার মশাই ফোন ধরে বলতে লাগলেন: "হ্যালো, দীনুখুড়ী? আমি নবকান্ত হালদার বলছি। আমাদের তাসের আড্ডায় বসে দীনুখুড়ো একটা তাস হাতে নিয়ে দেখছেন। আপনি কি টের পাচ্ছেন তাসটা কি? না না, তামাসা নয়, সত্যি বলছি। একটু ভেবে দেখুন বলতে পারেন কিনা দীনুখুড়ো কি তাস দেখছেন।"

দীনুখুড়ী ব্যাপারটাকে ইয়াকি বলেই উড়িয়ে দিতে চাইলেন প্রথমে, তারপর একটু ভেবে বললেন "আমি চোখ বুজে যেন দেখতে পাচ্ছি তাসটা কালো। ...ইস্কাপন। ......নওলা। হ্যাঁ, ইস্কাপনের নওলা।"

হালদার মশাইকেও আমরা তাসটা দেখাইনি। তাই তিনি যখন বললেন "খুড়ী বলছেন ইস্কাপনের নওলা", তখন আমরা সবাই ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম। তবে তো সত্যিই দীনুখুড়ো দৈবশক্তিতে তাঁর মনের চিন্তাটা দীনুখুড়ীর মনে চালান করে দিয়েছেন! এই যে ম্যাজিকের চাইতেও আশ্চর্য, অলৌকিক ব্যাপার! দেখলাম নিজের দৈবশক্তি দেখে যেন নিজেই অবাক হয়ে গেছেন দীনুখুড়ো।

ম্যাজিকের আসর এখানেই শেষ হল। আমরা সবাই বাড়ি ফিরলাম মনে বিস্ময় নিয়ে—এমন অদ্ভুত ব্যাপার কি করে সম্ভব হল?

'হালদার মশাই ফোন ধরে বলতে লাগলেন :'

দিন কয়েক বাদে আমি দীনুখুড়োকে চুপি চুপি শুধালাম, "ব্যাপারটা কি সত্যি অলৌকিক, খুড়ো ?"

খুড়ো হেসে বললেন, "অলৌকিক না হাতি। তোদের বোকা বানাবার জন্যে আমাকে আগেই কায়দা বাৎলে দিয়েছিলেন যতীন বাবু। তোদের খুড়ীকে ঐ সহজ কায়দাটা শিখিয়ে রেখেছিলাম আগেই।"

কিন্তু আমরা কি তাস বাছব তা তো আপনি আগে জানতেন না, খুড়ো।"
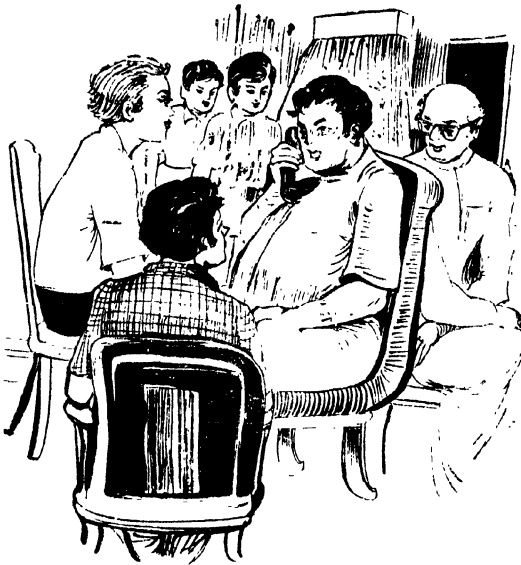
"আগে জানবার দরকারও হয়নি।" বললেন দীনুখুড়ো। "ঐ যে দুবার 'হ্যালো' বললাম, তা থেকেই তোদের খুড়ী বুঝে নিয়েছিলেন তাসখানা কি। আর ফোনে হ্যালো বলাটা খুবই স্বাভাবিক, তাই আমার দুটো হ্যালো-তে তোদের মনে কোনো সন্দেহ হয়নি।"

"কিন্তু দুবার হ্যালো শুনে দীনুখুড়ী তাসের নাম বুঝলেন কি করে ?"

দীনুখুড়ো বললেন, "ফোন ধরেই আমি একবার খুব স্বাভাবিক ভাবে ছোট্ট একটু কাশলাম। তোদের খুড়ী আমার ঐ ইশারা বুঝেই আস্তে আস্তে ফোনে বলতে শুরু করলেন : হরতন, রুইতন, ইস্কাপন......। ইস্কাপন বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমি বলে উঠলাম : 'হ্যালো।' শুনেই গিন্নী বুঝে নিলেন তাসটা ইস্কাপন। তারপর গিন্নী আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন : এক···দুই···তিন···চার···পাঁচ···ছয়···সাত · আট···নয়—। নয় বলবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি বললাম : হ্যালো। গিন্নী বুঝে নিলেন তাসটা নয় নম্বর, অর্থাৎ নওলা। এভাবে দুটো 'হ্যালো'তে আমি গিন্নীকে জানিয়ে দিলাম তাসটা ইস্কাপনের নওলা। কিন্তু তোরা তো গিন্নীর কথা শুনতে পাসনি, তাই চালাকিটা বুঝতে পারিসনি।"

শুনে আমি বললাম, "ছোট্ট এইটুকু চালাকি দিয়ে আমাদের কি অবাকটাই না করেছিলেন সেদিন ! যতীন বাবুর কায়দাটা চমৎকার, কিন্তু আপনার অভিনয়টাও কম চমৎকার হয়নি, খুড়ো।"

খুড়ো বললেন, "গোপন কথাটা শুধু তোকেই বলে দিলাম। খবরদার, আর কাউকে যেন বলিস না।"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "কাউকে বলব না, খুড়ো।"

কাউকেই বলি নি।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

(২৪)

রাজা কুড়েমী, আয়েস ও অহঙ্কার নিয়ে বড় হয়েছে। কিন্তু প্রজারা তা ঘুচাবে শুনে সে ভেব্‌ড়ে যায়। দু হাত উপরে তুলে হাই দেয়।

বলে, "চাষা বানিয়ে দেবে? রোদে জলে ক্ষেত খামারে খাট্‌তে হবে?"

যাত্রী বলে, "ও কথা বলতে নেই রাজা। চাষা হচ্ছে খুব ভালবাসার কথা। তারা চাষ আবাদ করে ফসল ফলায়,—তারা মানুষ বাঁচায়। খালি মানুষ কেন, সমস্ত জীবের সঙ্গে তাদের ভালবাসাবাসি।—এই চাষীরাই হল আসল রাজা, আর দিগ্বিজয়ী।"

রাজা অবাক হয়ে চায়।

যাত্রী বলে, "তুমি সোনার ফসল দেখেছ? ক্ষেতভরা ধান, গাছ ভরা ফল, পুকুর ভরা মাছ, গরুর বাঁট ভরা দুধ?—এ সবই কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন চাষ। আর এ দিয়েই তৈরী হয় মানুষের তুষ্টির আর পুষ্টির আহার। মিষ্টান্ন, সন্দেশ, রসগোল্লা, লুচি পরোটা কি করে তৈরী হয় জান?"

রাজা মজা করে খায়; কিন্তু জানে না। জানার পরিশ্রমও করে না। বলে, "জানি না।"

যাত্রী বুঝিয়ে বলে, "আখ থেকে হয় আখি গুড়, চিনি। খেজুরের রস থেকে খেজুরি গুড়,—তাল থেকে তাল গুড়। দুধ থেকে হয় দুধ, ছানা, ননী, মাখন, দৈ, ক্ষীর। গম থেকে আটা, ময়দা। আর চিনি, ছানা জাল দিয়ে সন্দেশ, রসগোল্লা। ঘরে বসে আহ্লাদ করে খাও। কিন্তু যদি চাষীরা খেটে তৈরী না করত কি খেতে?" রাজা তার জবাব খুঁজে পায় না।

যাত্রী বলে, "কি আর খেতে? আঙুল চুষতে, আর খুঁজে বেড়াতে বুনো ওল, কচু, ঘেঁচু। হয়ত ক্ষুধার জ্বালায় কেঁচো আর বিচুটিও খেতে!" সর্ব্বনেশে কথায় রাজার চোখ চড়ক গাছ হয়। যাত্রী বলে, "চাষীরা গায়ের রক্ত জল করে যে ফসল ফলায়, তা হল তাদের প্রজা। তাদের কিছু কিছু দেশ বিদেশে চালান হয়। তা খেয়ে দিগ্বিদিকের লোক আনন্দে জয় জয় করে। তাই হল সত্যিকারের দিগ্বিজয়।" চমক লাগা নতুন কথা শুনে রাজা থম্‌কে যায়। তার মুখে কথা জোগায় না।

মহারাজাও যাত্রীর কথা শুনছিল। লোকটি কথকের মত মিষ্টি করে কথা বলে। সঙ্গে হার্মোনিয়াম আর খোল না বাজুক, তার গলায় মিষ্টি বোল! কিন্তু তার সাদামাঠা চেহারা আর পোষাক দেখে তাকে চিন্‌তে গোল বাঁধে। সে প্রজার সাজে রাজা নয় ত? হয়ত রাজ্যপাট হারিয়ে ট্রেনের থার্ট (থার্ড) কেলাশে চলেছে!......

মহারাজা নিজেও থার্ড ক্লাশে চলেছে। কাঠের বেঞ্চতে অনেক ছারপোকা। তারা বিনা টিকিটে ট্রেনে দৌড়ায়। আর যারা টিকিট কেটে ট্রেন চড়ে, তাদের রক্ত খায়। রক্ত চোষার রাজা! দিব্যি রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে,—অনেক পুরুষ ধরে! এদ্দিন প্রজার রক্তই খেয়েছে। আজ মহারাজাকে প্রজা ভেবে তার রক্ত খাচ্ছে! কুট্‌স্‌ করে কামড়ায়, আর মহারাজার হাশ ফাশ লাগে। হঠাৎ একটা বড় দরের কামড়। মহারাজা দু নখে ধরে ছারপোকাটা চোখের সাম্‌নে ধরল। তার ইচ্ছা সেটাকে চোখ রাঙানী দিয়ে, তারপর টিপে মার্‌বে।

কিন্তু তা করার আগে যাত্রীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। আর সে দুহাত জুড়ে বলল, "নমস্কার মহারাজ!" তার গলায় মিঠে আওয়াজ। জয়ধ্বনির মত। রাজ্যের বাইরে জয়ধ্বনি শোনা দিগ্বিজয়ের সামিল। আনন্দে মহারাজা ছারপোকাটা ছেড়ে দিল। মনে মনে বল্‌ল, "যা বেঁচে গেলি। নিচু কাজ ছেড়ে এখন উঁচু কাজে যাচ্ছি।"

যাত্রী বলল, "মহারাজা আপনাকে আমি চিনেছি। কটা কথা বলতে চাই। ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে বলব?"

মহারাজাও তাকে আন্দাজ করে নিয়েছে। ভুয়ো সাজে সাজলে কি হবে? বলল, "নির্ভয়ে—"

যাত্রী বলল, "রাজাকে আমি টোকা দিয়ে দেখলেম। ওকে স্কুলে পড়ান।"

মহারাজা চোখ পাকিয়ে চায়। যাত্রী বলে, "বেশী আহ্লাদ পেয়ে সে হাঁদা হচ্ছে। কিন্তু যদি লেখাপড়া শেখান, সে গুণী, জ্ঞানী, বিজ্ঞানী হতে পারে। স্কুলে দিন।"

মহারাজা পাঁতিহাঁসের মত ফেক্ ফেক্ করে হেসে ওঠে। বলে, "ভিক্ষার গান আর প্যান্প্যান্ শিখতে ইস্কুলে! কি যে বলেন। আমার সভায় গাইয়ে আছে। ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে তানপুরা বাজায়, আর গলা ফুলিয়ে গান করে। তারাই হল—গিয়ে গানী আর গুণী। আর দুজনের ঠোকাঠুকিতে বিজ্ঞানী!"···মহারাজা হাঁ করে গানীর নমুনা দেখায়। দেখে যাত্রীরও হাঁ করতে ইচ্ছা হয়। সে বলে, "মহারাজ, মহাভারত আর রামায়ণ দেখেছেন?"

মহারাজা গরব করে বলে, "দেখিনি আবার। মোটা মোটা কেতাব। তাতে ঠাকুর দেবতার ছবি। সুর্পনখা আছে, কুম্ভকর্ণ আছে, হনুমান আছে। ল্যাজে আগুন লাগিয়ে সে কি লাফ—" মহারাজা বসে বসেই দেখায়।

যাত্রী বলে, "ছবি দেখেছেন, বুঝলেম। পড়েন নি?"

মহারাজা ঠোঁট উল্টে বলে, "সময় কোথায়! রাজসভা, নানা কাজ। কথক ঠাকুর পড়ে শোনায়। মহারাণী শোনে।"

যাত্রী মহারাজার বিদ্যার দৌড় টের পায়। বলে, "রাজাকে স্কুলে দিয়ে লেখাপড়া শেখান। সে পড়ে শোনাবে।"

কিন্তু মহারাজা ফের খুৎ খুৎ করে। বলে, "প্রজার সঙ্গে এক টুলে বসে পড়বে রাজপুত্র?"

যাত্রী বলে, "একটা গল্প জানেন? একজন সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে তারপর জিজ্ঞেস করেছিল, "সীতা কার বাপ"? ঠিক সে রকম প্রশ্ন হল না? এতক্ষণ রাজা প্রজার মজাদার এত কথা হল। তারপর—"

মহারাজা রামায়ণের সাত কাণ্ড কেন, এক কাণ্ডও পড়ে নি। খালি লঙ্কাকাণ্ডের কথা জানে। সে 'সীতা কার বাপ' এ প্রশ্নের কথা শুনে একটুও অবাক হল না। কিন্তু যাত্রী যেন তীর ধনুক নিয়ে তৈরী ছিল। সে চোখা চোখা প্রশ্নের বাণ ছুড়তে লাগল। তাক করা তীর। ধাক্ করে লাগে।

যাত্রী বলে, "এখনো মনে ভাবেন, প্রজার সঙ্গে পড়ে রাজার মান যাবে? অথচ প্রজা ছাড়া রাজার প্রাণ বাঁচে না। তার সেবা, তার ফসল, তার খাজনা পেয়ে তবে আহ্লাদে গান জমে। এখন লেখা পড়া শিখে তারা হয়েছে বুদ্ধিমান। তাই রাজা মহারাজার কান ধরে টান দিচ্ছে।"

মহারাজা নিজের কান ধরে দেখে। যাত্রী বলে, "মহারাজ, আপনার হাতিয়ার আছে?"

মহারাজা ঠাট্টা করে বলে, "রাজা নিধিরাম সর্দার নাকি যে তার ঢাল নেই, তলোয়ার নেই। তার সব আছে।"

যাত্রী বলে, "বেশ। কিন্তু যত্ন না করলে ত মরুচে ধরে। তখন কি করেন?"

মহারাজা বলে, "কি আর করি? ফেলে দি!"

যাত্রী অবাক হয়ে বলে, "দামী তলোয়ার ফেলে দেন!"

মহারাজা বলে, "কে আর শান দেবার মেহন্নত করে?"

যাত্রী বলে, "কিন্তু ছেলে যে অস্ত্রের সেরা। তা হল গিয়ে পাশুপত অস্ত্র। তা ত ফেলে দেওয়া চলে না। রত্নের মত যত্ন করে রাখতে হয়। তবে ত রাজত্ব চলে। কিন্তু রাজা মহারাজারা তা বোঝে নি। তাই কি করে রাজপাট ভাঙল তার খোঁজ পায় নি। আজ কোথায় সিংহাসন, কোথায় সভাষদ, কোথায় প্রজা? রাজ মহারাজার হাতি, ঘোড়া নেই। তারা থার্ড ক্লাশ গাড়ীতে হটর হটর করে গড়িয়ে চলে। তবু প্রজার সঙ্গে এক বেঞ্চিতে যায়গা নিতে মনে মনে রাগরঙ্গ!"

মহারাজা চারদিকে তাকায়। সত্যি থার্ড (থার্ড) কেলাশে প্রজারা চল্‌ছে। আর তাদের গা ঘেঁষে আধ বসা হয়ে তাদের হাত পায়ের গুঁতো খেয়ে চলেছে। যাত্রী ঘুরে ফিরে আবার কেতাবের কথা পাড়ে। মহারাজা আবার বলে, "কথক ঠাকুর আছে কি জন্য? পড়ে শোনাবার জন্য পেয়ামী পায়। সে সুর করে পড়ে আর মহারাণী শোনে। আমাকে শুনিয়ে মহারাণী ঘুম পাড়ায়।"

যাত্রী বলে, "আপনি পড়েন না, শোনেনও না? যেখানে রাজপুত্রদের লেখাপড়া, যুদ্ধ, রাজ্য চালনা, প্রজাপালন, দানধ্যান ও নানান্ শিক্ষার কথা আছে। সে সব পড়েন নি? তাই—"

মহারাজার মাথা চুলকানো বাড়ে। বলে, "রাজকার্যের ঝামেলায় আর নানা কাজে সময় পাই কোথায়?"

যাত্রী বলে, "এত কি কাজের ঝামেলা?"

মহারাজা বলে, "রাজ্য ত চালান নি, তাই জানেন না। শুনুন। মস্ত বড় রাজ্য আর অনেক প্রজা ত। ভেবে ভেবে অনেক রাতে ঘুমুতে হয়। মহারাজা কি না। সোনার থালা, বাটিতে অনেক রকম খেয়ে আঁইঢাই। আসে নানান্ স্বপ্ন। না দেখে উপায় নেই। দেখা শেষ হবার আগে নহবৎ বাজে। আর ঘুম ভেঙে যায়। তারপর

সোনার দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজা, মুখ হাত ধোয়া, খাবার খাওয়া, সাজগোজ করা, পাল্কী চেপে রাজসভায় যাওয়া, পাত্র মিত্রের সঙ্গে কথা বলা, তামাক খাওয়া, ফুঁ করে ধোঁয়ার পুরস্কার দেওয়া,—এত কাজ।"

মহারাজা চলন্ত রেলগাড়ীর সঙ্গে তাল রেখে আরও বলত। যাত্রী বাধা দিয়ে বলল, "বুঝেছি—"

মহারাজা বলে, "উঁহু, সব বোঝেন নি। বোঝার কথাত এখনো বলিনি। আজ দেখছেন নেড়া মাথা। কিন্তু এখানে ছিল ঝাঁকড়া চুল। কত তা গুনিনি। কিন্তু লাখ-খানেক হবে ত। তার আর তার ওপর মুকুটের বোঝা। সমস্ত শরীরে পোষাকের সাজও কি সোজা! তা ছাড়া শরীরের বোঝা—"

যাত্রী বলে, "বুঝে নিয়েছি—"

মহারাজা বলে, "বাইরের বোঝা না হয় বুঝেছেন। কিন্তু ভেতরের বোঝা না বল্‌লে বুঝবেন কি করে? ছল্ ছল্ করে রক্ত চলে, কল্ কল করে পেট ডাকে, হাঁসফাঁস করে বুক কাঁপে, ফোঁস্‌ফাঁস্ করে নিঃশ্বাস বয়, দুর্ দুর্ করে ভয় হয়, খিল্ খিল করে হাসি পায়,—এ সব বোঝা কি চোখ বুজে বওয়া যায়?"

শুনে যাত্রী হাসবে না কাঁদবে ঠাহর করতে পারে না।

মহারাজা বল্‌তে থাকে, "এ সব সামলানই দায়। কিন্তু হায় হায়—গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া!"

মহারাজা পা দেখায়। যাত্রী দেখে, সত্যি মহারাজার এক পায়ে গোদ আছে।

মহারাজা বলে, "ধরুন যদি গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া হয়?" (ক্রমশঃ)

আলপনা শিল্পী: শ্রীইন্দ্রাণী সেনগুপ্ত
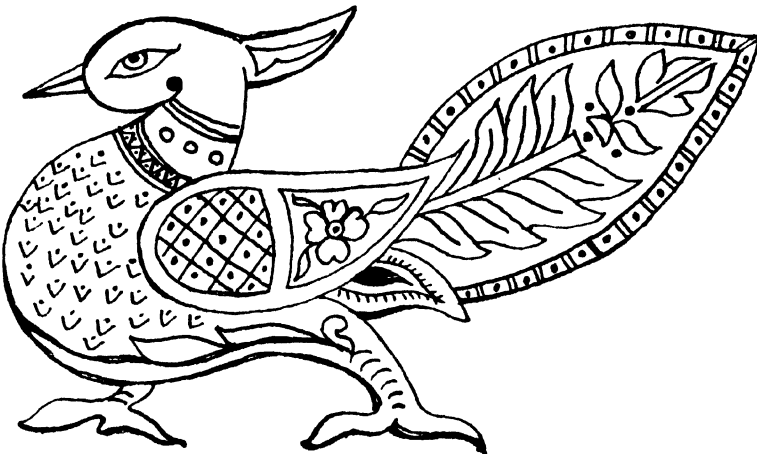
সুধীন্দ্র দা

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

সকালে দৈনিক পত্রিকার দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলাম। সুধীরদা নেই, পরলোকগমন করেছেন। মাথার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল, এই তো সেদিন তাঁর বাড়িতে বসে কত কথা বলে এসেছি। চোখের উপর সে দৃশ্য ভেসে উঠল। তাঁর কাছ হতে বিদায় নেবার সময় বলেছিলাম, নার্সিং হোমে যাবার আগে আমাকে সংবাদ দিবেন দাদা। তিনি মৃদু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন 'নিশ্চয়', কিন্তু সে খবর পেলাম পত্রিকায় একেবারে তিনি যখন ছেড়ে গেছেন। পরে শুনেছিলাম, রাত্রে রেডিওতে নাকি সে খবর প্রচার করেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে খবর আমার কানে পৌছায় নি। সেদিন সকালে আর কোন কাজ করতে পারলুম না। বুকের ভিতর কেমন শূন্যতা বোধ করলাম। ব্যথাতুর মন নিয়ে ছুটে গেলাম সুধীরদা'হীন বাড়িতে। উঠতে মন চাইল না—তবু উঠলাম। মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল এই বাড়িতে কতদিন কত আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসেছি। সুধীরদা'র সঙ্গে কত কথা বলে আনন্দ নিয়ে চলে এসেছি। কিন্তু আজ—ফিরে এলাম মনোবেদনা নিয়ে।

আমার জীবনে যত পুস্তক-প্রকাশক ও শিশু-সাহিত্যিক ও সম্পাদকের সঙ্গে মিশেছি তার মধ্যে সুধীরদা'কে ভুলতে পারব না জীবনে। তাঁর সঙ্গে বসে যখন কথা বলতাম মনে হ'ত তিনি আমার কত আপনজন। তাঁর কথাবার্তা ব্যবহারের ভিতর পেতাম স্নেহ, ভালবাসা। তাই বার বার তাঁর কাছে ছুটে যেতাম। তিনিও ছোট ভাইয়ের মত ব্যবহার করতেন। ১৯৬৪ সনে বিলেত হতে ফিরে আসার পর একদিন বলেছিলেন, "জানেন শচীনবাবু, ওদের মানুষগুলো বড্ড অদ্ভুত। ওখানে যদি আপনি সারা জীবন পড়ে থাকেন, কেউ আপনার সঙ্গে মিশবে না—কেউ গায়ে পড়ে কথা বলবে না। কিন্তু আপনার বিপদ দেখলে, কষ্ট দেখলে, ছুটে আসবে।

বললাম কি রকম দাদা? একটা উদাহরণ দিন?

সুধীরদা বললেন ট্যাকসি করে এক জায়গায় গিয়েছিলাম সঙ্গে দুটো সুটকেস ছিল। ট্যাকসি থেকে নেমে সুটকেস নিয়ে চলতে কষ্ট হচ্ছিল। হঠাৎ দেখি দুটো লোক এসে বলল, "স্যার মে আই হেলপ ইউ?" বলে আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে সুটকেস দুটি নিয়ে গন্তব্য স্থানে পৌছিয়ে দিল। এ কিন্তু আপনি ভাবতে পারেন না।"

সুধীরদা'র সঙ্গে পরিচয় আমার বেশী দিনের নয়, মাত্র বছর পনেরোর। লেখা নিয়ে হিমসিম খাচ্ছিলাম, এ মাসিক, ও মাসিক পাঠিয়ে বিরক্ত ধরে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। ভাবলাম, কেউ যখন লেখা ছাপাবে না, মিছেমিছি পাঠিয়ে করব কী। এমনি যখন মনের অবস্থা এমন সময় এক বন্ধু বলল, 'মৌচাকে' লেখা পাঠিয়েছ?

বললুম—না।

বন্ধু বলল, ওখানে পাঠিয়ে দেখ, লেখা ভাল হলে নিশ্চয় ছাপা হবে।

বন্ধুর কথা শুনে আঁতকে উঠলাম, বললাম, ওরে বাপ রে ওখানে সুধীর সরকার সম্পাদক, পুরানো ঝানু সাহিত্যিক লেখা গেলেই ফেরত আসবে। বন্ধু বললে, না হে না, তুমি পাঠিয়েই দেখ। তুমি তো ওকে জান না, উনি জীবন ভোর সাহিত্যিক সৃষ্টি করে গেছেন।

আর কথা নয়, বন্ধুর কথা মত মৌচাকে লেখা পাঠালাম। সুধীরদা'র সঙ্গে তখন পরিচয় হয়নি। কিন্তু মনে ভয় ছিল, এই বুঝি লেখা ঘুরে আসে। কিন্তু লেখা ঘুরলো না, এলো মৌচাক ঠিক তিন মাসের মাথায়। তাড়াতাড়ি খুলে দেখি আমার লেখা ছাপা হয়ে গেছে। বুঝলাম, বন্ধুর কথা কতদূর সত্য। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এলো। এর পরেও দেখেছি লেখা ভাল হলে মৌচাকে তার স্থান হবেই।

সুধীরদা সাদাসিদে সরল মানুষ। একবার যিনি তাঁর কাছে গিয়েছেন, তাঁর অমায়িক ব্যবহারে সে মুগ্ধ হয়ে গেছে। তিনি শুধু মৌচাকের সম্পাদকই ছিলেন না, তিনি জীবনে অনেক বইও লিখে গেছেন। সেই বইগুলো ভারতের শিক্ষিত মানুষের কাছে খুব সুখ্যাতি অর্জন করেছে।

ভেবে দেখি আয় না

শ্রীঅনিলেন্দু চক্রবর্ত্তী

ভেবে দেখি আয় না
সাপ বাঘ গিরগিটি
রাজপথে হাঁটে কেন,
হাসে কেন হায়না।
ভেবে দেখি আয় না
সব দেশে এমন কি
পেরু থেকে চায় না?
এক দেশ ঘুরে দেখি
চিড়িয়াখানায় এ কি,
চারিদিকে আঁটা খালি
বড় বড় আয়না!

মুখোমুখি খোপে খোপে
সাপ বাঘ হায়না।
নিজ মুখে চুন কালি
দেখে দেখে রাগে খালি
হাসি আর পায় না।
শিশু দেয় হাততালি
দেখে মজা আয়না।
বোঝো তবে এইবার
ঘোরে কেন ঘরবার
এদেশের গিরগিটি
বাঘ সাপ হায়না।

তিন ভাইয়ের গল্প

শ্রীপ্রদোষচন্দ্র রায়চৌধুরী

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার এক গ্রামে এক গরীব ভিখারী ছিল। তাদের নাম পিটার, পল ও ডিক। একদিন ভিখারী তার ছেলেদের ডেকে বলল, "দেখ, আমার বয়স হয়েছে। ভিক্ষা করবার ক্ষমতা নেই বললেই হয়। আমি মরলে তোমাদের জন্য কিছুই থাকবে না। সুতরাং তোমরা বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড় ও নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই ঠিক করে নাও।" তিন ভাই বাবা ও মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

সেই দেশের রাজা সেই সময়ে দুটি সমস্যা নিয়ে খুব মুস্কিলে পড়েছিলেন। রাজ-প্রাসাদের কাছে একটা মস্ত বড় ওক গাছ ছিল। সেটা খুব বড় হওয়ার জন্য তার ডাল-পালাতে রাজপ্রাসাদের ভিতরে আলো আসতে পারে না। ঘরগুলি সর্ব্বদা অন্ধকার এবং স্যাঁৎস্যাতে থাকে। কেউ সেই গাছ কাটতে পারে না। তার একটা ডাল কাটা মাত্র গাছ কয়েক ইঞ্চি বড় হয় ও সেই জায়গায় দুটো ডাল বেরিয়ে খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়।

গ্রীষ্মকালে কুয়া এবং পুকুরের জল প্রায়ই শুকিয়ে জল কষ্ট হওয়ার জন্য রাজার ইচ্ছা প্রাসাদের কাছে একটা খুব বড় ও গভীর কুয়ো খোঁড়াবেন যাতে সারা বৎসর পরিষ্কার খাবার জল পাওয়া যাবে। কিন্তু রাজ প্রাসাদ একটা মস্ত বড় পাথুরে পাহাড়ের উপরে তৈয়ারীর জন্য কুয়া খুঁড়তে পারা যাচ্ছে না। রাজা চার দিকে ঘোষণা করলেন যে ঐ গাছটাকে কেটে ফেলতে পারবে এবং প্রাসাদের কাছে একটা বড় কুয়ো করতে পারবে তাকে অর্দ্ধেক রাজত্ব পুরস্কার দেওয়া হবে ও পরমা সুন্দরী রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হবে। অনেক লোক চেষ্টা করল কিন্তু কেউ পারল না। গাছের একটা ডাল কাটার সঙ্গে সঙ্গে দুটো করে ডাল গজাতে লাগল ও পাথুরে পাহাড় শক্ত বলে কিছু করা গেল না।

পিটার, পল ও ডিক তিন ভাই ঠিক করল যে তারাও একবার চেষ্টা করে দেখবে। সফল না হলে পরে চেষ্টা করলে প্রাসাদের কাছাকাছি চাকরি পাবার সম্ভাবনা। এই ভেবে তারা রাজধানীর দিকে রওনা দিল। যেতে যেতে এক পাহাড়ের ঢালু জায়গাতে একটা পাইন গাছের জঙ্গল পড়ল। তার ভিতর দিয়ে যাবার সময় গাছ কাটার আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। ডিক বলল, "জঙ্গলের মধ্যে গাছ কাটছে কে?" তার দাদারা হেসে বলল, "এই বোকা, জঙ্গলের মধ্যে গাছ কাটা নিয়ে মজার কি আছে?" "তোমরা কিছু জান না আমি গিয়ে একবার খোঁজ নিয়ে আসি।" বলে ডিক আস্তে আস্তে গাছ কাটার শব্দের দিকে এগোল।

ক্রমশঃ সে পাহাড়ের চুড়ায় গিয়ে দেখল একটা কুড়াল নিজে নিজে গাছ কাটছে।

'রাজা খুশী হয়ে পরমা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ডিকের বিয়ে দিলেন।'

"আরে একি তুমি কি একাই সমস্ত গাছটাকে কেটে ফেলবে?" ডিক জিগেস করতে কুড়োল বলল, "হ্যাঁ। আমি একাই গাছ কাটি। আমি আপনার জন্য অনেক দিন হল অপেক্ষা করছি।" এই তো আমি এসে গেছি বলে ডিক কুড়োলটাকে তার থলিতে ভরল। তারপর তাড়াতাড়ি গিয়ে তার দাদাদের ধরল। "ওখানে মজার জিনিষ কি পেলি?" দাদারা জিজ্ঞেস করলে ডিক বলল, "শুধু একটা কুড়োল।"

চলতে চলতে এবার উপর থেকে ঝুলছে এমন একটি মস্ত বড় পাথরের পাহাড়ের কাছ দিয়ে তাদের যেতে হল। হঠাৎ সেই পাহাড়ের মধ্যে পাথর ভাঙার শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। কৌতূহলী ডিক অবাক হয়ে বলল, "এই পাথরের পাহাড়ের মধ্যে কে পাথর ভাঙছে?" তার দাদারা বকুনি দিয়ে বলল, "চুপ কর গাধারাম। পাহাড়ে পাথর ভাঙার মধ্যে কৌতুহল-জনক কি আছে?" "না, না, তোমরা বোঝ না। আমি গিয়ে দেখে আসি কে কাটছে, বলে ডিক শব্দের দিকে চলল। একটু পরে দেখল যে একটা গাঁইতি নিজে নিজে পাথর খুঁড়ছে। দেখেই অবাক হয়ে ডিক বলে উঠল, "তুমি একাই পাথর ভাঙছ?" গাঁইতি বলল, "হ্যাঁ আমি একাই খুঁড়ি। আমি আপনার জন্য অনেক দিন অপেক্ষা করছি।" ডিক বলল আমি এসে পড়েছি, বলে কুড়োলের সঙ্গে গাঁইতিটাকেও থলিতে ঢুকাল। দৌড়ে দাদাদের কাছে গিয়ে পৌছালে তারা হাসতে হাসতে বলল, "কিরে ওখানে কি পেলি?" "কিছু না শুধু একটা গাঁইতি।"

তারা আরও অনেক দূরে গিয়ে একটা ছোট নদী পেল। সেখানে তারা খাওয়া দাওয়া করে নদীর জল পান করল। কৌতূহলী ডিকের মনে হল, "আচ্ছা এই নদীর জল

কোথা থেকে আসছে ?" পিটার চেঁচিয়ে বলল, "আমার মনে হচ্ছে তুই সত্যি পাগল হয়ে গেছিস্।" পল হেসে বলল, "হাঁদারাম ঝরণার কথা কোনদিন শুনিস্‌নি ?" ডিক বলল, "শুনেছি ঠিক, তবে একবার দেখে আসতে চাই।" ডিক তাড়াতাড়ি নদীর স্রোতের প্রতিকূলের দিকে চলল। ছোট নদী ক্রমশঃ সরু হতে হতে একেবারে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার মত হল। ডিক দেখল যে ঘাসের উপর পড়ে থাকা একটা ছোট বাদামের গায়ের ছোট গর্ত্তর ভিতর থেকে সুতোর মতন জল বের হচ্ছে। ডিক অবাক হয়ে চেঁচিয়ে বলল, "বাঃ তুমি তো বেশ, একাই একটা নদী তৈয়ারী করছ।" বাদাম বলল, "হ্যাঁ আর আমি আপনার জন্য বহুদিন অপেক্ষা করে আছি।" "এবার আমি এসে গেছি," বলে ডিক বাদামের ছোট গর্ত্তটা শেওলা ও মাটি দিয়ে বন্ধ করে সেটাকে পকেটে রাখল। তাড়াতাড়ি দাদাদের কাছে গেলে তারা ঠাট্টা করে হেসে বলল, "কি রে নদীর জল কোথা হতে আসে এখন জানতে পেরেছিস তো ?" ডিক বলল, "হ্যাঁ একটা গর্ত্ত থেকে আসে। আর কিছুদিন পরে তারা রাজপ্রাসাদে গিয়ে পৌছাল।

ইতিমধ্যে ওক গাছ খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠে রাজপ্রাসাদ প্রায় ছেয়ে দিয়েছে। রাজা তো রেগে আগুন। তিনি ঘোষণা করেছেন যে কেউ যদি গাছ কাটতে চেষ্টা করে না পারে তাহলে তাকে দূর সমুদ্রের মধ্যে এক দ্বীপে বন্দী করে রাখা হবে। পিটার এবং পল নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে এত নিশ্চিন্ত ছিল যে তারা কিছুই পরোয়া করেনি। পিটার প্রথমে চেষ্টা করল। ও হরি! গাছ কাটবার জন্য কুড়াল দিয়ে এক কোপ মারে আর গাছ কয়েক ইঞ্চি বড় হয় আর দুটো ডাল গজায়। রাজার প্রহরীরা তাকে ধরে দূর সমুদ্রের দ্বীপের কারাগারে বন্দী করে এল। তারপর পল খুব বাহাদুরি করে গাছ কাটতে গেল। কাটা তো হলই না বরং আরও বেড়ে গেল তাকেও দূর সমুদ্রের জেলখানায় বন্দী করে রাখা হল।

ডিককে লোকেরা বলল, "কেন বৃথা চেষ্টা করবে। দেখলে তো তোমার দাদাদের কি দুর্দশা হল। গাছের সম্বন্ধে রাজা ভীষণ ক্ষেপে আছেন। আর গাছে যতই কোপ দেবে গাছ ততই বেড়ে উঠবে। আর বেশী ডাল গজাবে। সুতরাং তোমারও দাদাদের মত দশা হবে।" ডিক হেসে বলল, "দেখাই যাক না, আমি পারি কি না।"

ডিক তার থলি থেকে সেই যাদু-করা কুড়াল বের করে তাকে চুপি চুপি বলল, "ওক গাছটাকে কেটে ফেল।" কুড়াল ডিকের হাত থেকে ছুটে গিয়ে সেই মস্ত বড় ওক গাছটাকে কাটতে আরম্ভ করল। দেখতে দেখতে গাছ হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ল।

ডিক তার মন্ত্র দেওয়া গাঁইতিটাকে বের করে তাকে ফিস্ ফিস্ করে বলল, "একটা

মস্ত বড় কুয়ো খুঁড়ে ফেলত।" গাঁইতি তার হাত থেকে ছুটে গিয়ে খুব শক্ত পাহাড়ে গর্ত্ত করতে আরম্ভ করল। খটাখট আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে পাথরের টুকরো এদিক-ওদিক ছিটকে পড়তে লাগল। গাঁইতি ও পাথরে ঠোকাঠুকি লেগে আগুনের ফুলকি বের হতে লাগল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মস্ত বড় কুয়ো খোঁড়া হয়ে গেল।

তখন ডিক তার পকেট থেকে সেই ম্যাজিক বাদাম বের করে সেটার ছোট্ট গর্ত্তর মুখ থেকে মাটি ও শেওলা সরিয়ে আস্তে আস্তে "কুয়ো ভরে ফেল" বলে সেটাকে কুয়ার মধ্যে ফেলে দিল। অল্পক্ষণ পরেই কুয়ো পরিষ্কার ও টাটকা জলে ভর্তি হয়ে গেল।

রাজা খুবই খুসী হয়ে তখনি ডিককে অর্ধেক রাজত্বের রাজা করে দিলেন। খুব ধুমধাম করে তাঁর পরমা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ডিকের বিয়ে দিলেন।

রাজা খুসী হয়ে পিটার ও পল সমেত সমস্ত বন্দীদের সেই সুদূর দ্বীপের কারাগার থেকে মুক্তি দিলেন। ছোট ভাইয়ের কৌতূহল এত উপকারে লাগল একথা পিটার ও পল কোন দিনও ভুলতে পারল না।

বারোমাস্যা

শ্রীমণিকা ঘোষাল

বোশেখ মাসে আম-কাঁঠালের মকুল ওঠে জেগে,
জ্যৈষ্ঠ মাসে সে সব কুঁড়ি গাছে ওঠে পেকে।
আষাঢ় মাসে মেঘেরা সব চরাচরে মেশে,
শ্রাবণেতে জলের ধারায় বিশ্ব যে যায় ভেসে।

ভাদরেতে ভরা নদী স্রোতে খরতরা—
আশ্বিনেতে পূজোর বাদ্যে আত্মহারা মোরা।

কার্তিকের ঐ হিমেল হাওয়ায় নেইকো কোনো সুর,
অঘ্রানে নবান্ন সাথে খায় নলেনের গুড়।

পৌষ মাসের মিঠে রোদে পিঠে-পায়েস খায়,
মাঘের শীত কথায় বলে, লাগে বাঘের গায়।

ফাগুনের দখিন হাওয়ায় হৃদি পাগল পারা,
চৈত্র দিনের শেষ বিদায়ে শুধুই পাতা ঝরা।

মেঠুড়ে

মেক্সিকো অলিম্পিক

১২ই থেকে ২৭শে অক্টোবর হইতে যোল দিনের জন্মে পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকে অ্যাথলীটরা জমায়েত হবেন উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো শহরের প্রান্তে, নতুন তৈরী হওয়া আলম্পিক গ্রামে। এই গ্রামেই চলবে উনিশতম অলিম্পিক। এর আগে ১৯৬৪ সালে টোকিওতে শেষ অলিম্পিক হয়ে গেছে।

অলিম্পিক এক বিরাট অনুষ্ঠান। পৃথিবীর কোনো অনুষ্ঠানই এতো ব্যাপক এবং বিরাট নয়। এর জন্য কত প্রস্তুতি, কত পরিকল্পনা, কত উদ্যোগ আয়োজন এবং কী বিপুল অর্থব্যয় হয় তা তোমাদের অজানা নয়।

অলিম্পিক গ্রীকদের দান। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল এই অলিম্পিক। অলিম্পিক কথাটার উৎপত্তির বিবরণ হয়তো তোমাদের জানা আছে। গ্রীসের এথেন্স শহর থেকে প্রায় একশ, পঁচিশ মাইল দূরে এক সুন্দর ও সমতল ভূমি, যার একদিকে অলিফিরাস ও ক্ল্যাডিয়াস নদীর মোহনা, অন্যদিকে সবুজ গাছপালায় ঘেরা ছোট ছোট পাহাড়। এই সমতল ভূমির নাম অলিম্পিয়া। আর পর্বতমালার শিখর-দেশকে বলা হ'ত অলিম্পাস। গ্রীক ভাষায় অলিম্পিক কথার অর্থ হল স্বর্গ বা দেবতাদের আবাসভূমি। এই অলিম্পিয়াতে সেকালের খেলাধূলো হ'ত বলে নাম হয়েছে অলিম্পিক।

বর্তমান মেক্সিকো শহরের দক্ষিণে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির কাছে এক বিরাট বনজঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ী এলাকা পড়ে ছিল—সেখানেই অলিম্পিক গ্রাম, অলিম্পিক স্টেডিয়াম ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। এবারের অলিম্পিকে সবসুদ্ধ উনিশটা খেলাধূলোর কর্মসূচী আছে। এই উনিশটার ভেতর ফুটবল, হকি, বাস্কেটবল, ভলিবল, বক্সিং, সাইক্লিং, জিমনাসটিকস্, ওয়েটলিফটিং, সুটিং, রেস্টলিং, সুইমিং, ওয়াটার-পোলো প্রভৃতি অন্যতম।

অ্যাথলীটদের থাকার জন্যে অলিম্পিক গ্রামে উনত্রিশটা বড় বড় বাড়ি তৈরি হয়েছে।

এই বাড়িগুলো ছ' তলা থেকে দশ তলা উঁচু। এ বাড়িগুলোতে মোট ন শ' চার ফ্ল্যাট আছে। প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটে তিনটে শোবার ঘর, বসার ঘর আর রান্নার ঘর আছে। এক-একটা ঘরে দশ থেকে বারোজন প্রতিযোগীর থাকার জায়গা হতে পারে। এ ছাড়া প্রতিযোগীদের খাবার জন্য সেণ্টার ডাইনিং হল, আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্র ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা তো আছেই।

এবারের অলিম্পিকে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি একশ' তেইশটা দেশকে আমন্ত্রণ জানিছেলেন। তার ভেতর প্রায় একশ' উনিশটা দেশ অলিম্পিকে যোগ দেবার জন্য প্রায় সাড়ে সাত হাজার প্রতিযোগীকে মেক্সিকো পাঠিয়েছেন। এদের সঙ্গে আরো ন হাজার প্রতিনিধি অর্থাৎ অফিসিয়াল, কোচ, ডাক্তার ইত্যাদি আছেন।

মেক্সিকো অলিম্পিকে সবচেয়ে সুন্দর ও বেশীসংখ্যক আসনবিশিষ্ট স্টেডিয়ামের ভেতর আজটেক স্টেডিয়াম অন্যতম। এই স্টেডিয়াম শুধু ফুটবলের জন্যই তৈরি হয়েছে। সমস্ত স্টেডিয়ামে বসার জায়গা প্রায় এক লক্ষেরও বেশী। স্পোর্টস প্যালেসে পঁচিশ হাজার দর্শক বসে অলিম্পিক বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা দেখতে পাবেন। সুইমিং পুল ও জিমনাসিয়ামে সাঁতার, ডাইভিং ও তার সঙ্গে ওয়াটার-পোলো ফাইন্যাল খেলা হবে। এই পুলের চারধারে প্রায় দশ হাজার লোকের বসার জায়গা আছে। এবার ষোলটা টিম ওয়াটার-পোলো প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছেন। মোট বাহাত্তরটা খেলা হবে। জিমনাসিয়ামে হবে ভলিবল প্রতিযোগিতা।

মেক্সিকো শহরের দক্ষিণে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সিটির ভেতর অলিম্পিক স্টেডিয়াম। এই স্টেডিয়ামকে বাড়ানো এবং সংস্কার করা হয়েছে। এখানেই শটপুট, জাভেলিন থ্রো, দৌড়, পোল ভল্ট, ডিসকাস থ্রো, রিলে রেস, ম্যারাথন প্রভৃতি যাবতীয় অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

সংবাদ দেওয়া-নেওয়ার জন্য মেক্সিকো অলিম্পিক কর্তৃপক্ষ কোনো ত্রুটি রাখেন নি। মেক্সিকো সরকার একটা পাঠানোর আর একটা গ্রহণের জন্য দুটো জার্মান রেডিও ফটো মেশিন কিনেছেন। সাংবাদিকদের সুবিধার জন্যে অলিভেটি কর্পোরেশন বিভিন্ন ভাষার একশটা টাইপরাইটার মেশিন দিয়েছেন। কোনো মেশিনে ফরাসী, কোনো মেশিনে জার্মান, কোনো মেশিনে আরবি টাইপ হতে পারবে।

উনিশতম অলিম্পিক স্মারক হিসেবে মেক্সিকান সরকার নতুন ডাকটিকিট বের করেছেন। এ ছাড়া এই অলিম্পিক গেমসের সম্মানার্থে মেক্সিকো সরকার এক নতুন মুদ্রা কিছুদিন হ'ল চালু করেছেন।

কর্মকর্তা সমেত ষোল জনকে নিয়ে মোট ছত্রিশ জনের একটা হকি দল মেক্সিকো অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছেন। পাঞ্জাবের পৃথ্বীপাল সিং দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। তবে বাঙলার গুরুবক্স সিংকেও অধিনায়কের সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া চারজন কুস্তিগীর, দু'জন অ্যাথলীট, দু'জন রাইফেল চালক, একজন করে ভারোত্তোলক ও মুষ্টিযোদ্ধা এবারের অলিম্পিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

আধুনিক অলিম্পিকের প্রবর্তক ব্যারন পিয়ের দ্য কুবার্তা গ্রীসের প্রথম অলিম্পিকের উদ্বোধন দিনে যে বাণী দিয়েছিলেন, সে-বাণীর কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করে এবারের লেখা শেষ করছি। "অলিম্পিকে জয় নয়, অংশ গ্রহণই বড় কথা। বিজয়ীর পুরস্কারের চেয়ে বিজয়ের জন্যে সংগ্রামই অলিম্পিকের আদর্শ।"

কোলকাতার চিঠি

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

মন ভার মুখ ভার কেমন যে লাগে
কখনো এমন ফাঁকা লাগেনিতো আগে।
নেই মায়া, নেই কোনো ছায়ার বালাই
দিনরাত মন বলে পালাই পালাই
যতদূর চোখ যায় ইট আর ইট
জমাট পাষাণে বাঁধা এপিঠ-ওপিঠ।

একটু শান্তি নেই, একটু নিরালা
হুটোপুটি, হৈ চৈ, কান ঝালাপালা।
এত আলো, অলিগলি, পথ হয় ভুল
এত লোক, সব যেন কলের পুতুল।

নেই আলো, রোদ হাওয়া বিশেষ কোথাও
ধোঁয়াটে চাঁদের মুখ জোছনা উধাও,
সবুজ টিয়ার ঝাঁক চোখেও পড়ে না,
দল বেঁধে প্রজাপতি এখানে ওড়ে না,
নেইকো দোয়েল শিস, ঝিঁঝিদের গান
পাষাণের কান্না শুনে কেঁদে ওঠে প্রাণ।

শহর ছাড়িয়ে যাবে? আরো কদাকার
কল বস্তি ধুলো কালি পাঁকে একাকার,
মাছি মশা নর্দমা জল-পচা ডোবা
সেখানে কাপড় কাচে গাধা গাদা ধোবা।
কেবল গড়ের মাঠে পাবে কিছু ছুটি
হঠাৎ জুড়িয়ে যাবে পোড়া চোখ দুটি।
সেখানেই আছে কিছু সবুজের মায়া
গঙ্গার দূর ছবি আকাশের ছায়া,
কচি ঘাস, মিঠে হাওয়া, পাখিদের গান
হাঁফ ছেড়ে কিছুকাল বাঁচে তবু প্রাণ।

তারপর আর নেই এখানেই শেষ
আবার ইটের খাঁচা গুমোটের দেশ।
আবার গোমড়া-মুখো ভিড় গাদা গাদা
দম ফাটা বুক-চাপা সে গোলকধাঁধা।
চোখে আসে জল, মুছি জামার হাতায়
না এলেই ভাল ছিল এ কোলকাতায়।

সম্পাদক—শ্রীসুপ্রিয় সরকার

শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য: ০·৫০ পয়সা

পণ্ডিত জওহরলাল শিশুদের আদর করছেন

(১৪ই নভেম্বর শিশুদিবস স্মরণে)

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র *

৪৯শ বর্ষ]　　অগ্রহায়ণ : ১৩৭৫　　[৮ম সংখ্যা

খুকুর কি চাই

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী

আলজিভেরই অপারেশন কালকে হবে খুকুর :

খুকু যাবে হাসপাতালে।

আজকে সারা দুপুর

বোঝান তাকে মা যে :

মোটে একটুও ভয় নেই।

লাগে নাকো কোথায় কিছু।　দেখতে না দেখতেই

যায় যে হয়ে অপারেশন।　যায় না পাওয়া টের।

তার পরেই না বাড়ি ফিরে ফুর্তি করো ফের!

সেই যে যেমন অপারেশন সেবার হলো আমার?

হাসপাতালে দু'দিন থেকেই ফিরে এলাম আবার

কেমন মজা করে?

তুমিও তেমনি আসবে বাড়ি মোটর গাড়ি চড়ে।

বলল খুকু, মিনিটখানেক থামি,
'হাসপাতালে যেতে মোটেই ভয় খাইনা আমি।
তোমার মতন অপারেশন হোকনা কেন আমার!
ভয় কি তাতে? কিন্তু একটা কথা জেন আমার—
হাসপাতালের লোকদের মা কি রকম যে ব্যাভার।
খেলনা দেবার নামে তোমায় গছিয়ে দিলো সেবার
কাঁদুনে এক খোকা!
আমি কিন্তু নেব না তা। নইকো অতো বোকা।
বলে দিয়ো খোকন দিতে আছে খুকুর মানা।
খুকুর আমার চাই যে কুকুরছানা।'

গান্ধীজী সম্বন্ধে আইনস্টাইন

গান্ধীজী তাঁহার দেশবাসীগণের নেতা। বাহিরের কোন ক্ষমতার নিকট হইতে তিনি কোন সাহায্য লাভ করেন নাই। কোন কূটনীতি বা কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া শুধু নিজের প্রখর ব্যক্তিত্বের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া তিনি রাজনীতিবিদ্ হিসাবে সাফল্যলাভ করিয়াছেন। বিজয়ী সৈনিক হিসাবে তিনি সর্বদাই বলপ্রয়োগের নীতির প্রতি ঘৃণা পোষণ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি জ্ঞানী, বিনয়ী ও দৃঢ়সঙ্কল্প এবং অনমনীয় স্থৈর্যসহকারে স্বজাতীয়গণের উন্নতি সাধনের জন্য তিনি তাঁহার সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। সাধারণ মানুষের সহজ মর্যাদা লইয়া তিনি ইউরোপের পশুশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সর্বদাই জয়ী হইয়াছেন। এইরূপ একজন যে মানুষের দেহ ধারণ করিয়া এই পৃথিবীতে বাস করিয়া গিয়াছেন, তাহা হয়ত মানুষের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হইবে।

সাপ আর খরগোশ

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(অপ্রকাশিত রচনা)

বন-রাজ্যে পুলিশ-পাহারাওয়ালা হলো সাপ। তার কাজ—ঘুরে ঘুরে পাহারা দেবে··· দেখবে, কেউ কারো কিছু চুরি না করে···কেউ না কারো উপর পীড়ন-অত্যাচার করে···সকলে যেন রাজ্যের আইন-কানুন মেনে চলে।

সাপ ঘুরতে ঘুরতে এলো একটা ঝোপের সামনে—ঝোপের মধ্যে খরগোশের বাসা···সে বাসায় খরগোশ থাকে তার ছানাপোনা নিয়ে।

সাপ এসে—বলা নেই, কহা নেই—ফস করে ঢুকলো খরগোশের বাসায়···ডাকলো,— খরগোশ !···

সাপ পাহারাওয়ালা···পাহারাওয়ালাকে বাসায় দেখে খরগোশ ভয়ে একেবারে এতটুকু ! হাত জোড় করে খরগোশ বললে,—আপনি···হঠাৎ···আমার বাসায় !

সাপ বললে,—হ্যাঁ···এলুম···তার মানে, তোমাকে আইন শেখাতে !···অর্থাৎ, বুঝলে কিনা ···তোমাকে না বলে, না ডেকে···তোমার হুকুম না নিয়ে আমি যে এই তোমার বাসায় ঢুকেছি···এতে আমি বে-আইনী কাজ করেছি। এমন বে-আইনী কাজ যদি কেউ করে, তাহলে তুমি আমার কাছে নালিশ জানাবে—আমি দেবো তাকে সাজা ! বুঝলে ?···

খরগোশ বললে,—আজ্ঞে !

সাপ সেদিন এ কথা বলে চলে গেল।

তারপর একদিন যায়···দু'দিন যায়···সাপ এসে আবার ঢুকলো খরগোশের বাসায়। খরগোশকে না ডেকে···সাড়া না দিয়ে···খরগোশের বিনা-হুকুমেই। ঢুকে সামনে দেখে, খরগোশের একটা ছানা খেলা করছে। অমনি কথা নেই, বার্তা নেই—ছানাটাকে টক্ করে গালে পুরে সাপ এলো বেরিয়ে।

বেরিয়ে সাপ খানিক-দূরে গিয়ে বসলো চুপ করে। বসে রইলো খরগোশের আশায়··· খরগোশ এসে তার কাছে নালিশ জানায় কিনা—তার বাসায় সাপ ঢুকেছিল বিনা-হুকুমে···আর ঢুকে তার ছানা চুরি করে খেয়েছে···দু'দিন আগে সাপ গিয়ে খরগোশকে বলে এসেছে—এ কাজ বে-আইনী···এবং কেউ বে-আইনী কাজ করলে, তার নামে নালিশ চলবে···বিচারে তার হবে সাজা !

সাপ বসে আছে তো বসেই আছে…খরগোশ আর আসে না।…এক ঘণ্টা…দু'ঘণ্টা… তিন ঘণ্টা গেল কেটে…খরগোশের তবু দেখা নেই। সাপ রেগে ফোঁশ্-ফোঁশ্ করতে লাগলো· কি…খরগোশের এত বড় আস্পর্ধা…আইন মানবে না!

রাগে ফোঁশ্-ফোঁশ্ করতে করতে সাপ এলো খরগোশের বাসায়…এসে বাসায় ঢুকলো,— খরগোশ…

খরগোশ ভয়ে ভয়ে তাকালো সাপের পানে। সাপ বললে,—আইন শিখিয়ে গেলুম… আর তুমি আইন মানবে না?… জানো—আইন না মানলে, তাকে সাজা পেতে হয়!

খরগোশ ভয়ে ভয়ে বললে,—আজ্ঞে, কি আইন আমি মানিনি—বলুন!

সাপ বললে,—কেন…তোমার বাসায় চোর এসেছিল…এসে তোমার ছানা চুরি করে খেয়ে গেছে…এত বড় অন্যায় করে গেছে। বিনা-হুকুমে তোমার বাসায় ঢোকে ছানা চুরি! এর জন্য আমার কাছে এসে নালিশ জানালে না যে?…

খরগোশ বললে,—আজ্ঞে, আপনিই এ কারচুপি করেছেন…না বলে আমার বাসায় ঢোকা …বাসায় ঢুকে আমার একটা ছানা চুরি করে আপনিই খেয়েছেন। আর আপনি বলছেন— এর জন্য আপনার কাছে গিয়ে নালিশ করবো…আপনি করবেন, এ-অপরাধের বিচার!…তার মানে, আপনার নামে আপনার অপরাধের জন্য আপনার কাছে করবো নালিশ…আর আপনি করবেন সে-নালিশের বিচার!…এব কোনো মানে হয়, হুজুর?…

সাপ ফোঁশ্ করে উঠলো…আবার তর্ক!…হ্যাঁ, তবু নালিশ করতে হবে!…কেন না— এ হলো আইন!…তুমি সে আইন মানোনি…ভঙ্গ করেছো!…আইন-ভঙ্গ করার অপরাধে আমি তোমার বিচার করে সাজা দেবো।

এ কথা বলে খরগোশকে ধরে সাপ টক্ করে তাকে ফেললো গিলে।

তারপর খরগোশের বাসা থেকে বেরিয়ে এসে সাপ করলো ইস্তাহার জারি—

> …এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে…আমি সাপ-পাহারাওয়ালা নিজের পেট ভরাইবার জন্য খরগোশকে খাই নাই…আমি তাহাকে খাইয়া শাস্তি দিয়াছি—আইন-ভঙ্গ অপরাধের শাস্তি!

সূর্যমুখী

শ্রীঅশোকা দাশগুপ্তা

টুটুম তার কচি কচি পুটপুটে ঠোঁট দু'খানি খুলে তাকিয়েছিল অবাক হয়ে। কপালে ঝামরে-পড়া কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের ফাঁক দিয়ে বড় বড় বিস্ময়-মাখানো চোখে দেখছিল বাগানের সূর্যমুখী গাছটাকে। ঠিক যেন একটা সোনার মুকুট। এই তো সেদিন এতটুকু ছিল গাছটা। টুটুমের চেয়ে ঢের ছোট। দেখতে দেখতে বড় বড় ঘন সবুজ পাতায় নিজেকে ঢেকেঢুকে, অন্ততঃ দু দু'টো টুটুমকে একের মাথায় আর একজনকে দাঁড় করালে যতটা হয়, প্রায় ততটা লম্বা হয়ে গেছে। আর আজ তার একেবারে মাথায় একটা বিরাট সূর্যমুখী ফুটেছে। কবে যে এসব হ'ল টুটুম তা জানতেই পারেনি। হঠাৎ তার ভারী ইচ্ছা হ'ল ঐ সোনার মুকুটটাকে একটু ছোঁয়। পা উঁচু করে অতি কষ্টে আলতো হাতে ছুঁতে চেষ্টা করল হলুদ পালকের মত নরম পাঁপড়িগুলো। কিন্তু নাঃ, তার নাগালের অনেক বাইরে থেকে নীল আকাশের বুকে মুখ তুলে সূর্যমুখীটা শুধু একরাশি সোনা সোনা হাসি ছড়িয়ে দিল। আর সবুজ বড় খসখসে পাতার রুক্ষ ছোঁয়ায় টুটুমের নরম গালটি জ্বালা করতে লাগল। ভারী রাগ হ'ল হিংসুটে সূর্যমুখীর কাণ্ডটা দেখে। হাসিও পেল ওর দেমাকে। মাটিতে দাঁড়িয়ে নাইবা পেল সূর্যমুখীর নাগাল, বাবার কাঁধে ব'সে, টুটুম অনায়াসেই সূর্যমুখীর নরম হলুদ পাঁপড়িগুলো ছুঁতে পারবে। টুটুম তার লাল টুকটুকে জিবটা বার ক'রে সূর্যমুখীর দিকে মুখ তুলে ভেংচে দিল।

—"কি হচ্ছে টুটুম, একলা একলা ভেংচি কাটছ কাকে? সেই অদৃশ্য শত্রুটি কে?" টুটুমের কলেজে-পড়া বেণী-দোলানো দিদি মিষ্টি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করে। ভারী লজ্জা পায় টুটুম। ছুটে গিয়ে দিদির কোলে চড়ে দিদির বুকে মুখ লুকোয়। দিদি আবার শুধায়, "কে রে?"

দিদির বুকে মুখ গুঁজে ছোট্ট কচি বাঁ হাতটা তুলে সে দেখায় সূর্যমুখীটাকে। মিষ্টি টুটুমের লজ্জা-লজ্জা মুখটাকে জোর করে তার দিকে তুলে ধরে দিদি জিজ্ঞাসা করে আবার— "কাকে?" টুটুমের লজ্জামাখা মুখে আবার বিস্ময় ঘনায়। ঘন সবুজ শাড়ী পরা দিদির মুখটাকে সূর্যমুখীর মত দেখায়। সোনা সোনা হাসি-ভরা মুখটার সঙ্গে টুটুম তার নরম গাল ছোঁয়ায়। কানে কানে বলে, "সূর্যমুখীকে।"

মিষ্টি টুটুমের ঝাঁকড়া চুলের গোছা নেড়ে দিয়ে দিদি বলে, "কে রে সূর্যমুখী, ঝমরুর মেয়েটা নাকি?"

—"যাঃ, সে কেন হবে ? ওর নাম তো মুনিয়া।"

টুটুম আবার সূর্যমুখীটাকে দেখায়। এবার হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে মিষ্টি। টুটুমকে নিয়ে হাজির করে বাবার পড়ার ঘরে। ঝগড়াটে টুটুমের সূর্যমুখীর সঙ্গে একলা একলা ঝগড়া করার কথাটা জানায়। বলবে-না বলবে-না করে টুটুমকে বলতেই হ'ল কারণটা। এবার যেন হাসির ঝড় উঠল। টুটুমের বাবার দরাজ গলার সাথে মিষ্টির রিনরিনে গলটা বাজতে লাগল। টুটুম অবশ্য এতে হাসির কিছুই খুঁজে পেল না। হাসি থামলে বাবা টুটুমকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে, বাবার কাঁধে চড়ে, নয় মাটিতে দাঁড়িয়েই সূর্যমুখীটাকে যাতে টুটুম তার হাতের নাগালের মধ্যে পায়, তারই ব্যবস্থা করবেন তিনি। হ্যাঁ, আজই। কিন্তু তার মানে যে এই টুটুম কি সেটা আগে জানতে পেরেছিল ? রিণ্টু, অন্তু ও বুবুদের সঙ্গে পার্কে গিয়েছিল খেলতে। বাড়ীতে আসামাত্রই বাবা তাকে ডেকে দেখালেন, টেবিলের উপর ফ্লাওয়ার ভাসে সকালের সেই অহঙ্কারী সূর্যমুখীটাকে। টুটুম তার কচি হাতের আঙুল দিয়ে সূর্যমুখীর নরম তুলোর মত হলুদ পাঁপড়িগুলোকে আলতোভাবে ছুঁল। ভীষণ কষ্ট হ'ল তার। চোখ ফেটে জল এল প্রায়। বাবার বন্ধুরা সব ব'সে ব'সে গল্প করছিলেন, এই সূর্যমুখীটাকে নিয়েই। সত্যি, এত বড় সূর্যমুখী এর আগে আর তাঁরা দেখেন নি। কিন্তু হঠাৎ টুটুমের কি হ'ল ? সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কেন ? টুটুমের বাবা ব্যস্ত হয়ে ভিতরের ঘরে এসে দেখেন, টুটুম তার মার কোলে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

টুটুম আবার সূর্যমুখীটাকে দেখায়।

—"কি হ'ল টুটুম ?" বাবা শুধান।

মা শুধান, "কি হ'ল ?"

দিদি ছুটে এসে প্রশ্ন করে, "টুটুমের চোখে জল কেন ?"

আর কেন ? সে কথা কি টুটুম নিজেই ভালো ক'রে বুঝতে পারে, না বোঝাতে পারে ! অতবড় সোনার মুকুটটা আর গাছটার মাথায় ঝকঝক ক'রে জলবে না। এ কথা টুটুম ভাবতে পারে না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অস্ফুট-স্বরে বলে, "গাছটায় আবার সোনার মুকুট পরিয়ে দাও।"

—"এ আবার কি বেয়াড়া আব্দার ?" বাবা রাগ করেন।

—"অতিরিক্ত আদরে মেয়েটার মাথা তুমিই নষ্ট করেছ।" মা অভিযোগ করেন। আর দিদি শুধু ওর ঝাঁকড়া চুলে বিলি কাটতে থাকে। টুটুম কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই মনে পড়ে যায় সব কথা। ছুটে তখনি বাগানে চলে যায় টুটুম। গিয়ে দেখে, খস্‌খসে বড় বড় সবুজ পাতার গাছটা মুকুট হারিয়ে ভারী কষ্ট কষ্ট চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। টুটুমের ভীষণ কান্না পেতে থাকে।

কিন্তু ওটা কি ? টুটুম পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর ক'রে, উঁচু হয়ে দেখার চেষ্টা করে— ঐ তো ঐ তো। টুটুম ভারী খুশি। গাছটা আবার মুকুট পরার আয়োজন করছে। আর একটা সূর্যমুখী ফুটছে। নতুন একটা কুঁড়ির আবরণ ভেদ ক'রে হলুদ সোনা সোনা দু'একটা পাঁপড়ি উঁকি দিচ্ছে। টুটুম পা উঁচু ক'রে দেখতে গেল। তার নরম গালটা ভারী সবুজ পাতাটার খসখসে ছোঁয়ায় আজও জলতে থাকে। তা জলুক—টুটুমের তাতে আপত্তি নেই।

সংবাদ

শ্রীবিনায়ক সেনগুপ্ত

দৌড়ে এসে বললে হাবা, "বলছি তোরে সাচ্চা
তোদের বাড়ীর আম বাগানে জ্যান্ত বাঘের বাচ্চা,
ঝোপের মাঝে ঘাপটি মেরে ঘুমিয়ে দেখেই লম্বা
আর কি সেথায় এক মিনিটও দাঁড়ায় ভাবিস, শম্মা।"
খবর শুনেই বুঝনু ব্যাপার অনেক করে চেষ্টা,
ঘামিয়ে কপাল থামিয়ে হাসি বলনু তারে শেষটা,
"অই তো মোদের কবলি বেড়াল এবার পূজোয় ছোদ্দা
দিল্লী থেকে আনলে কিনে দশটি টাকায় মোদ্দা।"

ফেলে আসা দিনগুলো

(তিন)

শ্রীসমর দে

সে দিন, যে আশার-জাল ছিন্ন হয়ে গেল যে ব্যর্থতার ফলে, সে দুঃখের জের চলল, অনেক রাত অবধি ছাদে বসে চোখের জল ফেলে।

নইলে, যে ভাবে 'মৌচাক' সম্পাদক শ্রদ্ধেয় সুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয়, তখনই একখানা পাঁচ টাকার নোট আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন—"মাঝে মাঝে আসবেন, আপনাকে ধাঁধার কাজ দেব।" আর তাতেই, আর্ট স্কুলের মাইনে আমার তিন টাকা ও কাগজ-পেন্সিল আর রঙ-তুলি কেনার ভাবনা যেমন চলে গিয়েছিল সে দিন থেকে!

তেমনি 'বেঙ্গল কেমিকেল'-এ প্রথম সাফল্যের পর, এবার আশা করেছিলাম শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু মহাশয়ের কাছেও কিছু কিছু কাজ পেলে—হোষ্টেলে আমার থাকা-খাওয়ার চিন্তা দূর করে, জীবন-সংগ্রামে জয়ী হতে যা প্রধান সহায় তা শুরু করব নিশ্চিন্তে ও আনন্দে।

অর্থাৎ, স্কুলে ছবি আঁকার কাজ শিখে নেব দারুণ পরিশ্রম করে। আর পড়াশুনায় যে বিষয়গুলো আমার বেশী প্রিয়, সেই ইতিহাস, সাহিত্য, ভ্রমণ-কাহিনী ও জীবনী—পড়ে যাব রাত্রিতে নতুন উদ্যমে।

—অবশেষে যে মানুষটির আশ্চর্য মনোবল ও বেঁচে থাকার সুন্দর নিয়মানুবর্তিতা, আমার চোখের জলে হঠাৎ মুক্তো ঝরাল, সে হচ্ছে আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক বা 'রবিনসন ক্রুশো'।

তবে যে অবস্থার বিপাকে পড়ে, তখন যাঁদের সাহায্যে আমি এতখানি এগিয়েছি—এবার তাঁদের কথা বলা দরকার। সেই সঙ্গে, ঘটনাচক্রে যে সহপাঠীর সঙ্গে আমার দেখা, তাও যেন বিধাতার করুণা ও দৃষ্টি যে আমার প্রতিও বিদ্যমান, তারই এক চমকপ্রদ আশ্বাসদান!

যাই হোক, মাত্র ন'বছর বয়সে কাশী দেখে ফেরার পথে সর্বপ্রথম কোলকাতা এসে দর্শনীয় স্থান দেখাতে যাদুঘর সংলগ্ন যে সুন্দর কারুকার্য করা লাল বাড়ীটায় পিতৃদেব আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেটি আর্ট স্কুল।

সেই থেকে নিজে চোখে দেখে যাওয়া স্বপ্নময় পরিবেশে একদিন তাঁর মনের আশা পূ করতে আমাকে বি. এ. পাশ করে পড়তে হবে, সে অপেক্ষার নির্দেশ ভেঙ্গে দিয়ে—জ্যাঠামশাইকে জানালাম আমার মনের অভিপ্রায়।

শুনে তিনি বললেন, "তুই প্যারস্পেকটিভ্ ড্রইং জানিস?"

—বললাম, "হ্যা জ্যাঠামশাই, জানি আমি। যখন ক্লাস থ্রীতে পড়ি তখনই। দা (জ্যাঠতুতো ভাই) যেবার লর্ড কিচেনারের ছবি এঁকে প্রাইজ পান ক্লাস টেন-এ—সেব

তাজমহলের ছবি এঁকে আমি প্রাইজ পাই ক্লাস থ্রীতে। তাই সে ছবি আঁকার সময়, বাবা আমাকে প্যারস্পেক্‌টিভ্ ড্রইং কাকে বলে, তা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

—তা ছাড়া খুব ভোরে উঠে, তিনি আমাকে নিয়ে যখন বেড়াতেন—তখন, দুটো রেল লাইন যে দিকচক্রবালে এক বিন্দুতে মিশে যায়, তা দেখালেন। দূরের ও কাছের গাছপালা আর বাড়ী-ঘর যে ছোট-বড় দেখায়—রঙ পালটে ক্রমশঃ যে ঝাপসা হয়ে যায়—সেই কালার প্যারস্পেক্‌টিভ্‌ও দেখালেন।

পরে, তাজমহলের ছবিতে সারি সারি ঝাউ গাছে—তিনি নিজে হাতে রঙ চাপিয়ে আগে-পাছে দেখানোর যে পদ্ধতি, তা আরও সহজ করে বোঝালেন।"

আনন্দ ও বিস্ময়ে আমার কথাগুলো শুনে, জ্যাঠামশাই বললেন, "তাইতো অতগুলো বছর যে পড়তে হয়!"

খবরটি যখন পথে-ঘাটে সর্বত্র লোকমুখে রাষ্ট্র হয়ে গেল, তখন কেউ খুশি আবার কেউ খুশি নয়! ফলে, তাদেরই কাছ থেকে বাধা এল, যাঁরা তাঁর বন্ধু, একটু বিষয়ী ও স্থানীয় লোন অফিসের ডিরেক্টার।

যেহেতু, জ্যাঠামশাইকে করতে হচ্ছে আমাদের প্রতিপালন, তার উপর, আমরা যদি তিন ভাই মিলে তাঁকে ছয় ছয় বছরের ধাক্কা সামলাতে—যার যার খেয়াল মত আর্ট লাইন, ইঞ্জিনীয়ারিং ও ডাক্তারী পড়ানোর জন্যে বায়না ধরি, তাহলে (বাবা ও ছোট ভাইকে কোলকাতায় কালাজ্বর চিকিৎসা করাতে) এঁদের প্রতিষ্ঠিত লোন-অফিস থেকে ঋণ করা দু'হাজার টাকা, যা সুদে-আসলে বেড়ে গিয়ে অনেক টাকা! তা শোধ হবে কবে? এর পরে আছে দুটি বোন, আছে তাদের বিবাহ দেবার দায়িত্ব!

ভাবলাম, এ বেড়াজাল ভেঙে জ্যাঠামশাইয়ের দুর্ভাবনা কাটিয়ে, বাড়ী থেকে পালাই। বিশেষ করে, তখন বাইরের বই পড়বার আগ্রহে—তার ইন্ধন যোগাচ্ছে কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের দুঃসাহসিক জীবনী।

ঠিক সেই পরিস্থিতিতে, আমার জ্যাঠামশায় শ্রদ্ধেয় শশীমোহন দে'র সঙ্গে সকল দায়িত্ব-পূর্ণ কাজে অগ্রণী এবং শহরের উন্নতিকল্পে তাঁর প্রতিকাজে সহযোগী, শ্রদ্ধেয় অশ্বিনীমোহন ঘোষ মহাশয়, ঐ দিনের স্টেট্‌সম্যান্ কাগজে বার হওয়া বাঙলার গভর্নর লিটন সাহেবের ছবি দেখিয়ে আমাকে বললেন, "ছানা, এই ছবি দেখে ভাল করে একটা সচ্ পেন্টিং করত! অত তারিখে, চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুল উদ্‌ঘাটন করতে ছোটলাট সাহেব যাচ্ছেন সেখানে। ফেরবার পথে, তিনি মৈমনসিংহে আসছেন অত তারিখে। তখন তোকে আমি নিয়ে যাব, ছবিটা দিতে

তাঁর হাতে। দেখিস, লাট সাহেবকে একবার খুশি করতে পারলে, তোর আবার আর্ট স্কুলে পড়ার ভাবনা!"

নতুন উৎসাহে সে ছবি আঁকা শুরু করে দিই। মনের কৌতূহলে তিনি এসে এসে দেখে যান। কিন্তু একদিন হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন, "দেখেছিস ছানা, আজকের কাগজে কী দুঃসংবাদ? ছোটলাট সাহেবের বিশেষ জরুরী কাজে, মৈমনসিংহে আসার প্রোগাম তাঁর বাতিল করতে হয়েছে। মাত্র দু'মিনিটের মধ্যে, রেল স্টেশনেই মৈমনসিংহবাসীরা তাঁকে অভিবাদন জানাবে। এখন ঐটুকু সময়ের মধ্যে তাঁকে তো কিছুই বলা যাবে না! দেখি, পরে আর কোন উপায় বার করা যায় কিনা।"

আবার কি করে পালানো যায়, তারই ফন্দি আঁটি। ভাবি, সিন-সাইনবোর্ড যখন আঁকতে জানি, তখন ট্রায়েল হিসেবে পালিয়ে দেখিনা ঢাকা? তাহলে সেখান থেকে কিছু রোজগার করে—পূজোর ছুটিতে সুরেশ নাগ এলে, তার সঙ্গে এবার ঠিক চলে যাব কোলকাতা।

কেন না, সে পড়ে আর্ট স্কুলে। ছাত্র থার্ড ইয়ারের। থাকে আর্ট হোষ্টেলে। তাই কথা প্রসঙ্গে আরও কত কিছু জানবার আগ্রহে—যখন তার কাছে শুনলাম, 'শিশুসাথী' ও 'খোকাখুকু'তে ছবি আঁকেন যে মণি দাশগুপ্ত ও ফণী গুপ্ত তাঁরা থাকেন হোষ্টেলে। 'হিমানী'র বিজ্ঞাপনে বিনয় বসুর আঁকা ছবি ছাড়াও—মাঝে মাঝে ছবি বের হয় যে প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের, তিনিও থাকেন হোষ্টেলে। এছাড়া রঙিন ছবি যে আঁকেন—পূর্ণ চক্রবর্তী, পূর্ণ সিংহ, উপেন ঘোষ দস্তিদার ও চারু সেনগুপ্ত, 'বসুমতী' ও 'ভারতবর্ষে', তাঁরাও থাকেন হোষ্টেলে।

তখন একদিকে এদের সুনাম আর একদিকে তার যারা সহপাঠী, ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য, নরেন দত্ত, অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়া), ধীরেন ঘোষ ও সুবল পাল তাদেরও যে আছে নতুন প্রস্তুতি! আর তারই দৌলতে নিজের খরচ নিজে চালিয়ে নেবার যে সম্ভাবনা আছে—তার কথা বলেও আমাকে জ্যাঠামশাইয়ের কাছে ধন্না দিতে হয় বার বার।

স্নেহ বসে, যতবার তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন আমাকে সেখানে পাঠাতে—ততবার ভণ্ডুল বাধায় আর দশজনে। শেষে তিনি বললেন, "ক'টা আর কাগজ! আর তার গ্রাহক সংখ্যাই বা কত? তাই এত কৃচ্ছসাধন ও জমি চাষ করা সত্ত্বেও সাহিত্যকদেরই ভাগ্য খোলেনি যে দেশে, সে দেশে আর্টের জমি ভাল করে চাষ না হতেই—ভাগ্য খুলে যাবে বই আর মাসিক কাগজে ছবি এঁকে!

এ ছাড়া, রাজা-মহারাজার পেন্টিং করার স্বপ্ন দেখে যারা যায় আর্ট স্কুলে—পরে তো দেখি, সবাই সিন আঁকে, ফটো তোলে, নয়ত করে ব্রোমাইড এনলার্জ!

তার চাইতে তোকে একটা ভাল ক্যামেরা কিনে দেই। ড্রইং মাষ্টারী যোগাড় করে দেই—সেই তো ভাল।”

বুঝলাম, যে আইনের কাজ ও বহু দায়িত্বের মধ্যেও জ্যাঠামশাইয়ের—সাহিত্য ও শিল্পে, সংগীতে ও নাটকে উন্নত রসজ্ঞান ও পরম আনন্দ, এ নিশ্চয়ই তাঁর মনের কথা নয়। তবুও কথাটা মনে লাগল ভীষণ! কিন্তু, তৎক্ষণাৎ সেই ভাঙা মনে জিদ বাড়ল দ্বিগুণ।

কেন না, শিশুকালে যার জীবন কেটেছে, এক সুখী পরিবারের সাজানো-গোছানো সুন্দর বাড়ীর স্বপ্নময় পরিবেশে—অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে, বইটি হাতে আসার আগে যার হাতে বাবা অফুরন্ত রঙতুলি যোগায়—হেসে-খেলে ছবি আঁকায়—প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্যকাব্যে আলো-ছায়ার বিচিত্র শোভা দেখিয়ে, এক ভিন্ন জগতের সন্ধান জানায়—তার জীবন কাটবে এক নীরস অপাঙক্তেয় ড্রইং মাষ্টার হয়ে!

তা ছাড়া, যার কথা শুনেছি পরম বিস্ময়ে, সেই শশী হেস মহাশয়ের ছিল নাকি এমন পর্যবেক্ষণশক্তি, যার বলে তাঁর পরিচিত যে কাউকেই তিনি এঁকে দিতে পারতেন অতি সহজে।

একদিন মৈমনসিংহের এক স্কুলের সামান্য পণ্ডিতি ছেড়ে—আরও ভাল করে ছবি আঁকার উদ্দেশ্যে তিনি চলে যান ইটালীতে। ফিরে এসে, আবার তিনি চলে গেলেন সে দেশেই।

তখনও আর্টে ইটালী সকল দেশের সেরা। ফ্লোরেন্স, মিলান ও ভেনিসের মত আরও নানা স্থানে—যেখানে ইটালীর তৎকালীন শ্রেষ্ঠ শিল্পীদেরও জন্ম ও কর্মস্থল, সেখানে তাঁদের কাছে গিয়ে কাজ শেখার জন্য সারা পৃথিবীর শিল্পীরা পর্যন্ত পাগল!

অতএব, যাঁর অনুগ্রহে র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, টিসিয়ানের গল্প শোনে যে শিশুকালে, তাঁদের আঁকা ছবি ও মূর্তির প্রতিলিপি দেখে যে বই-এর পাতায় পাতায়—সে ভুলে থাকবে একটি ক্যামেরা পেয়ে!

এবার সে ক্যামেরাও এল, আমার হাতে। তবে অন্য এক উপায়ে। যাক্ ভালই হ'ল। এ বয়সে পালিয়ে গেলে—কোন বাজে লোকের খপ্পরে পড়ে, হয়ত আর এক বিপদ হ'ত। তাঁর চাইতে আমাদের গোপাল মামা, যিনি আমার জ্যেঠিমারই ছোট ভাই, তাঁর ছিল ফটোগ্রাফী সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান আর ফটো তোলার রীতিমত বাতিক। তিনি তুলে ধরলেন আমার সামনে এক নতুন সুযোগ।

বললেন, “ছানা, সাইনবোর্ড লেখার ঐ বাজে কাজ যদি তুই ছেড়ে দিস্, তাহলে

তোকে আমি ফটো তোলা শিখিয়ে দিতে পারি। এবার বল, ওসব লিখে তোর হাতে এখন কত টাকা আছে?"

বললাম, "আমার নিজের যা কিছু দরকার, তা তো ঐ টাকা থেকেই কিনি। হাত পাতি না কারও কাছেই। তাই খরচ-টরচ হয়ে, হয়ত ৬০ টাকার মত হবে।"

—"বেশ, তাহলে আয় খুঁজে দেখি, হাউটন বুচারের ক্যাটালগে কম দামের কি ক্যামেরা আছে, যা তোর এই টাকার মধ্যে হয়ে যায়।"

তাসের সাইজে ফটো হয়, এমন একটি 'এনসাইন' মডেলের ৩৫ টাকা দামের ফোল্ডিং ক্যামেরা—শতকরা ৩৩ টাকা ৷৹ আনা কমিশন বাদ দিয়ে মাত্র ২৩ টাকায় কেনা যাবে, ভাবতেই পারিনি আগে!

তাই এর প্রয়োজনে, একটি ফোল্ডিং ট্রাইপড বা তেপায়া স্ট্যাণ্ড, চার ডজন প্লেট আর সেই অনুপাতে সিলভার প্রিণ্ট (যে কাগজে মেটে রঙের ছবি হয়) ও ব্রোমাইড প্রিণ্ট করার জন্যে ফটো তোলার কাগজ, প্রিন্টিং ফ্রেম, ডেভেলাপার ও হাইপো ইত্যাদিতে মিলিয়ে ৫৭ টাকার একটি ভি, পি, অর্ডার—কোলকাতার হাঙ্গার ফোর্ড ষ্ট্রীটে হাউটন বুচার কোম্পানীকে তিনি লিখে, আমাকে নিয়ে চললেন চিঠিটা ডাকে দিতে।

যেতে যেতে বললেন, "ভাবলে অবাক লাগে! আজ যেমন তোমাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি চিঠিটা ডাকে দিতে—তেমনি আমার এক দুর্দিনে, তোমার বাবা নগেনবাবু, লণ্ডনে তখন ১০ শিলিং-এ বক্স-ক্যামেরা পাওয়া যাচ্ছে এক বিজ্ঞাপন দেখে—তাঁর নিজের গরজে এক চিঠি দিয়ে, আমাকে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন ঠিক এই পথে।

সেই থেকে, আমিও সর্বক্ষণ গোপাল মামার সঙ্গে থাকি আর কৌতূহলে দেখি, তাঁর ঘরময় বিস্তৃত ফটোগ্রাফীর রাজ্যে, যেখানে তিনি সদা ব্যস্ত, সেখানে কোন্ ক্যামেরার কি ব্যাপার! রকমারী লেন্সের কি ব্যবহার? ডার্ক রুমে লাল আলোর সামনে বসে, প্লেট-ফিলিম্ ডেভেলাপিং, প্রিন্টিং ও ওয়াস করার নিয়মকানুন এবং ফটো ট্রিমিং, মাউন্টিং ও রিটাচিং-এর কত কিছু।

উপরন্তু যখন যে কাজটি তিনি করতেন, সে তো বলে দিতেনই, তাছাড়া থরে থরে গুছিয়ে রাখা বইগুলো থেকে—নয়ত ফটোগ্রাফী জার্ণালের পাতা খুঁজে বার করে দেখাতেন, যে আর্টিকেলে ছবি দিয়ে চমৎকার করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে—লাইট এণ্ড সেডের তারতম্যে ফটোর ভালমন্দের বিচার। লেন্সের ডাইয়্যাফ্রাম কমিয়ে-বাড়িয়ে—টাইমে এক্সপোজ দেবার সঠিক ধারণা। ফটোর গ্রুপ সাজাতে বা কোন বিষয়বস্তুকে ভাল পোজিশানে ঠিক রেখে, রকমারী কম্পোজিশান। এমন কি, খেলনা, পুতুল আর হাতে-আঁকা ব্যাকগ্রাউণ্ড বসিয়ে 'টেবিল টপ ফটো' তোলার কত কিছু কল্পনা!

ব্যাকগ্রাউণ্ড বসিয়ে টেবিল টপ ফটো তোলার কল্পনা।

ইতিমধ্যে আমার ক্যামেরাও এসে গেল। অমনি শুরু করে দিলাম এক টাকায় দু'কপি করে ফটো তোলার অভিযান। এগিয়ে এল বন্ধুর দল। তুলতে চায় যে-যার ভাবের অভিব্যক্তি। কেউ জার্সি গায় বুকে মেডেল ঝুলিয়ে বল হাতে, দু'হাত ছেড়ে কেউ সাইকেল চ'ড়ে, মালকোছা মেরে দু'হাতে কেউ বারবেল তুলে। এ ছাড়া ডাক আসে, শহরের এ-বাড়ী থেকে সে-বাড়ী। মাঝে মাঝে ডেকে নিয়ে যায় দূর গ্রামেও।

আজ সত্যি বিস্ময় লাগে! ১৯২৪ সনের জুন থেকে অক্টোবর, সেই পাঁচ মাসে ফটো তুলেছিলাম আমি যতগুলো—তাঁর সব ক'খানাই ডেভেলাপ ও প্রিণ্টিং করেছিলাম যেমন মামার সামনে বসে, তেমনি দরকার হলে, প্লেট কাগজ ডেভেলাপার কিনতে ছুটেছি উভয়ে—জামালপুর থেকে ৩২ মাইল দূরে মৈমনসিংহে।

তবুও আমাদের এই নিরলস ও বহুগুণের অধিকারী রুচিবান বিশিষ্ট ভদ্রলোক মামা, শ্রদ্ধেয় অনুকূলচন্দ্র দত্ত মহাশয় আমাকে একবারও বলেন নি, "আনা আজ থাক, কাল হবে, কিংবা এবেলা থাক, ওবেলা হবে।"

এদিকে পূজার ছুটিতে সুরেশ নাগ এল। তার সঙ্গে সব কথা বলে, জ্যাঠামশাইকে বললাম, "সুরেশ নাগ এসেছে, এবার ওর সঙ্গে আমাকে যেতে দিন। আর্টের যে জমি চাষ করা দরকার আপনি বলেছিলেন, সেই জমি আমিও চাষ করিতে চাই—বাবার আশীর্বাদ ও আমার কাজের নিষ্ঠা দিয়ে। আপনি শুধু, হোষ্টেলের ফুডিং চার্জ যে ১২ টাকা, সেই টাকাটা আমাকে পাঠাবেন।

খুশি চিত্তে তিনি রাজী হয়ে গেলেন। আর আমরাও একদিন ভোর বেলায় শিয়ালদহ পৌছে গেলাম। তারপর হোষ্টেলে এসে দেখি, সুরেশ নাগের এক রুমমেট, চারকোল দিয়ে পর পর এঁকে চলেছে কয়েকটি ছবি! আর মুখে গাইছে রামপ্রসাদের গান।

আমাদের সাড়া পেয়ে, তিনি উৎফুল্ল হয়ে বললেন, "এই যে সুরেশ নাগ! সঙ্গে আবার কে?"

সুরেশ নাগ, তার দিকে একটু হেসে আমাকে বললে, "দেখছ সমর, পার্বতী ভট্চায মেম্যারিতে কেমন পোর্টেট আঁকে।"

—"এ তো পার্শি ব্রাউন।"

"চিনলে কি করে? ওহে এতক্ষণে বুঝলাম, তোমার আসার কারণ! স্কুলের প্রস্পেক্টাসে দেখেছ বুঝি প্রিন্সিপালের ছবি? আচ্ছা, থাকো তুমি ঐ সিটে আমাদের গেষ্ট হয়ে। গৌর দাস শীগ্গির আর আসছে না। ততদিনে একটা সিট তুমি পেয়ে যাবেই।"

তবুও মুস্কিল হ'ল। অসময়ে এসেছি, তাই এ সময়ে স্কুলে ভর্তি করাতে চায় না কিছুতেই। শেষে, সুরেশ নাগের চেষ্টায় ভর্তি হলাম আর্ট স্কুলে।

ক্লাসে দু'জনে কাজ করা যায়, এমন একটি লম্বা কালো বোর্ডে কিছুক্ষণ কাজ করার পর, সেখানে এল এক নতুন ছেলে। এসেই আমাকে জিজ্ঞেস করে, আমি কবে ভর্তি হয়েছি, কোথায় থাকি। এসেছি কোথা থেকে এবং আমার কি নাম।

অমনি সে বিস্মিত হয়ে বলে, "আরে! দু'জনকেই আসতে হ'ল অফ্-সীজনে। ভর্তি হতে হ'ল একই দিনে। কাজ শুরু করতে হ'ল পাশাপাশি একই বোর্ডে। তার উপর, দু'জনেরই কাছাকাছি নাম! সমর আর অমর! ভারী আশ্চর্য তো?

ভালই হ'ল। ছুটির পর, আমি যাব ভাই তোমার সঙ্গে আর্ট হোষ্টেলে। আমি এসেছি চাটগাঁ থেকে। লিটনের ছবি আঁকায় তিনি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, ডি, পি, আই থেকে আমার পড়ার স্কলারশিপ—কাজেই, আমার সিট আগেই ঠিক করা আছে, হোষ্টেলের ১১নং ঘরে।"

শুনে, থ হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। বলতে পারলাম না আর কিছুই।

আলোর পরী

শ্রীসদানন্দ চট্টোপাধ্যায়

তরুণ আর হিমাদ্রী দুই বন্ধু। গতবার ম্যাট্রিকুলেসান পাশ করে দু'জনেই কলেজে ঢুকেছে। খুব ভাল ছেলে দু'জনেই। পড়াশুনায় ভাল, খেলাধূলায় ভাল—সব বিষয়েই ভাল। দু'জনের মনের মিলও খুব। একটি বিষয়ে তাদের মধ্যে কেবলমাত্র অমিল ছিল। অরুণের ধারণা পরার্থপরতাই মনুষ্যত্বের লক্ষণ। হিমাদ্রী বলত, পরার্থপরতা একটা সদ্‌গুণ বটে, কিন্তু স্বার্থপরতটা আরও বড় গুণ; নিজের উন্নতিটা আগে দরকার। আত্মরক্ষাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এ নিয়ে তাদের মধ্যে প্রায়ই তর্ক হ'ত। দু'জনেই নানা রকম নজীর দেখিয়ে নিজের নিজের মত প্রমাণ করবার চেষ্টা করত। কিন্তু তর্কের কোন মীমাংসাই হ'ত না।

একদিন এক অদ্ভুত উপায়ে মীমাংসা হয়ে গেল। এক পরী ব্যাপাটার মীমাংসা করে দিল। সেই গল্পই আজ আমি তোমাদের বলব। তোমরা হয়ত মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসেছো, ভাবছ পরী বলে আবার কিছু আছে নাকি! আছে বই কি। তবে শোন। পিঠে ডানা লাগানো যে রকম পরীর ছবি আমরা রূপকথার বইয়ে সাধারণতঃ দেখি, সে রকম পরী আছে কিনা জানি না। আমি অন্ততঃ দেখিনি কখনও, কিন্তু পরী আছে।

তারা আমাদের আশেপাশে অনেক সময় নানা বেশ ধরে ঘুরে বেড়ায়, আমরা কিন্তু চিনতে পারি না। এই যে প্রজাপতির দল নানান রঙের পাখা দুলিয়ে উড়ে বেড়ায়, ওরা সবাই প্রজাপতি নাও হতে পারে। ওদের মধ্যেই কেউ কেউ হয়ত পরী। নির্জন অরণ্যে বা গভীর রাত্রে যে সব সূক্ষ্ম সুর বা শব্দ আমরা শুনতে পাই, তাও হয়তো হতে পারে পরীদের আলাপ। এই যে গাছে গাছে প্রত্যহ অসংখ্য ফুল ফুটেছে—কত রঙের কত ধরনের ফুল, ওরা সবাই যে ফুল তার কি কোন প্রমাণ আছে? ওদের মধ্যেই কোন কোন ফুল হয়ত পরী। ফুলের ছদ্মবেশে আসে, কিছুক্ষণের জন্য পৃথিবীর আলো-বাতাস উপভোগ ক'রে ঝরে পড়ে। স্বপ্নের দেশে চলে যায়, আবার আসে।

তরুণ আর হিমাদ্রী যে পরীটিকে দেখেছিল তার চেহারা প্রথমে মানুষের মত ছিল না। আলোর সূক্ষ্ম রেখা একটি। গঙ্গার ওপারে যে গুহাটি আছে, তার ভিতর একদিন তারা ঢুকেছিল। গুহাটির সম্বন্ধে নানান রকম প্রবাদ প্রচলিত ছিল। কেউ কেউ বলত ওটা নবাবী আমলের সুড়ঙ্গ। বিপদের সময় নবাবেরা ওই গুপ্তপথ ধরে পালিয়ে নাকি আত্মরক্ষা করতেন। আরও নানান ধরণের গল্প প্রচলিত ছিল। কিছুদিন আগে দু'জন ডানপিটে সহেব নাকি গুহার মধ্যে ঢুকেছিল, আর ফেরেনি।

একদিন তরুণ ও হিমাদ্রী ঐ গুহার মধ্যে ঢুকে দেখে বিরাট একটা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে

একটি ফুটফুটে মেয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে।

বসে আছে। বিরাট অজগর। অজগর শেষে মানুষের ভাষায় কথা কইল। তরুণ অবাক্ হয়ে গেল যখন অজগর তরুণের নাম ধরে সম্বোধন করল। অজগর বললে, "তরুণ, তোমারই জন্যে আমি বহুকাল ধরে অপেক্ষা করছি।" তরুণ ভয়ে ভয়ে বললে, "আমার জন্যে, কেন?"—"তোমাকে খাব বলে।" সাপ বললে। তরুণ বললে, "আমাকে খাবে, সে কি!"

"তুমি পরার্থপর ত্যাগি লোক, একটু আগেই নিজের খাবার একজন ক্ষুধার্ত ভিখারীকে দান করেছ। দাতা কর্ণ, দধিচী, শিব প্রভৃতির উদাহরণ দেখিয়ে হিমাদ্রীকে তর্কে হারিয়ে দিয়েছ বারবার। সেই জন্যেই আশা করে আছি আমার ক্ষুধা তুমিই মিটাবে। আমি হাঁ করছি, এস আমার মুখের মধ্যে ঢুকে পড়। বহুদিন অনাহারে আছি চলে এস, আর দেরি করো না।" এই বলে প্রকাণ্ড হাঁ করে এগিয়ে আসতে লাগল অজগর। তরুণ ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। তারপর দু'জনেই অজ্ঞান হয়ে গেল।

দু'জনের যখন জ্ঞান হ'ল দেখলে তারা দু'জনেই পাশাপাশি শুয়ে আছে; আর একটি ফুটফুটে মেয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাঁসছে। রং যেন ফেটে পড়েছে, এক মাথা কালো কোঁকড়ানো চুল, কালো চোখের তারা দু'টি নাচছে। আর তার দেহ থেকে উপচে পড়ছে আলো। কাপড় ভিজে।

"কি ব্যাপার এখানে ঢুকেছিলে কেন? তোমরা জান এই গুহায় যারা ঢোকে তারা আর বাইরে যেতে পারে না।. ভাগ্যে আমি কাছে ছিলাম। গোঁ গোঁ শব্দ শুনে দৌড়ে এসে দেখি, তোমরা দু'জন অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছ। গঙ্গা থেকে আঁচল ভিজিয়ে এনে তোমাদের চোখে মুখে জল দিলাম তবে তোমাদের জ্ঞান হ'ল। আর কখনও এসো না এখানে, এই গুহার ভিতর থেকে মাঝে মাঝে বিষাক্ত হাওয়া বের হয়; চল বাইরে চল।" মেয়েটির সঙ্গে আস্তে আস্তে তারা গুহা থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে দেখে

গুহার দ্বারের কাছে তিনটি বড় বড় পাকা আম রয়েছে। দু'জনেরই খুব খিদে পেয়েছিল, দু'জনেই আমগুলোর দিকে লুব্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মেয়েটি মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছিল। হিমাদ্রী বললে—"এখানে আম এল কি করে ?"

মেয়েটি বললে—"আমার আম। আমি রেখে গেছি এখানে। খেতে খুব ইচ্ছে করছে নাকি ?"

—"খু···ব···।" হিমাদ্রি বললে।

তরুণ বললে—"আমারও খুব খিদে পেয়েছে।"

মেয়েটি হেসে বললে—"তা' বলে সবগুলো দিচ্ছি না। ভাগাভাগি করেনি তা'হলে। তোমরা দু'জনে একটি করে নাও, আমার জন্যে একটি রাখ। বেশী স্বার্থপরতাও ভাল নয়; পরার্থপরতাও ভাল নয়। কি বল ?" এই বলে মেয়েটি দু'জনকে আম দিলে—তারপর নিজের আমটি নিয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

আলোর পরীকে ওরা চিনতে পারলে না। ওদের তর্কের মীমাংসা হয়ে গেল। ওই ছোট মেয়েটি ওদের বুঝিয়ে দিয়ে গেল যে, কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি ভালো নয়। সামঞ্জস্য করে না চললে দুঃখ পেতে হয়।

মহাত্মা গান্ধী

শ্রীঅনুকণা খাস্তগির

তুমি হে গান্ধী, তুমি মহাত্মা,
যুগ যুগ ধরি তোমারি সত্তা
রহিবে স্মরণে
মানবের মনে।

রাজনীতি, ধর্মনীতি, কর্মনীতি মাঝে
সত্যের প্রভাব তব রাজে
খুলেছ অর্গল
ভেঙেছ শৃঙ্খল।

জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বমানবেরে
দেখায়েছ সত্যপথ নির্ভীক অন্তরে
তোমারে প্রণাম
নরশ্রেষ্ঠ মহান্।

সন্ধানী

কিশোর কিশোরীদের অসিচালনা

আজকাল আর বড় কাউকে অসিচালনা শিখতে দেখা যায় না, কারণ বোধ হয় এই আণবিক যুগে অসি তার মান খুইয়েছে। যাই হোক পশ্চিম জার্মানীতে আবার এর রেওয়াজ

হয়েছে। অসিচালনায় পারদর্শী অস্কার অ্যাড্‌লার শ'খানেক দশ থেকে পনের 'বছরের কিশোর-কিশোরীদের বছর দেড়েকের মধ্যে অসিচালানায় বেশ রপ্ত কোরে তুলেছেন। এরা এখন আক্রমণ ও আত্মরক্ষায় সমান পটু।

ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াদের হাসপাতাল

ঘোড়ার চিকিৎসায় ডাক্তার উল্‌ফ্‌ একজন বিশেষজ্ঞ। এতোকাল তার দুঃখ ছিল যে, পশ্চিম জার্মানীতে ঘোড়াদের চিকিৎসার জন্য কোন হাসপাতালের ব্যবস্থা ছিল না। এবার তিনি নিজেই তার সুরাহা করেছেন। একটা খামারবাড়ি দুই লক্ষ মার্ক ব্যয়ে কিনে, সেটাকে তিনি ঘোড়াদের হাসপাতাল বানিয়েছেন। অস্ত্রোপচার, এক্স-রে যন্ত্রপাতি, গদি আঁটা আস্তাবল সমেত এটিকে একেবারে একটি আধুনিক হাসপাতাল বলা চলে। রুগ্ন ঘোড়াদের জন্যে এখানে নানারকম পথ্যের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। বর্তমানে এখানে একসঙ্গে এগারটি ঘোড়ার চিকিৎসা করা যাবে। ডাক্তার উল্‌ফ্‌ জানিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে তিনি এই হাসপাতালকে আরও বড় করবেন। হাসপাতাল খোলার পর প্রথম একটি ঘোড়ার ঘাড়ে অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল এবং তা যে সম্পূর্ণ সফল হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

বহুতল ভাসমান 'কার পার্ক'

মোটরগাড়ি চালানোর জন্যে একটি জাহাজ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে হামবুর্গের কোন এক শিপ-ইয়ার্ডে। তৈরি হয়ে গেলে এর নয়টি ডেকে মোট ২'৭০০ মোটরগাড়ি রাখা যাবে।
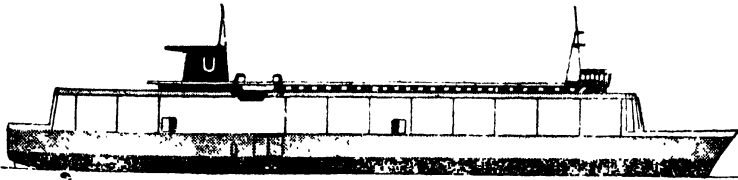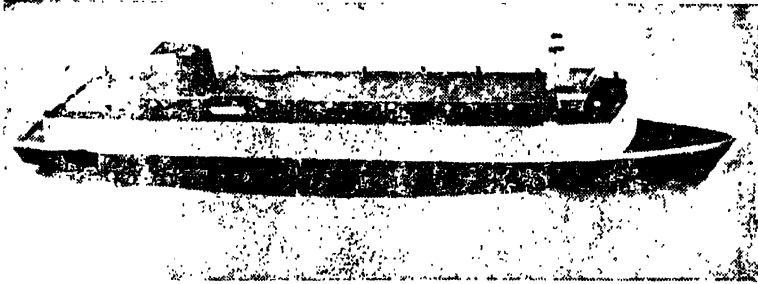
জাহাজটি এমন কায়দায় তৈরি হবে যে গাড়িগুলি চালিয়ে জাহাজের ডেকে তোলা যাবে ও বার করে নিয়ে আসা যাবে। মাঝ-দরিয়ায় তুফান উঠলে গাড়িগুলি ধাক্কা খেয়ে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে জন্যে জাহাজের ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যবস্থা থাকবে।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কি চাই, জিজ্ঞেস করল অরিন্দম। রিভলভারটা তার হাতে ধরাই আছে। সেদিকে তাকিয়ে লোকটার প্রায় কেঁদে ফেলবার মত অবস্থা। ঠিক সেই সময় সদর দরজার সামনে দত্তবাবুদের দরোয়ান এসে হাজির।

সেলাম বাবুজী, বলল দরোয়ান, এ লোকটা আমাদের কুঠিতেও গেছল; ডাকু আছে মালুম হচ্ছে। ওকে পুলিশের হাতে দিয়ে দিন হুজুর। ঘরের মধ্যে ঢুকে দরোয়ান লোকটার ব্যাগ খুলে সব জিনিস ঢেলে ফেলল মেঝের ওপর। স্ক্রু-ড্রাইভার, প্লাস ইত্যাদি কতগুলো যন্ত্র রয়েছে তাতে। দত্তবাড়ীর দরোয়ান অরবিন্দকে আরও মূল্যবান উপদেশ দিয়ে, একটা প্রকাণ্ড স্যালুট ঠুকে বিদায় নিল।

মিস্ত্রী সেজে যে লোকটা এসেছিল, তাকে পুলিশের হাতে দেওয়া হ'ল। পুলিশ তাকে নিয়ে চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই নরেনবাবু ফোন করলেন অরিন্দমকে।

অরিন্দম, এ লোকটাকে কোথায় পেলে ? জিজ্ঞেস করলেন নরেনবাবু।

আমার বাড়ীতে মিথ্যে অজুহাতে ঢুকেছিল। উত্তর দিল অরিন্দম।

লোকটা বউবাজারের মোড়ে জুতো পালিশ করে। পঁচিশ টাকা পেয়ে তোমার বাড়ীতে টেলিফোনের মিস্ত্রী সেজে গিয়েছিল। কিন্তু কে তাকে পাঠিয়েছিল বলতে পারছে না। প্রশ্ন করলেন নরেনবাবু।

নরেনবাবুর হাত থেকে কোন রকমে ছাড়া পেয়ে অরিন্দম চেয়ারে চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর লোকটা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে অনুসন্ধান করতে শুরু করল। হঠাৎ তার টেবিলের ওপর রাখা একটা চৌকো কার্ডের দিকে নজর পড়ল। নিমন্ত্রণের চিঠি ভেবে সেটা তুলে দেখে অবাক হয়ে গেল অরিন্দম। স্পষ্ট গোটা গোটা অক্ষরে লেখা, "দত্তবাবুর দরোয়ানের সেলাম নিন, খামোকা গরীব লোকটাকে পুলিশে দিলেন। ইতি—হরতন।" অরিন্দম স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হরতন তাকে বোকা বানিয়েছে। সে যখন ঐ লোকটার সামনে রিভলভার উঁচিয়ে বীরত্ব দেখিয়েছে, তখন হরতন দারোয়ান সেজে মজা

দেখেছে সমস্তক্ষণ। লজ্জায়, অপমানে, ক্ষোভে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অরিন্দম মুখার্জী।

গনপৎ সাউ, বিল্লু আর লতিফ বসে আছে অল হোয়াইট সোপ ফ্যাক্টারিতে।

দরজাগুলো বন্ধ আছে ? জিজ্ঞেস করল লতিফ।

হ্যাঁ, আছে। মাথা নাড়ল গনপৎ।

রেডিয়োটা চালিয়ে দাও জোর করে। বলল লতিফ।

শেল্‌ফের ওপরে রাখা রেডিওটা চালিয়ে দিল গনপৎ। চীৎকার করে একজন ওস্তাদী গান গাইছে কে। একটা টেপ-রেকর্ডার টেবিলে রেখে লতিফ বলল—এবার তোমরা কাছে সরে এস।

কাছে সরে এল সকলে। পকেট থেকে একটা টেপ বার করে যন্ত্রে লাগিয়ে দিল লতিফ। তারপর সুইচটা টিপে দিল। টেপ চালু হ'ল। একটা গম্ভীর গলা বলতে লাগল : "গনপৎ সাউ, তুমি আজকাল একটু ছটফট করছ বলে মনে হচ্ছে। কোন বদ মতলব থাকলে বিপদে পড়বে। বার সাবানের ওজন তিনবার কম হয়েছে এর মধ্যে। তার মানে, তুমি চার হাজার টাকা বেশী নিয়েছ। এটা ঠিক নয়। তোমার প্রাপ্য তোমায় বরাবর ঠিকই দেওয়া হয়েছে। দরকার হলে আরও চেয়ে নিতে পার, তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু চালাকি কোরে তুমি দলকে ঠকাবে তা চলবে না। সেই কারণে তোমায় বলছি লোভ ছাড়, না হলে বিপদ হবে। বিল্লু, তোমার আর সুলতানের কাজ ভাল হলে, তার জন্যে তোমরা ট্রানজিস্টার রেডিও আর একশো করে টাকা প্রত্যেকে পাবে। এর পরে যে কাজ করতে হবে তার জন্যে প্রস্তুত হও। লতিফকে আমি নির্দেশ দিয়েছি, তার কথা মত তোমরা চলবে। এলাহাবাদের কথা মনে করে ঘাবড়ে যেয়ো না। আমি নিজে দেখা করে এসেছি। লোকটা বৃদ্ধ। আমার দলের যে কোন লোক ওকে পিঁপড়ের মত টিপে মারতে পারে।"
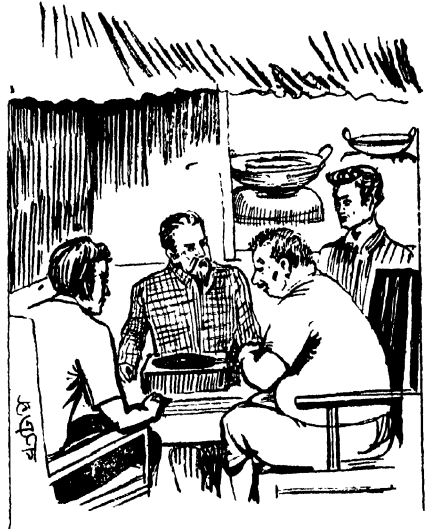
একটা টেপ-রেকর্ডার টেবিলে রেখে লতিফ বলল—

এইখানে টেপ শেষ হ'ল। লতিফ টেপটা নিয়ে একটা দেশলাই জ্বালল। তারপরে জ্বলন্ত কাঠি দিয়ে পুড়িয়ে দিল সেটা নিশ্চিহ্ন করে।

এলাহাবাদের তেওয়ারিজীর কথা মনে পড়ল অরিন্দমের। তিনি বলেছিলেন—চেষ্টা করে দেখ, হয়ত হরতনের দেখা পেলেও পেতে পার একদিনে। অরিন্দম স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে তার নিজেরই বাড়ীতে হরতনের সঙ্গে তার এত শীঘ্র দেখা হবে। হরতন তাকে তাচ্ছিল্য আর বিদ্রূপ করেছে। কথাটা ভেবে সে আরও দৃঢ়সংকল্প হ'ল।

এস এস. টেম্পেষ্ট একটা মাঝারি ধরনের মালবাহী জাহাজ। সাউদাম্পণ্টন থেকে বেশ কিছুদিন হ'ল জাহাজটা খিদিরপুর ডকে এসেছে। বেশীরভাগ মেশিনারি জাতীয় জিনিস আছে তাতে। মাল খালাস হচ্ছে রোজই। সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। গঙ্গার ধারে জনসমাগম নেই বললেই চলে। শুধু একটা জেলে-ডিঙি দাঁড়িয়ে আছে একধারে। একটু পরে একজন লোক চীনেবাদাম বিক্রি করতে এল একটা ঝুড়ি হাতে। তার কিছু পরেই বিল্লু এল কুলির ছদ্মবেশে।

এক আনার চিনেবাদাম দাও—পয়সা বাড়িয়ে দিল বিল্লু। দু'আনার [illegible]ন, একেবারে তাজা। বলল চীনেবাদামওয়ালা।

দু'জনেই হাসল ওরা। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে, গঙ্গার পার ধরে নেমে গেল বাঁধা জেলে-ডিঙিটার দিকে। মাঝি তাদের দেখে উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণ সে দিব্যি ঘুমোচ্ছিল নাক ডাকিয়ে। বাদামওয়ালার ছদ্মবেশে এসেছে সুলতান। বিল্লু আর সুলতান ডিঙির ওপর গিয়ে বসল। অন্ধকার হয়ে এল চতুর্দিক। রাস্তার গাড়ীগুলো মাঝে মাঝে তীব্র হর্ণ দিয়ে চলে যাচ্ছে এধার থেকে ওধারে। বিল্লু আর সুলতান একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে জাহাজটার দিকে।

হঠাৎ একটা টর্চের আলো জাহাজের দিক থেকে জ্বলে উঠল।

ঐ যে। বলল সুলতান।

চুপ। এখনও সংকেত পুরো হয়নি। একবার জ্বলে কিছুক্ষণ থাকবে। তারপর চার বার জ্বলবে আর নিভবে—পর পর।

দু'জনে ওরা স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেই দিকে। ঠিক তাই হ'ল। এবার মাঝিকে ডিঙিটা ধীরে ধীরে চালাতে হুকুম করল বিল্লু। একটা ছোট কাল রঙের জাঙিয়া পরে নিল বিল্লু। ডিঙিটা জাহাজের পেছন দিকে বয়ার কাছে গিয়ে পৌছতে বিল্লু ধীরে ধীরে নেমে পড়ল জলে। শুধু একটা টুপ করে আওয়াজ হ'ল মাত্র। ডুব-সাঁতার দিয়ে বিল্লু জাহাজের অপর পাশে চলে গেল। জাহাজ থেকে একটা একটানা আওয়াজ হচ্ছে।

একটু ভাল কোরে শুনল বিল্লু সেটা। আর কিছু নয়, জাহাজের ডায়নামোটা চলছে বলে বুঝল সে। জাহাজের ওপরে লোকজন চলাফেরা করছে এধার-ওধার ব্যস্ত হয়ে। এক, দুই, তিন—তিনটে পোর্ট-হোল বা ফোকর পার হয়ে, চতুর্থ টার কাছে এসে ভেসে উঠল বিল্লু। হাঁপিয়ে পড়েছে সে। খিদিরপুর এলাকায় বিল্লুর দারুণ প্রতিপত্তি। তার সাহস যত, শক্তিও তত। জাহাজের কাজে বিল্লুকে না হ'লে চলবেই না। জলে ডুবে সে অনেকক্ষণ থাকতে পারে, আর পুলিশকে সে থোড়াই কেয়ার করে। অনেক লড়াই সে করেছে পুলিশের সঙ্গে। হরতন যার পেছনে আছে, তার আবার ভয় কি?

বিল্লু একটু দম নিয়ে মুখে আঙ্গুল দিয়ে স্থঁই স্থঁই করে দুটো সিটি বাজাল পর পর। তারপর টুপ করে ডুবে গেল আবার।

একটু পরেই পোর্ট হোলের কাঁচের দরজা খুলে গেল। আর তার মধ্যে দিয়ে একটা প্যাকেট দড়ি বাঁধা অবস্থায় নেমে এল। জলের মধ্যে প্যাকেটটা লক্ষ্য করল বিল্লু। তাড়াতাড়ি গিয়ে দড়িটা ধরে টান দিল দু'বার। দড়িটা পড়ে গেল জলের ওপর। এবার বিল্লু ভেসে উঠল, অনেকক্ষণ সে জলে ডুবে ছিল। জাহাজের ধার ঘেঁষে সে দড়ি ধরে সাঁত্‌রে চলল ধীরে ধীরে। অবশেষে বয়ার কাছে পৌছল। লোহার শিকলটা ধরে একটু জিরিয়ে নিল সে। যদিও এ-কাজে সে অভ্যস্ত, তাহলেও সময় সময় একলা এ-কাজ করলে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। দড়িটা তার হাতেই ধরা আছে। ডিঙিটা অদূরে দাঁড়িয়ে আছে। সুলতান সেখানে পাহারা দিচ্ছে। চীনেবাদামের ঝুড়িটার মধ্যে শুধু বাদামই নেই, দুটো পিস্তল আর কয়েকটা তাজা বোমাও আছে। ডিঙিটাতে পৌছে প্যাকেটের দড়িটা পাশের একটা হুকে বেঁধে দিল সে। প্যাকেটটা জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে রইল। তবে ডিঙির সঙ্গে চলতে লাগল জলের মধ্যে। বিল্লু তার কাপড়-জামা পরে নিল। তারপর মাথাটা মুছে চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে নিল সযত্নে চুলগুলো। এবার বিল্লু আর সুলতান আরাম করে সিগারেট ফুঁকতে লাগল।

কেল্লা ফতে, কি বল? বলল সুলতান।

দাঁড়া, আগে মাল পাচার করি তারপর। উত্তর দিল বিল্লু।

হঠাৎ তীব্র স্বরে একটা সাইরেন বেজে উঠল।

ওটা কি? ভয়ে সুলতানের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে।

জল পুলিশ। বলল বিল্লু—বোমাগুলো জলে ফেলে দে।

আর পিস্তল দুটো? জিজ্ঞেস করল সুলতান।

আমায় দে।

পিস্তল দুটো নিয়ে বিল্লু মাঝির ভাতের হাঁড়ির মধ্যে পুরে দিল। উজ্জ্বল সার্চলাইটের আলো ফেলে সাদা লঞ্চটা হাঁসের মত স্বচ্ছগতিতে ভেসে এল। তাদের ইঙ্গিতে ডিঙিটা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একজন ইনস্‌পেক্টর ও দু'জন কনস্টেবল নামল ডিঙির উপর লাফিয়ে।

কোথা থেকে আসছ তোমরা? জিজ্ঞেস করল ইনস্‌পেক্টর।

ওপার থেকে, হুজুর।

কি আছে নৌকোয়?

কিছু নেই।

ও ঝুড়িতে কি আছে?

চীনেবাদাম। উত্তর দিল সুলতান। সেটা নেড়ে-চেড়ে দেখল একজন কনস্টেবল।

টর্চলাইট ফেলে ডিঙিটার চতুর্দিকে দেখে ইনস্‌পেক্টর বলল—তোমরা জাহাজের কাছে দাঁড়িয়েছিলে কেন?

বয়ার ফোকরে নৌকো আটকে গেছল। ভালমানুষের মত বলল বিল্লু।

ও হাঁড়িতে কি আছে?

মাঝির ভাত আছে হুজুর। বিনীতভাবে জানাল বিল্লু। (ক্রমশঃ)

লোকমাতা ভগিনী নিবেদিত

সু-মো-দে

লোকমাতা নিবেদিতা বিদেশিনী তুমি
তোমার সেবায় ধন্য পুণ্য বঙ্গভূমি।
বিদুষী মানসকন্যা ভারতভূমির
অনশ্বর মহাপ্রাণ দেশ জননীর।
রামকৃষ্ণ অনুরাগী শিষ্যা বিবেকের
আদর্শ মহিলা রত্ন আত্মিক পথের।
'জীবে প্রেম' সত্য ধর্ম রামকৃষ্ণ বাণী
জীবনে আদর্শ নীতি সুবিদিত জানি।
সন্ন্যাসিনী নিবেদিতা তোমার জীবন
অলৌকিক সাবলীল মনন চিন্তন।
বিবেকানন্দের তুমি মূর্ত আবিষ্কার
অমর জাগ্রত সদা প্রাণে জনতার।
হে ভগিনী নিবেদিতা গৌরবে তোমার
ভারতবাসীরা ধন্য স্মরি' অনিবার।

চলো যাই নেতারহাট

শ্রীরামপ্রসাদ সরকার

পূজোর ছুটিতে তোমরা তো কোথাও না কোথাও বেড়াতে যাও। কাশ্মীর বা সিমলা তো অনেক দূর। অতো দূরে যারা যেতে পারবে না, তারা চলে এসো বিহার রাজ্যে। আর এক ভূস্বর্গ দেখে যাও।

পূর্ব-ভারতের ভূস্বর্গ অথবা বিহারের 'Queen of Beauty Spots' বলতে নেতারহাটকেই বোঝায়। দূরত্ব এমন কিছু বেশী নয়। রাঁচি থেকে মাত্র ৯৬ মাইলের পথ।

হাওড়া স্টেশন থেকে রাঁচি-এক্সপ্রেস ধরে চলে এসো রাঁচি। রাঁচির রাতু রোড থেকে প্রতিদিন বেলা এগারটায় সরকারী বাস ছাড়ে। ভাড়া মাত্র ৫.৭৫ পয়সা। আগে থেকে রিজারভেশন করে যাওয়াই ভালো। সূর্যাস্তের আগে নেতারহাটে পৌঁছে দেবে।

রাঁচি থেকে ৬২ মাইল পথ অতিক্রম করে বাস এসে পৌঁছবে ঘাগরা বস্তীতে। ঘাগরা বস্তীকে ডাইনে ফেলে শুরু হয়েছে নেতারহাটের পথ। এখান থেকে দূরত্ব ৩৪ মাইল। উপজাতিদের অনেক ছোটখাটো গ্রাম, যেমন—ছাপাটেল, রেহিটেল, সেরকা, জাহুপ, চিপরি প্রভৃতি পেরিয়ে বাস এসে পৌঁছবে এই পথের শেষ গ্রাম 'বনারী'তে। বনারী থেকে শুরু হয়েছে উঁচুনিচু বিপদসঙ্কুল পাহাড়ী পথ। একদিকে সুউচ্চ পাহাড়, অপর দিকে গভীর খাদ—যার তল দেখা যায় না, তাকালেই মাথা ঘুরে যায়।

বনারী থেকে নেতারহাট পর্যন্ত এই বার মাইল পথটুকু তোমাদের খুব ভাল লাগবে। পথের দু'পাশে শাল, বাঁশ আর অজানা গাছের ভিড়। মাঝে মাঝে পাহাড়ী ঝরনার ক্ষীণ রেখা। একের পর এক পাহাড় ডিঙিয়ে বাস যখন প্রায় চার হাজার ফিট উঁচুতে উঠবে, তখন পথের দু'পাশের নিসর্গ শোভা দেখে তোমরা আত্মহারা হবে। পথের ক্লান্তি ভুলে যাবে। বাস এক সময় এসে পৌঁছবে নেতারহাটে। পাইন বীথি ও পাহাড়ী বাতাস তোমাদের স্বাগত জানাবে।

নেতারহাটের উচ্চতা ৩৬৭৬ ফিট। আয়তন ১৭ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা দু'হাজারের কাছাকাছি। প্রায় চার হাজার ফিট উঁচুতে এতোখানি সমতল জায়গা বিহারের আর কোথাও খুঁজে পাবে না।

নেতারহাটে থাকার জায়গা খুব বেশী নেই। পালামৌ ডাক বাংলো, রেভেনিউ বাংলো, পি. ডাবলিউ. ডি. ইন্‌সপেকশন বাংলো এবং ফরেস্ট রেস্ট-হাউসে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। তবে আগে থেকে ব্যবস্থা করে যেতে হয়। দোকানপত্তর কিছু নেই। একটা কোঅপারেটিভ স্টোরস্ আছে। সেখানে সব কিছু পাওয়া যায়। আর রয়েছে একটা চিপ-ক্যানটিন। এখানে স্বল্পমূল্যে নিরামিষ আহার পাবে।
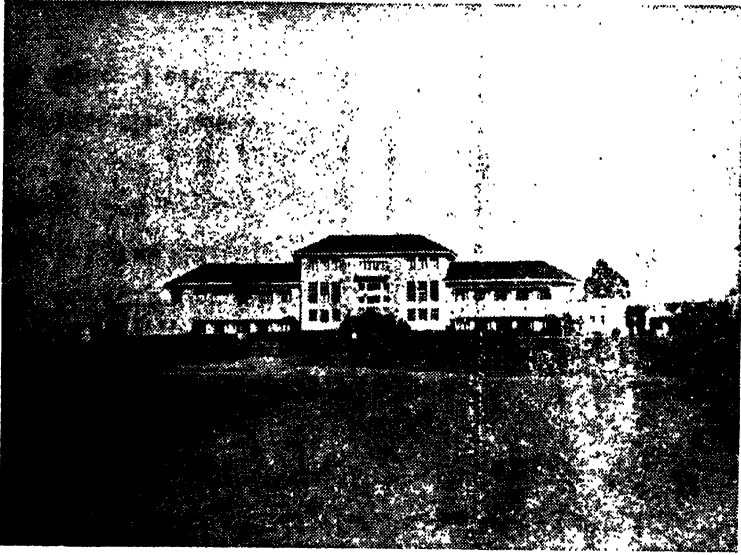
নেতারহাটের পাবলিক স্কুল

থাকা ও খাওয়ার অসুবিধে থাকলেও নেতারহাটের নিসর্গশোভা মন ভরিয়ে দেয়। চারিদিকে ছোট বড় নানান আকারের পাহাড়ের অপূর্ব সমাবেশ। পাইন, শাল ও বাঁশের জঙ্গল। মাঝে মাঝে আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ। অজস্র নাম-না-জানা রঙ-বেরঙের পাহাড়ী ফুল। সব মিলিয়ে আর এক ভূস্বর্গ রচিত হয়েছে যেন!

সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের দৃশ্য সহজে মন কেড়ে নেয়।

নেতারহাট থেকে দু'মাইল দূরে ম্যাগনোলিয়া পয়েণ্টে সূর্যাস্ত দেখতে যেতে হয়। সূর্যাস্তের প্রাক্কালে পড়ন্ত রোদের শেষ ছোঁয়া যখন সামনের পাহাড়গুলোর মাথায় এসে লাগে, তখন এক অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, কবির ভাষাও মূক হয়ে যায় এ দৃশ্য দেখে।

পালামৌ ডাকবাংলোর পাশেই 'সানরাইজ পয়েণ্ট'। ভোরের পাখি ডেকে ওঠবার আগেই গরম জামা-কাপড়ে আচ্ছাদিত হয়ে ভ্রমণার্থীরা এসে হাজির হয় সূর্যোদয় দেখবার জন্যে। সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে, সামনের পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে কখন সূর্য উঠবে।

পূবের আকাশ লাল হতে সুরু করে। আস্তে আস্তে আকাশের রঙ পালটায়। পাহাড় ও বনরাজি অপূর্ব রূপ ধারণ করে। সামনে প্রবহমান কোয়েল নদীর শীর্ণা-রেখা স্পষ্ট থেকে

স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। সকলের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে এক সময় সূর্য ওঠে। গাছপালা, পাহাড়, নদী, প্রভাতের প্রথম সূর্যালোককে অভিনন্দন জানায়।

নেতারহাট ভিউ-টাওয়ার থেকে নেতারহাটের সম্পূর্ণ ছবি তোমরা দেখতে পাবে। এক পাশে ছোট্ট জনপদটি। অপর পাশে সবুজ শ্যামল বনরাজি; অদূরে কোয়েল নদীর শীর্ণ রেখা দিগন্তের গায়ে গিয়ে মিশেছে যেন।

লাল সুরকির পথ ধরে এগিয়ে যাও। পাইন-বীথি এসে পৌছবে 'নেতারহাট পাবলিক স্কুলে'। বিহার রাজ্য-সরকার ১৯৫৪ সালে এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে ৩৬০টি ছাত্র পড়াশুনা করে। বিহার সরকার সব খরচ বহন করেন।

সঙ্গে গাড়ী থাকলে আশেপাশের কয়েকটি ঝরনা, যেমন—আপার ও লোহার ঘাগরী, বুরাহাডুগ, লোধ, সাডনী প্রভৃতি দেখে আসতে পারো। খুব ভালো লাগবে।

বিহার রাজ্য-সরকার লক্ষাধিক অর্থ ব্যয়ে সান রাইজ পয়েণ্টে ৫০ জনের রাত্রিবাসের উপযোগী একটি 'টুরিস্ট লজ' গড়ে তুলছেন। স্বল্প খরচে এখানে থাকা-খাওয়া যাবে। নেতারহাট ও আশপাশের দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখবার জন্য টুরিস্ট বাসেরও ব্যবস্থা হচ্ছে।

নেতারহাট থেকে ফেরার বাস ছাড়ে সকাল সাতটায়। রাঁচি-হাওড়া এক্সপ্রেস ধরিয়ে দেয়।

বিদ্যাসাগর

শ্রীজগজ্জীবন জানা

মেদিনীর মণি ধরণীর গুণী বিদ্যাসাগর বীর,
যাঁর নাম স্মরে' আবাল বৃদ্ধ নোয়ায় তাদের শির।
বীরসিংহের মুকুট-রতন পুরুষসিংহ প্রাণী,
দয়ারসাগর প্রেমাবতার শান্তি-সাধক মানী।
দীনের সহায় করুণানিধান এমন মহৎ প্রাণ,
মর এ-জগৎ ত্যজিয়া গেছেন করিয়া সকলি দান।
বাংলা ভাষার জনক, বিধবা-বিবাহের প্রবর্ত্তক,
স্বার্থত্যাগী পরোপকারী মাতাই যে তব সব!
মহা সে মানব চলিয়া গেছেন রহিয়াছে তাঁর স্মৃতি,
গুণমুগ্ধ দেশবাসী সবে জানায় তাঁরে যে নতি।

অপরাজা

(উপন্যাস)

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

যাত্রী বলে, "আহা, হয়েছে নাকি ?"

মহারাজা বলে, "ঠিক হয়নি। কিন্তু হতে বাকিই বা কি ? শুনলেন তো কত কষ্টে রাজ্য চালানো। তার ওপর প্রজাদের এমন ছ্যাচড়ামী ! এ তো গোদের ওপর বিষফোঁড়ার সামিল !"

যাত্রী সায় দিয়ে বলে, "তা তো বটেই।"

মহারাজা বলে, "তবু আমার বুদ্ধি আছে বলে সামলে নিচ্ছি। মহারাজা থেকে প্রজা যখন হতে হ'ল, ক'ধাপ উঁচুতে থাকতে চেষ্টা করছি।"

যাত্রী জিজ্ঞেস করে, "তা আবার কি ?"

মহারাজা বলে, "জানেন না বুঝি ? মহাপ্রজা। তা' হল গিয়ে প্রজার মোড়লদের ওপরে। মোড়লদের সায় পেলেই হওয়া যায়। ঐ যে যাকে বলে গিয়ে ভোৎ (ভোট)। দেখাচ্ছি।" মহারাজা উবু হয়ে গাঁটরি থেকে একটা ডাবা হুঁকো বার করল।

যাত্রী বলে, "এ দিয়ে কি হবে ?"

মহারাজা বলে, "কিনা হবে বলুন ? ফুঁ দোব।"

যাত্রী বলে, "হুঁকো তো তামাক খাবার জন্য।"

মহারাজা বলে, "বোকারা সব জানে না। হুঁকো দিয়ে এক ঢিলে দু'পাখী মারা যায়। তামাক সেজে নিজে টানেন, তার আয়েস। আবার প্রজাদের মুখে ধোঁয়ার ফুঁ দিয়ে তোয়াজ করুন, তারা খুসী। এই সরেস বুদ্ধি আমার আমদানী। এভাবে মোড়লদের হাত করলেই তারা বলবে, "ভোৎ দিন।" তারপর বুক ঠুকে বলে, "কাকে? এই আমাকে!"

যাত্রী তাকে তারিফ করে বলল, "মহারাজ, আপনি দেখছি বাচ্ছা ক্ষুর চালাতে জানেন। গাল কাটা কেন, গোঁৎ মেরে গলাও কাটতে পারেন।"

মহারাজা বলে, "তা পারি। কিন্তু ওরা টের পাবে না। প্রজাদের সঙ্গে গলাগলির চেষ্টা করছি। গালাগালির চেয়ে তার দাম বেশী। দেখাচ্ছি—"

মহারাজা আবার উবু হয়ে হুঁকো রেখে দিল। বার করল কাপড় পেঁচান একটা গোল জিনিস।

যাত্রী বলল, "এটা কি? ঢাল নাকি?"

মহারাজা বলে, "আজ তলোয়ারই নেই। ঢাল দিয়ে কি হবে? এখন তো যার ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, সেই নিধিরাম সর্দার।" মহারাজা খুলে দেখায়।

যাত্রী দেখে বলে, "টেকো!"

মহারাজা বলে, "ঠিক ধরেছেন। ছেঁচা বাঁশে তৈরী, বেত দিয়ে বাঁধা এই ছাতা মাথায় দিয়ে চাষীরা চাষ করে। রোদ জল ঠেঙিয়ে অসুখ ঠেকায়। এখন হাতে-কলমে চাষ করি না-করি, টেকো মাথায় যদি মাঠে দাঁড়াই প্রজারা বোকা বনে যাবে।"

যাত্রী অবাক হয়ে চায়।

মহারাজা বলে, "ধোঁকা দেবার দিন তো! হুঁকো হাতে, টেকো মাথায় চাষীদের মাঝে দাঁড়াব। ওরা আর রাজা বলে নাক কুঁচকাবে না। আসলে ওরাই চাষ করবে। মাঝ থেকে ভাগ পাব।"

যাত্রী বুঝল, শুক্নো আদার মত মহারাজার নষ্টামীর ঝাঁঝ এখনো কাটেনি। যাক তবু মন্দের ভাল। দাঁড়াতে পেলে মানুষ বসার জায়গা খোঁজে। মাঠে দাঁড়াবার অভ্যাস হলে মহারাজা চাষে হাত দেবে।

মহারাজা টেকো দেখিয়ে বলল, "খুব শক্ত, পোক্ত। টিপে দেখুন। কিন্তু জোটাতে হুটোপুটি হয়েছে।"

যাত্রী বলে, "কি রকম?"

মহারাজ বলল, "তার কি কম রগড়? ফেরার আগে হঠাৎ মনে হ'ল, শহর থেকে টেকো কিনেনি। ভাল জিনিস হবে, আর দেখে প্রজারা খুশী হবে। এ-দোকান সে-দোকান

খুঁজি। কিন্তু তারা বোঝে না। টুপি দেখায়, ছাতা দেখায়। আ মোল! ধানের চাল খাস, আর চাষবাসে কি লাগে জানিস না? তারপর না জানতে চাস ধান গাছে কি কাঠ হয়?" মহারাজা ফেক্ ফেক্ করে হাসে।

যাত্রী বলে, "তবে জোটালেন কি করে?"

মহারাজা বলে, "কপাল কুটে! কতক দোকানী খালি চাল দিয়ে বলে, এখানে এসব চলে না মশাই। সাহেব দোকানে চলে যান। বরাত ঠুকে গেলাম। মস্ত বড় দোকান। তার তো হালচাল জানি না। এদিকে চাই, ওদিকে চাই। এক মেমসাহেব আসে। আমি বাংলায় বলি, সে বোঝে না। সে চিঁ চিঁ গলায় ইংরেজীতে কি বলে আমি বুঝি না। তারপর দেখি কাঁচের আলমারিতে বড় টুপি মাথায় এক মেমসাহেব দাঁড়িয়ে। টুপিতে ঘোরান বারান্দা। তা দেখিয়ে টেকো বোঝাতে চাই। কিন্তু এমন সোজা কথা মেমসাহেব বোঝে না।" মহারাজ দাঁত দেখিয়ে বলে, "সাদা চাম হলে কি হবে? আসলে গোলাপ জাম নয়, কালো জাম!"

যাত্রী বলে, "নাম সমঝালেন কি করে?"

মহারাজা বলে, "ঝম্‌ঝম্ বাজনা বাজিয়ে। তা কম কথা নয়। বলি: মনে হ'ল, সাহেব দোকান, বড় টুপি যখন আছে, টেকোও আছে। টেকো, টোক্কা, ঠেকো, ঠোক্কা, এমনকি টেক্কাও বললেম। কিন্তু উঁহু, মেমসাহেব বোঝে না। ছেলেধরা ঠেকাবার জন্য আমার হাতে মোটা লাঠি ছিল। মেমসাহেবকে শেষবারের মত বোঝাতে আমার আঙুল দিয়ে তার খালি মাথায় টোকা দিলেম। সেই সঙ্গে দিলেম লাঠি দিয়ে কাঁচের আলমারিতে ঠোকা। ব্যস্! ঝন্‌ঝন্ করে কাঁচ ভাঙল, আর মেমসাহেবও খ্যান খ্যান করে গলা ছেড়ে চেঁচাল। আর পিল পিল করে আমাকে ঘিরে জুটল দোকানের এক পাল লোক। বুরবক রাজ্যের রাজাকে তারা পরোয়া করল না। ঘাড় ধরে দোকানের বার করে দিল।"

যাত্রী মুখ ফিরিয়ে বলল, "মারধোরও করল কি?"

মহারাজা বলল, "মারধোর ঠিক নয়। ওরা লোক ভাল।"

যাত্রী বলে, "কি রকম?"

মহারাজা বলল, "কাঁচ ভাঙলেম। তার দাম নিল না। বরং ঠেলা মেরে যাবার রাস্তা দেখিয়ে দিল।"

যাত্রী বলল, "তারপর কি করে জোটালেন?"

মহারাজা বলল, "বাড়ী ফিরে মহা সেনাপতিকে বললেম। সে আমাকে তার এক গাহেকের জিম্মা করে দিল। তার সঙ্গে এক পাড়াগাঁয়ে গেলাম। গাহেকটি ভালমানুষ।

ফিরিওয়ালা। গাঁয়ের ভেতরে হাঁটে, আর মাথা দেখিয়ে বলে 'চাই টোকা।' এখন সে গাঁয়ে থাকে যত সব ধাম্মিক লোক। তারা অতিথ্ ফেরায় না, যা চায় তা দেয়। আমরা সে গাঁয়ে নতুন। অতিথের সামিল। মাথার টোকা যাচ্ছি। তারা দলে দলে এসে আমাদের মাথায় টোকা দিতে লাগল। একটা-দুটো নয়,—ঝাঁকে ঝাঁকে টোকা। তারা বোকাও। এর ফল কি হ'ল, ফিরে চাইল না। আমাদের মাথায় বৃষ্টির শিলের মিসিল চালাল!"

যাত্রী যলে, "শিলাবৃষ্টি?"

মহারাজ বলে, "হাঁ। আর চাইনে, আর চাইনে বলে, বহু চেঁচালেম, তবে থামল। তারপর ব্যাপার বুঝতে পেরে টেকো এনে দিল কিন্তু দাম নিল না। বিনা টাকায় টেকো পেয়ে টোকার ব্যথা ভুলে গেলাম।" রঙ্গের কথা সাঙ্গ করার পর মহারাজা এক গাড়ী লোকের মাঝে টেকো মাথায় দিল। তারপর মহারাণীকে ডেকে বলল, "সেই টেকো! এর জন্য টাকা দিতে হয়নি। একদিন টোপর পরেছিলেম। আজ পরেছি টেকো।"

তারপর হি হি করে হাসল। তার হাসি দেখে আহ্লাদী আর জল্লাদী গলাগলি ধরে এক গাল হাসি ছড়াল!···

ওরা মুখোমুখি বেঞ্চিতে বসেছিল। অহ্লাদী কিনে এনেছে মাটির বেহালা, আর জল্লাদী এনেছে ডুগ্‌ডুগী। আসার সময় ছিল রাত। ভাল করে দেখাশোনা হয়নি। এবার দিনের বেলা চোখ পাকিয়ে বাইরে দেখ্‌ছে। বাইরে ঘর-বাড়ী গাছপালা ছুট্‌ছে। জল্লাদী বলে, "দেখ্‌ছিস? গোল্লাছুট খেল্‌ছে!"

আহ্লাদী ঝুঁকে পড়ে দেখে, কে জেতে।

মহারাণী বলে, "মুখ বাড়াস নি।"

আহ্লাদী ভয় খেয়ে মুখ টান্‌তে যেয়ে জাল্লাদীর মাথায় গুঁতো খায়। জাল্লাদী তখন গদগদ হয়ে ডুগডুগী বাজাচ্ছিল। আহ্লাদীকে বল্‌ল, "মহারাজা হাসছে রে। বেহালা বাজা।"

তারা কনসার্ট বাজায়। মহারাণী ফিক্‌ফিক্ হাসে।

যাত্রী বোঝে, বুরবক রাজ্যের রাজ-পরিবার আজ থার্ড ক্লাস গাড়ীর কাঠের বেঞ্চিতে বসে মৌজ করে চলেছে! জাল্লাদীর খাবার ষাঁড়ে খেয়েছে। তার বেশী খিদে। খাই খাই করে। আহ্লাদী খাজা গজা মোয়া বার করে, আর দু'জনে মুখ ফিরিয়ে খায়। রাজা হাত বাড়িয়ে বলে, "আমাকে—"

জাল্লাদী যাত্রীর দিকে চেয়ে বলে, "নাও—"

জানা নেই, শোনা নেই, মেয়েটা তাকে খাবার সাধে। যাত্রী শুরুতে অবাক হয়। তার পর টের পায় আসলে সে টেরা। রাজার দিকে চেয়েছে, আর মনে হচ্ছে তাকে ডাকছে। কিন্তু

রাজা ঠিক বোঝে। হাত পেতে নেয়। যাত্রী তাকে খাইয়েছে। তাই তাকে সাধে। যাত্রী বলে, "তুমি রাজা তো,—খাও। আমি মুখ হাত ধোব, তারপর।"

রাজা বলে, "ও"। তারপর কচর-মচর করে খায়।

মহারাজা অবশ্য খায় না, কিন্তু তার মুখ চল্‌তে থাকে। সে বলে, "ব্যাঙ দেখেছেন? কালো ব্যাঙ? কোল্‌কাতায় থাকে না। থাকে পাড়াগাঁয়ে, খালে-বিলে। বর্ষাকালে বৃষ্টি-বাদলে বেহালা বাজায়।" তারপর আহ্লাদীকে ডেকে বলে, "ব্যাঙের বেহালা শুনিয়ে দাও তো।"

মহারাজার হুকুম। আহ্লাদী বাজায়। জল্লাদী বলে, "আমিও বাজলা শুলাব, (বাজনা শুনাব)?"

মহারাজা বলে, "এট্টু পর। আগে ব্যাঙের ডাক শুনিয়ে নাও।" তারপর যাত্রীকে বলে, "শুনলে তো? ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ,—ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ! এ গান ব্যাঙেরা বানিয়ে ছে। ঝম্‌ঝম্ জলে বসে ওরা গায়। কিন্তু অত জলে পাছে গলা ভাঙে, তাই ওরা মাথা খাটিয়ে তৈরী করেছে ছাতা। দেখেন নি?"

যাত্রী বলে, "হ্যাঁ দেখেছি। ব্যাঙের ছাতা।"

মহারাজা তারিফ করে বলে, "চোখ আছে! ঠিক বলেছেন। এখন আসল কথা বলি, শুনুন। ইস্কুল আর নেকাপড়ার অনেক কথাই তো বল্‌লেন। এখন নেকাপড়া শিখেছিল কোন ইস্কুলে বলুন তো।" মহারাজা ফেক্‌ফেক্ করে হাস্‌ল। প্রশ্ন শুনে যাত্রী অবাক হয়। বলে, "মহারাজ, ব্যাঙ লেখাপড়া শিখবে কেন?"

মহারাজা মাথায় হাত দিয়ে বলে, "সবাই শিখবে, আর ব্যাঙ বাদ যাবে! ব্যাঙ মানুষ নয়?"

যাত্রী মুখ টিপে বলে, "নিশ্চয়। সেও তো ব্যাঙ মহারাজ!"

মহারাজ বলে, "ঠিক বলেছেন। ছেলেবেলায় ব্যাঙ থাকে ব্যাঙাচি, আর লেজ নেড়ে চলে। আর বড় হতে যখন লেজ খসে, তখন লাফিয়ে চলে। তার পর ছাতা মাথায় তানপুরা বাজিয়ে গান শোনায়। এই যে নাচ হয়, গান হয়, টেকো মাথায় চাষ, আর ছাতা মাথায় অফিস যাওয়া ও রাজার অভিষেক, তা কে শেখাল জানেন?"

যাত্রী বলে, "না তো!"

মহারাজা বলে, "ঐ ব্যাঙ! আপনাদের ইস্কুলে পড়ে নয়, কেতাব পড়ে নয়,—নিজে নিজে। নিজের মগজ থেকে নিজে শিখেছে। আর তা দেখে মানুষ শিখেছে। ব্যাঙের মাথা দেখেছেন? ঘাড় নেই, গলা নেই। মাথা থেকেই পেট আর ভুঁড়ি। তাই তুড়ি মেরে চলে। তেমনি—"

মজাদার কথা! যাত্রী বলে, "তেমনি কি?"

মহারাজ তার মাথা এলিয়ে দেয়। বলে, "এই মাথা! রাজা-মহারাজার মাথা। সেখানে লেখাপড়া, কেতাব, বুদ্ধি—সব গজগজ করে।"

যাত্রী চেয়ে দেখে ঠিক। মহারাজারও ঘাড় নেই, গলা নেই। মাথা থেকেই ভুঁড়ি। নাব্‌তে সিঁড়ি লাগে না।

যাত্রী বলে, "সরি (দুঃখিত)। আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। আর ডারউইন সাহেবকে চিঠি লিখব।"

মহারাজা বলে, "'সে আবার কে? ব্যাঙের কেউ নাকি?"

যাত্রী বলে, "তা জানি নে। তবে তানপুরা বাজিয়ে বলেছে—ব্যাঙ, গিরগিটি, বনমানুষ নাকি মানুষের পূর্বপুরুষ।"

মহারাজা বলে, "তা মন্দ বলেনি।" যাত্রী বলে, "একটা প্রাইজ দিন।" মহারাজ ভেংচি কাটল। যাত্রীর ভয় হ'ল, মহারাজার বক্তিমে আবার কোনদিকে তুফান তোলে। তা চাপা দেবার জন্য বল্‌ল, "মহারাজ, একটি কথা আছে। ভয়ে বল্‌ব, না নির্ভয়ে বল্‌ব?"

মহারাজ বলে, "নির্ভয়ে।"

যাত্রী বল্‌ল, "শহর থেকে টেকো আন্‌লেন। ট্রাক্‌টার আনলেন না কেন?"

মহারাজা এ নাম শোনেনি। জিজ্ঞেস করল, "সেটা আবার কি? বড় টেকো, না টাকের ওষুধ? জাঁক করা নাম তো!" (ক্রমশঃ)

দু' হাতে দুটো চাই

শ্রীঅমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দু' হাতে দুটো চাই
পেলে সে খুশী ভাই
না হলে মন তার ভরে না,
বাড়ীতে ফিরে এলে
দৌড়ে ছোট ছেলে
দাঁড়ায় কাছে এসে, নড়ে-না;

এ' হাতে চকোলেট
অমনি মাথা হেঁট
ও-হাতে আর কিছু চাই-যে,
কত যে খোঁজাখুঁজি···
পকেটে নেই বুঝি,
ভাবছি কাছে কি পাই যে।

রাজকন্যা কেশবতী

শ্রীবিনয় বাগচী

বিশাল রাজ্য—বিরাট রাজবাড়ি। রাজবাড়িতে আছে সব কিছুই, কিন্তু কারো মনে আনন্দ নেই। কারণ রাজা নিঃসন্তান।

রাণী কেঁদে বসন ভেজান, রাজা ভেবে ভেবে দরবারে বসতে ভুলে যান। কোন কোন সময় ইচ্ছা করেই বসেন না। কি হবে এ রাজ্য দিয়ে, যদি একটি ছেলেই না থাকল? তাই রাজা গম্ভীর, মন্ত্রী গম্ভীর, গম্ভীর সব সেপাই-সান্ত্রী। রাণী কাঁদেন, মন্ত্রী-পত্নী কাঁদেন, কাঁদে সব পরিচারিকা।

সে রাজবাড়িতেও কিনা সকলের মুখে হাসির রেখা দিল দেখা। কিছুদিন বাদেই রাণী হবেন মা। রাণীর চেহারায় দেখা দেয় নতুন লাবণ্য, রাজার চেহারায় দেখা দেয় প্রশান্তি। মন্ত্রীর আর সেপাই-সান্ত্রীর পোষাকে দেখা দেয় জলুস, আর বাহার দেখা দেয় গোঁফে। মন্ত্রী-পত্নীর গহনার আড়ম্বর বাড়ে, পরিচারিকাদের বাড়ে রঙবেরঙের শাড়ীর পারিপাট্য আর দাসদাসীদের বাড়ে পানের ডিবে ও কল্কের আনাগোনা।

যথাকালে রাণী প্রসব করেন এক মেয়ে। অতি অদ্ভুত তার রূপ। যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়। যেমন নাক, তেমন চোখ, আর তেমনই টুকটুকে রঙ। কিন্তু আশ্চর্য হ'ল তার চুল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত যতটুকু লম্বা দেহ, চুল হয়েছে তার তিনগুণ।

তাই আড়ালে আড়ালে গুঞ্জন শুরু হ'ল—এ মেয়ে নিশ্চয় কোন অপদেবী, একে রাখলে রাজ্যের অমঙ্গল হবে। আর সেদিনই কিনা মারা গেলেন বুড়ো-মন্ত্রীর খুনখুনে বুড়ো বাপ। মন্ত্রী বেঁকে বসলেন, এ মেয়ে কিছুতেই রাজপুরীতে রাখা চলবে না। রাজ-পুরুতের সাহায্যে তিনি রাজাকে সম্মত করালেন। শাস্ত্রের নামে মিথ্যা শাসানীতে রাজি হলেন তিনি ভয়ে ভয়ে; পিতৃস্নেহ হ'ল উপেক্ষিত। কিন্তু রাণী? বেচারা আর কি করবেন। আলুথালু বেশে কাঁদলেন অনেক। সকলের বিরুদ্ধে তাঁর মাতৃস্নেহ হ'ল পরাজিত। কেড়ে নেয়া হ'ল কন্যাকে তাঁর বুক থেকে।

সেনাপতি এক সতেজ ঘোড়ায় চললেন রাজকন্যাকে নিয়ে। টগবগিয়ে চলল ঘোড়া। জোরে খুব জোরে। অনেক-অনেক দূর যেতে হবে তাঁকে। এ রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে, কোন বনে বিসর্জন দিয়ে আসবেন তিনি রাজকন্যাকে।

এ রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে, পাশের রাজ্যের প্রায় যোজনখানেক গিয়ে এক গভীর বনে প্রবেশ করলেন সেনাপতি। সেখানে ছিল এক আধ-ভাঙা প্রাসাদ। তার পাশে রাজকন্যাকে রেখে ফিরে গেলেন তিনি।

উভয়ে উভয়ের দিকে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত।—পৃঃ ৩৭২

সে প্রাসাদে বাস করত এক রাক্ষসী। সন্ধ্যার সময় সে আস্তানায় ফিরছিল। দূর থেকে মানুষের গন্ধ পেয়ে তার জিবে জল এল। কিন্তু সামনে এসে তার সে রাক্ষুসে লোভ দূর হয়ে গেল। আহা কি সুন্দর শিশু! স্নেহ দেখা দিল রাক্ষসীর মনে। আদর করে হাত বুলিয়ে দিল সে রাজকন্যার গায়ে। আদর করে হাত বুলালে কি হবে—রাক্ষুসীর যে বড় বড় নখ! রাজকন্যার কোমল শরীরের অনেক জায়গায় ছড়ে গেল। ব্যথায় কেঁদে উঠল সে। রাক্ষসী তাকে কোলে তুলে নিয়ে বলে উঠল :

কাঁদিসনে কাঁদিসনে কন্যে আমার কোলে আয়,
মানুষ যাকে ত্যাগ করেছে রাক্ষসী পুষবে তায়।

রাক্ষসী তাকে প্রাসাদে রেখে পালতে লাগল। বন থেকে মিষ্টি ফল এনে রস করে খাওয়ায়; ঝর্ণা থেকে জল এনে স্নান করায়। এভাবে ক্রমে ক্রমে বড় হতে লাগল রাজকন্যা, রূপ ফুটতে লাগল বেশী করে দিনে দিনে। আর চুল? চুলও বাড়তে লাগল দেহের তিনগুণ অনুপাতে। রাক্ষসী প্রথমে বড় চুল দেখে বিস্মিত হয়েছিল এবং ছোট করে কেটেও দিয়েছিল দু'তিনবার। তার ফল হয়েছে খারাপ। রাজকন্যা তাতে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, কিন্তু চুল যে-কে-সেই হয়েছে দু'দিন যেতে না যেতেই। তাই সে আর কাটেনি। বড় চুলই যত্ন করে খোপা বেঁধে দেয়।

এমনি করে চলে যায় কয়েকটা বছর। রাজকন্যার মায়ায় বাঁধা পড়েছে রাক্ষসী। যেখানে যা ভাল জিনিস পায় রাজকন্যার জন্য নিয়ে আসে—আদর করে হাতে তুলে দেয়। রাজকন্যাও রাক্ষসীর স্নেহে-যত্নে সুখেই আছে। এর চেয়ে বেশী সুখ সে কল্পনা করতে পারে না।

রাজকন্যা এখন ষোড়শী। প্রাসাদের চারদিকে আপন মনে ঘুরে বেড়ায়। গাছ থেকে

ফল পেড়ে খায়, ফুল তুলে খোপায় গোঁজে। ঝর্ণার জলে একমনে নিজের মুখ দেখে আর গুনগুন করে গান করে।

উল্টে গেল সব। ছুটে গেল রাজকন্যার আপন খেয়ালে মগ্ন হয়ে থাকা প্রশান্তি।

এক রাজপুত্র এল বনে মৃগয়া করতে। দূর থেকে রাজকন্যাকে ফুল তুলতে দেখে এগিয়ে এল সে। সামনে এসে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রাজকন্যার দিকে। রাজকন্যার নজর পড়ল তার দিকে। উভয়ে উভয়ের দিকে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। রাজপুত্র ভাবছে এ বনে এমন অপরূপ রূপময়ী মেয়ে এল কোথা থেকে! রাজকন্যা গেল হকচকিয়ে। পৃথিবীতে যে এমন সৃষ্টি আছে তা সে প্রথম দেখল। আশ্চর্য তো হবেই।

আলাপ হ'ল দু'জনের। রাজকন্যা খবর পেল লোকালয়ের। দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার—এই প্রথম দীর্ঘশ্বাস। এই প্রথম ছটফটিয়ে উঠল তার মন। রাজপুত্র মুগ্ধ হয়েছে রাজকন্যার রূপে। পারল না সে বন ছেড়ে যেতে। ডেরা বাঁধল বনের এক প্রান্তে। প্রতিদিন দুপুরে রাক্ষসী যখন থাকে না, তখন সে আসে রাজকন্যার কাছে। নানা রকম গল্প করে। গল্প শুনে রাজকন্যা উল্লাসিত হয়ে ওঠে, আর রাজপুত্র চলে গেলেই তার মন বিমর্ষ হয়ে যায়।

দু'চারদিন বাদেই রাক্ষসী তার এ আনমনা ভাব টের পেল। সে এর কারণ খুঁজতে লাগল এবং বুঝল সব। বুঝল রাজকন্যার মন কেঁদে উঠেছে লোকালয়ের জন্যে। কেঁদে উঠল রাক্ষসীর মনও। ষোল বছরের স্নেহের গ্রন্থী তার টনটন করে উঠল। না কিছুতেই হবে না—রাজকন্যাকে সে কিছুতেই ছাড়তে পারবে না। কোথাও না গিয়ে সে বাড়ীতেই থাকল তাকে আগলে। রাজপুত্র আসে, আশেপাশে ঘুরে নিরাশ হয়ে চলে যায়। রাজকন্যা চোখের জল ফেলে।

এক-দুই-তিন—দিন চলে এমনি। এদিকে অনাহারে থেকে রাক্ষসীও অস্থির হয়ে উঠেছে। তাই চারদিনের-দিন দোতলার এক কোঠায় রাজকন্যাকে রেখে প্রাসাদের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিয়ে, রাক্ষসী বেরিয়ে পড়ে শিকারের উদ্দেশ্যে।

সে ঘরের জানালা খুলে পথের দিকে চেয়ে বসে থাকে রাজকন্যা। পা টিপে টিপে রাজপুত্র এসে নীচে দাঁড়ায়। উপরে উঠবার কোন উপায় না দেখে বলে: কি করে উপরে উঠব? রাজকন্যা হেসে জানালা দিয়ে তার চুল নামিয়ে দেয়। চুল বেয়ে উপরে উঠে যায় রাজপুত্র। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, রাজধানীতে গেলে সবাই তোমার চুল দেখে আশ্চর্য হবে। তার কথা শুনে গম্ভীর হয়ে যায় রাজকন্যা। ভাবে, তাই তো নগরে গেলে সবাই তাকে দেখে হাসবে, তবে কি হবে নগরে গিয়ে? তার চেয়ে—

এমন সময় অলক্ষ্যে কে বলে উঠল :

রাজকন্যা কেশবতী
কি হেতু ভাবছ অতি,
গেলে তুমি লোকালয়ে
চুল যাবে ছোট হয়ে।

একথা শুনে খুশি হয় রাজকন্যা, খুশি হয় রাজপুত্র। রাজপুত্র বলে, চলো এবার পালাই রাক্ষসী ফিরতে না ফিরতে। দরজা ভেঙে রাজকন্যাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে। রাজধানীর দিকে যাত্রা হয় শুরু।

সন্ধ্যার অনেক আগেই ফিরে এসে রাজকন্যাকে না পেয়ে রাক্ষসী বুক চাপড়ায় আর কাঁদে। কাঁদে আর ভাবে—মানুষ কেন এত অকৃতজ্ঞ !

স্বর্ণলতা

শ্রীচামেলী চক্রবর্তী

রূপনগরের রাজার মেয়ে নামটি স্বর্ণলতা—
মিথ্যে কিন্তু, বলছি না ভাই, সত্যি এ রূপকথা
দেখতে ছিল সুন্দরী সে, মাথায় কালো চুল,
গলায় ছিল মোতির মালা, কানে ছিল দুল।
হাতে ছিল সোনার চুড়ি পায়েতে নূপুর,
চলতো যখন, বাজতো তখন, ঝুমুর ঝুমুর !
মাথায় দিয়ে সোনার মুকুট পায়ে প'রে মল
সখীর সাথে কলসী নিয়ে আনতে যেত জল ;
একদিন সে ফুলের বনে ফুল তুলতে গেল,
রাত্রি হোল তবুও সে আর না ফিরে এল।
রাণী-মা তো, কেঁদেকেটে মূর্ছা গেলেন শেষে—
আজাক গল্প এইটুকু থাক, কালকে বলবো এসে।

ক্ষেত্রনাথ রায়

মেক্সিকো অলিম্পিক

স্বর্ণপদকের খতিয়ান

মেক্সিকো সিটিতে ১৯তম অলিম্পিক গেমস বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে শেষ হয়েছে। লাতিন আমেরিকার মাটিতে অলিম্পিক গেমসের আসর এই প্রথম। এই বিরাট অলিম্পিক গেমস পরিচালনা করা মুখের কথা নয়—খুবই কঠিন কাজ, বিপুল অর্থব্যয় এবং বিরাট দায়িত্ব। এ ব্যাপারে মেক্সিকোর জাতীয় সরকার এবং স্থানীয় অলিম্পিক গেমস কমিটির কর্মকর্তারা তাঁদের নিষ্ঠা, আতিথেয়তা এবং কর্মদক্ষতার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছেন। মেক্সিকো সিটির এই ১৯তম অলিম্পিক গেমস নানা বিষয়ে নজির সৃষ্টি করেছে। প্রথমেই ধর, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মেক্সিকো সিটির উচ্চতা ৭,৩৫০ ফিট। এত উঁচু জায়গায় এর আগে অলিম্পিক গেমসের আসর বসেনি। মেক্সিকো সিটির অলিম্পিক গেমসে যোগদানকারী দেশ এবং প্রতিযোগীর সংখ্যা অলিম্পিক গেমসের ইতিহাসে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। মোট ১১২টি দেশের ৬,০৯৬ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। একদল পণ্ডিত ব্যক্তি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন, মেক্সিকো সিটির দীর্ঘ উচ্চতা উন্নত ক্রীড়ামানের প্রধান প্রতিবন্ধক হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের ধারণা ভুল প্রতিপন্ন হয়েছে—গণ্ডা গণ্ডা বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

অলিম্পিক গেমসের আকর্ষণ সর্বজনীন। সারা বিশ্বের লোক চোদ্দ দিন ধরে মেক্সিকো সিটির অলিম্পিক আসরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন। খেলার ফলাফল নিয়ে সে কি

উত্তেজনা, জয়োল্লাস এবং হতাশা! এর কারণ, অলিম্পিক গেমসের স্বর্ণপদক জয়ের গুরুত্ব বিশ্ব নেতার জয়ের সমান এবং সেই সূত্রে বিশ্বসভায় প্রভূত জাতীয় মর্যাদালাভ।

অলিম্পিক গেমসে একমাত্র অপেশাদার খেলোয়াড়রাই যোগদান করতে পারেন। যোগদানও করেন নানা পেশার লোক—যেমন স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, অফিস কর্মচারী এবং শ্রমিক। গত কয়েকটি অলিম্পিক গেমসের হিসাবে দেখা যায়, অলিম্পিক গেমসে প্রতিযোগী ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেশী। বিভিন্ন রকমের পদক জয় এবং বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড ভাঙায় তাঁরা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আমেরিকা এবং রাশিয়ার মত বড় দেশের অলিম্পিক দলে কি পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রীরা নির্বাচিত হন তার একটা হিসাব তোমাদের সামনে রাখছি। মেক্সিকো অলিম্পিক গেমসে রাশিয়ার অলিম্পিক দলে প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০০। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীই ছিলেন প্রায় ২০০ এবং দলের বাকি অর্ধেকে ছিলেন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, অফিস কর্মচারী এবং কলকারখানার শ্রমিক। আমেরিকার অলিম্পিক দলের সন্তরণ দলটিকে ছাত্র-ছাত্রীদের টিম বললেই চলে—বেশীরভাগই স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী।

মেক্সিকো অলিম্পিক গেমসে যে-সব ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক স্বর্ণপদক জয়ের সূত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের কয়েকজনের নাম করি: সাঁতারে তিনটি স্বর্ণপদক বিজয়িনী ১৬ বছরের স্কুল-ছাত্রী কুমারী ডেবী মেয়ার (আমেরিকা), ১০০ ও ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতারে স্বর্ণপদক বিজয়ী ১৮ বছরের বিশ্ববিদ্যালয়-ছাত্র মাইক ওয়েনডেন (অস্ট্রেলিয়া) এবং ডেকাথলনে স্বর্ণপদক বিজয়ী স্কুল-শিক্ষক বিল টমী (আমেরিকা)। এই তিনজনেই নতুন অলিম্পিক রেকর্ড করেছেন এবং মাইক ওয়েনডেন ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে বিশ্ব রেকর্ড ভেঙেছেন।

মেক্সিকো অলিম্পিকের চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছে আমেরিকা (মোট ১০৬), দ্বিতীয় স্থান রাশিয়া (মোট পদক ৯১) এবং তৃতীয় স্থান জাপান (মোট পদক ২৫)। মোট স্বর্ণপদক জয়ের তালিকাতেও প্রথম আমেরিকা (৪৫), দ্বিতীয় রাশিয়া (২৯) এবং তৃতীয় জাপান (১১)। ১৯৫২ সালের আগের অলিম্পিক গেমসে আমেরিকা উপর্যুপরি ৯ বার (১৮৯৬-১৯৩২) এবং জার্মানী ১ বার (১৯৩২ সালে) চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় সর্বাধিক পয়েন্ট জয় করে শীর্ষস্থান পেয়েছিল। অলিম্পিক গেমসের সূচনা (১৮৯৬ সাল) থেকে কেবল ১৯৩২ সাল বাদে আমেরিকার সে কি দোর্দণ্ড প্রতাপ! আমেরিকার তুলনায়

দ্বিতীয় স্থান অধিকারী. দেশগুলির পয়েন্টের অবস্থা কি শোচনীয় ! এরপর আমেরিকা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয় ১৯৫২ সালে। রাশিয়া ১৯৫২ সালে অলিম্পিক গেমসে প্রথম যোগদান করেই আমেরিকার সঙ্গে যুগ্মভাবে পয়েন্টের তালিকায় প্রথম স্থান পায়। পরবর্তী তিনটি অলিম্পিক গেমসের (১৯৫৬, ১৯৬০ ও ১৯৬৪) পয়েন্টের তালিকায় প্রথম স্থান পায় রাশিয়া এবং দ্বিতীয় স্থান আমেরিকা।

মেক্সিকো অলিম্পিক গেমসে পদক জয়ের তালিকায় সর্বাধিক স্বর্ণপদক (৪৫টি) এবং সর্বাধিক মোট পদক (১০৬টি) জয়ের কৃতিত্ব আমেরিকার। তাদের এই পদক জয়ের প্রধান উৎস ছিল দু'টি বিষয়—সাঁতার-ডাইভিং এবং এ্যাথেলেটিক্স। আমেরিকা এইভাবে তাদের ৪৫টি স্বর্ণপদক সংগ্রহ করেছিল – সাঁতার-ডাইভিং-এ ২৩টি, এ্যাথলেটিক্সে ১৫টি এবং বাকি ১৫টি খেলায় ৭টি পদক! আমেরিকার মোট ১০৬টি পদক এইভাবে সংগৃহীত হয়েছিল— সাঁতার-ডাইভিং-এ ৫৮টি, এ্যাথলেটিক্সে ২৮টি এবং বাকি ১৫টি খেলায় ২০টি পদক। চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারী রাশিয়া তার ২৯টি স্বর্ণপদক এইভাবে সংগ্রহ করে। এ্যাথলেটিক্সে ৩টি এবং বাকি ১৭টি খেলায় ২৬টি। সাঁতারে রাশিয়া কোন স্বর্ণপদক পায়নি। এ্যাথলেটিক্স এবং সাঁতারে শোচনীয় ব্যর্থতার কারণেই আমেরিকার কাছে রাশিয়া এই প্রথম নতি স্বীকার করেছে।

মেক্সিকো অলিম্পিকের এ্যাথলেটিক্সে বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে আফ্রিকা এবং আমেরিকার নিগ্রো এ্যাথলীট্রা। এ্যাথলেটিক্সে স্বর্ণপদক জয়ের তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছে আমেরিকা (স্বর্ণপদক ১৫) এবং দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে দু'টি দেশ, রাশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশের কেনিয়া—উভয় দেশই ৩টি করে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে। এখানে বলে রাখি, ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের অনেক পর—১৯৬৩ সালে কেনিয়া স্বাধীনতা লাভ করেছে।

নিগ্রো এ্যাথলীটদের স্বর্ণপদক জয়

এ্যাথলেটিক্সে স্বর্ণপদক-বিজয়ী কয়েক জন বিশিষ্ট নিগ্রো এ্যাথলীটের নাম এখানে উল্লেখ করছি।

আমেরিকার পক্ষে: ১০০ মিটারের দৌড়ে জিম হাইন্স, ২০০ মিটার দৌড়ে টমি স্মিথ, ৪০০ মিটার দৌড়ে লী ইভান্স, ১১০ মিটার হার্ডলসে উইলী ডেভেনপোর্ট, লং জাম্পে বব বিমোন, এবং মেয়েদের ১০০ মিটার দৌড়ে উইওমা টিয়াস।

জিম হাইন্স (আমেরিকা)

১০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক বিজয়ী-নতুন অলিম্পিক রেকর্ড এবং পূর্বের বিশ্ব রেকর্ড সময়ে (৯.৯ সেঃ)

আফ্রিকার পক্ষেঃ ১,৫০০ মিটার দৌড়ে কিপ্‌চো কিনো (কেনিয়া), ১০,০০০ মিটার দৌড়ে নাফতালী তেমু (কেনিয়া), ম্যারাথন দৌড়ে মামো ওলডে (ইথিওপিয়া) এবং ৩,০০০ মিটার ষ্টিপেলচেজে এমোস বিয়োট (কেনিয়া)।

জাপানের সার্থক ভূমিকা

জাপান অন্যান্য বারের মত এবারও এশিয়া মহাদেশের মুখ রেখেছে। এশিয়ার মাত্র চারটি দেশ স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে—জাপান ১১, ইরান ২, তুরস্ক ২ এবং পাকিস্তান ১।

কেঞ্জি কিমিহারা (জাপান)
এ্যাথলেটিক্সে একমাত্র পদক-বিজয়ী এশিয়ান।

এশিয়ার ৮টি দেশ মোট ৪১টি পদক পেয়েছে—স্বর্ণ ১৬, রৌপ্য ১০ ও ব্রোঞ্জ ১৫। জাপানের মোট পদক সংখ্যা ২৫ (স্বর্ণ ১১, রৌপ্য ৭ ও ব্রোঞ্জ ৭)। অলিম্পিক গেমসের শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান এ্যাথলেটিক্সে এশিয়ার পক্ষে এবার মাত্র দু'জন পদক পেয়েছেন—পুরুষ বিভাগে জাপানের কেঞ্জি কিমিহারা (ম্যারাথনে রৌপ্য) এবং মহিলা বিভাগে তাইওয়ানের শ্রীমতী চী চেং (৮০ মিটার হার্ডলসে, ব্রোঞ্জ)। এশিয়ার কপালে এবার সাঁতারের একটা পদকও জোটেনি। অথচ ১৯৩২ সালের অলিম্পিকে সাঁতারের পুরুষ বিভাগে জাপান শীর্ষস্থান পেয়েছিল। ফুটবলের ব্রোঞ্জ পদকটি এবার পেয়েছে জাপান—অলিম্পিক ফুটবলে এশিয়ার পক্ষে এই প্রথম পদক জয়।

আফ্রিকার সাফল্য

অলিম্পিক গেমসে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে আফ্রিকা মহাদেশ। ইউরোপের পর্যটকরা অবজ্ঞাভরে যে আফ্রিকার নাম দিয়েছিলেন 'অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশ', সেই দেশই আজ অলিম্পিক

নাফতালি তেমু (কেনিয়া)

১০,০০০ মিটারে স্বর্ণপদক এবং ৫০০০ মিটারে ব্রোঞ্জপদক বিজয়ী।

মহম্মদ গামৌদি (তিউনিসিয়া)

৫০০০ মিটারে স্বর্ণপদক এবং ১০,০০০ মিটারে ব্রোঞ্জপদক বিজয়ী।

গেমসের বিজয়-মঞ্চে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জের পদক-গলায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। আফ্রিকার পাঁচটি স্বাধীন দেশ—কেনিয়া, ইথিওপিয়া, তিউনিসিয়া, উগাণ্ডা এবং ক্যামেরুণ মোট ১৬টি পদক পেয়েছে (স্বর্ণ ৫, রৌপ্য ৭ ও ব্রোঞ্জ ৪)। স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে তিনটি দেশ—কেনিয়া ৩, ইথিওপিয়া ১ এবং তিউনিসিয়া ১। পুরুষদের ৫,০০০ মিটার এবং ১০,০০০ মিটার দৌড়ে আফ্রিকার এ্যাথলীটরাই স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জপদকগুলি জয় করে একাধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। শ্বেতকায়দের চ্যালেঞ্জের মুখের মত জবাব আমেরিকা এবং আফ্রিকার নিগ্রো এ্যাথলীটরাই দিয়েছেন।

সাঁতারে আফ্রিকার প্রাধান্য

অলিম্পিক গেমসের তালিকায় মর্যাদার দিক থেকে প্রথম স্থান এ্যাথলেটিক্সের এবংদ্বিতীয় স্থান সাঁতারের। ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকের মতই আমেরিকার সাঁতারুরা এবার বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন মেক্সিকো অলিম্পিকে। সাঁতার ও ডাইভিং-এ মোট ৯৯টি পদকের মধ্যে আমেরিকাই পেয়েছে ৫৮টি (স্বর্ণ ২৩, রৌপ্য ১৫ ও ব্রোঞ্জ ২০)। আমেরিকার স্বর্ণপদক জয় ২৩টি —পুরুষ বিভাগে ১১ এবং মহিলা বিভাগে ১২। সাঁতার-ডাইভিং-এ মোট ৩৩টি স্বর্ণপদক জয়ের হিসাবঃ আমেরিকা ২৩, অস্ট্রেলিয়া ৩, পূর্ব জার্মানী ২ এবং একটি করে স্বর্ণপদক পেয়েছে মেক্সিকো, ইতালী, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং নেদারল্যাণ্ডস।

কিপচোগে কিনো (কেনিয়া)
১,৫০০ মিটারে স্বর্ণপদক এবং ৫০০০ মিটারে রৌপ্যপদক বিজয়ী।

লক্ষ্য কর, আমেরিকা যেখানে একাই ২৩টি স্বর্ণপদক পেয়েছে সেখানে ৭টি দেশ মিলে বাকী ১০টি স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে।

ভারতবর্ষের চরম ব্যর্থতা

ভারতবর্ষ হকি, এ্যাথলেটিক্স, ভারোত্তলন, কুস্তি এবং স্যুটিং-এ যোগদান করে শেষ পর্যন্ত হকিতে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ ১৯২৮ সাল থেকে উপর্যুপরি ৮বার ফাইনাল খেলার সূত্রে স্বর্ণপদক জয় করেছে ৭ বার (এর মধ্যে ৬ বার উপর্যুপরি) এবং রৌপ্যপদক ১ বার (১৯৬০ সালে)। মেক্সিকোতে ভারতবর্ষ সেমি-ফাইনাল খেলায় ১-২ গোলে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে যায়।

বিভিন্ন খেলার চূড়ান্ত ফলাফল

হকিঃ স্বর্ণ—পাকিস্তান, রৌপ্য—অস্ট্রেলিয়া, ব্রোঞ্জ—ভারতবর্ষ

ফুটবলঃ স্বর্ণ—হাঙ্গেরী, রৌপ্য—বুলগেরিয়া, ব্রোঞ্জ—জাপান

বাস্কেটবলঃ স্বর্ণ—আমেরিকা, রৌপ্য—যুগোশ্লাভিয়া, ব্রোঞ্জ—রাশিয়া

ভলিবল :

পুরুষ বিভাগ—**স্বর্ণ :** রাশিয়া, রৌপ্য : জাপান, ব্রোঞ্জ : চেকোশ্লোভাকিয়া

মহিলা বিভাগ—**স্বর্ণ :** রাশিয়া, রৌপ্য : জাপান, ব্রোঞ্জ : পোল্যাণ্ড

জিমন্যাস্টিক :

পুরুষদের দলগত : স্বর্ণ : জাপান, রৌপ্য : রাশিয়া, ব্রোঞ্জ : পূর্ব জার্মানী

মহিলাদের দলগত : স্বর্ণ : রাশিয়া, রৌপ্য : চেকোশ্লোভাকিয়া, ব্রোঞ্জ : পূর্ব জার্মানী

পুরুষদের ব্যক্তিগত : স্বর্ণ : সায়াও কাতো (জাপান)

মহিলাদের ব্যক্তিগত : স্বর্ণ : ভেরা কাসলাভাস্কা (চেকোশ্লোভাকিয়া)

ভেরা কাসলাভাস্কা (চেকোশ্লোভাকিয়া)
মেক্‌সিকো অলিম্পিকের জিমন্যাসটিক্‌সে ৪টি স্বর্ণপদক-বিজয়িনী।

ভারোত্তোলন : স্বর্ণপদক—রাশিয়া (৩), পোল্যাণ্ড, জাপান, ইরাণ এবং ফিনল্যাণ্ড (প্রত্যেকে একটি করে পদক)

মুষ্টিযুদ্ধ : স্বর্ণপদক—রাশিয়া (৩), মেক্সিকো (২), আমেরিকা (২), ভেনিজুয়েলা বৃটেন, পূর্ব জার্মানী এবং পোল্যাণ্ড (প্রত্যেকে একটি করে পদক)

ওয়াটারপোলো : স্বর্ণ—যুগোশ্লাভিয়া, রৌপ্য—রাশিয়া, ব্রোঞ্জ—হাঙ্গেরী

কুস্তি ঃ

ফ্রি-স্টাইল ঃ স্বর্ণপদক—জাপান ৩, রাশিয়া ২, তুরস্ক ২, ইরাণ ১

গ্রিকো-রোমান ঃ ২টি করে স্বর্ণপদক—পূর্ব জার্মানী, হাঙ্গেরী এবং বুলগেরিয়া
১টি করে স্বর্ণপদক—রাশিয়া এবং জাপান

অসাধারণ কৃতিত্ব

আলফ্রেড ওর্টার (আমেরিকা)
উপর্যুপরি চারটি অলিম্পিকে ডিসকাস থ্রো-তে স্বর্ণপদক জয়ী হয়ে অভূতপূর্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন।

আলফ্রেড ওর্টার (আমেরিকা) ঃ পুরুষদের ডিসকাস ক্ষেপণে প্রথম স্থান পেয়ে উপর্যুপরি চারটি অলিম্পিকে (১৯৫৬, ১৯৬০, ১৯৬৪ ও ১৯৬৮) ডিসকাসে স্বর্ণপদক জয়ের যে গৌরবলাভ করেছেন, তা অলিম্পিকের ইতিহাসে একমাত্র নজির। তাঁর আগে এ্যাথলেটিক্সের কোন একটি বিষয়ে, কোন একজনের পক্ষে মোট চারবার স্বর্ণপদক জয় করাই সম্ভব হয়নি।

কুমারী উইওমা টিয়াস (আমেরিকা) ঃ ১০০ মিটার দৌড়ে উপর্যুপরি দু'বার (১৯৬৪ ও ১৯৬৮) স্বর্ণপদক জয়ের সূত্রে একমাত্র নজির স্থাপন করেছেন। ১০০ মিটার দৌড়ে তিনি ছাড়া আর কেউ মহিলা বা পুরুষ মোট দু'বারও স্বর্ণপদক জয় করতে পারেন নি।

পুরুষদের লং জাম্পে স্বর্ণপদক-বিজয়ী বব্ বিমোন (আমেরিকা) মেক্সিকো অলিম্পিকে শ্রেষ্ঠ এ্যাথলীটের সম্মানলাভ করেছেন। তিনি অবিশ্বাস্য ২৯ ফিট ২॥ ইঞ্চি দূরত্ব অতিক্রম করে, নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

৪টি স্বর্ণপদক জয় ঃ ভেরা কাসলাভাস্কা (চেকোশ্লোভাকিয়া)—মহিলাদের জিমন্যাস্টিকে।

৩টি স্বর্ণপদক জয় ঃ কুমারী ডেবী মেয়ার (আমেরিকা)—২০০, ৪০০ ও ৮০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল সাঁতারে।
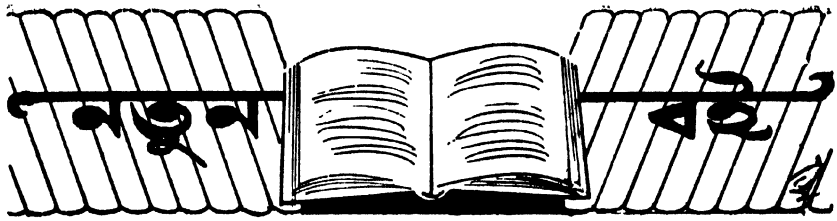
(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

এক যে ছিল শেয়াল—শ্রীপ্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ, ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১.৫০

খ্যাতনামা শিল্পীর হাতের রেখার সঙ্গে লেখা মিশে 'এক যে ছিল শেয়াল' ছোটদের একখানি সুন্দর উপভোগ্য বই হয়ে উঠেছে। কাহিনীটি যেমন পড়তে পড়তে তোমরা ছাড়তে পারবে না, তেমনি ছড়াগুলি পড়েও প্রচুর মজা পাবে। এর উপর আছে পাতা-ভরা অফসেটে ছাপা বহু রঙের ও এক রঙের অজস্র ছবি। প্রচ্ছদপটটি যে-কোন ভাল বেদেশী ছোটদের বইয়ের মত। এ বই বাড়িতে গেলে কড়াকাড়ি পড়ে যাবে।

পথ থেকে হারিয়ে—শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী। প্যাপিরাস, ৯ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২.৫০

মজার গল্পের রাজা শিবরাম চক্কোত্তি। তাঁর গল্পের স্বাদই আলাদা! সে গল্প পড়তে পড়তে খুশিতে মন ভরে ওঠে। তাঁর লেখা এই বইটি গল্পের বই নয়, উপন্যাস। একটানা এই লম্বা গল্প—পাঞ্জাবী মেয়ে 'ভাবিনী'র হারিয়ে যাওয়ার গল্প, ভারী চমৎকার। একবার পড়তে আরম্ভ করলে আর ছাড়া যাবে না। বইখানির ছবি, ছাপা, কাগজ বাঁধাই সবই সুন্দর; তবে ৮৮ পৃষ্ঠায় একটি ভুল আছে সেটি সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন। ঠাকুরের কল্পতরু উৎসব প্রসঙ্গে শিবরাম বাবু 'বসুমতী'র সতীশবাবুর কথা যে ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন, সেটি সতীশচন্দ্র না হয়ে তাঁর পিতা উপেন্দ্রনাথ হবে।

বীর সৈনিক নমস্কার—শ্রীবিবেকানন্দ ভট্টাচার্য। ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ৫৭-সি কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১.৭৫

সর্বদেশের জাতীয় জীবনে সৈনিকদের স্থান বিশেষ মর্যাদার। তাঁদের মহান্ আত্মদান, সৌর্য-বীর্য ও দক্ষতার ফলেই জাতির স্বাধীনতা রক্ষা হয়, সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে। অধ্যাপক বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য অত্যন্ত যত্ন ও দরদের সঙ্গে পাক-ভারত যুদ্ধে আমাদের স্থল-জল ও অন্তরীক্ষের সৈনিকদের বীরত্বের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। বইখানি প্রত্যেক বাঙালী ছেলেমেয়েদের পাঠ করা উচিত।

১। জন্তুদের সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কিরকম স্পষ্ট, নীচের এই খালি জায়গাগুলি কেবলমাত্র জন্তুদের নাম পূরণ করে প্রমাণ করো।

(অ)—মত সাহসী। (আ)—মত বৃহৎ। (ই)—মত জ্ঞানী। (ঈ)– মত ধূর্ত। (উ)—মত বিশ্বস্ত। (ঊ)—মত বলিষ্ঠ। (ঋ)—মত ব্যস্ত। (ঌ)– মত ক্ষুধার্ত।

২। এমন ছ'টি জন্তুর নাম করো, যারা সমুদ্রে বাস করে।

৩। তিন অক্ষরে নাম তার পদবী বিশেষ
প্রথমটি দিলে বাদ স্বাদ অবশেষ।
শেষেরটি বাদ দিলে বাকী যাহা থাকে,
পূজার সময় ভাই কাজে লাগে তাকে।

শ্রীসন্দীপকুমার দাঁ

(উত্তর আগামীবার বেরুবে)

বিগত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। দর্শনীয় যাহা কিছু করেছি দর্শন
স্মরণীয় যাহা কিছু করিব স্মরণ।
দীন জন আমি এক, আছে মোর দৈন্য
ঘৃণা কর তাই বুঝি, নহি কিন্তু ঘৃণ্য।
ভয়ে কেন হও তুমি, হও কেন ভীত ?
উপকার ক'রে মোরে কর উপকৃত।
জগতেতে আছে যাহা, তাই জাগতিক
দর্শন জানেন যিনি, তিনি দার্শনিক।
গভীরতা আছে যাহে বলে তা গভীর,
বীরত্ব নাহিক যার, কি করে সে বীর ?
প্রমাণ হয়েছে যাহা তাহাই প্রামাণ্য,
প্রধান যিনিই হন—তাঁরই প্রাধান্য।
উপবাসী আছি আমি করি উপবাস
মাসিক পত্রিকাখানি বন্ধ ছয় মাস।

২। দিবা ৩। গোরু (গরু বানান রবীন্দ্রনাথ বা অন্য অনেকের লেখায় 'গোরু' প্রচলিত আছে)।

সম্পাদক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার

শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : ০.৫০ পয়সা

ডান দিকে :

কলকাতার বিদেশী বণিকের বাসগৃহ
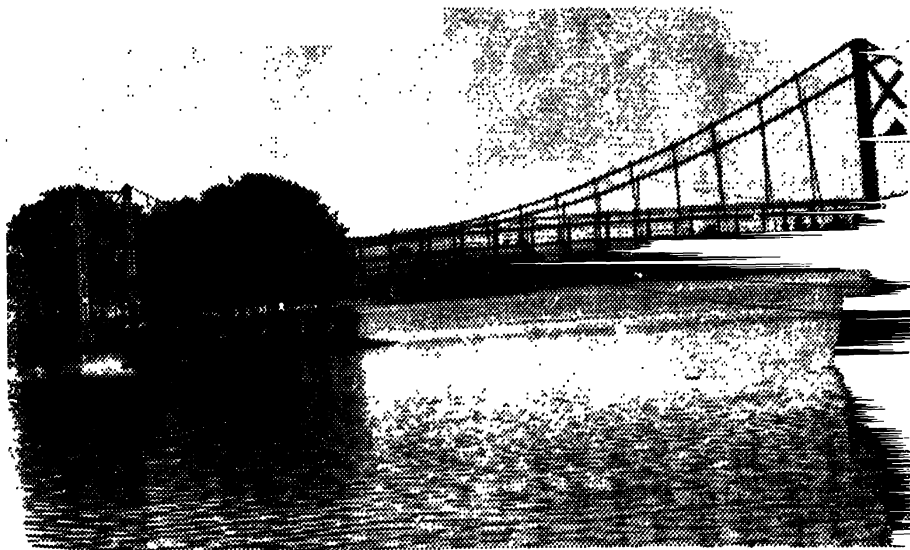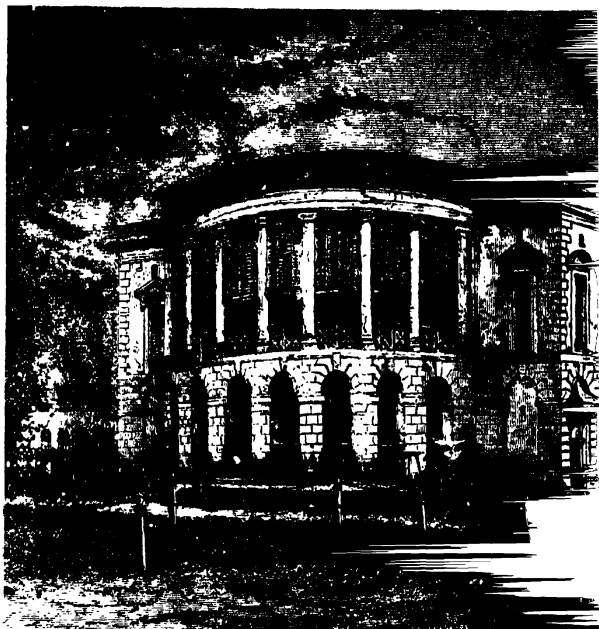
কলকাতার ঢাকুরিয়া লেকে ঝুলন্ত ব্রীজ

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র *

৪৯শ বর্ষ] পৌষ ঃ ১৩৭৫ [৯ম সংখ্যা

এক যে ছিল ছোট্ট মেয়ে

[অমিল ছন্দের ছড়া]

শ্রীদেড়কড়ি শর্মা

এক যে ছিল ছোট্ট মেয়ে—
নামটি তাহার পারুল রাণী।
তার ছিল এক ছাগল-ছানা,
আর ছিল এক ছোট্ট পাখী।
ছাগলের নাম বলছি শোনো,
তার আগে ভাই পাখীর কথা
শুনতে হবে—বুঝলে কিনা ?
কারণ পাখী ছোট্ট যে খুব—

পারুলও যে ছোট মেয়ে
সব চেয়ে ভাই বাড়ির মাঝে—
তাই তো তারে আর পাখীরে
বাসে সবাই বড্ড ভালো।

তাই ব'লে যে ছাগল-ছানায়
আদর কেহ করতো নাকো—
এমন কথা বলবে না কেউ,
ছাগল ছিল সবার প্রিয়।
পারুল রাণী বিশেষ করে
করতো আদর সবার চেয়ে।
কুটনো-খোসা, গাছের পাতা
খাইয়ে কত তৃপ্তি পেতো!

সেবার মোরা হাজারীবাগ
চেঞ্জে গেলাম সবাই মিলে—
সেইখানে এক হাটের বারে
সবুজ মাঠে, গাছের তলায়

পারুল হঠাৎ দেখতে পেল
একটি কালো ছাগল-ছানা,
হরিণ-শিশুর মতই তাহা
খাচ্ছিল ঘাস মনের সুখে।
পারুল তারে ধরতে গিয়ে
হোঁচট্ খেয়ে ভাঙ্‌লো হাঁটু—
তাই দেখে কেউ করলো আদর,
চোখের জলে ভাসলো মেয়ে।

বাধ্য হয়েই দিলাম ধরে
ছাগল-ছানা তাহার হাতে,
যাহার ছাগল, ডেকে তারে
দিলাম ধরে দামটি তারি।
এলাম যখন কলকাতাতে,
ছাগল নিয়েই আস্‌তে হোলো—
তার সাথে এক জুটলো পাখী
হঠাৎ-করে একটি ভোরে।
পাখীর মায়ের নেইকো দেখা,
তাই, যত দায় পারুল রাণীর—
ছোলা খাওয়ায়, যত্ন করে,
খাঁচায় পুরে রাখলো তারে।
এমনি করে ছাগল-ছানা,
টুকটুকে লাল ছোট্ট পাখী—

পারুল রাণীর সঙ্গী হোলো,
তাদের নিয়েই সময় কাটে।

এমনি ভাবে পারুল রাণীর
দিনের পরে দিন কেটে যায়—
অঙ্ক কষার বয়স হোলো,
নয়া পয়সা শেখাই 'কে জি'।
'কে জি স্কুলে' ভর্তি হবার
সময় এল তাহার যখন,
ছাগল পাখী সঙ্গে নিয়েই
স্কুলে গিয়ে হাজির—এ কি!
মেয়েরা সব উঠলো হেসে,
দিদিমণি করেন বারণ—
ছাগল-ছানা, পাখীর-ছানা
চলবে নাকো সঙ্গে রাখা।
পারুল তখন করবে কি আর?
হাপুস্ নয়ন অঝোর ঝরে!
সেই ফাঁকে তার পালায় ছাগল,
উড়লো পাখী আকাশ-পানে।
বনের পশু, বনের পাখী,
বনেই ভালো থাকবে তারা—
এই ভেবে তার কান্না থামায়
পারুল রাণী ছোট্ট মেয়ে।

উৎকলমণি

শ্রীচুনীলাল রায়
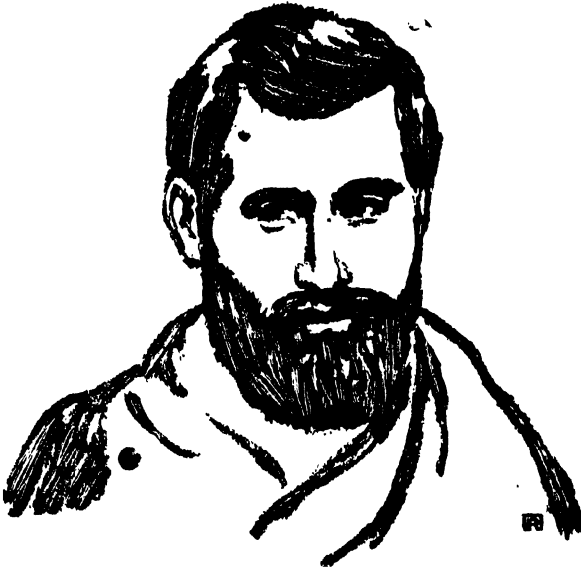
উৎকলমণি গোপবন্ধু দাস

তোমরা নিশ্চয়ই 'দেশবন্ধু' চিত্তরঞ্জনের কথা শুনে থাকবে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের আন্দোলনে তার অবিস্মরণীয় ভূমিকার কথা দেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। দেশসেবার কাজে সবক্ষণ আত্মনিয়োগের জন্য তিনি 'ব্যারিষ্টারী' ত্যাগ করে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

কিন্তু আরো একজন যিনি ঠিক এমনিভাবেই বহু উপার্জনের 'ব্যারিষ্টারী' বৃত্তি ত্যাগ করে দেশের কাজে নেবেছিলেন, তার কথা আমরা অনেকেই জানি না। আমরা ক'জন জানি পণ্ডিত গোপবন্ধু দাসের কথা, যাকে তার দেশবাসী 'উৎকলমণি' অর্থাৎ 'উড়িয়্যার রত্ন' বলে সম্মানিত করেছিল?

যারা পরাধীন দেশবাসীর কাছে স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ কি এবং কেন স্বাধীনতা কম্য এই মহান্ বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন, পণ্ডিত গোপবন্ধু দাস ভারতমাতার সেই সব মহান্ সন্তানদেরই একজন।

উড়িষ্যার পুরী শহরে ১৮৭৭ সনের ৯ই অক্টোবর গোপবন্ধু দাস জন্মগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে সফলভাবে শিক্ষা শেষ করে ব্যারিষ্টারী বৃত্তি গ্রহণ করেন।

সফল ব্যারিষ্টার হিসাবে তার খ্যাতিও হয় বেশ।

যাহোক পরে তিনি এই খ্যাতি ও উপার্জনের আইনব্যবসা ত্যাগ করে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

১৯২০ সনে মহাত্মা গান্ধী যখন উড়িষ্যা সফরে গিয়েছিলেন, তখন গোপবন্ধু দাসের অপূর্ব সংগঠন ক্ষমতায় মহাত্মাজী মুগ্ধ হন। এই তরুণ কর্মী তাঁর বিশেষ নজরে আসেন। মহাত্মাজীর

অনুপ্রেরণায় গোপবন্ধু দাস পরের বছর অর্থাৎ ১৯২১ সনে 'অসহযোগ আন্দোলনে' যোগ দেন। পরবর্তীকালে তিনি বহুবার দেশের জন্য কারা-যন্ত্রণা ভোগ করেন।

তিনি একসময় 'লোক সেবক মণ্ডল'-এর সঙ্গেও বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। এই সময় তিনি লালা লাজপত রায় এবং পণ্ডিত অমৃতলাল থাকারের নিবিড় সংস্পর্শে আসেন।

শুধু মাত্র দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনেই নয়, দেশে শিক্ষা-বিস্তারের কাজেও তিনি আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। তিনি জাতীয় শিক্ষার ভিতর দিয়ে জাতির সবল মেরুদণ্ড তৈরী করার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেছিলেন।

আজও পুরী জেলার সাক্ষীগোপাল-এর 'সত্যবাদী হাইস্কুল' দেশের শিক্ষা-বিস্তারের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ এবং ভালবাসার জীবন্ত চিহ্ন বহন করে চলেছে।

শুধু এই নয়—একজন কবি এবং সুলেখক হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। তাঁর অনেক লেখার মধ্যে 'বন্দীর আত্মকথা' বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

দেশে সমাজ-সংস্কারক হিসাবেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। দেশের চারিদিকে যখন রক্ষণশীল নীতিরই বিশেষ প্রাধান্য ছিল, তখন তিনি উদারনৈতিক মতবাদ অবলম্বন করে সমাজ-সংস্কারের মহৎ কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। ১৯১৭-২০ সনে গোপবন্ধু দাস বিহার এবং উড়িষ্যার 'ব্যবস্থাপক সভা'র (Legislative assembley) সভ্য হিসাবেও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

দেশের এই সুসন্তান ১৯২৮ সনে পরলোকগমন করেন।

বাপু

শ্রীশান্তি বসু

জয় জয় রঘুপতি রাঘব রাম
রাম ধূন প্রিয় তব, প্রিয় সীতারাম ;
ইতিহাসে লেখা আছে বীর-গাথা যত
যত পড়ি শ্রদ্ধায় হই অবনত।
ভাঙিলে সাগব তীরে লবণ-আইন,
বিদেশী বণিকে করি, বিস্ময় সেদিন।
দেশবাসী-দুঃখে তব ঝরে দু'নয়ন
তব স্নেহে ধন্য হ'ল যত হরিজন।
সন্ন্যাসী হে বীর নেতা, চির বরণীয়,
প্রাণের প্রণাম খানি আজিকে হে নিও

এক যে ছিল রাণী

শ্রীবিবেকানন্দ ভট্টাচার্য

এক রাণী ছিলেন। রূপকথার রাণী নয়,—সত্যি-সত্যিই। এই আমাদের দেশেই, মাত্র একশো বছরের কিছু আগে তিনি রাজত্ব করে গেছেন। তাঁর জীবনের কাহিনী রূপকথার মতনই, চাই কি, রূপকথার চেয়েও ভালো। কিংবা বলতে পারো, আধুনিক যুগের রূপকথা তো এইই। শনো, এখন তাঁর কথা বলি—।

তখনকার ভারতবর্ষে ঝাঁসী নামে ছোট্টখাট্টো একটা স্বাধীন দেশ ছিল। তার রাজা ছিলেন গঙ্গাধর রাও, আর রাণী,—হ্যাঁ, সেই রাণীর কথা বলার জন্যেই তো এই লেখা। সেই রাণী, পরে ঝাঁসীর রাণী নামে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন। রাণীর নাম লক্ষ্মীবাঈ।

রাণীর কি রূপ, কি তেজ আর কি তাঁর দয়া মায়া মমতা ভালোবাসা! দেশের সবাই তাঁকে মায়ের মতন ভক্তি শ্রদ্ধা করত।

কিন্তু রাজা ও রাণীর এক দুঃখ, তাদের ছেলেমেয়ে নাই!

দিন যায়—একদিন রাজা এসে বললেন, রাণী, আমার শরীর ভালো যাচ্ছে না! রাজ্যের কথা ভেবে ভেবে আরো ভেঙ্গে পড়ছি। এবার আমি ঠিক করেছি, একটি ছেলেকে দত্তক নেব!

রাণী রাজী হয়ে গেলেন। তখনকার দিনের নিয়ম মতো তারা দামোদর নামে একটি ফুটফুটে ছেলেকে দত্তক নিলেন। রাজা মারা গেলে সেই রাজ্য পাবে, রাজা হবে।

বিরাট উৎসব হলো। সাতদিন ধরে সারা দেশে, বাড়ির ছাদে ছাদে আলো জ্বলল, বাঁশি-সানাই বাজল। দলে দলে লোক রাজার বাড়ি গিয়ে নেমন্তন্ন খেলো, আর দু'হাত তুলে রাজপুত্রকে আশীর্বাদ করল।

এর কিছুদিন পরে সত্যি-সত্যিই রাজা স্বর্গে গেলেন। শোকের মেঘ দেশ থেকে সরে যেতে না যেতেই রাণী লক্ষ্মীবাঈ শিশুপুত্র দামোদরকে পাশে বসিয়ে রাজ্য চালাতে লাগলেন।

একদিন রাণী দরবারে বসেছেন, এমন সময় রক্ষীরা ইংরেজের এক দূতকে সেখানে নিয়ে এলো। দূত কুর্নিশ করে একটা কাগজ দিলো দেওয়ানের হাতে। দেওয়ান সেটি প'ড়ে রাগে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, বাঈসাহেব, ইংরেজরা আমাদের রাজ্য জোর করে দখল নিয়ে ঘোষণা পাঠিয়েছে। বেইমানরা আপনার পুত্র দামোদরকে স্বীকার করছে না। বলছে, দত্তক নেওয়া চলবে না। অথচ ওদের সঙ্গে সর্ত ছিলো, দত্তক নেওয়া চলবে।

কথাগুলো শুনতে শুনতে লক্ষ্মীবাঈ লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন খোলা তলোয়ারের মতন। তাঁর চোখ মুখ দিয়ে আগুন বেরুতে লাগল। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, কি, ফিরিঙ্গীদের এতোবড়

স্পর্ধা! জোর যার মুল্লুক তার! আমার ঝাঁসী নেবে! ঝাঁসী দিয়ে দোব? কক্ষনো না! দেখি কেমন করে ঝাঁসী নেয়!

ইংরেজ বড়লাট ঝাঁসী রাজ্যটি নিয়ে নিয়েছে শুনে সারা দেশের লোক ক্ষেপে গেল। সেই সময় এক সুযোগও এসে গেল। তখন সিপাহীরা সারা ভারত জুড়ে স্বাধীনতার যুদ্ধে নেমেছে। বিদ্রোহ নয়, স্বাধীনতার যুদ্ধ। ঝাঁসীর প্রজারা রাণী লক্ষ্মীবাঈকে তাদের রাণী ঘোষণা করে স্বাধীনতার যুদ্ধে নেমে পড়ল। তারা আর কারুকে মানবে না। এরপর ঝাঁসীর দুর্দিন এলো। ১৮৫৮ সালের জানুয়ারী মাসের ছ' তারিখে রাণী লক্ষ্মীবাঈ দরবার করছিলেন। হঠাৎ দুর্গের সিংদরজায় তুরি ভেরি বেজে উঠল।

দূর থেকে ধুলো উড়িয়ে একদল ঘোড়সওয়ার আসছে। সবাই সতর্ক হয়ে রইল। শেষে দেখা গেলো ঘোড়সওয়াররা ঝাঁসীরই সৈন্যদলের লোক। তারা রাণীর সঙ্গে দেখা করতে চাইল রাণী শুনে তাদের সঙ্গে সঙ্গে দরবারে ডেকে পাঠালেন। তারা এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কাল রাতে এক বিরাট ফিরিঙ্গী সৈন্যদল ঝাঁসীর কাছে এসে তাঁবু গেড়েছে!

—কোন জায়গায়? রাণী সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞেস করলেন।

—ঝাঁসীয় সীমান্ত থেকে সাত ক্রোশ দূরে!

—কত সৈন্য ওদের?

—তা বিশ হাজার হবে! সারি সারি কামান আসছে!

—ঠিক আছে! রাণী বললেন, দেওয়ানজী! সেনাপতিদের বলুন ঝাঁসীতে ঢোকার সমস্ত রাস্তা যেন ভেঙে নষ্ট করে দেয়। ঘরবাড়ি, শস্য, সমস্ত নষ্ট করুক। ওরা যেন পথে জল পর্যন্ত না পায় তার ব্যবস্থা করুক। এদিকে আমরা তৈরি হই!

ইংরেজ সেনাপতি হিউরোজ বিরাট সৈন্যদল নিয়ে ঝাঁসী দখল করতে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। এ কি? দেশটাকে মরুভূমি করে রেখেছে যে! গাছ নেই, ছায়া নেই, এমনকি ঘোড়ার খাবার ঘাস পর্যন্ত নেই! হিউরোজ দূরবীন দিয়ে দেখলেন, শহর-দুর্গকে ঘিরে হাজার হাজার সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। কামানের মুখগুলো দেখা যাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে রাণী লক্ষ্মীবাঈ শাদা ঘোড়ায় চড়ে টগবগিয়ে দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

চব্বিশে মার্চ শেষ রাত্রিতে হঠাৎ শব্দ উঠলো—বুম! বুম!! বম! বম!! সমস্ত ঝাঁসী কেঁপে কেঁপে উঠল সে শব্দে।

চীৎকার উঠল, ইংরেজরা ঝাঁসী আক্রমণ করেছে—ভীষণ কামান দাগছে! অন্ধকার আকাশে কামানের গোলাগুলোকে বড় বড় তারার মতন দেখাতে লাগল। দক্ষিণ দরজায় এসে

'রাণী লক্ষ্মীবাঈ কি জয়।'

গোলা পড়তে লাগলো যে দাঁড়ান যায় না। ঝাঁসীর গোলন্দাজরাও মুখ ঘুরিয়ে চালাল পালটা গোলা—বুম! বুম বুম!! বুম-বুম!!
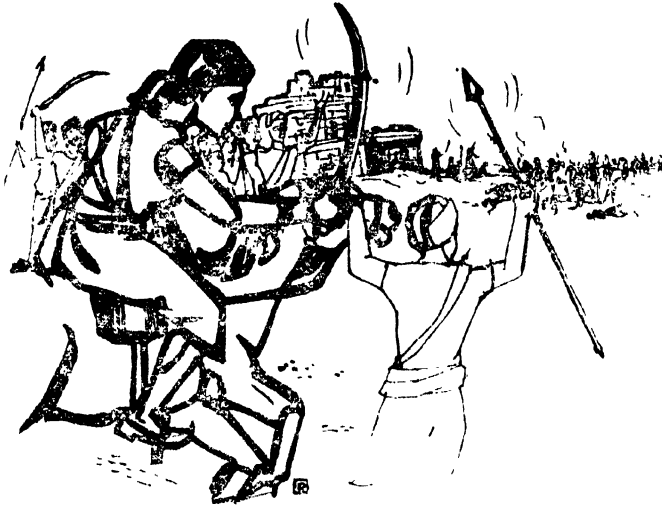
প্রধান গোলন্দাজ গোলাম ঘোষখাঁ এমনই তাক করে গোলা চালালো যে, তার তৃতীয় গোলাটা ইংরেজদের সবচেয়ে ভালো গোলন্দাজের ঠিক বুকে গিয়ে লাগল, আর তাকে নিমেষে উড়িয়ে দিলো।

সাবাস ঘোষখাঁ! সবাই চীৎকার করে উঠল। ইংরেজদের কামান চুপ করে গেলো।

পেছন থেকে ঘোড়ার পায়ের শব্দ উঠল। সবাই ফিরে তাকিয়ে চীৎকার করে উঠলো—রাণী লক্ষ্মীবাঈ কি জয়!

রাণী ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে ঘোষখাঁর পিঠ চাপড়ে বললেন, সাবাস্! তারপর একটা সোনার তাবিজ ঘোষখাঁকে পরিয়ে দিয়ে বললেন, এটা সামান্য! তোমার জন্যে আরো পুরস্কার অপেক্ষা করছে। কয়েক দিন পর পর ইংরেজরা যুদ্ধে হেরে ভূত হয়ে গেলো!

তেসরা এপ্রিল ইংরেজরা সমস্ত শক্তি দিয়ে চারদিক থেকে ঝাঁসী আক্রমণ করল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর খবর এলো উত্তর দরজায় ফিরিঙ্গীরা ভীষণ হামলা চালাচ্ছে। দেওয়ালে মই লাগিয়েছে। পাঁচিলে উঠে পড়বে। রাণী ঘোড়া ছুটিয়ে উত্তর দরজায় হাজির হলেন। তাঁর সৈন্যেরা তাঁকে দেখে চীৎকার করে বলল—হর হর মহাদেও! মারো ফিরিঙ্গীদের!!

দুম্ দাম্, ফট্ ফাট্! মুষলধারে বুলেট বৃষ্টি হতে লাগলো। মই দিয়ে যারা পাঁচিলে উঠছিল তারা শুকনো পাতার মতন নিচে ঝরে পড়ল। ইংরেজরা পালালো। কিন্তু এতো করেও কিছু হলো না। কিছু বিশ্বাসঘাতকদের সাহায্যে ইংরেজরা দক্ষিণ দরজা দিয়ে ঝাঁসীতে ঢুকে প'ড়ে, সব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার্ করে দিয়ে, ঝাঁসী অধিকার করে নিল।

সর্দারদের অনুরোধে রাণী লক্ষ্মীবাঈ গভীর রাতে একদল বিশ্বস্ত দেহরক্ষী নিয়ে আর পিঠে সিল্কের কাপড়ে শিশুপুত্র দামোদরকে বেঁধে নিয়ে, ঘোড়ায় চড়ে শত্রু সৈন্যের ভেতর দিয়ে ঝাঁসী ছেড়ে গেলেন। পথে একদল ইংরেজ তাঁকে আক্রমণ করল বটে, কিন্তু তিনি তলোয়ার চালিয়ে তাদের মেরে কেটে ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন। সারারাত সারাদিন ঘোড়া ছুটিয়ে পেশোয়ার রাজ্যে এসে হাজির হলেন। ইংরেজ বাহিনী তাঁর পেছু নিয়েছে শুনে, তিনি পেশোয়ার সৈন্যদল নিয়ে যমুনা নদীর ধারে ইংরেজ সৈন্যদলের মুখোমুখি হলেন কয়েক দিন পর। দারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হলো। পেশোয়ার বাহিনী হেরে যাচ্ছে দেখে, রাণী তলোয়ার খুলে বজ্রের মতন ইংরেজ সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মেরে কেটে ওদের ছত্রভঙ্গ করে দিলেন—লাল ঘোড়সওয়ার বাহিনী নিয়ে। হঠাৎ-আক্রমণে ইংরেজরা হতভম্ব হয়ে গেলো। ইংরেজ গোলন্দাজদের উপর তিনি ঘোড়সওয়ার চালিয়ে দিলেন, আর ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ কাটতে লাগলেন ইংরেজদের মাথা।

ইংরেজরা হেরে যাচ্ছে দেখে ওদের সেনাপতি উট-বাহিনী নিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালালো। তখন আর কিছু করা গেলো না। রাণী পেছু হঠে গেলেন। কিন্তু কয়েক দিন পরে গোয়ালিয়রে আবার যুদ্ধ বাধলো। রাণী বীরবিক্রমে ইংরেজদের আক্রমণ করলেন। বহু সৈন্য মার পড়ল। গুলী, গোলা, তলোয়ারের ঠ্যাং ঠ্যাং শব্দে কানে তালা লেগে গেলো। ইংরেজরা উট বাহিনী দিয়ে আবার দ্বিতীয় বার আক্রমণ চালালো। হঠাৎ রাণী দেখলেন, চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। তিনি তলোয়ার চালিয়ে ব্রিটিশ সৈন্যদল ভেঙে নিরাপদ জায়গার দিকে দৌড়লেন। ইংরেজরা নেকড়ের মতন তাঁর পিছু ধাওয়া করল। দৌড়তে দৌড়তে মাঝে মাঝে ফিরে দাঁড়ান আর দু'চারজন ইংরেজকে তলোয়ার দিয়ে শেষ করেন।

দৌড়তে দৌড়তে কয়েক মাইল গিয়ে একটা ছোট পাহাড়ী নদী পড়ল। ওটা লাফ দিয়ে পেরুতে পারলেই ইংরেজদের ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে চলে যাবেন রাণী। কিন্তু সারাদিনের যুদ্ধে ঘোড়াটা এতই ক্লান্ত হয়েছিল যে, সে আর লাফ দিতে পারে না। রাণী যতো তার পেটে গুতো দিয়ে লাফ দেওয়াতে চেষ্টা করেন, ঘোড়াটা খালি বোঁ বোঁ করে একই জায়গায় ঘোরে, পা খায়। এদিকে ইংরেজরা পেছনে এসে গেলো। রাণী তখন পেছন ফিরে ওদের আক্রমণ করলেন একা। তলোয়ারে-তলোয়ারে দারুণ যুদ্ধ চলল, কিন্তু অত লোকের সঙ্গে একা কতক্ষণ যুদ্ধ করা যায়! হঠাৎ একজন পেছন দিকে গিয়ে ওঁর মাথায় তলোয়ারের এক কোপ বসিয়ে দিলো। রাণীর মাথার ডান দিকটা ডান চোখ সুদ্ধু কেটে দু'ফাঁক হয়ে গেলো। উনি শ করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন ওর বুকে তলোয়ার চালিয়ে দিলো। সেই অবস্থাতে বীরাঙ্গণা নারী লক্ষ্মীবাঈ একজন ইংরেজকে একঘায়ে শেষ করে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন!

তার অনুচরেরা কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে তুলে নিয়ে সামনের এক কুটীরে শুইয়ে দিলো। একজন গঙ্গাজল দিলো মুখে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাণী দেহত্যাগ করলেন। অনুচরেরা শুকনো ঘাস দিয়ে সেই যুদ্ধের স্থানেই তাঁর শবদেহে আগুন জালিয়ে দিলো।

মাত্র তেইশ বছর বয়সে ভারতের প্রথম নারী, গোলাপের মতন সুন্দরী, আধুনিক রূপকথার রাণী লক্ষ্মীবাঈ দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে করতে গৌরবময় মৃত্যু বরণ করে নিলেন।

সারা পৃথিবীকে আমরা বুক ফুলিয়ে গর্ব করে বলতে পারি—দেখো, আমাদের দেশে এমন একজন রাণী জন্মেছিলেন, যা আর অন্য কোনো দেশে সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না।

মিনারাণী

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

হয়ে গেছে জানাজানি ছোট মেয়ে মিনারাণী
সারাদিন কাজে থাকে মগ্ন ;
কাচের জিনিসগুলি কচি হাতে লয় তুলি
ফেলে দিয়ে করে সব ভগ্ন।
দোয়াতের যত কালি ফেলে দিয়ে করে খালি,
হাতে-মুখে থাকে তার চিহ্ন ;
পুতুলের জামা চাই মিনারাণী বসে তাই
নিজের পোশাক করে ছিন্ন।
পোষা যে বিড়াল আছে সেটিও মিনার কাছে
শুয়ে রয় হয়ে চির-বাধ্য,
যত দুধ মিনা পায় সবটাই পুষি খায়,
বাধা দেয় নাই কারো সাধ্য।
সব ঠাঁই নিশিদিন গতি তার বাধাহীন
রাঙা ঠোঁটে মাখা তার হাস্য ;
যাহার নিকট যায় সে তখনি সুখ পায়
হেরি তার চঞ্চল লাস্য।
অন্যায় কাজে তার পথ নাই বকিবার—
বকিলেই চোখ দুটি ছলছল ;
তাই ভাবি সব যাক্ মিনা শুধু কাছে থাক—
অবসর সময়ের সম্বল।

লাল কালো

শ্রীআভা পাকড়াশী

মান্তু ভীষণ মিষ্টি খেতে ভালবাসে। চকলেট, লজেন্স তো ছেড়েই দেওয়া গেল, চিনি গুড়ও তার ভীষণ পছন্দ। খেতে বসে রোজ ছোট বোনের সঙ্গে ঝগড়া করবে। বলবে, এই তুই বেশী মিষ্টি খাস না, একেই ব'লে টিপসী হচ্ছিস! দেখেছিস না, বড়দি মোটা হয়ে যাচ্ছে বলে মিষ্টি খায় না। ছোট বোন ঝাঁজিয়ে উঠে বলে, আহা তুমি যেন বড় রোগা তাই নয়! সাত বছরের দিদি মান্তু বলে, বাঃ রে আমি যে ভীষণ রোগা!

এতো দুধ চিনির অভাব, তবু সেদিন শান্তুর জন্মদিনে মা পায়েস করেছেন। মান্তু বড় হলেও ছোটবোন শান্তুর কাছ থেকে কি করে আর একটু পায়েস বাগানো যায় তার মতলব খুঁজছে। খেতে বসে সে শান্তুকে বলল, এই, এই, ঐ দেখ তোর পায়েসের বাটিতে কি পড়েছে! মা মাকে ডেকে নিয়ে আয় তুলে দেবে। আমি হাত দিলেই তো চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করবি! মনে করবি যেন আমি সবটা খেয়েই ফেললাম। শান্তু দেখল সত্যি যেন একটা কালো মত কি!

মা মাছ ভাজাতে ভাজতে উঠে এসে বললেন, একি! আমি যে বাটি ভরে পায়েস দিলাম শান্তুকে! জন্মদিনে বাটি ভরা পায়েস খেতে হয়। তা কমলো কি করে! তুই খেয়েছিস! শান্তু বলল, সে এখনো ছোঁয়ইনি। মা হাত দিয়ে মরা একটা কালো পিঁপড়ে তুলে আনলেন! তারপর মান্তুর মুখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, এসব তোর কি কাণ্ড! পায়েস খাবার জন্য নোলা একেবারে সকসক করছে! ছিঃ ছিঃ, আজকে ওর জন্মদিন। আর ওকে ফাঁকি দিয়ে তুই ওর পায়েস ঢেলে নিয়েছিস! তিনি ঠাস ঠাস করে দু'গালে দুটো চড় বসিয়ে দিলেন মান্তুকে। সে কাঁদতে কাঁদতে উঠে চলে গেল। সকলের খাওয়া হয়ে গেলে মাই আবার তার হাত ধরে ডেকে এনে খেতে বসালেন। কিন্তু পায়েসের বাটি দিতে গিয়ে দেখেন, তাতে লাল পিঁপড়ে থিক থিক করছে। তখন উঠে গিয়ে রান্নাঘরের কোণ থেকে একটা মস্ত কালো ডেও পিঁপড়ে এনে পায়েসের বাটিতে ছেড়ে দিলেন। মান্তু রাগে ও দুঃখে চেঁচিয়ে উঠল। একে পিঁপড়ে ধরেছে, তারপর আবার পিঁপড়ে! মা বললেন, থাম না, দেখ! এক্ষুণি সব লাল পিঁপড়ে পালাবে, তারপর কালোটাকে তুলে ফেলে দেব। তখন তুই পায়েস খাবি! তবে ভাগ্যিস কালো পিঁপড়ে ধরেনি তাহলে আর এতক্ষণ এই পায়েসের কিছুই থাকত না!

মান্তু তার জন্মদিনে একটা ছড়ার বই পেয়েছে—সে ছড়া কাটছে পিঁপড়ে দেখে:

—আজব শহর দেখবে যদি

আমার সঙ্গে চলো,

আনারসের মোরব্বাতে জ্বালে তারা আলো!

সিঙাড়াতে রিক্সা টানে, নিমকি চালায় নৌকো,
ছানার-গজা মস্ত রাজা!
মিহিদানার বাড়ী তাজা!
সন্দেশ হ'ল সান্ত্রী!
জিলিপিতো সিঁড়ি বানায়,
রসগোল্লা গাড়ী চালায়,
পান্তুয়ারা পাগড়া বেঁধে
ক্ষীর কদম্বর লাঠি ঘোরায়.
খাস্তা হ'ল মন্ত্রী!
ঐ আজব শহর দেখবে যদি
এবার তবে চলো,
লাল কালোকে সঙ্গে নিয়ে
আমায় কর ফলো!

রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়েছে মান্তু। হঠাৎ কার ডাকে চমকে উঠে বসল। খুব সরু মিহি গলা তার। সে বলছে, আঃ! একটু ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নাও না, দেখছ না আমি শীতে কাঁপছি! মান্তু জিজ্ঞেস করল তুমি কে? সে উত্তর দিল, আমি লালুসর্দার, চল আমার সঙ্গে। আমাদের রাণীমা তোমায় তলব দিয়েছেন। মান্তু বলল, কোথায় যেতে হবে। সে বলল, কেন, আমাদের মিষ্টিপুরে! হুকুম করে বলল, চল শীগ্‌গির! মান্তু বলল, বারে তোমায় দেখতে পেলে তো তোমার সঙ্গে যাব! লালুসর্দার ভীষণ বিরক্ত হয়ে বলল, আর ন্যাকামি কোর না, এই তো তোমার ফ্রকের কলার-এর ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছি, ওঠো! ব'লে কি যেন একটা ভীষণ জোরে তার গলায় ফুটিয়ে দিল! গলা চুলকোতে চুলকোতে তার সঙ্গে চলল মান্তু! আঃ, কি সুন্দর মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ আসছে! ওমা একি সে যে হেঁটে চলেছে, জিলিপির ওপর দিয়ে! আবার তাকে পাশ কাটিয়ে, মহা ব্যস্ত ভাবে হিং-এর গন্ধ ছড়িয়ে কিছু খাস্তা কচুরি চলে গেল! আবার একটু পরেই দেখল, একরাশ চকলেট কুইক-মার্চ করে আসছে। তারা গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যেতেই দেখল চতুর্দিকে কেমন সুন্দর আনারসের গন্ধ বেরুচ্ছে। তারপর দেখল, মস্ত মস্ত চমচম সার সার সাজান। আর তার থেকে ফ্ল্যাগের মত আনারসের মোরব্বার বড় বড় চাকা ঝুলছে। কেমন সুন্দর একটা হলদে আলো বেরুচ্ছে তার থেকে। মান্তু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে একটা চমচম তুলে মুখে দিতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে হাতের উপর হুল ফোটাল লালুসর্দার। বলল, ছিঃ, তোমার এত লোভ! এই জন্যই তো তোমার ওপর চটে গেছেন রাণী-মা! তুমি আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করেছ!

চুপচাপ হেঁটে চল! এটা আমাদের মিষ্টিপুরের রাজধানী। তাই যেখানকার যেটি সুন্দর তাই এনে আমরা এই শহরটি সাজিয়েছি! আমরা তোমাদের মত কুঁড়ের বাদশা নই, যে রাতদিন নেই নেই করব! ঐ দেখ আমাদের সৈন্যরা ওখানে কি রকম কুচকাওয়াজ করছে!

মান্তু বলে, সে তো সব দেখতেই পাচ্ছি! কিন্তু এই রেশনের সময় তোমরা এত চিনি রাস্তা-ঘাটে ছড়িয়ে নষ্ট করছ!

মান্তুর সঙ্গে লালুসর্দার

সে বলল, রেশন! রেশন মানে কি? তা আমরা জানি না। আমরা জানি কাজ করতে, আর খাবার নিয়ে এসে নিজেদের ভাঁড়ার ভরতে! সেই জন্যেই আমাদের দেশে কখনও খাবারের দুঃখ হয় না! ওকি, ওটা কি গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে! মান্তু তাড়াতাড়ি লাফ দিয়ে সরে গেল। দেখল, মস্ত একটা সিঙাড়া গড়াতে গড়াতে জোরসে বেরিয়ে গেল! কানের কাছে লালুসর্দারের মিহি হাসি শুনল। সে বলল, আঃ, ভয় পাচ্ছ কেন? ওটা একটা রিক্সা গেল, আর খাস্তার কচুরিদের দেখিয়ে বলল, ওগুলো ঠেলা! রসগোল্লাদের দেখিয়ে বলল, ট্যাক্সি! সেটা একটা চৌরাস্তা! সেখানে প্রচুর রসগোল্লা, হিং-এর কচুরি আর সিঙাড়ার ভিড়! বলল, আঃ, আজও আবার ট্রাফিক জ্যাম হয়েছে দেখছি! গেল কোথায় সেপাই সাহেব!

মান্তুর পাশ দিয়ে আবারও ভীষণ মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে কে যেন চলে গেল! সে ভাল করে তাকিয়ে দেখে, সন্দেশ যাচ্ছে মাথায় ছানার জিলিপির লাল পাগড়ী আর তার হাতে ক্ষীর-কদম্বর লম্বা ডাণ্ডা! আহা ও না হয় মান্তুকে একবার ঐ ডাণ্ডা মেরেই ঠাণ্ডা করতে আসুক, তাহলেই তো সে এক কামড় খেয়ে নেবে! নাঃ, এলো না! এবার রাস্তাটা যেন কাঁকর বেছান, তাকিয়ে দেখল ডালমুট ছড়ান রাস্তা। লালু সর্দার বলল, আঃ কথা বোল না, ঐ যে রাজবাড়ী এসে গেছে!

মাস্তু দেখে বেশ গোলাপী রং-এর ছোট একটা বাড়ী ; এরও গন্ধটা চেনা-চেনা ; ওঃ হো ছানার-গজা না ! হ্যা হ্যা, তাই তো ! সিঁড়িগুলো জিলিপির ! মাস্তুর সেখানে পা দেবার আগেই হাত দিয়ে ভেঙ্গে খেয়ে নিতে ইচ্ছে করছে ! কিন্তু দেখল জিবে-গজার বল্লম হাতে দু'জন পাহারাওয়ালা সিঁড়ির দু'দিকে দাঁড়িয়ে। সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে আছে মাস্তু, লালুসর্দার গেল রাণী-মাকে খবর দিতে। তারপর দেখে এক রাশ কালো সুড়সুড়ি পিঁপড়ে মাথায় করে কি নিয়ে যেন সেই জিলিপির সিঁড়ি দিয়ে নামছে ! লালুসর্দার ওদের আগে ছুটে এসে ওর কাছে দাঁড়াল ! এবার ভাল করে চেয়ে দেখে একটা বিস্কুট বয়ে নিয়ে আসছে ওরা ! তার ওপর দুধ-সাদা ক্রীম মাখান। সেখানে খুব সুন্দর লাল রং-এর ঘাগরা আর ওড়না পরা একটি মেয়ে বসে রয়েছে ! তার মাথায় মুকুট ! লালুসর্দার মাথা নীচু করে তাকে প্রণাম করল, তার দেখাদেখি সেও করল ! তিনিই রাণী। হাত-পা নেড়ে ওকে কি যেন বললেন, প্রথমটা শুনতে পেল না মাস্তু। তারপর বুঝতে পারল তাঁর কথা -বলছেন, তুমি মিষ্টি ভালবাস ! আমরাও মিষ্টি ভালবাসি ! সেই জন্য এতদিন ছিলে তুমি আমাদের বন্ধু ! সেই জন্যই আমি আমার সৈন্য পাঠিয়ে, আজ সকালে তোমার পায়েসের বাটি পাহারাও দিয়েছিলাম ঐ কালোমুখো ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। একটা কৃতজ্ঞতাও ছিল, কেন না তুমি সকালবেলা ওদের এক কালো সর্দারকে মেরেছিলে ! ওরা যত সংখ্যায় কমে ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গল ! কিন্তু তোমার মা'র একি ব্যবহার ! তিনি কিনা আমাদের সৈন্যদের এভাবে মেরে ফেললেন। এর শাস্তি তো তোমাকে পেতেই হবে। বলেই দু'হাতে তিনি তালি বাজালেন। একরাশ লাল সৈন্য এসে তার দু'ধারে কাতার দিয়ে দাঁড়াল। তিনি বললেন, যাও ! একে ঐ চিত্রকূট পাহাড় পার করে ঐ কালো রাজার দেশে দিয়ে এস। আজ থেকে ও আমাদের শত্রু। তাঁর মিষ্টি রিনরিনে সুর থেমে যেতেই সুড়সুড়ি পিঁপড়েরা সেই বিস্কুটের সিংহাসন তুলে নিয়ে রাজবাড়ীর দিকে চলতে লাগল, আর লাল সৈন্যরা মাস্তুকে ঘেরাও করে ধরে সামনের পায় কামড়াতে লাগল। ঐ লালুসর্দারও তার গলায় হুল ফুটিয়ে দিল। সে ভয় পেয়ে ছুটতে লাগল ! তার পায়ের তলায় কত সিঙ্গাড়া, কচুরি, ডালমুট গুঁড়িয়ে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখে সামনে মস্ত একটা চিত্রকূট পড়ে রয়েছে ! কিন্তু তাতে একবিন্দু রস নেই। একেবারে শুকনো খটখটে। ও দিকটা তাকিয়ে দেখল কোথাও কিছু নেই। সব শুকনো খড়খড় করছে।

এমন সময়ে কে যেন তার হাত ধরল। দেখল মস্ত একটা কালো পিঁপড়ে, গায়ে তার লাল কুর্তা। সে বলল, আমি সীমান্ত প্রহরী। তুমি এভাবে বিনা পাশপোর্টে আমাদের

দেশে ঢোকবার চেষ্টা করছ কেন? শীগ্‌গির চল আমাদের রাজার কাছে। তারপর তাকে ভাল করে দেখে বলল, ওঃ তুমিই তো সেই! আমাদের কালু সর্দারকে তো তুমিই মেরে ফেলেছ, তাই না? বেরোও! বেরোও শীগ্‌গির এখান থেকে! সুবিধেবাদী, বিশ্বাসঘাতক কোথাকার! লাল সৈন্য তাড়াবার জন্য আমাদের সাহায্য নিয়ে আবার আমাদেরই দূর করে দিয়েছ—পাজী, বদমাস! এবার ভীষণ জোরে একটা শব্দ করে সে তার সেই কালো যমদূতের মত চেহারা নিয়ে তেড়ে গেলো মান্তুকে।

মান্তু ভয় পেয়ে ও-মাগো বলে চেঁচিয়ে উঠল! চোখ খুলে দেখে ভোর হয়ে গেছে। শান্তুর স্কুলের বাসটা হর্ন দিলে। ভোঁ...প্‌প্‌।

আজব দেশের ছড়া

শ্রীকরুণাময় বসু

কোলকাতার বোলতারা চালতার চাটনিতে
প্যাক হয়ে চলে গেল হালফিল কাটনি-তে।
শালখের শালিখরা তাই শুনে রাগ করে
পালকিতে চেপে যায় দলে দলে ভাগ করে।
কাকাদের কাকাতুয়া ঝাপটায় খাঁচাতেই,—
প্রান্তরে ছেড়ে দাও প্রাণ তার বাঁচাতেই।
হীরামন পাখি শুনি মীরাদি'র হাত থেকে
দুধ খায়, ছোলা খায়, বলে দাও ভাত মেখে।
মীরাদি'র বিড়ালেরা ভেঙে পড়ে কান্নায়,
দুধ দিলে খাবো কি যে এ তো ভারী অন্যায়
ছড়া কয় রেগে-মেগে দাও তবে রসবড়া,
এক কড়া পানতুয়া কিংবা সে হাতকড়া।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ইনস্‌পেক্টর নিজেই হাঁড়ির ঢাকাটা তুলে দেখল টর্চ ফেলে। বিল্লু, সুলতান, মাঝি ভয়ে কাঠ হয়ে বসে আছে। হাঁড়ির ভেতর একটু সন্ধান করলেই পিস্তল দুটো বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু ইনস্‌পেক্টর তা করল না। ভাত দেখেই আবার ঢাকা দিয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল সুলতানের। ধরা পড়লে এক্ষেত্রে বিল্লু কি করবে তা সে আগেই ঠিক করে রেখেছিল। ডিঙি থেকে টুপ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ডুব-সাঁতার দিয়ে অন্য জায়গায় গিয়ে উঠবে। সৌভাগ্য বশতঃ সেটা আর তাকে করাতে হ'ল না। দড়ির সিঁড়ি বেয়ে ইনসপেক্টর আর কনেষ্টবলরা উঠে পড়ল লঞ্চের উপর। সাইরেনটা বাজিয়ে সাদা লঞ্চটা মোড় ঘুরে উল্টো দিকে চলে গেল তীব্র বেগে। ডিঙিটা নির্জন একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ডিঙির আরোহিরা কিন্তু কেউ নামল না। অপেক্ষা করতে লাগল যেন কার জন্য। একটা ভ্যান এসে রাস্তার ধারে দাঁড়াল একটু পরে।

এই এসেছে। বলল সুলতান।

দাঁড়া, অত ব্যস্ত হস নে ; এই নে পিস্তলটা। যদি অন্য কেউ হয় তবে আমি গুলি ছুঁড়ব, তুইও সেই সঙ্গে চালাবি, তারপর জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে অন্য জায়গায় গিয়ে উঠবি।

আমি যে সাঁতার জানি না ভাই ! ভয়ে ভয়ে বলল সুলতান।

বিরক্ত হ'ল বিল্লু। বলল, তাহলে এসেছিলি কেন এ-কাজে ?

একটা লোক ভ্যান থেকে নেমে গঙ্গার ধারে দাঁড়াল। তারপর হাত দুটো ছড়িয়ে দিল আড়াআড়িভাবে ট্রাফিক পুলিশের ভঙ্গীতে।

ঠিক আছে। বলল বিল্লু, এ আমাদেরই লোক, ভয় নেই। পিস্তল কোমরে রেখে দে।

ডিঙির ধারে বাঁধা দড়িটা ধরে টানতে লাগল বিল্লু। প্যাকেটটা উঠে এল। মাঝারি সাইজের একটা প্যাকেট মজবুত করে পলিথিন জড়ানো। ভ্যানের লোকটা এগিয়ে আসতে

প্যাকেটটা তার হাতে দিল বিল্লু। তারপর তাকে মাঝখানে রেখে দু'জনে এগিয়ে চলল ভ্যানের দিকে।

অরিন্দম একটা খবর পেল থানা থেকে। নরেনবাবুই ফোন করলেন।

তুমি কখন আসছ? জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

আমি এখন কোথায় যাব? উত্তরে জানতে চাইল অরিন্দম।

কেন, খিদিরপুরে—আবার কোথায়?

তা তো বুঝলাম, কিন্তু খিদিরপুর তো একটা ছোট জায়গা নয়। আর মাল তো সরান হয়েছে জাহাজ থেকে, তাই না? বলল অরিন্দম।

হ্যাঁ, তাই। তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর ভাই। ওপরওয়ালা ভীষণ তাড়া লাগাচ্ছে। বললেন নরেনবাবু।

বেশ তাহলে কাল থেকেই আমি কাজে নামব।

খুব ভাল কথা। নরেনবাবু খুশী হয়ে বললেন, কটা লোক চাই বল?

এখন লোক চাই না, এখন আমি শুধু সাঁতার কাটব।

কি বললে? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন নরেনবাবু।

এখন আমি সাঁতার কাটব কিছুদিন, বলল অরিন্দম।

কি উল্টো-পাল্টা বকছ? ডাক্তারবাবু কি কড়া ট্যাবলেট খাইয়েছেন তোমায়? আমি জাহাজের মাল চুরির কথা বলছি আর তুমি সাঁতার কাটব, সাঁতার কাটব বলে তখন থেকে বকছ!

আমি ঠিকই বলেছি নরেনবাবু, জাহাজ তো জলেই ভাসে। তাছাড়া জাহাজ রেড রোডে চলে বলেও কখনও শুনিনি। তাহলে আজ থেকেই আমি জলে নামছি। কথাটা বলে ফোনটা ছেড়ে দিল অরিন্দম।

হতভম্ব হয়ে গেলেন নরেনবাবু অরিন্দমের কথা শুনে। অল্পবয়সে ছেলেটার মাথা খারাপ হয়েছে বলে মনে মনে কিছুটা যেন দুঃখই করলেন তিনি।

সুইমিং কস্টিউম নিয়ে বেরোবার মুখে পরেশের সঙ্গে দেখা হ'ল অরিন্দমের।

বাবু কখন ফিরবেন? জিজ্ঞেস করল পরেশ।

এই ঘণ্টা দুই পরে। উত্তর দিল অরিন্দম।

তা'হলে চার ঘণ্টা। আস্তে বলল পরেশ।

মিঠু সেই সময় চিৎকার করে বলে উঠল, এই চুপ কর, বাজে বকিস নি।

শুনলেন বাবু, নিজের কানে শুনলেন তো? আমি কিছু বললেই ওই হতভাগা পাখী ওইভাবে চিৎকার করবে। একদিন দোব মাথার ঝুঁটি ধরে—।

হাসিমুখে বেরিয়ে গেল অরিন্দম প্রথমে হেড অফিস, তারপর সেখান থেকে সোজা গঙ্গার ঘাট। ঘাটে বামুন ঠাকুরের কাছে কাপড় জামা রেখে, কষ্টিউম পরে সে গঙ্গায় নামল। সাঁতার সে ভালই জানে। তা ব'লে স্টেজে মেরে দেব, এই ভাবটা তার নেই। সে রিহার্সালে বিশ্বাস করে, অনুশীলন আর অভ্যাসের উপর নির্ভর করে একান্তভাবে। এদিক দিয়ে তার নিষ্ঠা অটুট। প্রথমে সাধারণভাবে সে সাঁতার কাটল এক ঘণ্টা ধরে। লক্ষ্য করল, তাতে তার দমের অকুলান হচ্ছে না। তার ভয় ছিল, এলাহাবাদের অত্যাচারের পর শরীর হয়ত দুর্বল হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তা হয়নি। উপরন্তু এতদিন বিশ্রামের ফলে তার শরীর ও মন আরও সতেজ হয়েছে অনুভব করল অরিন্দম। এবারে ডুব-সাঁতার। একসঙ্গে আধঘণ্টা জলের তলায় থাকা তার অভ্যাস আছে। সেটা বজায় আছে দেখে খুশী হ'ল সে। গতবার সে ন্যাশনাল ডাইভিং প্রতিযোগিতায় ফার্ষ্ট হয়েছিল, তবুও সে ঠিক করল সুইমিং পুলে গিয়ে আরেকবার ডাইভিংটা ঝালিয়ে নেবে। সাঁতার কেটে ভারী আনন্দ হ'ল অরিন্দমের। কাপড় জামা পরে যথারীতি ঠাকুরকে তার প্রাপ্য দিয়ে এগিয়ে চলল সে থানার দিকে। এবার তার মেজাজটা মিইয়ে গেল। নরেনবাবুর বকবকানি শুনে নির্ঘাৎ তার মাথা ধরে যাবে। কিন্তু উপায় নেই, কর্তব্য তাকে করতেই হবে। জীবনে কখনও কর্তব্যের অবহেলা করেনি কিংবা দায়িত্ব এড়িয়ে যায়নি অরিন্দম। এটা তার ধাতে সয় না। আলস্যে সময় নষ্ট করলে শরীরেই শুধু ঘুণ ধরে না, মনেও দুর্বলতা আসে।

নরেনবাবু অরিন্দমকে দেখে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন।

তুমি এসেছ! হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন তিনি। তোমার বাড়ীতে ফোন করেছি কয়েকবার, লোক পাঠিয়েছি চতুর্দিকে। এবার ভাবছিলাম—

গঙ্গায় জাল ফেলবেন আমার জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে বলল অরিন্দম।

অবশ্য প্রায় তাই। চেয়ারে বসলেন নরেনবাবু।

কি বলুন এবার। বলল অরিন্দম।

বড় জবর খবর—এস. এস. টেম্পেস্ট থেকে প্রচুর মাল পাচার হচ্ছে।

ও তো পুরনো খবর। মন্তব্য করল অরিন্দম।

কাল জল-পুলিশ একটা ডিঙি সার্চ করেছিল, কিন্তু কিছু পায়নি।

তা'হলে আর কি! হতাশার একটা ভাব করল অরিন্দম।

তুমি একবার কান্তিবাবুর সঙ্গে আলাপ কর। বললেন নরেনবাবু।

কে কান্তিবাবু?

জল পুলিশের ইনস্পেক্টর।

একটু পরেই কান্তিবাবু এলেন। লম্বা-চওড়া চেহারা, অরিন্দমেরই বয়সী। দেখলে বেশ মজবুত বলে মনে হয়। নরেনবাবু অরিন্দমের সঙ্গে কান্তিবাবুর আলাপ করিয়ে দিলেন।

আপনিই অরিন্দম মুখার্জী। অবাক চোখে তাকাল কান্তি।

হাঁ। মাথা নীচু করল অরিন্দম।

অনেক দিন থেকে আপনার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে ছিল। আপনার নাম অনেক শুনেছি। বললেন কান্তিবাবু।

নাম মানে! উচ্ছ্বসিত হলেন নরেনবাবু। বললেন, ওর মত কুস্তি লড়তে কে পারে? বক্সিং লড়ুক কেউ ওর সঙ্গে—একটা ঘুষি একটা হাতুড়ির সমান! জুজুৎসুর প্যাচে কারুকে কাবু করতে ওর পাঁচ সেকেণ্ডও লাগে না।

নরেনবাবুকে বাধা দিতে চেষ্টা করে অরিন্দম, কিন্তু কে-কার কথা শোনে!

নরেনবাবু যেন তুবড়িতে আগুন দিয়েছেন, কথার ফুল্‌কি বন্ধ করে কার সাধ্য!

এই তো সেদিন—বলতে থাকেন নরেনবাবু : এলাহবাদে পাঁচ ছ'জন দাগী গুণ্ডার সঙ্গে একলা খালি হাতে লড়ে তাদের জখম করে ছেড়েছে। নরেনবাবু একটু দম নিলেন। এই সুযোগে কান্তি বলল, এবার তা'হলে আমাদের একটু দেখুন, নয়ত বিপদ! এস. এস. টেম্পেস্ট থেকে যে রেটে মাল পাচার হচ্ছে, আর কিছুদিনের মধ্যে গোটা জাহাজসুদ্ধ লোপাট না করে দেয়!

ধরা যাচ্ছে না? জিজ্ঞেস করল অরিন্দম।

আমরা জলের লোক, ডাঙার কথা বলতে পারি না; তবে শুনেছি সমানে মাল পাচার হচ্ছে খিদিরপুরে।

কাউকে সন্দেহ করা হয়েছে?

কাল একটা ডিঙিকে সন্দেহ করে ধরেছিলাম, কিন্তু কিছুই পেলাম না।

ক'জন ছিল?

দু'জন আর মাঝি। একটা লোক চীনেবাদাম বিক্রি করতে গিয়েছিল ওপারে, আর একজনকে কুলিশ্রেণীর লোক বলে মনে হ'ল।

কি রকম দেখতে?

একেবারে সাধারণ।

কারও দেহ বা জামা ভিজেছিল?

সে আবার কি? মাঝা থেকে বলে উঠলেন নরেনবাবু, লোককে সন্দেহ করলে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেখতে হবে চুল ভিজে আছে কিনা?—কি বলছ অরিন্দম, আমি তোমার কথা কিছু তো বুঝতে পারছি না বাপু!

আমি বুঝেছি। বলে উঠল কান্তি, ওরা সাঁতার কেটেছে কিনা, চুল ভেজা থাকলে সেটা বোঝা যেত, তাই না?

হ্যাঁ, তাই। স্বীকার করল অরিন্দম।

ইস্ বড্ড ভুল করে ফেলেছি। বলল কান্তি, ওটা দেখা আমার খুবই উচিত ছিল।

নরেনবাবু এতক্ষণে বুঝলেন। বললেন, তোমার ঐ মাথায় কত বুদ্ধিই যে খেলে তাই ভাবছি। জানেন কান্তিবাবু, ব'লে চলেন নরেনবাবু—আজ সকালে ফোনে ওঁর কথা শুনে কেমন খটকা লাগল, পাঁড়েকে বললাম তাই পিছু নিতে।

সে কি নরেনবাবু! অবাক হয় অরিন্দম।

তা কি করব বলো? আমি ভাবলাম তুমি হয়ত উল্টোপাল্টা ওষুধ খেয়ে মাথা গরম করে জলে ডুবতে যাচ্ছ। তাই পাঠালাম পাঁড়েকে তোমার পিছু নিতে।

অরিন্দম আর কান্তি দু'জনেই হেসে উঠল, নরেনবাবুর কথা শুনে।

আরে হাসছ কি? বললেন নরেনবাবু, খানিক পরে পাঁড়ে ফোন করে বলল, তুমি নাকি ডুবে গেছ।

না ডুবিনি, তবে ডুব-সাঁতার দিচ্ছিলাম বটে। বলল অরিন্দম।

তা কি করে বুঝব বলো, একেবারে নাকি আধ ঘণ্টা পাত্তা নেই তোমার! আর পাঁড়েরই বা দোষ কি বলো! জলের তলায় কোন লোক অতক্ষণ থাকতে পারে?—তা সে যাক্, এখন কি করবে বল?

কাজে নামতে হবে। আর দেরি করে লাভ কি! বলল অরিন্দম।

(ক্রমশঃ)

প্রজাপতি! প্রজাপতি!

শ্রীউদয়ন ভৌমিক

প্রজাপতি! প্রজাপতি!
শোন তো দেখি ভাই,
সারাক্ষণই উড়ে বেড়াস
বিশ্রাম কি নাই?

চুপটি করে বেড়াস উড়ে
নেইকো মুখে কথা,
নাকি রে তোর বলতে কথা
লাগে গলায় ব্যথা?

কি বললি? বলবিনাকো?
মারবো পিঠে কিল?
ওকি রে! তুই উড়েই গেলি?
আচ্ছা মুশকিল!

বিজয়ী

শ্রীইন্দিরা দেবী

সকলেরই একটু আশ্চর্য লাগছে। ক্লাসের ছেলেদের তো কথাই নেই—মাষ্টার মশাইরাও বিস্ময় বোধ করছেন। স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ উৎসব হবে—নাম টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক এক করে অনেকগুলি নাম রয়েছে। সম্ভাব্য নাম, নতুন নাম, যে নাম সকলে আশা করেছেন—সবই রয়েছে, কিন্তু একটি নাম কেমন করে ভুল হলো? এ তো ভারী অদ্ভুত ব্যাপার মনে হচ্ছে। ক্লাসের সেরা ছেলে প্রতি বছরই কোন-না-কোন বিষয়ে তার পুরস্কার আছেই—বিশেষ করে ইতিহাসে সর্বোচ্চ নম্বর তার থাকেই। ক্লাসের বন্ধুরা অনেক সময় ঠাট্টা করে বলে: ঐতিহাসিক মশাই বলুন তো এটা কি হবে? এ কথার উত্তরে কল্যাণ ঠাট্টা-তামাসা না বুঝেই ঝর ঝর করে বলে চলে—যেন মুখস্থ বলছে। তাছাড়া পুরস্কার পাওয়া তো আছেই।

কল্যাণের নাম কোথাও নেই। যে নাম টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে, অনেকবার করে পড়েছে সকলে। না কোথাও তার নাম নেই। কল্যাণের যারা বিশেষ বন্ধু তারা শুধু আশ্চর্য নয় দুঃখিতও হয়েছে—কিন্তু কিছুই জিজ্ঞাসা করতে পারছে না—না কল্যাণকে, না মাষ্টার মশাইদের কাউকে। কেবল সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে একি হলো!

দু' তিন দিন ভারী অস্বস্তিতে কাটলো সকলের। এক বেঞ্চ যারা বসে, কল্যাণকে তারা ভালবাসে—তারা সকলেই তাকে এড়িয়ে যেতে লাগলো। সৌম্য, সুরেশ, সুহৃদ, সুভাষ, সুকোমল, অতনু সবাই যেন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়েছে। সহজ চলার মাঝে কি যেন ছন্দপাতন হয়েছে।

স্পষ্টবাদী বলে সুজয়ের একটু নাম ছিল—তাছাড়া নির্ভীকও ছিল খুব। অন্যায় না হলে অশঙ্কোচে প্রতিবাদ জানাতো সকলকে—লঘুগুরু মানতো না। যেদিন সুজয় বললো এবং নিজে গিয়ে দেখলো—সত্যি কল্যাণের নাম নেই, সেদিন সোজা প্রধান শিক্ষকের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ালো মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে--কেন এরকম হয়েছে তা জানতে হবেই।

প্রধান শিক্ষক খুব ব্যস্ত ছিলেন, বললেন—কাল এসো সুজয়, দেখছো তো কাল বিকেলে প্রাইজ হবে, খুব ব্যস্ত রয়েছি।

কাল তা'হলে কখন আসবো স্যার? তা ছাড়া কালকের পর এই দরকার আমার আর থাকবে না। আমার কথা আপনাকে আজ শুনতে হবে, আপনি কাজ সেরে নিন। আমি অপেক্ষা করছি।

তার দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনে প্রধান শিক্ষক একটু থামলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা ওপাশের দরজা দিয়ে এসো, কিন্তু সময় মাত্র দু' মিনিট।

এক মিনিটেই হয়ে যাবে—উত্তর দিয়ে সুজয় তাঁর কাছে গেল এবং জিজ্ঞাসা করলো।

হেড মাষ্টার মশাই একটু ভেবে বললেন—আচ্ছা যাও, কি হয়েছে দেখছি। তবে একথাও ঠিক—একটি ছেলেই প্রতিবছর বিজয়ী নাও হতে পারে। ওর চেয়ে অন্যের নম্বর ভাল আছে হয়তো। এই ইতিহাসে যার নাম দেখেছো, তার নম্বর হয়তো ভালো হয়েছে ওর চেয়ে। আচ্ছা তবু আমি নিশ্চয় এ বিষয়ে অনুসন্ধান করবো। আর তুমি যে এ বিষয় জানাতে আমার কাছে এসেছ এজন্য আমি খুব খুসী হয়েছি।

সুজয়কে বন্ধুরা ঘিরে ধরলো, কি বললেন রে মাষ্টার মশাই? আর কি বলবেন—বললেন খবর নেবেন।

অতনু বললে, কল্যাণ কিন্তু জেনেছে সে এ বছর কোন পুরস্কার পায়নি।

—তা তো জানবেই। নাম টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে আর জানবে না! কিছু বলছিল?

সুকোমল বললে, মোটেই না। কিচ্ছু বলেনি—বলবার কি আছে? বাপকে বাবা! এই ব্যাপার নিয়ে ক'দিন আমাদের মন খারাপ। খেলাধুলো পড়াশুনা কিছুই হচ্ছে না। ও সব ছেড়ে দাও, সুজয় তো বলেই এসেছে আর কি করা যাবে! কাল আসছিস তো সবাই? আমরা নাই বা পেলাম, তা'বলে বন্ধুদের আনন্দের ভাগ নেবো না?

—নিশ্চয়ই আসবো সকলে। কল্যাণকেও আনবো।

ব্যাপারটা কি জানবার জন্য প্রধান শিক্ষক মশাই ডেকে পাঠালেন নিকুঞ্জবাবুকে—তিনি ইতিহাস পড়ান ও পাতাগুলো মুখস্থ বলে চলেন।

মাষ্টার মশাই বললেন, হতভাগা ছেলে, সারা বছর এত খেটেখুটে পড়ালাম—বই-এর কোন কোন পাতার লাইনে দাগ দিয়ে বার বার পড়তে হবে, সবই বলা হয়েছিল। তখন মনে হতো বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনছে, কিন্তু দেখুন কি বাজে লিখেছে। প্রশ্ন ছিল, 'হর্ষবর্ধনকে কি কারণে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা বলে গণ্য করা হয়।' তার জবাবে কি লিখেছে তা আপনাকে পড়ে শোনাচ্ছি। নিকুঞ্জবাবু প্রধান শিক্ষককে পড়ে শোনালেন:

—"প্রতি পাচ বৎসর অন্তর গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে দান-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। দেশের নানাস্থান হইতে এই উৎসবে বহু ব্যক্তি যোগদান করিতেন। সম্রাট নিজ হস্তে সকলকে দান করিতেন—কোনও প্রার্থীকেই বিমুখ করিতেন না। দান-ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইয়া গেলে কোনো প্রার্থী যদি উপস্থিত থাকিত, তাহাকে আপন পরিধেয়খানি পর্যন্ত দান করিয়া দান-যজ্ঞ সম্পন্ন করিতেন।" ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা হর্ষ সম্বন্ধে আর কোনো ঘটনারই উল্লেখ নেই। কেবল দান আর দান-যজ্ঞ। কবে কি অবস্থায় তিনি রাজা হয়েছেন, কোথায়

'কল্যাণের জয়—আমাদের জয়!' —পৃঃ

ছিল তাঁর রাজধানী, কত দেশ জয় করেছিলেন; তাছাড়া তাঁর রাজ্যশাসন, রাজ্যবিস্তৃতি, সে সম্বন্ধে একটি কথাও লেখেনি। হিউয়েনসাং, বানভট্ট ইত্যাদিদের সম্বন্ধেও কোথাও এতটুকু উল্লেখ নেই। বলুন তাকে আমি কি করে নম্বর দেবো? অথচ অন্য অন্য প্রশ্ন ভালই লিখেছে। অন্য বিষয়ও ও বরাবর ভালো করাতেই ওর উপর অনেকখানি আশা ছিল, কিন্তু এরপর আর কোনো আশা নেই আপনি ওকে ডেকে ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন, ইতিহাস অত সোজা বিষয় নয়—এবে খুব খুঁটিয়ে পড়া দরকার।

হেড মাষ্টার মশাই নিকুঞ্জবাবুর কাছ থেকে খাতাখানি চেয়ে নিলেন।

পরের দিনের উৎসবে ছাত্ররা এবং পুরস্কার বিজয়ীরা সকলেই এসেছে। সভাপতি, প্রধান অতিথি আসনে বসেছেন। তাঁদের বক্তৃতা শুনবার জন্য সকলে আগ্রহ সহকারে অপেক্ষা করছেন। স্কুলের কথা, ছাত্রদের কর্তব্যের কথা, নিয়মানুবর্তিতার কথা প্রভৃতি যা কিছু বলার সব বলা হলো। তারপর প্রধান অতিথি বললেন, এই বিদ্যালয়ের যিনি প্রধান শিক্ষক তাঁর কাছে আজ আমরা একটি বিস্ময়কর ঘটনা শুনেছি। ঘটনাটি এই স্কুলেরই একটি মেধাবী ছাত্রের সম্বন্ধে। আজকে পারিতোষিক যারা পেয়েছে সকলের নামই আগে জানান হয়েছে, কিন্তু একটি নতুন নাম আজ কিছুক্ষণ আগে সংযোজন করা হয়েছে। প্রধান শিক্ষক মশাই বলেছেন, এই ছাত্রটি প্রতি বছরই পুরস্কার পায়, কিন্তু এবছর তার নাম ছিল না। সে বিষয় অপর একটি ছাত্র তাকে জানাবার ফলে তিনি বিশেষভাবে তার খাতা দেখতে চান। সেই লেখা দেখে

আমাদের দ্বি-মত নেই, এবং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে অপরিহার্যভাবে সে পুরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত। ছেলেটির নাম শ্রীমান্ কল্যাণ চক্রবর্তী।

সমবেত দৃষ্টি একত্র হয়ে সামনে উপবিষ্ট কল্যাণের উপর পড়লো। লজ্জা ও বিস্ময়ে কল্যাণের মুখ রক্তাভ হয়ে উঠেছে।

এরপর প্রধান শিক্ষক বললেন, ইতিহাস-পাঠ শুধু পড়া মুখস্থর জন্য নয়—কল্যাণীয় কল্যাণ যে সত্য নিজের মনে উপলব্ধি করেছে, তাকেই সে তুলে ধরেছে তর্ষবর্ধনের শ্রেষ্ঠ রূপ হিসাবে। তার লেখায় শ্রদ্ধা ও সত্যের রূপ প্রতিভাত হয়ে উঠেছে···।

করতালির শব্দে আর কোনো কথাই কল্যাণের কানে পৌঁছল না।

অভিভূত ভাবটা যখন কেটে গেল, তখন কল্যাণ দেখলো সৌম্য, সুভাষ, সুজয় ও অতনুর মাঝখানে বসে আছে আর তারা উচ্চৈঃস্বরে বলছে : কল্যাণের জয়—আমাদের জয় !

হে ভারতী রক্ষা করো

[illegible]

হে ভারতী রক্ষা করো
　　　আসছে বছর নেইকো ফাঁকি,
পরীক্ষাটা এগিয়ে এলো
　　　এখন দেখি সবই বাকী।
সারা বছর ঘুরে ঘুরে
　　　ক্লাসে বসে গল্প করা,
বিকেল বেলায় বেড়িয়ে এসে
　　　পড়ার সময় মাথা ধরা।
তারপরেতে বছর শেষে
　　　হয় যে ব্যাপার নাটকীয়।
বইগুলো সব গিলতে হলে
　　　সব কিছু হয় শোচনীয়।
কোন মতে বেরিয়ে গেলে
　　　অতীত কথা হয়তো রে ভাই,
নতুন বছর একই রকম
　　　কিছুতে তার বৈচিত্র্য নাই।

শিশুরা হাত দিয়ে শেখে

মণ্টেসরি স্কুলের শিক্ষাধারা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। পশ্চিম জার্মানীতে মণ্টেসরি স্কুলের পড়ুয়াদের সংখ্যা প্রায় পাঁচহাজার। এদের বয়স তিন থেকে ছয় বছর।

শিশুদের জন্যেই মণ্টেসরি স্কুলের সব কিছু তৈরী। এখানে শিশুদের ছুরি-কাঁচির ব্যবহার পর্যন্ত শেখানো হয় এবং শিশুরা খুব তাড়াতাড়ি ওসব জিনিস সম্বন্ধে সাবধান হতে শেখে। লিখতে-পড়তেও তাদের শেখানো হয় স্পর্শ পদ্ধতিতে। খেলাধূলার সময় শিশুরা এখানে শেখে শৃঙ্খলা, মনোযোগ ও স্বাবলম্বন এবং পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে তারা আশ্চর্য জ্ঞানলাভ করতে শেখে। এক কথায় বলতে গেলে মণ্টেসরি ধারার শিক্ষিত শিশুরা নিজেদের দেখাশোনা করতে পারে।

ফ্রাঙ্কফুর্টের একটি মণ্টেসরি স্কুলে শিশুরা নিজেরাই প্রাতরাশের টেবিল সাজিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে বাসনপত্র ধুয়ে নেয়। চোখ-বাঁধা অবস্থায় তারা রিলিফ ম্যাপে হাত বুলিয়ে ঠিক বলে দেয় সেটা কোন্ মহাদেশের মানচিত্র। এটা শিশুদের কাছে একটা মজার খেলা হয়ে উঠেছে।

পশ্চিম বার্লিনে 'ষাঁড়ের লড়াই'

বার্লিনের ফরাসী এলাকায় প্রথম ষাঁড়ের লড়াইয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। বার্লিনের তরুণরা সাহসের সঙ্গে এই লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছিল। এই উৎসব উপলক্ষ্যে সমগ্র এলাকায় বেশ

ফরাসী আবহাওয়ার সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই ষাঁড়ের লড়াই দেখতে মিত্রশক্তির হোমরা-চোমরারা ব্যক্তিরা ছাড়াও বহু গণ্যমান্য অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

ইথিওপীয়ার বিখ্যাত দৌড়বিদ

আবেবে বিবিলা, বিশ্বের বিস্ময়। তিনি রোম ও টোকিয়ো অলিম্পিকের ম্যারাথন দৌড়ের স্বর্ণপদক বিজয়ী। সেই বিবিলা হাঁটুর রোগ সারাতে পশ্চিম জার্মানী এসেছিলেন। এখানকার ডাক্তারদের রোগনির্ণয়ে ভুল হয়নি; হাঁটুর চাকতি ও পায়ের ডিম শক্ত হয়ে গেছল বিবিলার। হাসপাতালে দু'সপ্তাহ থেকে বিবিলা সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে গেছেন।

পাঁচ সন্তানের পিতা বিবিলা রোজ খালি পায়ে বিশ মাইল দৌড়ন আর তার ট্রেনারের সঙ্গে কিছুক্ষণ টেনিস খেলেন। বিবিলা ইথিওপীয়ার সম্রাটের একজন দেহরক্ষী।

এক রাজা

(উপন্যাস)

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

যাত্রী বলে, "না। বড় ষাঁড়ের জ্ঞাতি।"

মহারাজা জিজ্ঞেস করে, "অনেক দুধ দেয় ?" তারপর জিভ কাটে।

যাত্রী বল্‌ল, "আসলে ষাঁড় নয়। কিন্তু একেলা অনেক ষাঁড়ের কাজ সামলায়। ঝক্কি-ঝামেলা পোয়াতে হয় না। গাঁয়ে গরুরগাড়ী দেখেছেন। আর শহরে দেখেছেন ট্রাম, বাস, ট্রাক্। ট্রেন চেপে হু হু করে চলেছেন। গাড়ীতে শুয়ে শুয়ে গরু জুতে এমন জোরে চলা কি সম্ভব ?"

মহারাজ বলে, "মেপে দেখিনি।"

জানালা দিয়ে দেখা গেল গাঁয়ের পথ ধরে ক'টা গরুরগাড়ী একই দিকে চলেছে। যাত্রী বল্‌ল, "মেপে দেখুন।"

মহারাজা সত্যি মাপার জন্য জানালা দিয়ে হাত বাড়াল। আর ঠক্ করে জানালার পাট তার হাতে পড়ল। চোট পেয়ে মহারাজা মুখ বাঁকাল। "উহু" করে বল্‌ল, "মাপা গেল না।"

যাত্রী মুখ টিপে বল্‌ল, "হাত দিয়ে নয়, চোখ দিয়েই মেপে দেখুন। গরুরগাড়ী পেছনে ফেলে ট্রেন কোথায় এগিয়ে গেল। যন্ত্রের এমনি জোর! ট্রাকটারেরাও চাষের যন্ত্র। তা একা অল্প সময়ে অনেক যাড়, লাঙ্গল, কাস্তে, কোদালের কাজ মন্ত্রের মত করে। আর তাতে অনেক বেশী ফসল ফলান যায়।

তবু মহারাজা মানতে চায় না। বলে, "দূর, তা'হলে এদ্দিন সবাই চোখ বুজে ছিল?"

যাত্রী বলে, "কিন্তু চোখ মেলে ছিল না। লেখাপড়া না জানায় তারা চোখ মেলতে শেখেনি।"

মহারাজা হে হে করে হেসে বলে, "কি যে বলেন! আমিও তো লেখাপড়া করিনি। তাই বলে চোখ মেলতে শিখিনি? কোন্ প্রজার ঘরে কি আছে—সব দেখতে পাই। মাছের কাঁটা বেছে খাই। মহারাণীর মাথায় ক'টা চুল পাকল বলে দি—" তারপর জিভ কেটে বলে, "মহারাণীর নয়, আমার মাথায় ক'টা চুল পাকল তা গুণে দি।"

যাত্রী বলে, "বাইরের চোখ নয়, ভেতরের চোখের কথা বলছি।"

মহারাজা ঠাট্টা করে বলে, "কি যে বলেন! ভেতরে আবার চোখ থাকে নাকি? বাইরে দুটো চোখ থাকে।"

যাত্রী বলে, "বাইরের চোখ অন্ধ ছাড়া তো সবারই থাকে। কিন্তু সে চোখে কতদূর আর দেখা যায়? লেখাপড়া শিখে ভেতরের চোখ ফোটালে তবে তো দুনিয়ার অনেক কিছু দেখা যায়, জানা যায়। আমিও অশিক্ষিত গেঁয়ো চাষী প্রজার ছেলে। ছেলেবেলা মা বাপ মরে যেতে পরের বাড়ী মজুর হয়েছিলেম! গরু চরাতেম, আর লেখাপড়া না শিখে গরুই হচ্ছিলেম। দু'বেলা আধপেটা খেয়ে, বেগার খেটে বকুনী আর মার সত্ত্বেও ভাবতেম তবু তো আছি। বাইরের চোখে এর বেশী দেখতে পেতাম না। ছোট্ট মানুষ, কিন্তু মাঝে মাঝে তাগড়া গরুগুলোকে গাঙের জলে নাওয়াতে হ'ত। একদিন তাল সাম্লাতে না পেরে, জোয়ারের জলে ভেসে গেলাম। ডুবেই যেতাম, কিন্তু এক ভদ্রলোক নৌকো করে যাচ্ছিলেন, তিনি বাঁচালেন। আমার সব কথা শুনে তাঁর দয়া হ'ল। তিনি চাষ-বিভাগের বড় চাকুরে। নিজের ছেলেপিলে নেই, তাঁর আর তাঁর স্ত্রীর আমার উপর কেমন মায়া পড়ে গেল। আমাকে ছেলের মত পেলে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। তারপর স্কুল থেকে কলেজে। তারপর কৃষি কলেজে। সেই ভদ্রলোকের উপদেশ ও স্কুল-কলেজের পড়া আমার ভোঁতা মনে শান দিয়ে ধারাল করে তুলল।"

মহারাজা অবাক হয়ে বলল, "ভোঁতা দা, তলোয়ার শান পেয়ে ধারাল হয়। মানুষ হয় নাকি?" সত্যি সে তার গায়ে হাত ঘষে বলল, "কৈ, কাটল না তো!

তার হাঁদামীকে ঠাট্টা ভেবে যাত্রী বলল, "ধারাল হওয়া মানে ভেতরের চক্ষু খুলে যাওয়া। ভাল শিক্ষা ও উপদেশে ভেতরের চোখ খোলার নাম হচ্ছে জ্ঞানলাভ। এই জ্ঞানলাভ করেই মানুষ জ্ঞানী, গুণী, বিজ্ঞানী হয়। চাষবাসও মস্ত বড় বিজ্ঞান।"

মহারাজা বড়াই করে বলে, "এসব তো আমার প্রজারা হামেশা করে। তার জন্য আবার কষ্ট করে ইস্কুলে পড়তে হয়?"

যাত্রী বল্‌ল, "খানিক আগে গরুরগাড়ী আর রেলগাড়ীর তফাত হাতে ঠেকে, ফের এ-কথা বলছেন।"

হাতের ব্যথা তখনো যায়নি। মহারাজা মাথা চুলকায়।

যাত্রী বলে, "তিনি আমাকে চাকরী ধরিয়ে দেন। বলেন, কিছুদিন চাকরী করে টাকা জমিয়ে নিজে চাষবাস কর। নিজের মা'টিকে ছেলেবেলা হারিয়েছ। কিন্তু আর এক মা আছেন, তার নাম মাটি। মায়ের মত তারও মায়া, মমতা, দরদ। কচি ছেলে ক্ষুধায় কাঁদলে মা এসে দুধ দেয়, তেমন চাষ-আবাদ করলে মাটি দেয় সোনার ফসল। তা সবার সঙ্গে ভাগ করে খেতে হয়। তা করে তোমার যাত্রীচরণ নাম সার্থক কর। পৃথিবী পুণ্যস্থান, তীর্থ। আর মানুষ হ'ল তীর্থযাত্রী। দিনরাত্রি যাত্রাগানের সঙ না সেজে তীর্থ-পথিকদের চলার সাহায্য কর।"

রাজা হা করে শুনছিল। বল্‌ল, "বাস্ রে, যাত্রীদের কাঁধে বয়ে?"

যাত্রী হেসে বলে, "কাঁধে বয়ে নয়, ফসল দিয়ে বাঁচিয়ে। চলার জন্য মোটর, বাস্, ট্রেন, ট্রাম, জাহাজ তৈরীর মগজ গড়ে। লেখাপড়া করে তবে তা সম্ভব হয়। আরও শেখার জন্য তিনি আমাকে বিলেত যাবার ব্যবস্থাও করে দেন। কিন্তু সেখান থেকে যখন ফিরে আসি, তখন তিনি বেঁচে নেই।" যাত্রী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

তারপর খানিক চুপ করে থেকে বলে, "তাঁর উপদেশ আমার মনে জেগেছিল। চাকরী শেষ হতে যন্ত্রপাতি নিয়ে চাষবাস শুরু করি। ফসল ফলিয়ে তার কতক যেখানে অভাব সেখানে পাঠাই।"

শুনে মহারাজা অবাক হয়। প্রজার মত সাধারণ লোকটা বিলাত-ফেরত কেউকেটা! কোনও ঠাট নেই, থাট (থার্ড) ক্লাস গাড়ীতে চলেছে।

যাত্রী বলে, "চাষীর ছেলে বলে কি হয়? যখন মাঠ-ভরা ফসল হয়, তখন ভাবি, তা আমার প্রজা, আর তারা হাওয়ায় নুয়ে আমাকে প্রণাম জানাচ্ছে! সে ফসল নানাদেশের মানুষ বাঁচিয়ে তাদের মন জয় করে, তাই হ'ল দিগ্বিজয়। বন্দুক সামনে দিয়ে মানুষ মেরে রাজ্যজয়ের চেয়ে তা কত মহান্।"

তবু মহারাজা ঠোঁট উল্টে বলে, "প্রজারা করবে দিগ্বিজয়! পুরো ফসলই ফলাতে পারে না। খাজনা দেবার বেলা হেরে যায়।"

যাত্রী বলে, "হারা-জেতার কথা নয়। অনেক চেষ্টা করেও নানা কারণে ফসল কম হয়, দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, ওরা নিজেরা ভাত পায় না।"

রাজা গালে হাত দিয়ে বলে, "এমা কি বোকা ! ভাত না পায়, লুচি খেতে পারে না ?"

মহারাজা সায় দেয়।

বুরবক রাজ্যের রাজা, মহারাজার এমনি প্রশ্নের কি বা জবাব আছে ? যাত্রী ঠাট্টা করে বলে, 'হয়ত ওদের পেটে সয় না। না খেয়ে খেয়ে পেট মরে গেছে কিনা। তাই তাদের মধ্যে যারা লেখাপড়া শিখেছে তারা বলছে 'কুড়ে রাজা খাবে, আর প্রজা খেটেখুটে উপোস দেবে, তা চলবে না। রাজপাট তুলে দিয়ে, রাজা প্রজা এক করে দাও। সবাই খেটে খাবে।"

মহারাজা মুখ কালো করে বলে, "কিন্তু এতকালের বুরবক রাজ্য ভেঙ্গে দেওয়া ধর্মে সইবে না।

যাত্রী বলে, "তারা নতুন করে গড়বে। 'বুর্' শব্দ বাদ দিয়ে বানাবে সাদা ধবধবে এক রাজ্য। 'বক'কে জানেন তো ? বকের চেহারা ধরে স্বয়ং ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়েছিলেন।"

রাজা হঠাৎ বল্‌ল, "বক আমি জানি। বক দেখাতে পারি।" তারপর বাঁ হাতের চেটোয় ডানহাতের কনুই রেখে, বাপের মুখের সামনে আঙুল নাচিয়ে দেখাল। দেখে যাত্রী অবাক। ছেলে একগাড়ী লোকের সামনে বাপকে বক দেখায়, আর বাপ তা অনায়াসে চেয়ে দেখে !…

তখন যাত্রী রাজাকে বলে, "রাজা, বাবাকে বক দেখাতে নেই।"

রাজা বলে, "দেখালে কি হয় ?"

যাত্রী বলে, "লোকে নিন্দা করে।"

রাজা বলে, "বাঃ রে ওরাও তো বক্‌বক করেই কথা বলে।"

যাত্রী বলে, "বাপ হ'ল গিয়ে গুরুজন। তাকে বক দেখালে পাপ হয়।"

রাজা বলে, "বাবা বুরবক রাজ্যের মহারাজা। বুর হ'ল বুড়ো। বাবার বকরাজ্য নিয়ে কারবার। হরদম বক দেখবে।"

যাত্রী বোঝে শিক্ষা না পেয়ে রাজা বেকুব হয়ে আছে। যেমন মহারাজা তেমন রাজা,—যেমন বাপ, তেমন বেটা !

তখন যাত্রী আবার রাজাকে মিষ্টি করে উপদেশ দেয়।

বলে, "রাজা, তুমি তো খুব ভাল ছেলে। তোমার অনেক বুদ্ধি।"

প্রশংসায় রাজা খুশী হয়। একগাল হেসে বলে, "হা আমার অনেক বুদ্ধি। তারপর তার বুদ্ধির কথা জানাতে সমস্ত বেকুবীর বিষয় বলে।

যাত্রী তাকে আর মহারাজাকে আগে যে সব কথা বলেছে, তা আবার নতুন করে, আরও মিষ্টি ভাবে বলে। আবার তার হাতে মিষ্টি খাবার দেয়। রাজা আরও খুশী হয়।

যাত্রী রাজার সঙ্গে তাল দিয়ে বলে, "রাজা প্রজা যখন উঠে যাচ্ছে, রাজার আর প্রজার সঙ্গে এক স্কুলে পড়তে বাধা নেই। কেমন ?"

রাজা থুং থুং করে বলে, "কিন্তু এক বেঞ্চিতে বসে নয়। ওদের গায়ে গন্ধ। থুঃ—"

যাত্রী বলে, "কিসের গন্ধ ?"

রাজা বলে, "প্রজার গন্ধ—"

যাত্রী বলে, "তা'হলে শহরে কি দেখে এলে ? দোকান ভরা এসেন্স, আতর, চন্দন সব তো প্রজার তৈরী। তাদের হাতের রান্না খাও, তাদের পাতা বিছানায় শোও, তাদের কাঁধে চড়ে বেড়াও,—তখন তো কৈ গন্ধ লাগে না। লাগে খালি স্কুলে পড়ার বেলা ? এই যে ট্রেনে প্রজার গা ঘেঁষে বসে চলেছ !"

রাজা উত্তর খুঁজে পায় না। মুখ বুজে মাথা চুলকায়।

যাত্রী বলে, "আসলে কুড়েমী। কিন্তু তাতে কি চলে ? ভগবান হাত পা দিয়েছেন পরিশ্রম করার জন্য। নৈলে—"

রাজা বলে, "নৈলে দিতেন না ?" তা'হলে কি হ'ত, কি করে খেত আর খেলা করত— সে কথা মনে উঁকি দেয়।

যাত্রী বল্‌ল, "হাত পা দিতেন না। মাথা আর পেট নিয়ে ঠুঁটো রাজা হয়ে থাক্‌তে। ঠোঁট বাঁকিয়ে খাবারের জন্য চেঁচাতে !"

পেটুক রাজা ভয় পায়। যাত্রী বলে, "কেউ দয়া করে কিছু মুখে দিলে খেতে, নয় তো উপোস।" যাত্রী আরও ভয়ের কথা বলে, "ভগবান দেন, আবার ইচ্ছা হলে নিয়ে যান। হাত পা দিয়েছেন কাজ করার জন্য, মাথা দিয়েছেন বিদ্যাবুদ্ধি শিখে সবার উপকার জন্য। তা না করলে কেড়ে নিতে কতক্ষণ ?"

রাজা ভড়্‌কে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, "কিসে তিনি খুশী হন ?"

যাত্রী বলে, "ভাল কাজে। ভাল কাজ কি তা জানতে হলে লেখাপড়া শিখতে হয়। তাতে বুদ্ধি হয়, জ্ঞান হয়। নৈলে মাথা ভূতের বোঝার মত মিছেই কাঁধের ওপর থাকে !"

যাত্রীর মুখে একটার পর একটা ভয় দেখান কথা! রাজা ঢোকগিলে শুক্‌নো গলায় বলে, "তা'হলে আমি লেখাপড়া করব। কিন্তু—"

যাত্রী বলে, "আবার কিন্তু কিসের ?"

রাজা বলে, "মাষ্টারের নাকি বেত আছে ?"

যাত্রী ভরসা দিয়ে বলে, "তাতে ভাল ছেলের ভয় নেই। ভাল ছেলেকে মাষ্টার আদর করে পড়ান, সুন্দর গল্প শোনান, ছবি দেখান।

আমিও তো স্কুলের মাষ্টার! আমার বেত নেই।"

যাত্রীর মিষ্টি কথা শুনে, খাবার খেয়ে রাজা ন্যাওটা হয়েছিল। সে মাষ্টার, অথচ তার হাতে বেত নেই! কি জানি ভুরাই কম্বল গায়ে বাঘের মত ছদ্মবেশী কিনা! রাজা ভয়ে ভয়ে তার দিকে তাকায়। যাত্রী তার পিঠে হাত দিয়ে বলে, "কোনও ভয় নেই রাজা। স্কুলে খেলাধুলো। যাতে গাঁয়ের ছেলেরা বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে চাষবাস শেখে আমি সে রকম স্কুল খুলেছি। এখানে মনের রাজা আর দিগ্বিজয়ী হওয়া শেখান হয়।"

রাজা জিজ্ঞেস করে, "ইস্কুলে ক্ষেত, লাঙ্গল আর ষাঁড় আছে? তীর-ধনুক আর লাল নিশান? কিন্তু লাল নিশান দেখে ষাঁড় ক্ষেপে যায়।"

যাত্রী বলে, "ষাঁড় দিয়ে নয়, আমি যন্ত্র দিয়ে চাষ শেখাই। তার নাম হ'ল ট্রাক্টার। সব স্কুলে এমন শিক্ষা চালু করার চেষ্টা করব। যেন পাশ করা ছাত্র চাষীর দল অনেক ফসল ফলায়। এভাবে দেশ স্বচ্ছল হলে সবার মন আনন্দে টলমল করবে।"

কিন্তু স্কুল তিন মাইল দূরে শুনে রাজা মাথা চুলকায়।

যাত্রী বলে, "আমি বুড়োমানুষ হেঁটে যাতায়াত করি, আর তুমি পারবে না? তুমি তো ধীর হতে চাও, দিগ্বিজয়ী হতে চাও।"

রাজার দিগ্বিজয় যাত্রার কথা মনে পড়ে যায়। সে বলে, "তা চাই-ই তো! তবে এখনও তো হাতি-ঘোড়া নেই। তার জায়গায় আছে একটা ষাঁড়! কিন্তু ওটার হাড়গোড় কোমরে লাগে। মোটাসোটা গাধাও আছে। তার পিঠে চড়ে স্কুলে যাব?"

যাত্রী বলে, "অমন কম্ম করো না রাজা। স্কুলের ছেলেরা ক্ষেপাবে। বরং হেঁটে যেও। দু'চার দিন একটু কষ্ট হবে। তারপর সয়ে যাবে।"

রাজা হঠাৎ খল্‌খল্‌ করে হেসে ওঠে। তারপর হাততালি দিয়ে বলে আমি কল বানাব। যেতে কষ্ট হবে না। হাজার জানি তো। কি কল, যাত্রী জানতে চায়।

এখন রাজা বলে, "দিগ্বিজয়ে বাহনগুলো যেতে চায়নি তো! তারপর মাথা খাটিয়ে একজনকে ঘাসপাতা নিয়ে আনে কি। সে খাবার দেখিয়ে পিছোয়, আর বাহনগুলো এগোয়, তারপর কি হয়েছিল জানেন?"—রাজা খিল্‌খিল্‌ করে হাসে।

যাত্রী জিজ্ঞেস করে, "কি হয়েছিল?"

রাজা বলে, "সে পেছনে মুখ করে সম্মুখে এগোচ্ছিল। এখন চোখ তো মুখের দিকে। সে হোঁচট খেয়ে উল্টে পড়ল। আর যেই পড়া—খাবার নিয়ে বাহনগুলোর কাড়াকাড়ি!"

যাত্রী বলে, "তা তো দিগ্বিজয়ের কথা। স্কুলে সুবিধের কথা বল।"

রাজা বলে, "অনেক সুবিধে বার করেছি। এ সব হ'ল মগজের খেল্‌।

আপনি লোহার ডাণ্ডাকে বন্দুক বানালেন। আমি বানাব পা'কে ঘোড়া। এট্টু কষ্ট হবে না।" তারপর সে মুখ-হাত নেড়ে বলে, "ঘাস পাতা চোখে দেখে জানোয়ার ছোটে তো! মেঠাই মোণ্ডা দেখে মানুষ কেন ছুটবে না? খাবার লোভ তো সবারই আছে। কি বলেন?"

যাত্রী বলে, "এর আর বলাবলির কি আছে?"

রাজা বলে, "তা নেই। তবু খুলে বলি। যেন কোনও গোল না থাকে। আচ্ছা কোন খাবার দেখে মুখে নোলা বেরোয় বলুন তো?"

যাত্রী বলে, "কারু মিষ্টি, কারু নোন্‌তা, কারু টক।"—

রাজা বলে, "আমরটা বলুন।"

যাত্রী বলে, "মিষ্টি।"

(ক্রমশঃ)

তিন চড়ুই-এর ছড়া

আবদুল মজিদ

তিনটে চড়ুই যুক্তি করে
তিনতলাটার ছাদে,
চড়ুইভাতি করতে যাবে
মঙ্গলে না চাঁদে?
কিল্‌বিল্‌ বিল্‌ পোকার মত
মানুষ চারিদিক,
ছোট্ট চড়ুই আমরা করি
কোন্‌খানে পিক্‌নিক্‌?

চাল ও আগুন, ডাল ও আগুন
মিল্‌ছে শুধু হিং;
কালোবাজার করছে তাড়া
উঁচিয়ে জোড়া শিং।
হবু রাজার মন্ত্রী গবু
নিত্য নতুন আইন,
ক্ষিদে পেলেই পুলিশ ছোটে
চোদ্দ টাকা ফাইন।

গোঁফ জোড়াটি বাগিয়ে হঠাৎ
হাজির হলো হুলো,
ফুড়ুং ফুড়ুং পালিয়ে গেল
ছোট্ট চড়ুইগুলো

ক্রেস্‌কোগ্রাফ আবিষ্কারের কথা

শ্রীসুনীলকুমার সরকার

বিংশ শতাব্দীতে অনেক যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে এবং অনেক যন্ত্রেরই নাম হয়তো তোমরা শুনেছো। কিন্তু ক্রেস্‌কোগ্রাফ নামক একটি যন্ত্রের নাম কি তোমরা শুনেছো?—শোননি। অথচ শুনলে তোমরা আশ্চর্য হবে যে—এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছেন আমাদের দেশেরই একজন বিজ্ঞানী, নাম তাঁর–আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। শুধু তাই নয়—এই যন্ত্রের মাধ্যমেই তিনি প্রমাণ করেছিলেন, মানুষের মত গাছেরাও প্রাণবন্ত—সুখে-দুঃখে অনুভূতিশীল। সে এক ইতিহাস।

প্রাচীনকালে আমাদের দেশের মুনি-ঋষিরা বলতেন, গাছপালারও প্রাণ আছে—ওরাও সুখে-দুঃখে অনুভূতিশীল। জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধি সবই তাদের আছে। কিন্তু পরবর্তীকালের লোকেরা একথা বিশ্বাস করলেন না। বললেন, মিথ্যা কথা—তা হতেই পাবে না।

কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদের কথা এবং মুনি-ঋষিদের কথা যিনি বিশ্বাস করতেন, সেই বরেণ্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় কিন্তু এর সত্যতা প্রমাণ ক'রে গিয়েছেন। বিশ্ববৈজ্ঞানিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম এই বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন জগদীশচন্দ্র। তিনি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, গাছপালা নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বললেনঃ সত্যি-সত্যিই গাছের প্রাণ আছে—এরাও মানুষের মত উত্তেজনায় সাড়া দেয়। আর এই সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে তিনি আবিষ্কার করলেন—ক্রেস্‌কোগ্রাফ নামক একটি যন্ত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তখন জগদীশচন্দ্রের কথা কেউ বিশ্বাস করতে চাইলেন না। বললেন, আজগুবী সব মিথ্যা কথা—এমন কি, দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিকরা পর্যন্তও বিশ্বাস করলেন না। অতঃপর জগদীশচন্দ্র আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাছে এক আবেদন জানিয়ে বললেনঃ 'আমার এই আবিষ্কারের সত্যতা আপনাদের সামনে আমি প্রমাণ করে দিতে পারি। অবশ্য যদি আপনাদের অনুমতি পাই।' এরপরই আমেরিকার বিজ্ঞানীরা তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে বললেন, বেশ আপনি আসুন, এসে আমাদের সামনে পরীক্ষা করে দেখিয়ে দিন।

বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কারের পরেও এমনি একটি দিনের প্রতীক্ষায় থাকেন। কেন না এই দিনটিই বৈজ্ঞানিকদের কৃতিত্ব জাহির করে স্বীকৃতি আদায়ের দিন—কাজেই জগদীশচন্দ্র এ সুযোগ হাতছাড়া করলেন না। তিনি তাঁর ক্রেস্‌কোগ্রাফ যন্ত্রটি নিয়ে আমেরিকা গিয়ে পৌছলেন। তারপর নির্দিষ্ট দিনে বিশ্বের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকদের এক বিরাট সমাবেশে ভারতের বিজ্ঞান-সাধক জগদীশচন্দ্র তাঁর ক্রেস্‌কোগ্রাফ যন্ত্রটি নিয়ে যখন সুসজ্জিত এক হলঘরে প্রবেশ করলেন—তখন সমবেত বৈজ্ঞানিকরা তাঁকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানালেন। তার উত্তরে

জগদীশচন্দ্র শান্ত অথচ গম্ভীর স্বরে বলেছিলেন: 'আজ আমি যে সত্যতা আপনাদের কাছে প্রমাণ করতে এসেছি, তা আমার একার কথা নয়—ভারতের পূর্বপুরুষ ও মুনি-ঋষিরা বহু যুগ আগেই একথা বলে গিয়েছেন। আমি শুধু তাঁদেরই কথা আপনাদের সামনে বাস্তবে প্রমাণিত করতে চাই। এই বলে জগদীশচন্দ্র সমবেত বিজ্ঞানীদের সামনে তাঁরই আবিষ্কৃত 'ক্রেস্‌কোগ্রাফ' যন্ত্রটির সাহায্যে প্রমাণ করে দিলেন, গাছপালাও প্রাণবন্ত—তাঁরাও প্রাণীদের মত উত্তেজনায় সাড়া দেয়।

সমবেত খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকরা স্বচক্ষে এসব দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। শুধু তাই নয়—তাঁর এই দেশপ্রীতি ও নতুন আবিষ্কারেব জন্যে বিশ্ববাসী তাঁকে অভিনন্দন জানালেন।

জগদীশচন্দ্রই প্রথম বলেছিলেন, বিনা তারেও সংবাদ প্রেরণ করা যায়।

ফসল রোয়ার দিন

শেষ উপদেশ

শ্রীচন্দ্রকুমার মেহরা

বহুকাল আগে চীন দেশে কনফুসিয়াস নামে একজন বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন। তাঁর মতো পণ্ডিত আর ধ্যানী পুরুষ সেকালে আর কেউ ছিল না। তিনি ধর্মের কথা এমন সহজভাবে বুঝিয়ে দিতেন যে, কারো মনে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতো না। যখন তিনি অন্তিমশয্যায় মৃত্যুর অপেক্ষা করছিলেন, তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের শেষ উপদেশ দেবার জন্যে ডেকে বললেন, "প্রিয় শিষ্যগণ, আমার মুখের ভিতরটা একবার দেখো তো; আমার জিভটা আছে কিনা ?"

একটি শিষ্য দেখে বললো, "জিভ তো ঠিকই আছে গুরুদেব।"

এরপর তিনি এক শিষ্যকে ডেকে বললেন, "তুমি বলো আমার দাঁত আছে কিনা !"

—"না গুরুদেব, আপনার মুখে একটিও দাঁত নেই।" সেই শিষ্য উত্তর দিল।

তখন মহাত্মা কনফুসিয়াস জিজ্ঞাসা করলেন, "বলো তো আগে জিভের জন্ম হয়েছে, না দাঁতের ?

শিষ্যেরা সমস্বরে উত্তর দিলো, "জিভের গুরুদেব।"

"—ঠিক।" ব'লে তিনি শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, "বৎসগণ, জিভটা দাঁতের চেয়ে বয়েসে বড়ো, কিন্তু সেটা এখনও ঠিক আছে, আর দাঁত তো জিভের চেয়ে বয়সে ছোটো, তাহলে সেগুলো আগে নষ্ট হয়ে গেলো কেন ?"

এই প্রশ্নটি শুনে শিষ্যেরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো, কেউই সে-কথার উত্তর দিতে পারলো না। তখন গুরুদেব তাদের নিজেই বুঝিয়ে বললেন, "শোনো, জিভটা সরস আর কোমল, এই জন্যে সে এখনও টিকে আছে, কিন্তু দাঁত হিংস্র আর কঠোর, সেইজন্যে সেটা তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে।"

এই বলে কনফুসিয়াস তাঁর চোখ বুজলেন।*

---

* ধর্মাত্মা ও চীন রাজনীতিবিদ কনফুসিয়াস ৫৫১ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সু-লিয়েঙ্গ হেই চীনের অন্তর্গত লু প্রদেশের একজন বিখ্যাত যোদ্ধা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। কিংবদন্তী আছে যে, মাত্র ১৫ বছর বয়সে কনফুসিয়াস চীনা ভাষায় লিখিত পাঁচখানি বিখ্যাত ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে ধর্মশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি দেশের নানা জায়গায় রাজকার্যে নিযুক্ত থেকে কতকগুলি সমাজ-সংস্কার বিধান করেন এবং চাটুং নগরের শাসকের পদে নিযুক্ত হন। তাঁর শাসনকালে দেশ থেকে অন্যায় অপরাধ নাকি একেবারে দূর হয়ে গিয়েছিল।

জাতীয় উন্নতির জন্য রাজকার্য পরিত্যাগ করে তিনি ১৩ বছর রাজ্যের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করে মানুষের মধ্যে সৎকথা ও সদুপদেশ প্রচার করেছিলেন। এই সময় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু ব্যক্তি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর ধর্মকথায় লোকে অভিভূত হ'ত এবং এ ব্যাপারে মানুষের উপর তাঁর প্রভাব ছিল অনন্যসাধারণ। কথিত আছে মৃত্যুকালে তিনি তিন হাজার শিষ্য রেখে গিয়েছিলেন। ৪৪০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে এই মহাপুরুষ পরলোক গমন করেন।

তাঁর মৃত্যুকালের 'শেষ উপদেশ' নামক এই লেখাটি থেকেই তোমরা বুঝতে পারবে তিনি কতবড় জ্ঞানী ছিলেন। এই লেখাটির লেখক চন্দ্রকুমারের বয়স অল্প এবং তার মাতৃভাষা বাঙলা নয়। কিন্তু নিজের চেষ্টায় সে বাঙলা শিখে, হিন্দী থেকে এই লেখাটি তর্জমা করে তোমাদের উপহার দিয়েছে।—মৌঃ সঃ

নতুন কাচ

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

কাচের জিনিস বলতে এমন একটা জিনিস বোঝায়, যে জিনিসটা দেখতে হয় সুন্দর আর আর অন্য জিনিসের তুলনায় এর বড় গুণ, কাচ হয় স্বচ্ছ। যতই সময় বয়ে যাক, যত্ন নিলে কাচ থাকে নিত্য নতুন। কিন্তু একটা আপসোস কাচ জিনিসটা খনভঙ্গুর। একটু অসাবধানতায় যে জিনিসটা আমার পছন্দসই, তাই হাত থেকে পড়ে টুকরো-টুকরো হয়ে যায়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা কাচের এই খনভঙ্গুরতা দূর করে নতুন এক ধরণের জিনিস তৈরী করছেন, যাকে আধুনিক বিজ্ঞানে 'ফাইবার গ্লাস' বলে ডাকা হচ্ছে। বড় বড় গ্লাস কোম্পানীতে এই নতুন ধরণের কাচ তৈরী হয়ে কাচ-শিল্পে এক নতুন সম্ভাবনা খুলে দিয়েছে।

প্রধান উপকরণ রেসিন (রজন বলে বাংলায়) দিয়ে তৈরী এই গ্লাস করাত দিয়ে কাটা যায়, কাঠের মত এই কাচে পেরেক পোতা যায়। শুধু কি তাই? এই কাচ জলে ভাসে, রবারের মত এই কাচ বেঁকানো যায়। এই কাচ থেকে বোনা সুতোয় সিল্কের মত কাপড় তৈরী করা যায়।

প্লাষ্টিক দিয়ে মেশানো এই কাচের সুতোর সাহায্যে এমন আবরণ তৈরী করা যায়, যা কোন শক্তিশালী রিভলবারের বুলেটও ভেদ করে যেতে পারবে না। এমন দিন আসতে বেশী দেরি নেই, যেদিন এই ধরণের কাচ দিয়ে মোটরগাড়ীর ব্যাম্পার থেকে, বাস বা রেলগাড়ীর বডি, আসবাবপত্র, এমন কি রোজকারের ব্যবহারের জুতো পর্যন্ত তৈরী হবে।

ক্ষতস্থান সেলাই করার জন্য বা সবচেয়ে নরম স্পঞ্জের জন্য সার্জনরা গ্লাস ফাইবারের সুতো বেশী পছন্দ করবেন। এ ছাড়া চেয়ারের কুশন প্যাড ইত্যাদি যে-কোন নরম জিনিস তৈরীর ব্যাপারে ফাইবার গ্লাসের জুড়ি নেই। কারণ ফাইবার গ্লাস যেমন শক্ত করে তৈরী করা যায়, তেমনি তৈরী করা যায় নরম করে। এই ধরণের কাচের স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity) খুব বেশী। এক টুকরো গ্লাস-উল নিয়ে হাতের মুঠোয় চেপে ধরে হাতের মুঠো খুললে দেখবে, আবার যে-কে সেই। রবারের সঙ্গে এই কাচের তফাত, রবার একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্তই চাপ দিয়ে ছোট করা যায়।

এই নতুন ধরণের কাচ আর ভঙ্গুর নয়। তাপ ও শৈত্য দুটোই এ কাচ অনায়াসে সহ্য করিতে পারে। তাই বহু কারখানায় এই নতুন ধরণের কাচ যন্ত্রপাতি সংরক্ষণে বা তাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার হচ্ছে। ভারতবর্ষেও এই নতুন ধরণের কাচ প্রস্তুত হচ্ছে ইদানীং।

কাচে হাত-পা কাটেনি এমন ঘটনা তোমার-আমার কারোর ঘটেনি, কিন্তু এ কাচে কিছুতেই হাত কাটবে না।

নতুন এই কাচের এত বেশী গুণ যে, এমন দিন ভবিষ্যতে হয়ত আসবে, যেদিন ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদিকে এই কাচ বাতিল করে দেবে।

অঙ্কের কারসাজি

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ দাস

এখানে একটি অদ্ভুত, সুন্দর অতি সরল অঙ্কের খেলার উল্লেখ করছি। বন্ধু-বান্ধবদের দেখিয়ে বেশ মজা পেতে পারবে।

প্রথমে যে কোন ৩টি সংখ্যা (Digit) বেছে নাও। তিনটি অঙ্ককে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখলে মোট ছ'বার বিভিন্ন রাশি লেখা যায়। এবার ঐ সমস্তগুলি যোগ কর। পুনরায় যে কোন তিনটি সংখ্যাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে লিখে সমস্তগুলি যোগ কর। এইভাবে তোমার খুশি মত যতগুলি ইচ্ছা ঐরূপ সেট (Set) তৈরী কর। এবার সমস্ত যোগফলগুলি একত্রে যোগ কর। এদিকে প্রতি সেটে তিনটি করে অঙ্ক আছে, সেগুলি সব একসঙ্গে যোগ কর। এবার পূর্বের যোগ-ফলটিতে শেষের যোগফল দ্বারা ভাগ কর এবং বলো ভাগফলটি কত হবে ?

ওটা বলা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়—স্রেপ্ ২২২। তিন সংখ্যা নিয়ে খেলাতে উত্তরটি সর্বদাই এক (Equal) হবে।

একটা উদাহরণ দিচ্ছে তাহলেই ব্যাপারটা সম্যক উপলব্ধি করতে পারবে।

মনে কর একটি সেটের সংখ্যাটি হচ্ছে ২৪৬ (মানে তিনটি অঙ্ক) এটিকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বিভিন্ন রকমে ছ'বার লিখলে সংখ্যাগুলির যোগ ফল দাঁড়ায়ঃ

২৪৬ + ২৬৪ + ৪২৬ + ৪৬২ + ৬২৪ + ৬৪২ = ২৬৬৪

ধর আরও দু'টি সেট যথাক্রমেঃ ১৯৮ এবং ৭৯৮ (তিন সংখ্যার দ্বারা গঠিত)। ১৯৮ এবং ৭৯৮ এই সংখ্যাগুলি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ছ'বার লিখে যোগ করিলে, যোগফল যথাক্রমে দাঁড়ায়ঃ ৩৯৯৬ এবং ৫৩২৮। এবার তিনটি যোগফল একত্রে যোগ করিলে হয়ঃ ২৬৬৪ + ৩৯৯৬ + ৫৩২৮ = ১১,৯৮৮।

পুনরায় প্রতি সেটের অঙ্কগুলি যোগ করিলে দাঁড়ায়ঃ (২ + ৪ + ৬ + ১ + ৯ + ৮ + ৭ + ৯ + ৮) = ৫৪

এবার ভাগ করলে অঙ্কটি দাঁড়ায় ৫৪) ১১৯৮৮ (২২২
১০৮
১১৮
১০৮
১০৮
১০৮

এভাবে তিন অঙ্কের যতগুলি ইচ্ছা অঙ্কের সেট করে কষলে উত্তর দাঁড়াবে ২২২। খুব মজার—তাই না ?

মেঠুড়ে

টেনিস ঃ ডেভিস কাপ

ডেভিস কাপের আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইন্যালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ৪-১ খেলায় ভারতকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলার অধিকার অর্জন করেছে। এডিলেডে যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া শেষ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে ২৬-২৮ ডিসেম্বর, ১৯৬৮।

ভারত ও আমেরিকার আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইন্যাল খেলার ফলাফলের পার্থক্যটা বেশ বড় রকম একথা সকলেরই জানা আছে, তবে ভারতের পরাজয়কে ছোট নজরে দেখার যুক্তিটা গ্রহণীয় নয়। কারণ এই খেলার একক প্রতিযোগিতায় কোনো কোনো সময় ভারতের কৃষ্ণন ও প্রেমজিত যুক্তরাষ্ট্রের আর্থার অ্যাশ, ক্লার্ক গ্রেবনার প্রমুখ যশস্বী খেলোয়াড়দের প্রতিষ্ঠার কাছেই চলে গিয়েছিলেন। শুধু ডাবলসে ভারত জুটি সুবিধে করতে পারেন নি। তবু তাকে আমরা পুরোপুরি দ্বৈত ব্যর্থতা বলতে পারি না, কারণ জয়দীপ সুনামের সঙ্গে খেলতে না পারলেও কৃষ্ণনের চেষ্টায় ভাটা পড়েনি। ওঁরা যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ডাবলস জুটির মোকাবিলা করতে নেমেছিলেন, তাঁরা দু'জন ছিলেন সম্পূর্ণ পোক্ত টেনিসের জুটি।

হাজারো দর্শক-ভরা মাঠে দু'দেশের প্রথম সিঙ্গলস খেলা আরম্ভ হয়। আর্থার অ্যাশ প্রেমজিতকে ৬-২, ৫-৭, ৬-২, ৬-৪ সেটে হারিয়ে দেন। আমেরিকা ১-০ ম্যাচে এগিয়ে থাকলেও বর্ষীয়ান কৃষ্ণন কোর্টে নামার আগে বুঝেছিলেন, প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রেবনারের গোলা-সার্ভিস যদি অনায়াসে ফেরত পাঠাতে পারি তবেই জয় নিশ্চিত। তাই হ'ল। শেষ পর্যন্ত গ্রেবনার কৃষ্ণনের কাছে হার স্বীকার করলেন ৭-৫, ৪-৬, ৬-২, ৬-২ সেটে।

কিন্তু পরের দিন ডাবলসের খেলায় বয়েসের ব্যবধানটাই তরুণ বব লাজ ও স্ট্যান স্মিথের বিরুদ্ধে কৃষ্ণন-জয়দীপের জয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। জয়দীপের দুর্বল সার্ভিসই পরাজয়ের অন্যতম কারণ। কৃষ্ণনের কৃতিত্ব সত্ত্বেও ভারতীয় জুটির স্ট্রেট সেটে আমেরিকার কাছে পরাজয় ঘটে ২-১ খেলায়। শেষ দিন গ্রেবনারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রেমজিত চার সেট পর্যন্ত খেলাটাকে টেনে নিয়ে যান। ১১-৯ গেমে প্রেমজিত প্রথম সেট বিজয়ী হবার পর গ্রেবনার পর পর তিনটে সেট পান ৯-৭, ৭-৫ ও ৬-৪ গেমে। তাই শক্তিশালী আমেরিকার কাছে পরাজিত হলেও ভারত পর্যুদস্ত হয়নি একথা বলা চলে।

জিমন্যাস্টিকস

সত্যি ময়দানের ভলিবল ফেডারেশনের মাঠে কাজাকিস্তানের জিমন্যাস্টরা তাঁদের উন্নত কলা-কৌশল ও দেহ-ভঙ্গীর সুন্দর ছবি ফুটিয়ে তুলে দর্শকদের সাধুবাদ পেয়েছেন।

জিমন্যাস্টিকসে রাশিয়া বিশ্বের অগ্রগণ্য দেশ। ওদেশের স্ত্রী-পুরুষ সব বিষয়েই প্রায় সমান দক্ষ। প্যারালাল বার, হোরাইজণ্টাল বার, পোমেণ্ড হর্স, হর্স ভল্টিং, রিং, ফ্লোর একসারসাইজ সব কিছুতেই ওদের নতুন নতুন ফিগার এবং কষ্টসাধ্য দেহ-ভঙ্গী বিকাশের প্রচেষ্টা। কাজাকিস্তানের এই দলে রাশিয়ার প্রথম সারির জিমন্যাস্ট অর্থাৎ অলিম্পিকে স্বর্ণ ও রৌপ্য পদকের অধিকারী কেউ আসেন নি।

রাশিয়ান জিমন্যাস্ট দলের উরি শেরভ (অধিনায়ক), ভ্লাডিমির টিটভ, ওবস টেন, ভ্লাডিসভ আসিটস্কি, আদমেৎজান জাকুপো, ভ্লাডিমির কোজোনকভ, নীল চুকায়েভ, র‍্যামাসন আলকিমভায়েভ —সবাই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং বয়েসে প্রবীণ। শুধু স্বাস্থ্যের অধিকারী বললে তাঁদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। তাঁদের দেখে মনে হয়েছে সুগঠিত দেহের মাংসপেশী থেকে যেন তেজ ও দীপ্তি ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। এই মাস্‌ল বা মাংসপেশীর প্রাচুর্য নাকি দৈহিক পেলবতার অন্তরায়। কিন্তু দেখলে আশ্চর্য লাগে সমস্ত দেহের কঠিন মাংসপিণ্ডের মধ্যে এঁরা এমন পেলবতা আনেন কী ভাবে? ওঁদের ফ্লোর একসারসাইজে দেহের ভল্টিং দেখে অনেক সময়েই মনে হয়েছে দেহে বুঝি হাড়গোড় নেই। অবশ্য আমাদের দেশের কয়েকজন জিমন্যাস্ট, যেমন দিলীপ ওঝা, যশোবন্ত মোর, পতঙ্গ মইতে বা মেয়েদের মধ্যে নীলিমা গল, অসীমা গল ও অম্বালিকা মজুমদারও দেহের পেলবতায় দর্শকদের কম সাধুবাদ পাননি। ফ্লোর একসারসাইজে দর্শকরা আনন্দ পান সবচেয়ে বেশী। প্রসঙ্গত তোমাদের জানাই রাশিয়ান দলের সঙ্গে কোনো মহিলা জিমন্যাস্ট আসেন নি।

ফুটবল ঃ

ক-দিন আগে কলকাতার ফুটবল ক্রীড়া-রসিকরা রাশিয়ান দলের ফুটবল খেলা দেখার আশায় মেতে উঠেছিলেন। ডায়নামো মিনস্ক ও আই. এফ. এ. একাদশের প্রদর্শনী খেলা দেখার জন্যে ইস্টবেঙ্গল-এরিয়ান মাঠের সব দর্শক আসনই ভরে গিয়েছিল, কিন্তু স্বীকার করতেই হচ্ছে খেলা দেখে কারো মন ভরেনি। বিদেশী দলের কাছে আমাদের যে নতুন প্রত্যাশা থাকে, ডায়নামো মিনস্ক সে প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারেন নি। রাশিয়া দল দুটো গোল করে বিজয়ী হলেও, গোল দুটো এসেছে নিঃশব্দে যেন দর্শক ও খেলোয়াড়দের অজান্তে। তাই ডায়নামো মিনস্ক দলের খেলা সম্পর্কে কাউকেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে দেখিনি। তবু বলব ডায়নামো মিনস্ক দলের সব খেলোয়াড় সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। পায়ের বল কণ্ট্রোল প্রশংসনীয়।

চোখ চেয়ে ঘাসের ওপর দিয়ে বল দেওয়া-নেওয়ার পদ্ধতিও প্রশংসার দাবি রাখে। শটের তীব্রতাও চোখে পড়েছে।

আই. এফ. এ, দলে রক্ষণভাগে যে ছ-জন খেলোয়াড় ছিলেন এবং শান্ত মিত্র, অরুণ ঘোষ, সি. প্রসাদ, সুনীল ভট্টাচার্য ও নাইমকে নিয়ে গড়া রক্ষণব্যূহকে ভারতের শ্রেষ্ঠ রক্ষণব্যূহ বলা যেতে পারে। ডায়নামো মিনস্কের সঙ্গে এরা খেলেছেনও অনমনীয় দৃঢ়তা নিয়ে। বিনা বাধায় কোনো রাশিয়ান খেলোয়াড় গোলে শট করার সুযোগ পাননি। লেফট আউট সারমাদ খাঁ এবং রাইট হাফ নায়িম দ্বিতীয়ার্ধে গোল করার যে দুটো সহজ সুযোগ নষ্ট করেছেন, ডায়নামো মিনস্কের খেলোয়াড়রা নিজেদের ক্রীড়াশৈলীতে তেমন সহজ গোলের সুযেগে সৃষ্টি করতে পারেন নি। রাশিয়ান দল যে দুটো গোল করেছেন তার একটা অরুণ ঘোষের সাময়িক ব্যর্থতায় আর একটা গোল কিপারের সম্পূর্ণ ভুলের জন্যে।

অ্যাথলেটিকস্

শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাথলেটিকসের আসর বসতে শুরু করেছে। কয়েক দিনের মধ্যে দুটো অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটা সুন্দর ও সুব্যবস্থাসম্পন্ন পরিবেশ রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের আন্তঃ সার্ভিসেস স্পোর্টস, অপরটা কাঁচড়াপাড়ায় পূর্বাঞ্চল অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপ।

রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের সার্ভিস অ্যাথলেটিকসের নিঃসন্দেহে আকর্ষণ বেশী ছিল। কারণ সামরিক বিভাগের অ্যাথলীটদের কেন্দ্র করেই ভারতীয় অ্যাথলেটিকসের যা কিছু মান। এই সর্বভারতীয় সামরিক অ্যাথলেটিকসে ভারতের প্রথম সারির প্রায় সব অ্যাথলীটই কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন। চারদিনব্যাপী এই আকর্ষণীয় অ্যাথলেটিকসে পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ের সাদার্ন কম্যাণ্ডের মুক্তিয়ার সিং ভারতীয় রেকর্ড ভঙ্গ করেন, লোহার বল ছোঁড়ায় এই কম্যাণ্ডের ক্যাপ্টেন যোগীন্দর সিং এশিয়ান রেকর্ডের দূরত্ব অতিক্রম করেন। এছাড়া আন্তঃ সার্ভিসে অনেকেই নতুন রেকর্ড করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও সার্ভিসেস অ্যাথলীটদের নিয়ে কাঁচাড়াপাড়ার রেলওয়ে স্টেডিয়ামে আয়োজিত পূর্বাঞ্চলিক অ্যাথলেটিকস-এর মানও উঁচু পর্যায়ে ওঠেনি। এখানেও সার্ভিস অ্যাথলীটরাই সব বিষয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। পুরুষদের একুশটা বিষয়ের ভেতর আঠারোটা বিষয়ে তাঁরা প্রথম স্থান অধিকার করেন। বহু বিষয়ে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানও অধিকার করেছেন তাঁরা।

মেয়েদের বিভাগে পশ্চিমবঙ্গের মহিলারা চ্যাম্পিয়নশিপ পান তেষট্টি পয়েণ্ট সংগ্রহ করে। উত্তর প্রদেশ পায় দ্বিতীয় স্থান একটি মহিলার কৃতিত্বে অর্থাৎ তাদের সর্বসাকুল্যে সংগৃহীত পয়েণ্টের মধ্যে কল্পনা বাগচীই সংগ্রহ করেন চোদ্দ পয়েণ্ট।
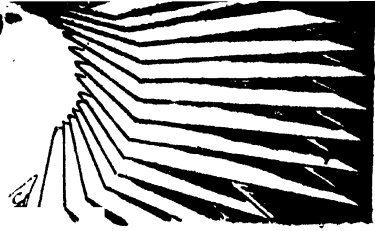
মেক্সিকো অলিম্পিক ও আমরা

প্রতি চার বৎসর অন্তর অন্তর অলিম্পিকের আসর বসে। এই আসরে বিভিন্ন প্রকার খেলাধূলার অনুষ্ঠান হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এই সব খেলাধূলার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এইবার মেক্সিকো শহরে এই অলিম্পিকের আসর বসেছিল।

এশিয়া মহাদেশের কিছু সংখ্যক দেশ এবারকার অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করেছিল। বলা বাহুল্য আমরাও অলিম্পিক অঙ্গনে নেমেছিলাম অনেক আশা নিয়ে। হকিতে আমাদের একচ্ছত্র প্রাধান্য রয়েছে বলেই আমরা জানতাম। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আমরা আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বর্ণপদক থেকে বঞ্চিত হলাম। এই প্রতিযোগিতায় তৃতীয়স্থান লাভ করে একটি ব্রোঞ্জপদক পেয়ে এবার আমাদের সন্তুষ্ট হতে হ'ল। হকি ছাড়া আরও দু-একটা প্রতিযোগিতায় আমরা অংশ-গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু ওইগুলিতেও ভারতীয় অ্যাথলীটরা চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের খেলার মান যখন দিন দিন উন্নত হচ্ছে, তখন আমাদের দেশের খেলার মান দ্রুত অবনতির দিকে এগুচ্ছে। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র জাপান স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ মিলিয়ে মোট ২৫টি পদক নিয়ে সগৌরবে ঘরে ফিরল। তাদের প্রতিটি খেলাধূলার উন্নতির পিছনে রয়েছে কঠোর অনুশীলন ও একাগ্রতা। পরবর্তী অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে মিউনিক শহরে ১৯৭২ সালে। সেখানে খেলাধূলায় প্রভূত উন্নতির পরিচয় দিলে আমরা আমাদের হৃত-সম্মান ফিরে পাব। এত দুঃখের মধ্যেও একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, আমাদের মেক্সিকো থেকে একেবারে রিক্ত হস্তে ফিরতে হয়নি বটে, কিন্তু সব খেলাধূলারই মান যে ভাবে দ্রুত নেবে চলেছে তাতে আগামী অলিম্পিকে একটি ব্রঞ্জপদকও আমরা আনতে পারবো কিনা তাই চিন্তা।

শ্রীঅভিজিৎ বাগচী (বর্ধমান)

বিনিময়

ইঁদুর ভায়া ইঁদুর ভায়া
দেখ ইঁদুর ভাই,
তোমার আছে ঝকঝকে দাঁত
আমার কেন নাই ?
তোমার দাঁতের ধার তো কড়া
কাটো কুটুর-কুট,
আর এদিকে আমারগুলি
ভাঙছে পুটুর-পুট।

ইঁদুর ভায়া, ইঁদুর ভায়া
বলি তোমায় শোন :
দু'চারটে করলে বদল
কমবে নাকো জেনো !
পোকাখেকো দাঁতগুলো সব
তুমি নিয়ে নাও,
তার বদলে আমায় তোমার
ধারালো দাঁত দাও

শ্রীগৌর দত্ত পোদ্দার

—

সুখ ও দুঃখ

সুখ-দুঃখ মানবের নিত্য সহচর
পালাক্রমে আসে তারা বাধা নাহি মানে,
বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ থাকি স্থির মনে
কার্য করে যান করি ঈশ্বরে নির্ভর।
শান্তির সংসার যার, শুভ্র পরিধেয়
সামান্তে যে তুষ্ট হয় নিরোগ শরীর ;
সুপুত্রের মাঝে পৌত্র আছে বর্তমান
জীবন সার্থক তার বেঁচে থাকা শ্রেয়ঃ।
চোর প্রতিবেশী যার বড় দুষ্ট গাই,
প্রবঞ্চক ভাই যার মূর্খ পুত্র গৃহে
অন্নের সংস্থান তরে যেবা নিত্য ঘোরে
তার মত দুঃখী ভবে আর কেহ নাই।

শ্রীজগজ্জীবন জানা

—

শীত এলো রে

শীত এলো রে শিশির ভেজা
হেমন্তের ঐ হাত ধরে
গোলাপ গাঁদার গন্ধে বাতাস—
মদির হ'ল মন্তরে !

কুয়াশার ঐ আঁচলখানি,
নিল শীতল অঙ্গে টানি,
রবির করে আলোর বাণী—
ছড়িয়ে দিল প্রান্তরে।
শীত এলো আজ শান্ত হিমেল,
হেমন্তের ঐ হাত ধরে।।

আলপনা
শিল্পী : শ্রীনূপুর ঘোষাল

হর্ষে পাগল সর্ষে খেতে,
পাকা ধানের স্বর্ণ স্রোতে,
কে এলো আজ কোথা হ'তে—
বাঁশীতে কি গান ভ'রে !
শীত এলো রে স্বপন-মাখা,
হেমন্তের ঐ হাত ধরে ॥

শ্রীচন্দ্রশেখর গোস্বামী

—
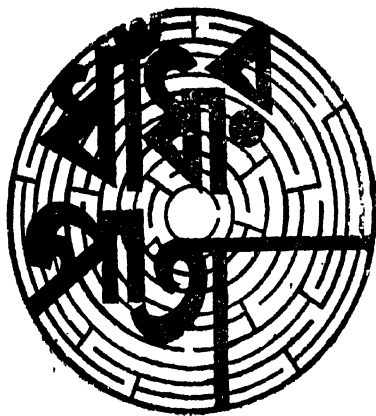
১। স্বদেশে থাকি বিদেশে থাকি
থাকি না প্রবাসে,
কারো পাতে পাচে থাকি না
থাকি আমি স্ববশে।

২। তিনে মিলে সৃষ্টি মোর,
প্রথম বাদে পশু হয় অতি বৃহৎ,
মধ্য বাদে যা, সবে করে তা
হোক না হীন কিংবা মহৎ।

৩। চার বর্ণে মিলে সুন্দর এক প্রাণী,
প্রথমার্ধে নয় কিন্তু রাজা জমিদার,
নারীরা খুব শ্রদ্ধা করেন তায়—
হয় যাহা শেষার্ধেতে তার।

৪। তিন বর্ণে নদী কিবা ভারত ভিতরে ?—
সেই নামে আছে দ্রব্য লাগে যা আহারে ;
মধ্য বাদে ফল হয় পরিচিত অতি,
মানবের অঙ্গ পাবে শেষ ছাড়ো যদি।

৫। তিন অক্ষরের এমন একটি শব্দ বার কর, যার প্রথম অক্ষরের সঙ্গে অন্য দুটি প্রতিশব্দের প্রথম অক্ষর মিলিয়ে সেই শব্দটিই হবে।

—শ্রীবিনয় বাগচী

৬। কোন্ প্রশ্নের জবাবে কখন 'হ্যাঁ' বলা চলে না ?
৭। কথা বললেই কোন জিনিস ভেঙে যায় ?
৮। কে এক ইঞ্চি না নড়ে কোলকাতা থেকে দিল্লী পর্যন্ত চলে গেছে ?
৯। কোন যুগ আগামী যুগ ছিল, গত যুগ হবে ?

—শ্রীকৃষ্ণা বসু

(উত্তর আগামী মাসে বেরুবে)

॥ গত মাসের ধাঁধার উত্তর ॥

১। (অ) সিংহের মত সাহসী (আ) হস্তী বা তিমির মত বৃহৎ (ই) পেঁচার মত জ্ঞানী (ঈ) শৃগালের মত ধূর্ত (উ) কুকুরের মত বিশ্বস্ত (ঊ) বৃষের মত বলিষ্ঠ (ঋ) হরিণ বা মৌমাছির মত ব্যস্ত (৯) ভাল্লুক বা বিড়ালের মত ক্ষুধার্ত।

২। সীল, সিন্ধুঘোটক, তিমি, জলহস্তী, হাঙ্গর, মেরু-ভল্লু। ৩। ঘটক।
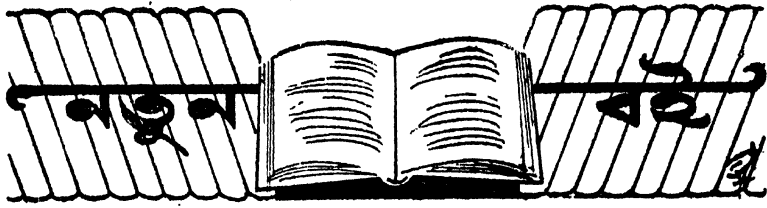
যেখানে বাঘের ভয়—শ্রীগীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এভারেষ্ট বুক হাউস, এ ১২ এ, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২.০০

লেখিকা সম্ভবতঃ এর আগে আর একটি ভাল্লুকের গল্পের বই লিখেছিলেন। সে বইটির প্রশংসা সকলে যে করেছিল কেন, এ বইটি পড়ে তা বুঝতে পারা যায়। নদীয়া জেলার ঝোপ জঙ্গলে ভরা গোরাচাঁদপুর গ্রামের মাদী এবং মদ্দা জোড়া বাঘের কাহিনী পড়তে একবার আরম্ভ করলে তোমরা আর ছাড়তে পারবে না। অজস্র ঘটনার উত্তেজনায় ভরা এই কাহিনী ভারী সুন্দর করে লেখা। সুন্দর সুন্দর ছবিও আছে অনেকগুলি। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই যেমন ভাল, তেমনি ভাল নামকরা শিল্পী শ্রীযুক্ত ও, সি, গাঙ্গুলীর প্রচ্ছদপটটি।

—

আলোর পরশ—শ্রীশঙ্কর দাশগুপ্ত। সুন্দরম্ প্রকাশনী, ১১৭ বি, বি, চ্যাটার্জী রোড, কলিকাতা ৪২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১.২৫

'আলোর পরশ' ছোট ছেলেমেয়েদের নানা রকমের ছড়ার রঙচঙে বই। খুব ছোটরা এটি পড়ে আনন্দ পাবে। বড় টাইপে, দু'তিন রঙে মজার ছবিসহ ছাপা। দুই বুড়ো, ব্যাঙেদের স্কুল, একজন, শামুক শামুক, ইঁদুর নাচন, হাতি ও খোকন, চড়াই পাখির লড়াই, পড়ে সবাই খুশি হবে।

—

আমাদের কবিয়াল—শ্রীসতীকুমার নাগ। চয়নিকা পাবলিশিং হাউস, ৭৭, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ০.৭৫

এক সময় আমাদের দেশে কবিগানের খুবই প্রচলন ছিল। কবির লড়াই হ'ত পূজা-উৎসব আনন্দে বারোয়ারি তলায় বা কোন বড়লোকের বাড়িতে। এই কবিয়ালরা মুখে মুখে গান বেঁধে, ছড়া কেটে একজন আর একজনের সঙ্গে মজার লড়াই করতেন। এ ব্যাপারে কয়েকজন খুবই নাম করেছিলেন। তাদের মধ্যে ভোলা ময়রা, দাশু রায়, হরু ঠাকুর ও রাম বসুর নাম বিখ্যাত। লেখক এঁদেরই জীবন কথা সহজ করে লিখেছেন এই বইখানিতে। তোমরাও পড়লে বুঝতে পারবে এবং এই কবিয়ালদের কথা জেনে আনন্দ পাবে। শেষের দিকে 'কবিয়ালপঞ্জীর মধ্যে আরও কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আছে।

—

সম্পাদক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার

শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : ০.৫০ পয়সা

পুতুলের বিয়ে

ফটো : শ্রীলেখা দত্ত

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র *
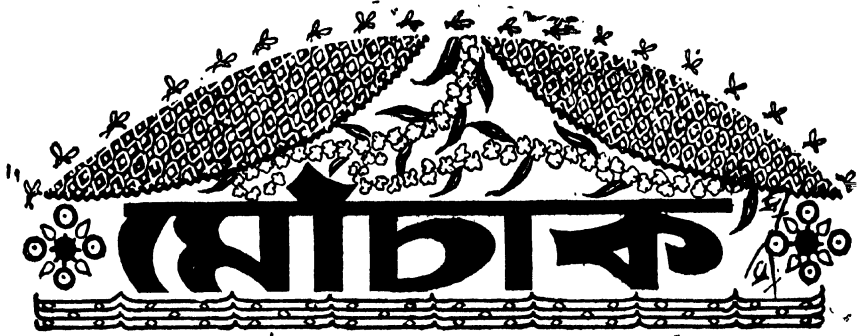
৪৯শ বর্ষ] মাঘ : ১৩৭৫ [১০ম সংখ্যা

টিকটিকি

শ্রীসুশীল রায়

লোকে ছুটোছুটি করে, কাজ করে লোকে-
এর মাঝে সংসারে কে পাঠালো তোকে ?
কুড়ের বাদশা তুই
নাই কাজ কিচ্ছুই
ওত পেতে চাস্ শুধু ড্যাবডেবে চোখে !

তোর আচরণ দেখে ভাবছি বলি কি—
ইচ্ছে কি কোনো কাজে নেই, টিকটিকি ?
কাজ বিনে বাঁচা দায়
তোকে তবে কে বাঁচায়
বল্, সারাদিন আজ করেছিস কি-কি !

কাজে নেই মন, তাই কিছুই না ক'রে
যখনই তাকাই, দেখি, হাঁ ক'রে হাঁ ক'রে
জিভ দিয়ে টেনে টেনে
মুখের মধ্যে এনে
গিলে নিস টপাটপ পোকা ও মাকড়ে !

শিখেছিস শুধু তুই হামাগুড়িটাই
দেয়ালে-দেয়ালে হাতে ভর দিয়ে তাই
একভাবে চলা তোর,
বল্ তো জীবন-ভোর
এমন চললে লোকে বলে না বালাই ?

আমরাও একদিন ছোট-ই ছিলাম
হাতে ভর দিয়ে হামাগুড়ি হাঁটতাম,
কত-না আছাড় খেয়ে
কত-না আঘাত পেয়ে
ধীরে-ধীরে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালাম !

বড় হতে হবে, শোন্, বড় হতে হয়
বিনা কাজে কাটাতেও হয় না সময়।
না'ই-বা দিলেম তাড়া
ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়া,
আমরা জেনেছি এতে নেই কোনো ভয়।

"তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদ-সর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে। ধর্ম ছাড়িলে হিন্দুর জাতীয় মেরুদণ্ডই ভগ্ন হইয়া গেল—যে ভিত্তির উপর জাতীয় সুবিশাল সৌধ নির্মিত হইয়াছিল, তাহাই ভাঙিয়া গেল ; সুতরাং ফল দাঁড়াইল সম্পূর্ণ ধ্বংস।"

—*স্বামী বিবেকানন্দ*

জননী ও দেশমাতা

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

আশ্চর্য! অমন পিতারও এমন পুত্র হ'তে পারে?...

মহারাণা প্রতাপ সিংহ। লোকের মুখে মুখে ফেরা নাম—রাণা প্রতাপ। শুধু রাজস্থানের ইতিহাসে নয়, সমস্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা নাম—রাণা প্রতাপ। মেবারের রাণা প্রতাপ সমগ্র হিন্দুস্থানের মনে আসন পেতে আছেন পরম দেশভক্ত আর মহাবীর রূপে।

নামটি উচ্চারণ করলেই হল্‌দীঘাটের যুদ্ধের কথা সকলের মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে বিশাল মোগল বাহিনীর সঙ্গে রাজপুতদের যুদ্ধের কথা। স্বাধীন থাকবার জন্যে রাণা প্রতাপের সব সুখ, ঐশ্বর্য, আরাম জন্মের মতন ত্যাগ করবার কথা। বাদশা আকবরের শত ভয়, শত প্রলোভন অগ্রাহ্য করে শত দুঃখ কষ্ট সহ্য করা। রাজার সমস্ত বিলাস, সম্পদ স্বেচ্ছায় উপেক্ষা করে পাহাড়ে জঙ্গলে বাকি জীবন যাপন করা। শুধু একটিবার মোগল সম্রাটের কাছে মাথা নত করলেই রাণা প্রতাপের সব কষ্টের অবসান ঘটত। আবার তিনি ফিরে পেতেন হারানো রাজ্য, ঐশ্বর্য, সুখ-সম্পদ। কিন্তু রাণা প্রতাপ স্বাধীনতা হারিয়ে কোন কিছুই লাভ করতে চাননি। স্বাধীনতা গৌরবে গরীয়ান হয়ে অমন সাহসে সহ্য করে গেছেন দুঃখের কশাঘাত। দেশ ভক্তির প্রেরণায় তপস্যার মতন করে কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন।

সেই তেজস্বী মহাবীর রাণা প্রতাপের পুত্র অমর সিংহ হয়েছেন ভীরু, কাপুরুষ। মোগল আক্রমণের ভয়ে সন্ত্রস্ত। অমন মহান্ পিতার বীরত্ব কিংবা তেজ কিছুই অমর সিংহের নেই।

ওদিকে আকবরের মৃত্যুর পর বাদশা হয়েছেন জাহাঙ্গীর। তিনি অমর সিংহের আসল পরিচয় জানতে পেরেছেন। আর মনে মনে মতলব করেছেন—এইবার মেবারকে হাতের মুঠোয় আনা যাবে। রাণা প্রতাপ আর নেই। তাঁর ছেলে অমর সিংহ বাপের তুলনায় অপদার্থ।

নতুন বাদশা এই সব বিবেচনা করে অমর সিংহকে ফার্মান পাঠালেন—মোগল শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

বাদশাহী দাবী শুনে অমর সিংহের বুক কেঁপে উঠল। তিনি মেবারের সর্দারদের জানালেন, 'আমি ভাবছি, পরাক্রান্ত মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে কাজ নেই। আমি তাহলে একেবারে শেষ হয়ে যাব। মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে আমরা কিছুতেই পেরে উঠব না।'

কুনহা সিং মেবারের এক তরুণ যোদ্ধা। রাণার কথা শুনে তিনি জ্বলে উঠলেন, 'এ কি কথা আপনি উচ্চারণ করছেন? আপনার মহান্ পিতার মুখে কি আপনি কালি লেপে দিতে চান?'

অন্য মেবারী যোদ্ধারাও কুন্‌হা সিংকে সমর্থন জানালেন। তখন নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে অমর সিংহ প্রত্যাখ্যান করলেন জাহাঙ্গীরের দাবী।

তারপর জাহাঙ্গীরের হুকুমে দেখতে দেখতে মেবারী উপত্যকা মোগল পঙ্গপালে ভরে গেল। আর সেই সব বাদশাহী সৈন্যদল আক্রমণ করলে রাজপুত যোদ্ধাদের।

কুন্‌হা সিং আর তাঁর সেনাবাহিনী বাঘের মতন যুদ্ধ করতে লাগল। সারা দিন লড়াইয়ের শেষে প্রচুর হতাহত হ'ল মোগল সেনাদলে।

এমন সময় দেখা গেল, শত্রু সৈন্য ঘিরে ফেলেছে রাণা অমর সিংহকে। কুন্‌হা সিং তাঁর অনুচরদের চীৎকার করে বললেন, 'ভাই সব, রাণার দিকে ছুটে চলো।'

মোগল সৈন্যরা তখন রাণাকে প্রায় বন্দী করে ফেলেছে। এমন সময় কুন্‌হা সিং তাঁর দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বাদশাহী সৈন্যদলের ওপর।

দু'পক্ষে ভীষণ লড়াই বেধে গেল।

শেষ পর্যন্ত রাণাকে উদ্ধার করলে কুন্‌হা সিংহের সহ-যোদ্ধারা। কিন্তু সেই শুভক্ষণে কুন্‌হা সিং আর্তনাদ করে উঠলেন।

তাঁর পিঠে বিদ্ধ হয়েছে শত্রুর বর্শা। শেষ শক্তি সংগ্রহ করে কুন্‌হা সিং ঘুরে দাঁড়িয়ে সেই মোগলের বুকে তলোয়ার বিঁধে দিলেন। তারপরই সেই শত্রু সেনার শরীরের কাছেই তিনিও লুটিয়ে পড়লেন রক্তে আপ্লুত হয়ে।

কুন্‌হার বাড়ি সেখান থেকে বেশি দূরে নয়। তাঁর মায়ের কাছে তখনি খবর চলে গেল—'আপনার ছেলে সাংঘাতিক আহত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে রয়েছে···'

কুন্‌হার মা অবিচল হয়ে সংবাদটা শুনলেন। তাঁর চোখে এক ফোঁটা জল দেখা গেল না। শুধু বললেন, 'আমায় একটা ঘোড়া এনে দাও।'

একজন ঘোড়া এনে দিলে তিনি তাতে সওয়ার হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে গেলেন, আহত পুত্রের সন্ধানে। সেখানে ইতস্ততঃ ছড়ানো হতাহত সৈনিকদের দেখে দেখে ছেলের খোঁজ করতে লাগলেন। শেষে পুত্রকে দেখতে পেলেন, ধরাশায়ী অবস্থায়। কুন্‌হা সিংহের পিঠ থেকে এমন ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরিয়ে আসছে যে মনে হয় মৃত্যুর আর দেরি নেই।

ঘোড়া থেকে নেমে মা তাঁর কাছে ঝুঁকে বসতে কুন্‌হা সিংয়ের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল।

কিন্তু মা আস্তে আস্তে সান্ত্বনার সুরে বললেন, 'দুঃখ কোরো না, বাছা। স্বাধীনতার জন্যই তুমি সর্বস্ব দিয়েছ···'

কুন্‌হার তখন এত রক্তপাত হয়েছে যে, সেই দুর্বলতায় তাঁর কথা বলবার শক্তি নেই। মা কিন্তু তখনো হতাশ হলেন না। তিনি নিজের কাপড় ছিঁড়ে কুন্‌হার ক্ষতস্থান ভাল করে বেঁধে দিলেন, যাতে আর রক্তপাত না হতে পারে।

ঠিক সেই সময় একজন আহত সৈনিকের করুণ কাকুতি শোনা গেল, 'একটু জল… জল…'

যে মোগল সৈন্য কুন্‌হাকে জখম করেছিল, এ তারই কাতর কণ্ঠ।

কুন্‌হা সেদিকে চেয়ে সত্যিকার রাজপুতের মতন বললেন, 'মা, ওকে একটু জল এনে দাও।'

জননী উত্তর দিলেন, 'আর এক মুহূর্ত দেরি করা চলবে না। এখনি তোমায় ঘরে নিয়ে গিয়ে ক্ষতের চিকিৎসা করতে হবে, না হলে…'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই আরো সকরুণ গলায় আবার আকৃতি শোনা গেল, 'জল…জল…'

আবার কুন্‌হা সিং বললেন, 'মা, দয়া করে ওকে একটু জল এনে দাও। যুদ্ধ শেষ হলে শত্রুতাও আর থাকে না। ওকে যদি জল এনে না দাও, আমি শান্তিতে মরতে পারব না…'

নিতান্ত অনিচ্ছায় জননী পুত্রকে সেই অবস্থায় রেখে জল আনতে গেলেন।

ততক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকার চারদিকে ঘনিয়েছে। একদল মোগল যুদ্ধক্ষেত্রে খুঁজতে এসেছে তাদের পক্ষের হতাহত সৈন্যদের।

'দেখো, দেখো,' তাদের একজন বলে উঠল, 'একজন বেঁচে রয়েছে ‥'

তারা এসে হাজির হ'ল, যেখানে কুনহা সিং আর তাঁর আততায়ী যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ে রয়েছে।

সেই আহত মোগল সৈন্য তার দলের লোকদের দেখে কুন্‌হা সিংহের দিকে আঙ্গুল তুলে বিড়বিড় করে কি বললে।

দলের একজন সেকথা স্পষ্ট না বুঝতে পারলেও বললে, 'এ বলতে চায়, ওই কাফেরটাই এর এই অবস্থা করেছে।

একথা বলবার সঙ্গে সঙ্গেই একজন মোগল সৈন্য ঐ রাজপুতের দেহটা টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললে।

তারপর তারা সেই মোগল সৈন্যকে তুলে নিয়ে চলে গেল নিজেদের শিবিরের দিকে।

একটু পরেই কুন্‌হার মা জল নিয়ে ফিরে এলেন। অস্পষ্ট আলোয় সেই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। নিজের পুত্রের দেহ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে আর সেই আহত মোগল সৈন্যের কোন চিহ্ন সেখানে নেই।

শোকে আর ক্রোধে আত্মহারা হয়ে গেলেন কুনহার জননী। প্রতিহিংসার তাড়নায় তাঁর শিরায় রক্ত উদ্দাম হয়ে উঠল। মরণাহত শত্রুর ওপর এ কি অমানুষিক ব্যবহার ওদের? আর যে শত্রু নিজের প্রাণ বিপন্ন করে ওদেরই একজনের জন্যে নিজের মাকে জল আনতে পাঠিয়েছে!

'তরোয়াল ঘুরিয়ে আহ্বান করলেন—খবরদার!'

কুন্‌হার মা একবার আবছা অন্ধকারে চারদিক লক্ষ্য করলেন মোগল দলটার সন্ধানের আশায়। কিন্তু কোনদিকে কারুর দেখা পাওয়া গেল না।

তবে অনেক দূর থেকে সেই স্তব্ধ রণক্ষেত্রে ভেসে এল ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। তিনি কান পেতে শুনলেন, কারা ঘোড়ায় চেপে চলে যাচ্ছে—আর এ তাদেরই আওয়াজ।

তিনি আর এক মুহূর্ত দেরি না করে নিজের ঘোড়ায় উঠে পড়লেন। তারপর ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন সেই ঘোড়সওয়ার দলের শব্দ লক্ষ্য করে।

তাদের কাছাকাছি এসে তিনি চীৎকার করে তাদের থামতে বললেন। শক্তিরূপিণী দেবীর মতন ফুলে উঠে তলোয়ার ঘুরিয়ে আহ্বান করলেন, 'খবরদার!'

এই তীক্ষ্ম কণ্ঠের ধ্বনিতে খান খান হয়ে গেল নির্জন প্রান্তরের নিস্তব্ধতা।

মোগল সৈন্যেরা অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তারা যেন নিজেদের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না যে একজন নারী একা এসে তাদের দলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইছে।

কিন্তু আর অবিশ্বাসের কোন সময় নেই। কারণ কুন্‌হার জননী ততক্ষণে সিংহিনীর বিক্রমে মোঘলদের উপর আক্রমণ আরম্ভ করে দিয়েছেন। তাঁর তরবারির ঘায়ে ধরাশায়ী হয়েছে দলের সৈন্য।

মোগলেরা তখন সেই একাকিনীর বিরুদ্ধেই লড়াই করতে লাগল।

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কুন্‌হার জননীর দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ঘোড়ার ওপর থেকে।

কিন্তু তার আগে মোগল দলের প্রায় অর্ধেক যোদ্ধার জীবন শেষ হয়ে গেছে তাঁর শাণিত তলোয়ারের আঘাতে।···

এ যুদ্ধের সমস্ত সংবাদ যথাসময়ে বাদশা জাহাঙ্গীরকে শোনানো হ'ল।

জাহাঙ্গীর চমৎকৃত হয়ে বললেন, 'যে দেশে এমন মেয়েদের জন্ম, সেই মেবারকে জয় করবে কে?'

দুটি যমজ ভাই

শ্রীনিখিল বসু

কালোপানা মুখে রামের
　　বত্রিশ দাঁত সাদা,
কুতকুতে চোখ আলুর মতন
　　শ্যামেরও নাক খাঁদা।
রাম খায় মাংসের স্যুপ
　　শ্যাম মাছের মুড়ো,
রাম মুখে ফেস পাউডার,
　　শ্যাম চকের গুঁড়ো।
রাম দিলে ডন-বৈঠক
　　সকাল সাঁঝে রাতে—
শ্যাম তখন কুস্তি করে
　　নিজের ছায়ার সাথে।
বিছানাতে শুলেই রামের
　　বিচ্ছিরি নাক ডাকে,
শ্যাম তখন রামের মুখে
　　কাইজারি গোঁফ আঁকে।
ঝগড়া-ঝাঁটি হবেই ওদের
　　মিল নেই একতিল
শ্যাম কাটলে রামচিমটি
　　রাম লাগাবে কিল।

কাঁকড়া বিছের জীবন কথা
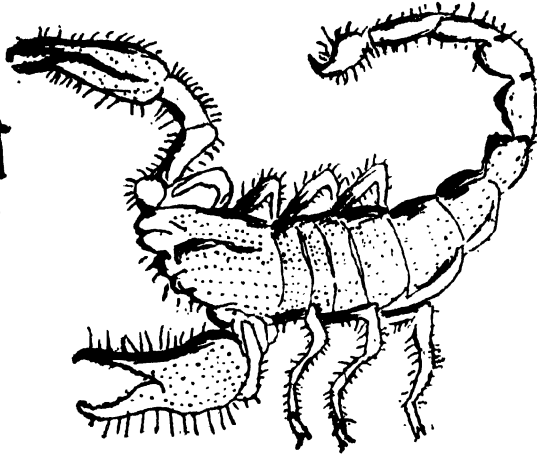
শ্রীসৌরেন্দ্রকুমার পাল

উঃ! গেছি গেছি! কি কামড়াল পায়ে! উঃ, যন্ত্রণায় মরে গেলাম!

মারাত্মক বিষ প্রয়োগ করে ল্যাজ তুলে সুড়সুড় করে পালাল ভয়ংকর-দেহী কালো এক কাঁকড়া বিছে। যাকে কামড়াল সে তখন বিষের প্রতিক্রিয়ায় ছট্‌ফট্‌ করছে।

ভগবান করুন তোমাদের যেন কাঁকড়া বিছে না কামড়ায়। কিন্তু যাকে কামড়েছে সে যদি মারা গিয়ে থাকে, তবে বিষের জ্বালায় তিলে তিলে জ্বলে মরেছে এবং মরবার আগে পর্যন্ত অনুভব করেছে সে জ্বালা কি তীব্র। আর যে চিকিৎসার জোরে এবং ভাগ্যগুণে বেঁচেছে, সে স্বীকার করতে বাধ্য যে যমের দক্ষিণ দুয়ার থেকে জীবন নিয়ে ফিরে আসা যাকে বলে, এই বিছে কামড়ানো তাই। এই নিদারুণ অভিজ্ঞতার জন্যে সেই ব্যক্তিই বলতে পারে কাঁকড়া বিছের দংশন কি মারাত্মক।

কাঁকড়া বিছে পৌরাণিক জীব-জগতের এক প্রাণী এবং পৃথিবীর এতো পরিবর্তন সত্ত্বেও যুগ যুগ ধরে একই আকৃতি এবং প্রকৃতি নিয়ে আজও পৃথিবীর বুকে এদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রয়েছে এবং হয়তো এ জীবের কোনদিনই অবলুপ্তি ঘটবে না।

বিভিন্ন জাতের কাঁকড়া বিছে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র আছে। জঙ্গলে, অনুর্বর পাহাড়ী অঞ্চলে, স্যাঁৎসেঁতে ভিজা জায়গায় এবং তুষার অঞ্চল সর্বত্রই এদের পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক কত দুর্যোগ পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে যুগে যুগে বয়ে গেছে, কত প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তুর বিলোপ ঘটছে কালের গর্ভে, কিন্তু কাঁকড়া বিছে তার দৈহিক গঠন অপরিবর্তিত রেখে আজও বেঁচে আছে। তার কারণ, কাঁকড়া বিছে যে কোন প্রাকৃতিক অবস্থায় সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এরা অত্যন্ত সহনশীল, অথচ বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় দাবি খুবই

সামান্য। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, বরফের মত ঠাণ্ডায় সপ্তাহাধিক কাল নিশ্চল অবস্থায় এরা থাকতে পারে এবং পরে স্বাভাবিক জীবনধারায় সহজেই ফিরে আসতে পারে। আটটি ফুসফুসের সাতটিকে নিষ্ক্রীয় রেখে মাত্র একটি ফুসফুসের সাহায্যে দিনের-পর-দিন এরা জলে ডুবে থাকতে পারে। জলের ভিতর থাকার জন্য কাঁকড়া বিছের শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না এবং দেহে রক্ত উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন তারতম্য ঘটে না।
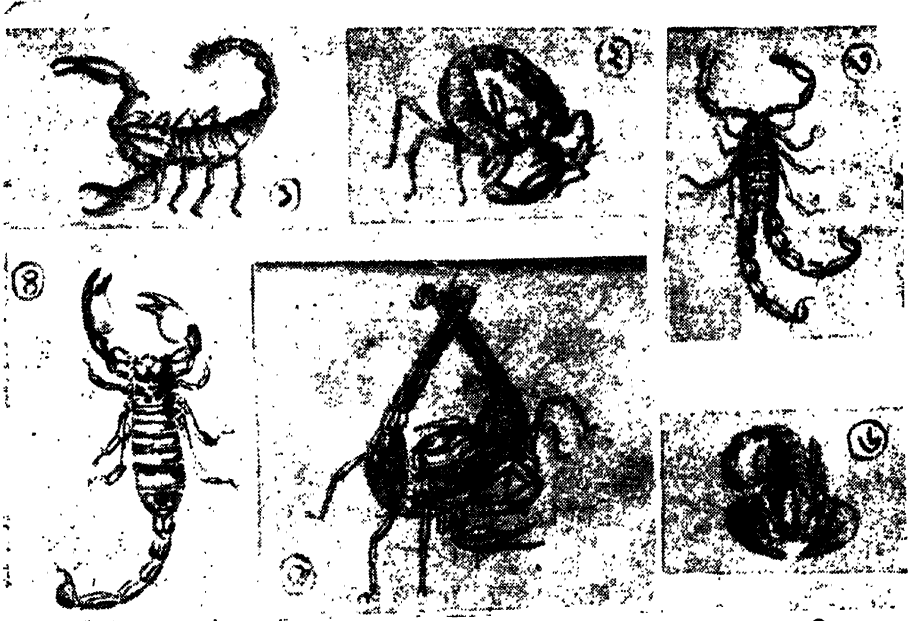
১। শিকারের সন্ধানে বা আক্রমণাত্মক ভঙ্গী। ২। কাঁকড়া বিছে ফড়িং ধরে হুল ফুটিয়ে দিচ্ছে। ৩। দুষ্প্রাপ্য দুই ল্যাজ বিশিষ্ট এই স্ত্রী-কাঁকড়া বিছে আফগানিস্থান অঞ্চলে পাওয়া যায়। লম্বায় এরা ৯ সেঃ মিঃ পর্যন্ত হয়। ৪। সর্ববৃহৎ জাতের কাঁকড়া বিছে, লম্বায় ২০ সেঃ মিঃ পর্যন্ত হয়। দক্ষিণ আমেরিকার গায়েনায় পাওয়া যায়। ৫। কাঁকড়া বিছের দ্বন্দ্বযুদ্ধ। ৬। সাধারণ বিছে ঘুমন্ত অবস্থায় লম্বায় প্রায় ১৩ সেঃ মিঃ হয় এবং ভারতের পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে পাওয়া যায়।

কাঁকড়া বিছে মন্থরগতিসম্পন্ন জীব এবং চলাচলে এদের অতি সামান্যই শক্তি ক্ষয় হয়। দৈহিক সহনশীলতার আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, একবার এরা পেট ভরে খেয়ে নিলে কয়েকমাস এমনকি এক বৎসর পর্যন্ত পুনরায় না খেয়ে অনায়াসে বেঁচে থাকতে পারে।

বিভিন্ন পোকা, মাকড়সা ও কীটপতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণী কাঁকড়া বিছেদের খাদ্য। যখন এরা খাবার অন্বেষণে যায়, তখম এরা পিছনের ছ' পায়ে ভর দিয়ে চলে ও পিছনের লেজের অংশটি

উঁচু অবস্থায় রেখে, সামনের দাড়া দুটি শিকারকে ধরবার জন্যে উন্মুক্ত অবস্থায় প্রস্তুত রাখে। নিজেকে প্রতিরক্ষার ক্ষণে এবং শত্রুকে আক্রমণের ক্ষেত্রে ঐ একই ভঙ্গিতে কাঁকড়া বিছে চলে। আক্রমণাত্মক ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে লেজের শেষাংশে অবস্থিত হুল ফুটিয়ে বিষ ঢেলে দেয়, কিন্তু শিকারের ক্ষেত্রে যদি কোন পোকা বা পতঙ্গ দাড়ার সাঁড়াশীর চাপ থেকে পালাবার চেষ্টা করে, তবে হুলের সূচাগ্র ফুটিয়ে তাকে সে কাবু করে ফেলে এবং শিকার মরে গেলে তাকে লালা মিশিয়ে গলধঃকরণ করে।

কাঁকড়া বিছের দৃষ্টিশক্তি অতি ক্ষীণ, অথচ এরা নিশাচর। এদের গায়ে যে সব রোঁয়া বা লোম আছে, সেগুলি অনুভব করার কাজে সাংকেতিক ইন্দ্রিয়র কাজ করে। এই লোমগুলি চতুর্দিকে মুখ করে থাকায় কাঁকড়া বিছের চলাচলের প্রধান সহায়ক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

পুরুষ এবং স্ত্রীর কাঁকড়া বিছের শারীরিক গঠনে প্রধানতঃ কোন তারতম্য বা বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য নেই যা থেকে দেখামাত্র সহজেই এদের প্রভেদ বোঝা যায়। সাপ, বড় গিরগিটি বা ঐ ধরণের সরীসৃপদের ক্ষেত্রে ঐ একই ভাব দেখা যায়। কাঁকড়া বিছের বাচ্চা ডিম ফুটে বার হয় এবং একবারে এদের প্রায় এক কুড়ি বাচ্চা হয়।

আপন জন

শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত

নাম না-জানা বুলবুলিটা
নাম না-জানা গাছে
শিস্ দিত' সে নাম না-জানা
ফুল যেখানে আছে।
নাম না-জানা পাহাড় চূড়ো
নাম না-জানা দিঘি
অরুণ ছটায় ছড়িয়ে পড়ে
সোনার ঝিকিমিকি।
দিশেহারা আকাশটাতে
নাল না-জানা তারা
খিল্‌খিলিয়ে উঠছে হেসে
আকুল পাগল-পারা।
অবাক হয়ে ভাবছে খোকন
পুলক-ভরা মন
এরাই আমার মা, বাবা, ভাই
এরাই আপন জন।

কুনো ব্যাঙের দৃষ্টি

শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়

দুই দিকে দুই শহর। মধ্যিখানে একটা পাহাড়। দুই শহরে বাস করে দুই বন্ধু। কুনো ব্যাঙ তারা। তাদের সখ হলো দু'জনে দু'জনের বাড়ীতে বেড়াতে যাবে আর ভাল করে দেখবে দু'জনে দু'জনের শহর দুটোকে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। একদিন তারা দু'জনে থপাস থপাস করতে করতে পাহাড়ের দিকে আগুয়ান হোলো। কারণ এই পথেই শহরে যাওয়া যাবে অতি সহজে।

চলতে চলতে একসময় তারা দু'জনেই সেই পাহাড়ের মাথার উপর এসে উঠলো। পাহাড় উঁচু জায়গা। সেখান হতে শহরকে খুব ভাল ভাবেই দেখতে পাওয়া যাবে।

'বন্ধু এসেছো?'

'হ্যাঁ ভাই, এলাম।'

'ভালই হলো তা'হলে আর শহরে যাবার প্রয়োজন নেই; এই পাহাড়ের ওপর থেকে এসো দু'জনে শহর দেখার কাজ সেরেনি, কেমন?'

'তা মন্দকি আর হাঁটতেও পারি না।'

'তবে এসো দু'জনে ওই ঢিপিটার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে উঁচু হোয়ে শহর দেখার কাজ সারি।'

'সেই ভালো, এসো তাই-ই করি।'

এই না বলে দুই কুনো ব্যাঙ পাহাড়ের ওপরের একটা ঢিবিতে উঠে দাঁড়ালো আর দু'জনে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে দু'দিকে তাকালো আর সঙ্গে অবাক হোয়ে গেল! অবাক্ হয়ে একজন আর একজনকে তার বিস্ময়ের কথা জানালো।

'তোমাদের শহরটা ঠিক আমাদের শহরের মতই দেখতে, কি আশ্চর্য!'

'হ্যাঁ, তোমাদেরটাও ঠিক আমাদের মতই যে, আশ্চর্য তো?'

'বাড়ীগুলো ঠিক আমাদের মতই সোনার মত ঝকেঝকে-তকৃতকে, গাছগুলো ঠিক আমাদের শহরের মতই সবুজ, সতেজ আর সুন্দর।

'হ্যাঁ, ঠিক আমাদের শহরের গাছগুলির মতই তোমাদের শহরের গাছগুলো, আশ্চর্য বটে!'

'হ্যা ভাই, তোমাদের শহরের মন্দিরগুলোর চূড়া ঠিক আমাদের শহরের মন্দিরের চূড়ার মতই বটে!'

'তা যা বলেছো—এ তো দুটো শহরই একরম দেখতে হে!'

দু'জনে পাহাড়ের ওপরে একটা ঢিপিতে উঠে দাঁড়ালো।

'তা'হলে আর নূতন কি দেখার আছে তোমাদের শহরে?'

'তোমাদের শহরেও নূতন কিছু নেই দেখার ভাই—চলো এবার বাড়ী ফিরি তা'হলে!'

'তা আর বলতে ভাই!'

এই না বলে দুই বন্ধু দুই দিকে নিজের শহরের দিকে প্রত্যাগমন করছিল। আসলে তারা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যে যার নিজের শহরকেই দেখেছিল। কারণ, কুনো ব্যাঙের দৃষ্টি উঁচু বলে তা তার সামনের জিনিসের পরিবর্তে পিছনের জিনিসই দেখতে পায়। এই রকমই গড়ন তাদের চোখ দুটোর। বিধাতার দান। একে তো আর অস্বীকার করা যায় না। কুনো ব্যাঙরা তা করেও না কোনোদিন—এই দেখার তফাত নিয়ে তারা দিব্যি আরামে আছে।

এক যে

শ্রীঅনিলেন্দু চক্রবর্তী

এক যে ছিল জন্তু—
নাম বলব না কিন্তু।
রক্ত নখ লোমশ হাত
বাঁকা বাঁকা লম্বা দাঁত
খায় হাতী খায় ঘোড়া
মনুষ্য খায় জোড়া জোড়া
শূন্য কাঁদে বাজার হাট
খাঁ খাঁ করে রাজ্যপাট,—
সেই যে এক কিমাকার
কে না জানে নামটা তার।

আর এক যে কিমাকার
নামটি কিন্তু বলব না তার।
গিলে খায় বাজার-হাট
শুষে খায় পল্লী মাঠ।
আলো খায় নিভিয়ে,
বই পুঁথি চিবিয়ে।
কল্‌জে খেতে ঠুকরে
পায় সে কী সুখ রে।
সেই যে আছে কিমাকার
বলতে পারো নামটা তার?

মহাসমুদ্রের যাত্রী রাজকুমার

(আইরিশ উপকথা)

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কয়েক হাজার বছর আগেকার কথা। আয়ার্ল্যাণ্ডের উত্তরে সমুদ্রের ধারে রাজকুমার 'ব্র্যান'-এর রাজপ্রাসাদে সেদিন কি একটা উৎসব ছিল। বাড়ীখানা আগাগোড়া সাজানো হয়েছে ফুলে পতাকায়; মাঝের মস্ত বড়ো হলঘরটার দেয়ালে দেয়ালে সোনালী জরির ঝালর দেওয়া বেগুনী মখমলের পরদা টাঙানো, তার মধ্যে লম্বা লম্বা টেবিল আর বেঞ্চি পেতে রাজ্যের যত প্রাধানেরা বসেছেন রাকুমার ব্র্যান-এর ভোজের আসরে। হাসি, গল্প, গান কিছুরই বিরাম নেই।

সুগন্ধ সাদা ফুল-ভরা একটি ডাল ব্রান-এর দিকে এগিয়ে ধরলেন।

পরিবেশকরা থালায় থালায় রাশি রাশি খাবার আনছে, দেখতে দেখতে উড়ে যাচ্ছে। হাঁকে-ডাকে চারিদিক সরগরম, সবাই আনন্দে মশগুল!

হঠাৎ কোথা থেকে একটা মিষ্টি গানের সুর ভেসে এল। ব্রান প্রথমে শুনলেন সেই সুর তিনি হাত তুলতেই নিমেষে সমস্ত সভা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সকলে চেয়ে দেখল, সভাঘরের প্রধান দরজায় দাঁড়িয়ে এক অপরূপ সুন্দরী বিদেশিনী। তিনি দেবী কি মানবী কেউ বুঝতে পারল না। তাঁর সর্বাঙ্গে ঝলমল করছিল যে বহুমূল্য বসন-ভূষণ সে রকম পোশাক বা গহনা সে দেশে কেউ কখনও দেখেনি। তিনি গান গাইতে গাইতে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন সুগন্ধ সাদা ফুলে-ভরা একটি ডাল তিনি হাতে করে এনেছিলেন, সেটি ব্রান-এর হাতে দিয়ে তিনি হাসলেন। তখনও তাঁর গান শেষ হয়নি। তিনি গাইছিলেন, পশ্চিম দিগন্তের ওপারে মহাসমুদ্রের মধ্যে একটি আশ্চর্য দ্বীপের কথা; সেখানে কেবলই আনন্দ—জরা নেই, মৃত্যু

নেই, দুঃখ নেই। শ্রোতারা তন্ময় হয়ে শুনতে শুনতে হঠাৎ দেখল গায়িকা কখন অন্তর্ধান করেছেন। তিনি কে, কোথা থেকে এলেন, কোথায় গেলেন, কেউ বলতে পারলেন না।

ভোজ শেষ হ'ল, অতিথিরা যে-যায় বাড়ীতে ফিরে গেলেন; ব্র্যান আবার নিজের বাড়ীর কয়েকজন পরিচারকের মধ্যে একা। তাঁর বাবা মা কিছুদিন আগে মারা গেছেন, তিনিই এখন সে রাজ্যের অধীশ্বর। তাঁকে খুশি রাখবার জন্য বাড়ীর লোক শশব্যস্ত। তাঁর কিন্তু মনে শান্তি নেই। কেবলই সেই মেয়েটির মূর্তি তাঁর চোখের সামনে ভাসছে, তাঁর গানের স্বর তাঁকে উন্মনা করে তুলেছে। বসতে, শুতে, খেতে তাঁর আর অন্য চিন্তা নেই।

একদিন মাঠের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল সেই অপূর্ব সংগীত যেন তাঁকে অনুসরণ করে আসছে। তিনি দাঁড়ালেন, চারিদিকে চাইলেন, কোথাও কাউকে দেখতে পেলেন না। একটা ছোটো টিলার উপর উঠে তখন সমুদ্রের ওপারে দিগন্তে দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। ক্রমে ক্লান্তি এল, টিলার উপর মাটিতে শুয়েই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের মধ্যে ব্র্যান স্বপ্ন দেখলেন, সেই বিদেশিনী রাজকন্যা যেন তাঁকে বলছেন, "ওঠো, সমুদ্রযাত্রার জন্য তৈরী হও। আমি যে আশ্চর্য দ্বীপের কথা তোমাকে গান গেয়ে শুনিয়েছি, সমুদ্র পার হয়ে সেখানে আসতে হবে, আর দেরি কোরো না।" ব্র্যান ধড়মড় করে উঠে বসলেন। বুঝলেন স্বপ্নে দেখা সেই মেয়েটির ডাক তাঁকে শুনতেই হবে, দিগন্তের ওপারে সেই আশ্চর্য দ্বীপের সন্ধান না করে তাঁর উপায় নেই।

তখনই তোড়জোড় আরম্ভ হ'ল। তাঁর তিনটি ছোটো বৈমাত্রেয় ভাই ছিল, তারা তাঁর সঙ্গী হতে চাইল। তাদের প্রত্যেকের অধীনে ন'জন ক'রে মোট সাতাশ জন সুদক্ষ নাবিক নেওয়া হ'ল জাহাজে। তখনকার পালের জাহাজ ছিল বড়ো নৌকার মতো, তা'তে সারি দিয়ে বসে দাঁড় টানত কতকগুলি লোক; কেউ-বা পাল টাঙাবার, ঘোরাবার এবং নামাবার কাজ করত, কেউ-বা হাল ধরে থাকত। জাহাজে ঐ মোট একত্রিশ জন যাত্রীর কয়েক মাসে যতটা খাবার জল দরকার হতে পারে তা ভরে নেওয়া হ'ল। তারপর দেবতাদের নামে জয়ধ্বনি করে যাত্রীর দল ভেসে পড়ল অকূল সমুদ্রে।

দু'দিন দু'রাত কেবলই ঢেউ-এর সঙ্গে যুদ্ধ আর জলজন্তুদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে যখন সবাই হতাশ হয়ে পড়েছে, এমন সময় এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল তাদের। সমুদ্রের জলের উপর দিয়ে তেজী দু'টো সাদা ঘোড়ায় টানা একটা সোনার রথ ছুটে আসছে, তার মধ্যে বসে আছেন রাজোচিত মহিমায় এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। রথ এসে ব্র্যান-এর জাহাজের পাশেই দাঁড়াল, রথের আরোহী ব্র্যানকে ডেকে বললেন, "আমি সমুদ্রের দেবতা 'মানান্নান'; তোমাদের দেশে আমার রাণী খুঁজতে যাচ্ছি। আমার একটি ছেলে হবে,

তার নাম হবে 'মঙ্গান'। সে হবে মহাবীর এবং মহাজ্ঞানী, দেবতা এবং মানুষ সকলের প্রিয় হবে আমার সেই ছেলে।"

ব্র্যান সমুদ্র-দেবতা 'মানান্নান'কে দূর থেকে প্রণাম জানালেন, তারপর তাকে সেই আশ্চর্য দ্বীপের পথের সন্ধান দিতে বললেন। মানান্নান বললেন, "সে তো অমরাবতী, সেখানে জরামৃত্যু নেই। তোমরা ঠিক পথেই চলেছ, এগিয়ে যাও। ভয় নেই, আর অল্প দূর গেলেই সেই দ্বীপ দেখতে পাবে।"

দেবতার রথ চলে গেল আয়ার্ল্যাণ্ডের দিকে, তাঁর দয়ায় সমুদ্র শান্ত হ'ল, সগম হ'ল। আর কয়েকদিন পরেই সমুদ্রের বুকে দেখা দিল একটি সাদা ফুলের বাগানে ভরা ছবির মতো সুন্দর দ্বীপ, যেন নীলজলের মধ্যে এক গাছি সাদা ফুলের মালা ভাসছে। জাহাজ দ্বীপের কাছাকাছি আসতেই ব্র্যান গানের স্বর শুনতে পেলেন, তাঁর সেই চেনা স্বর আর সেই বিদেশিনী রাজকন্যাকে দেখতে পেলেন। তিনি সেই রাজ্যের রাণী, একদল পরমাসুন্দরী সখীকে সাঙ্গ নিয়ে তিনি যেন দাঁড়িয়েছিলেন সমুদ্রের ধারে তাঁদেরই অপেক্ষায়। ব্র্যানকে দেখে তিনি এগিয়ে এলেন। তাঁর হাতে ছিল একটা শক্ত সুতোর গোলা, তিনি তার একটা মাথায় পাথর বেঁধে ছুঁড়ে দিলেন ব্র্যানদের জাহাজে আর একটা মাথা নিজের হাতে আস্তে আস্তে জড়িয়ে জাহাজ টাকে টেনে আনলেন তীরের পাশে। সবাই যখন নিরাপদে ডাঙায় উঠলেন, তখন সেই অমরী রাণী তাঁদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন পাহাড়ের চূড়োয় তাঁর অপূর্ব রাজপুরীতে। সেখানে দিনরাত চলল আনন্দোৎসব। রাণী নিজে বরণ করলেন রাজকুমার ব্র্যানকে, তাঁর সঙ্গীরা প্রত্যেকে যে-যার মনের মতো অমরী স্ত্রী নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগল। রোগ নেই, জরা নেই, হিংসা নেই, চিরবসন্তের রাজ্যে যেন সবাই এক একজন রাজা। রূপে, রসে, গন্ধে, সুরে সবাই উন্মাদ, কোথা দিয়ে দিন গেল, বছর গেল কেউ জানতে পারল না।

এত সুখ কিন্তু সকলের সইল না। একদিন ব্র্যানদের একজন সঙ্গী এসে তাঁকে বলল, "কুমার, দেশের কথা কি একেবারে ভুলে গেলে? তোমার না হয় সেখানে কেউ নেই, আমাদের তো স্ত্রী-পুত্র আছে। আমরা এতদিন নিষ্ঠুরের মতো তাদের ভুলে আছি, তারা হয়তে আমাদের জন্য কেঁদে সারা হচ্ছে। বসন্ত দেখে দেখে অরুচি ধরেছে, শীতের পাতা-ঝরা, বরফ-পড়া দেখবার জন্য প্রাণ অস্থির হয়েছে। আমাদের পিতৃপুরুষের দেশ ছেড়ে এসেছিলু তোমার কথায়, এখন তোমার কর্তব্য আমাদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।" ক্রমে অনেকেই জানাল, দেশের জন্য তাদেরও মন কাঁদছে।

ব্র্যান কি করবেন? রাণীকে গিয়ে বললেন সঙ্গীদের কথা, বিদায় চাইলেন। অমরী রা চোখের জল ফেললেন না, তবে তাঁর মনে যে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে তা তাঁর মুখ দেখে বুঝলে

রাজকুমার। তিনি বললেন, "বুঝতে পারছি, তোমার না গিয়ে উপায় নেই। তবে আমার একটা কথা মনে রেখো। আয়ার্ল্যাণ্ডে গিয়ে তোমরা কেউ ডাঙায় নেমো না। দ্বীপের চারপাশে জাহাজে করে ঘুরবে। দেশের সমস্ত দৃশ্যই দেখতে পাবে, দেশের লোকের সঙ্গে ইচ্ছে করলে কথাও বলতে পারবে, কিন্তু নামলেই বিপদ হবে।" ব্র্যান তাঁর কথা মনে রাখবেন ব'লে জাহাজ ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হলেন সঙ্গীদের নিয়ে। রাণী সখীদের নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তীরে।

কত বছর কেটে গেছে, জাহাজে একটু ধূলো পড়েনি, একটি কুটো নড়েনি। ব্র্যান তঁরে দলবল নিয়ে জাহাজে উঠলেন, আবার জাহাজ পাল তুলে যাত্রা করল আয়ার্ল্যাণ্ডের অভিমুখে। সমুদ্রের ঢেউ-এর দোলায় দুলতে দুলতে কয়েক দিন গিয়েই তাঁরা একটা দ্বীপ দেখতে পেলেন। সেখানে দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ সমুদ্রের ধারে পাগলের মতো নাচছে-গাইছে। কি ব্যাপার দেখবার জন্য ব্র্যান তাঁর এক বৈমাত্রের ভাইকে তীরে নামিয়ে দিলেন। সেই যে সে গেল আর ফিরল না। সেই দ্বীপে সেই নাচের দলে জুটে সেও পাগলের মতো নেচে-গেয়ে দিন কাটাতে লাগল। ব্র্যান জাহাজ থেকে তাকে অনেক ডাকাডাকি করলেন, শেষে হতাশ হয়ে তাকে ফেলে রেখেই আবার যাত্রা করলেন দেশের দিকে, জাহাজে পাল তুলে।

কিছুদিন পরে শীতের কুয়াশায় ঢাকা আয়ার্ল্যাণ্ডের উপকূল চোখে পড়ল তাঁদের। উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের যে অঞ্চলে ব্র্যান বাস করতেন ক্রমে সেই দিকে নিয়ে যাওয়া হ'ল জাহাজ। দেখা গেল সমুদ্রতীরে খুব লোকের ভিড়। প্রিয়জন ও পরিচিতদের সঙ্গে আবার মিলিত হবার আশায় জাহাজের নাবিকেরা তখন সবাই উৎফুল্ল হয়ে উঠল, চীৎকার ক'রে জানাল, "তোমাদের রাজকুমার ব্র্যান তাঁর ভাই এবং সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে এসেছেন। আমাদের চেনা লোক কে আছে?"

ডাঙা থেকে তার উত্তরে শোনা গেল, "ব্র্যান ব'লে কাউকে আমরা জানি না, তিনি আবার কে?" একজন বলল, "দিদিমার মুখে গল্প শুনেছিলুম বটে, তাঁর দিদিমা বুড়োদের মুখে সেকালে শুনেছিলেন, ব্র্যান ব'লে এক রাজপুত্র সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়ে আর ফেরেন নি। সে কি আজকের কথা, সে তো কয়েক শ' বছর হয়ে গেল! তিনি কবে সমুদ্রের মধ্যে ডুবে গেছেন হয়তো! তোমরা কি আমাদের ছলনা করতে এসেছ তাঁর নাম ক'রে?" জাহাজের লোকেরা অনেক বোঝল, ডাঙার লোকেরা বলল, "আমরা ধাপ্পায় ভুলছি না।"

ব্র্যান বুঝলেন, লোকে তাঁদের ভুলে গেছে, কেউ তাদের কথা বিশ্বাস করবে না। তাঁদের তো বয়স বাড়েনি, চেহারা বদলায় নি, কিন্তু দেশের চেহারা যেন বদলে গেছে, লোকের সাজসজ্জা বদলে গেছে। গ্রাম শহর হয়েছে, শহর জঙ্গল হয়েছে। তাঁর প্রজারা কেউ বেঁচে নেই, এ কোথায়

এলেন তাঁরা ? অগত্যা তিনি আবার জাহাজ ফেরাতে বললেন সেই অমরী রাণীর দ্বীপে ফিরে যাবার জন্য। কেবল তাঁর এক বৈমাত্রেয় ভাই তাঁর কথা না শুনে ডাঙায় ওঠবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সাঁতার কাটতে আরম্ভ করল। তীরের লোক কৌতূহলবশে ছুটে এল, সে ডাঙায় উঠতেই কয়েকজন গিয়ে তাকে সাহায্য করবার জন্য তার হাত ধরল। সঙ্গে সঙ্গে তার অসাড় দেহটা ধড়াস করে শুয়ে পড়ল মাটিতে। সবাই অবাক হয়ে দেখল বহু বৎসর পূর্বে-মৃত একটা মানুষের গলিত শব পড়ে আছে তাদের সামনে ! কে বলবে সেই মানুষটা একটু আগে সাঁতার কাটছিল ?

ব্র্যানের জাহাজ তখন দূরে সমুদ্রের বুকে মিলিয়ে যাচ্ছে। তিনি জাহাজের পাটাতনে দাঁড়িয়ে তখনও। স্বদেশের দিকে তাকিয়ে আছেন, কিন্তু তিনি তখন সেই অমরী রাণীর শেখানো আশ্চর্য দ্বীপের বর্ণনা দেওয়া গানটা গাইছেন ! দূর থেকে তার প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল তখনও। জনতার মধ্যে কয়েকজন লেখক সঙ্গে সঙ্গে সেই গানটি লিখে রাখল। 'ওযান' নামে আয়ার্ল্যাণ্ডের পুরাকথা সংগ্রহের যে বই আছে, রাজকুমার ব্র্যানের কাহিনী এবং তাঁর সেই আশ্চর্য দ্বীপের বর্ণনা তাতে স্থান পেল। আজও আয়ার্ল্যাণ্ডের পুরাকথায় সমুদ্রের যাত্রী রাজকুমার ব্র্যান স্মরণীয় হয়ে আছেন—কয়েক শ' বছর পরে মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়ে যিনি আবার অকূল সমুদ্রেই মিলিয়ে গেছলেন।

কোথায় আছ তুমি ?

শ্রীগণেশচন্দ্র চক্রবর্তী

বাংলা মায়ের দামাল ছেলে তুমি মহাপ্রাণ ;
বিশ্ব-ভুবন শ্রদ্ধাভরে অর্ঘ্য করে দান।
দীপ্ত তুমি, মুক্ত তুমি, তুমি স্বাধীনচেতা,
উদার তুমি, মহান্ তুমি, তুমি সবার নেতা।
দেশের তরে কারাবরণ করলে বারংবার—
কোন বাধা মানলেনাকো, ভাঙলে কারাগার।
বৃটীশ তোমায় আটক রাখে—পুলিশ প্রহরায় ;
অলক্ষ্যেতে উধাও হলে—ভোজবাজিরই প্রায় !
শিকল মায়ের খুলবে বলে, ধরলে যোদ্ধৃবেশ,—
ফিরলে না আর মায়ের কোলে,—হলে নিরুদ্দেশ।
কেউ বা বলে আছ তুমি, কেউ বা বলে নাই !
তোমার ধ্যানের বিশাল ভারত দ্বিখণ্ডিত তাই।
সব-ই আছে, সবাই আছে, মুক্ত ভারত-ভূমি।
এমন দিনে প্রশ্ন শুধু—"কোথায় আছ তুমি ?"

কালির কথা

শ্রীঅতসি সেন

অদৃশ্য কালি কি ভুতুড়ে লেখার ম্যাজিক নিশ্চয়ই তোমরা সকলেই দেখেছ। দেখিয়েও থাকবে কেউ কেউ। আগুনের তাপে সাদা কাগজের গায়ে লেখা ফুটে ওঠাটা আজকে নতুন নয়, বহুকাল থেকেই এর চলন হয়ে আসছে। আজকাল হয়ত তোমরা লেখ পেঁয়াজের রস দিয়ে, আগের দিনে পাতিলেবুর রসটারই প্রচলন ছিল বেশী। তফাত শুধু পেঁয়াজের রস দিয়ে লিখলে লেখাটা বেশ লালচে হয়ে ফোটে, আবার লেবুর রসে হয়ে যায় বাদামী।

এই অদৃশ্য কালি, যা দিয়ে আজ তোমরা ম্যাজিক দেখাও, এর সৃষ্টি কিন্তু গোপনীয় চিঠিপত্র আর সংবাদ আদান-প্রদানের জন্যেই। শুধু এযুগে নয়, প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগেও প্লিনি বলে এক পণ্ডিত, দুধের সঙ্গে একজাতের গাছের রস মিশিয়ে তৈরী এর রকম এক গোপন কালির কথা বলে গেছেন। ইংরাজেরা যাকে বলত সিপাহী-বিদ্রোহ, ভারতের সেই প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে এরকম অদৃশ্য কালির বহুল প্রচলন ছিল। সে কিন্তু অন্য ধরনের কালি। লেখা হ'ত চালের জল দিয়ে। শুকিয়ে গেলে আর বোঝাই যেত না, পরে পড়বার সময় 'আইওডিন'-এর ভাপে লেখাটাকে ভাপিয়ে নিতে হ'ত। ভাপ লাগলেই অক্ষরগুলো নীলচে হ'য়ে পড়া যেত। এছাড়া আজকাল অনেক রাসায়নিক দ্রব্যাদি দিয়েও নানান্ রকমের নতুন সব অদৃশ্য কালি তৈরী করা হচ্ছে। তার কিছু কিছু শিশি করে বিক্রীও হয়। ওই যে লটারীওলা সাদা কাগজ হাঁড়িতে ভিজিয়ে লেখা ফোটায়, সেও ওই জাতেরই। কোবাল্ট এক ধরনের ধাতুবিশেষ, তার থেকে এমন এক গোলাপী কালি তৈরী করা যায়, তাপে যা নীলচে সবুজ হয় আবার ঠাণ্ডা হলেই পূর্বের রঙ ফিরে পায়। গোলাপী কাগজে ম্যাজিকের মজা ভালই ফোটে।

কালির আবিষ্কার আজকের নয়। 'কালি, কলম, মন, লেখে তিনজন'। তাই লেখার জন্যে কালি ও কলম, দুই-ই মানুষকে তৈরী করে নিতে হয়েছে, সেই সঙ্গে কাগজও। পাঁচ হাজার বছর আগেও ইজিপ্ট আর চীনদেশের লোকেরাও কালির ব্যবহার জানত। ঠিক কি ধরনের কালি দিয়ে যে তারা লিখিত, তা আর আজ সঠিক করে বলা যায় না। তবে মনে হয় কাঠকয়লার গুঁড়ো কি ভূষোকালি আর আঠাই ছিল সেদিনের সাজ-সরঞ্জাম। তবে যাই হোক না কেন, তার কৃষ্ণত্ব আর ঔজ্জ্বল্য সম্বন্ধে কিন্তু কোন সন্দেহের কারণ নেই। প্রাচীন পুঁথিগুলিই তার জাজ্বল্য প্রমাণ। তবে একটা অসুবিধা এগুলি চট করে জমে যায় আর তাই আজকালকার ঝর্ণাকলমগুলিতে ব্যবহার করা একেবারেই অসম্ভব।

পুরাকালে জন্তুজানোয়ারের চামড়া শুকিয়েও মানুষ লেখার কাগজ করেছে। মিশর দেশে সেদিন লেখার কাগজ ছিল 'প্যাপিরাস' বলে এক জাতের নল-খাগড়া, অনেকটা আমাদের তালপাতার পুঁথির মত। তবে তারা শুধু কালো ভুষো কালি দিয়েই লিখত না, তাতে নানান্ রঙবেরঙও ফোটাত। লালকালি হ'ত এক জাতের রাঙা মাটি, অনেকটা আজকের 'জলরঙ'-এর মত বলা চলে। সেগুলিকে তারা গঁদের আঠা দিয়ে গুলে নিত।

'কাটল ফিস' বলে এক জাতের মাছেদের পেটের নীচের থলিতে এক রকমের ঘন বাদামী রঙের রস থাকে। হঠাৎ কোন শত্রু আক্রমণ করলে থলি থেকে রস ছিটিয়ে, সেই অন্ধকারের আড়ালে লুকিয়ে পালায়। প্রাচীনকালে রোমানরা এই মাছ ধরে তার রসটাকেই কালি হিসাবে ব্যবহার করত। একে বলা হ'ত 'সিপিয়া'। বর্তমানেও এর প্রচলন লোপ পায়নি, তবে আজ আর লেখার জন্যে ব্যবহৃত হয় না, হয় ফোটোগ্রাফ রঙ করার জন্যে। কেউই আর কষ্ট করে মাছ ধরতে যায় না, ওয়াল নাটের রস থেকেই এই রঙ তৈরী করে নেয়।

'গল মাছি' বলে এক জাতের ছোট ছোট পোকা, গাছের নরম লতা ফুটো করে ডিম পাড়ে। গাছটাও অমনি তাড়াতাড়ি তার ক্ষত সারাতে নতুন ছাল-চামড়া দিয়ে সেটা ঢেকে দেয়। এমনি করেই এক-একটা প্রায় ইঞ্চিখানেক আবের মতন গজিয়ে ওঠে। এই 'গল' বা আবের ভেতর 'ট্যানিন' বলে এক জাতের রঙ থাকে যেটা এক ধরনের কালির প্রধান উপাদান। একাদশ শতাব্দী থেকেই এই কালির চলন দেখা যায়, তারপর বহুদিন পর্যন্ত ভাল কালি বলতে এটাকেই বোঝাত।

রাসায়নিক কালি আবিষ্কারের আগে অবধি সবই ছিল প্রাকৃতিক রঙ। ভিনিগার-এ গোলা ব্রাজিলের কাঠ কিংবা অ্যামোনিয়ায় গোলা 'কোচিনীল' বলে এক জাতের লঙ্কাকীটের শুকনো দানা থেকেই সেদিন লাল রঙ তৈরী হ'ত। হলদে রঙ হ'ত পারস্যের এক জাতের ফল বা 'গাম্বোজ' বলে এক জাতের রঙ থেকে। বেগুনী রঙ হ'ত নীল গাছ আর কোচিনীল মিশিয়ে। 'প্রাশিয়ান ব্লু' বলে জলজলে নীল রঙটা তো অদ্যাবধি ব্যবহৃত হয়।

আজকাল 'গল মাছি'র সঙ্গে অ্যানিলিন রঙ আর হীরাকষও (ফেরাস সালফেট) মেশানো হয়। এতে লেখাটা প্রথমে নীল রঙ-এর হলেও, বাতাসে বা আলোয় রঙটা মোটেও অস্পষ্ট বা নষ্ট হয়ে যায় না বরং আরও উজ্জ্বল আর কালচে হতে থাকে। এটাকেই বলা হয় ব্লু-ব্ল্যাক কালি।

ঝর্ণাকলমের অর্থাৎ ফাউন্টেন পেনের কালিগুলি সাধারণতঃ কালো 'অ্যানিলিন রঙ' আর 'নিগ্রোসিন' মিশিয়ে তৈরী। এগুলি 'ব্লু-ব্ল্যাক কালি'র মত স্থায়ী না হলেও, এগুলির বিশেষত্ব এরা কখনও জমে না বা তলানিও পড়ে না। বাধাহীন ভাবে এবং সরল প্রবাহে হইতে থাকে। রঙগুলি গ্লিসারিনে গোলা থাকায় সহজে বাষ্পীভূত হয় না।

'চাইনিজ ইঙ্ক' নামক বিশ্ববিখ্যাত কালিটার আবিষ্কার হয়েছিল চীন দেশে প্রায় হাজার দুয়েক বছর আগে। এগুলো তিলতেলের ভুষো আর গাধা কি ষাঁড়ের চামড়ার আঠা মিশিয়ে তৈরী হ'ত। এমন চিরস্থায়ী রঙ আর হয়নি বল্লেই চলে। আজকাল অবশ্য এগুলোও রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেই তৈরী হয়ে থাকে।

'ইণ্ডিয়ান ইঙ্ক' যা দিয়ে শিল্পী বা নকসাকারেরা ছবি আঁকে। সেটিও ইজিপ্টে প্রচলিত ভুষোকালিরই রূপান্তর। শুধু রঙগুলিকে গালা, সোহাগা আর অ্যামোনিয়া মিশিয়ে জল-নিরোধক করে নেওয়া হয়।

ধোপার বাড়ির চিহ্ন কি ড্রাই ক্লিনিং-এর নম্বর যেগুলো জামাকাপড়ে দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলো 'সিলভার নাইট্রেট' বলে এক জাতের রাসায়নিক পদার্থ জল আর অ্যামোনিয়ায় গুলে লেখা। জামাকাপড় ছিঁড়ে যায় তবু দাগ ওঠে না, এতই জোরাল! আগে কিন্তু ইজিপ্টে এসব কাজেও গাছের রস ব্যবহৃতহ'ত। কাজুবাদাম থেকেও এক ধরনের 'মার্কা-মারা কালি' তৈরী হ'ত।

কপিং কালি, যাকে কপিং পেনসিল বলা হয়, তাতে জল কম, রঙ বেশী দিয়ে কঠিন করা হয়। এছাড়া আঠা কি গ্লিসারিনও মিশোতে হয়। পেন্সিলের মত লেখা ফুটলেও জলে ভিজলেই সেটা কালি কালি হয়ে ওঠে।

আজকাল আবার ঝর্ণাকলমের চেয়ে 'ডট্ পেন' বা 'বল পয়েণ্ট পেন'-এর চাহিদা বেশী। এমন গাঢ় কালিও তৈরী হচ্ছে যা পাতলা কালিগুলোর মত মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে না। অল্পেতেই লেখা হয়, কালিও ফুরোয় কম। এ জাতের কালিতে রঙের ভাগ অনেক বেশী থাকে, যাতে লেখাটা সরুও হয় আর ধেবড়েও যায় না। এসব শুকনো আর চটচটে কালি তৈরী করতে গোলা রঙের সঙ্গে কিছু ঘন করার মশলাও মিশিয়ে দিতে হয়।

ষ্ট্যাম্প প্যাড, অর্থাৎ যাতে রবার ষ্ট্যাম্প ছাপা হয়, তার কালি আবার ভিজে-ভিজে হওয়া চাই যাতে সেগুলো চট করে না শুকোয় আর কাগজের মধ্যেও শুষে যেতে পারে। এতেও গ্লিসারিন দেওয়া থাকে। এক সময় টাইপরাইটারের ফিতেও গ্লিসারিন গোলা ভুষো কি অ্যানিলিন রঙ দিয়েই তৈরী হ'ত। আজকাল কিন্তু সেগুলো ছাপাখানার কালির মতই মোম-তেল গুলে আঠালো করা হয়। কার্বন পেপার যা দিয়ে কপি করা হয়, সে কাগজগুলোতেও এই একই মশলা মাখানো হয়। ছাপাখানার কালি যা দিয়ে বই ছাপা হয়, সেগুলোও চটচটে আঠালা কালি, অনেকটা তেলরঙও বলা যেতে পারে।

বিজ্ঞাপন ছাপার জগতে তো যুগান্তর এসেছে বললেও বেশী বলা হয় না। কালির সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধ সৌরভেরও প্রবেশ ঘটেছে সেখানে। তাছাড়া ঝকমকে, উজ্জ্বল, রঙ্গীন লেখাগুলি তো আজ দেয়ালে দেয়ালে। এক্ষেত্রে ফ্লুরোসেণ্ট রঙটিকে রঞ্জন প্ল্যাষ্টিকে গুলে তেলের সঙ্গে মেশানো হয়। তাই লেখার ওপর আলো পড়লেই তা প্রতিফলিত হয়ে জলজল করে ওঠে। মোটর গাড়ীর বাম্পারে পেছন থেকে হেডলাইটের আলো পড়লেই যে নিশানাটি অন্ধকারের মধ্যে ঝলসে ওঠে সেটিও এই জাতের।

কালের গতিতে কালির স্রোতের চলমান জীবন অবশ্য আজও শেষ হয়নি। নবরূপে, নবরঙে বয়েই চলেছে বৈচিত্র্যের ঘাটে ঘাটে।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

রাজা হাতের চেটোয় তালি দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, "গোল্, গোল্!"

যাত্রী অবাক হয়ে বলে, "কি হ'ল ?"

রাজা বলে, "গোল হ'ল ! আমি শহরে ম্যাচ খেলা দেখে এসেছি। তাক করে বল মেরে দুটো খুঁটোর মধ্যে ঢোকাতে পারলে, সবাই গোল গোল বলে চেঁচায়। আমার মনের মধ্যেও খুঁটি পোতা ছিল। তার মধ্যে আপনার জবাব ঢুকে পড়েছে।"

যাত্রি বলে, "গোল না হয় হ'ল, কিন্তু এখনো ঠিক গোল কাটল না।—তুমি কলের কথা বল।"

রাজা বলে, "পেছনের কথা না বল্‌লে গোল থেকে যেত। এখন শুনুন: আমার গলা দেখছেন ? তার ওপরে মুখ, তার ওপরে চোখ। তাদের ভারী গলাগলি। চোখ খাবার দেখে মুখকে বলে, তখন মুখ জিভ বাড়িয়ে খাবার আনে। দাঁত তা চিবোয়। তারপর গলা তা কোঁৎ করে গিলে পেটে নিয়ে যায়।"

যাত্রী বলে, "বাঃ ! কিন্তু এ দল থেকে নাক, কান, হাত, পা বাদ গেল কেন ?"

রাজা বলে, "কেউ বাদ যায়নি, সবাই আছে। আমি খালি অন্দরের কথা বলেছি, সদরের কথা বলিনি। এখন কি করে কল বানাব তা দেখাই।"

সে গাঁঠরি থেকে একটা সরু লম্বা খুন্তি বের করে। বলে, "এ তো বাড়ী নয়, রেলগাড়ী ;

এখানে যন্ত্রপাতি নেই, যে জারিজুরি দেখাই। যা আছে তা দিয়েই বোঝাই। এখন ধরে নেন এই খুন্তিই লোহালক্কড়, তার, আর যন্তর। খুন্তির জিভ বাঁকিয়ে দি। যেখানে থাকবে মোণ্ডা মেঠাই মুখের খানিকটা আগে। খুন্তির ডাঁট থাকবে গলার সঙ্গে আট্‌কান। তার ফল কি হবে বুঝতে পেরেছেন ?"

যাত্রী মুখ টিপে বলে, "না তো !"

রাজা হে হে করে বিজ্ঞের মত বলে, "আপনি 'আবোল তাবোল' বই পড়েন নি বুঝি। তাই জানেন না। আমি পড়েছি। অনেক মজার কবিতা তাতে আছে। জিভ-ঝরান আবার খাবার মুখের সামনে রাখব—কায়দা করে নাগালের বাইরে। তখন লোভী জিভ তা টিপের মধ্যে পাবার জন্য পাকে বলবে হেট্ হেট্। কিন্তু গলার খানিক আগে আটকান খাবারের সঙ্গে গোল্লাছুট্ খেলায় আঁট্‌তে পারবে কেন ? কোনও ফয়দা না হোক, ছুটে স্থলে পৌছতে মোটেও লেঠা হবে না। ও বই পড়ে এ কল বানিয়েছি।"

সে খুন্তি মুখের সামনে ধরে হাতে-কলমে দেখাতে যায়। কিন্তু কেলেঙ্কারি দেখা দিল। হঠাৎ ঝাঁকনীতে চলতি ট্রেনে গলতি হয়। আর তাতে খুন্তির ডাঁট রাজার মুখের মধ্যে ঢুকে গেল। আর রাজার গলায় শুরু হ'ল ওয়াক ওয়াক !

যাত্রী তো অবাক। তখন সে আর মহারাজা তার মাথায় ফুঁ দিল। তারপর অনেক ফুঁক-তাকের পর রাজা হাঁফ ছাড়ে। তবু জাঁক করে বলে, "দেখলেন ? এমন কল বানাব।"

যাত্রী বলে, "দেখলেম। ভারী রগুড়ে কল !"

রাজা বলে, "দেখে সবার চোখ ছানাবড়া হবে।" তারপর আরও বাহাদুরী করে বলে, "শুধু কি এই ! আরও কি বানাব জানেন ?"

যাত্রী বলে, "না তো।"

রাজা জানায়, "তার নাম হ'ল গিয়ে ঘুরপাক কল। তাতে সবার মাথা ঘুরবে বোঁ বোঁ করে।"

যাত্রী বলে, "ঘানীর মত কল, যা চোখ-বাঁধা কলুর বলদ ঘোরায় ?"

রাজা বলে, "ধ্যেৎ। আমি কি কলুর বলদ ? ঘানী বানাব কেন ? তার বদলে বানাব ঘুরন্ত ঘুরপাক কল। আবার তাকে উড়ো কলও বলা চলবে।—আপনি বাদুড় দেখেছেন ?"

যাত্রী বলে, "হাঁ দেখেছি।"

রাজা বলে, "আর চামচিকে ?"

যাত্রী বলে, "হুঁ।"

রাজা বলে, "তারপর আরশুলা, ডানা-মেলা উই ?"

যাত্রী এবার মুখ টিপে হেসে বলে, তাও দেখেছি।"

রাজা বলে, "ভয় পান না তো? আহ্লাদী আর জল্লাদী ভারী ভয় পায়। ওরা জ্যান্ত মাছ ভয় পায় না। ধরে কোটে; কিন্তু।"

রাজা হঠাৎ ধমক দিয়ে উঠল। যাত্রী চমকে গেল। তারপর সে কাকে ধমক দিল তা খুঁজতে যেয়ে দেখল, আহ্লাদী আর জল্লাদী রাজাকে ভেংচি কাটছে!

রাজা তাদের বলল, "জিভ দেখাচ্ছ কেন? আমি মিছে বলছি নাকি? ঐ যে একদিন— যাক্, জিভ টেনে নাও। বলব না।"

ওরা জিভ টেনে নেয়। আর রাজা বলে, "বেশ। ও সবই তো দেখেছেন। আচ্ছা শহরে ইলেকট্রি (ইলেকট্রিসিটি,—বিদ্যুৎ) দেখেছেন? গাঁয়ের ইলেট্রি দেখেছেন?"

যাত্রী বলে, "তা আবার কি?"

রাজা বলে, "এ মা, তা জানেন না? ঝোপঝাড়, খাল বিল দেখেছেন তো?"

যাত্রী বলে, "তা দেখেছি।"

রাজা বলে, "কিন্তু আন্ধার রাতে তা দেখেন নি। তখন সেখানে মিট্‌মিট্ করে অনেক ইলেকট্রি জ্বলে। আর ভূত ভেবে সবাই ভয় পায়। বলে, কানা ভূতের ছানার চোখ!"

যাত্রী বলে, "তুমি ভয় পাও না?"

রাজা বুক ফুলিয়ে বলে, "উহুঁ। আমি রাজা। শিকার করি, দিগ্বিজয় করি, আমি সব জানি। ওগুলো ভূতই নয়। ওগুলো হ'ল গিয়ে জোনাক। আগুনের মত জ্বলে। কিন্তু তাতে আগুন নেই। এখন শুনুন—এ সব দিয়ে কি করে ঘুরপাক কল বানাব।"

যাত্রী বলল, "বল, আমি কান পেতে আছি।"

রাজা মুখ ঘুরিয়ে বলে, "বাদুড়, চামচিকে, আড়শুলা ধরে ধরে খাঁচায় জমাব। মোটা সুতো, দড়ি আর গঁদের আঠা জোটাব। বাঁশ কেটে বানাব একটা সিংহাসন। তার সঙ্গে ওগুলোকে দড়ি আর সুতো দিয়ে বাঁধব। জোনাক পোকা আঠা দিয়ে আঁটব। শহর থেকে অনেক বেলুন কিনে এনেছি। তাও জুড়ে দোব। তারপর সিংহাসনে বসে সাঁ করে শূন্যে উড়ব। দিনের বেলা গরম তো—তাই রাত্তিরে উড়ব। আর জোনাকীর আলোয় পথ দেখে ঘুরপাক খেয়ে যাব চাঁদের দেশে।"

যাত্রী তারিফ করে বলে, "বাঃ, দিব্যি মাথা তো! কিন্তু যদি রাজা বলে, যে মাথা ঘোরে?"

রাজার মূলোর মতো দাঁত বেরিয়ে আসে। সে গরব করে বলে, "আমার তেমন মাথা নয় জানেন আমি কত ঘুরপাক খেয়েছি?" তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে, দু'হাত ছড়িয়ে সুর করে বলে,—

"আনি মানি জানি না, পরের ছেলে মানি না,
ঘুরি, তবু ঘানি না, টানি তবু আনি না।"

সে চলন্ত ট্রেনে বন্‌বন্‌ করে ঘুরতে থাকে। তারপর টলে পড়ে আহ্লাদী ও জল্লাদীর কোলে। তারা মাটির বেহালা আর ডুগডুগি কোলে করে, রাজার কাণ্ড দেখে হাস্‌ছিল। হঠাৎ কেঁদে উঠল। রাজার জোর ধাক্কা লেগে তাদের বাজনা গাড়ীর মেঝেতে ছিট্‌কে পড়ল,—আর চুরমার! মেলা থেকে কিনে দেওয়া হবে, এই আশ্বাস দিয়ে তাদের থামান গেল। কিন্তু রাজা তার বাহাদুরী থামায় না। বলে, "কেমন কল?"

যাত্রী বলে, "বলার আর কিছু নেই। এখন স্কুলে পড়ে লেখাপড়া শিখে, মাথা চালু করে নেওয়া। তারপর একেবারে সত্যিকারের চাঁদে। কাঁধে করে এত ফাঁদ নিয়ে যাবে সেখানে চাঁদের হাট বসবে—বিজ্ঞানীদের স্পুট্‌নিক আর রকেট হারিয়ে দেবে!"

(ক্রমশঃ)

তেঁতো-ভোজী শশীনাথ

শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্র মজুমদার

মিষ্টি ফেলে তেঁতো কে খায়?
সে আমাদের শশীনাথ রায়।
খুশী হরি বড় নোন্‌তা পেলে,
টক খায় ননী নোন্‌তা ফেলে।
ঝাল খেতে ফণী ভালোবাসে,
লঙ্কা সে খায় প্রতি গ্রাসে।
খাওয়ায় রুচি কী যে কার—
এসব কথা বলাই ভার!

কিন্তু তেঁতো কে খায় বলো?
শশীনাথকে দেখবে চলো।
পল্‌তা-নিম টপাটপ,
যা দেবে খায় গপাগপ।
ভেজে দিলে কথাই নাই,
পাঁচন পেলে গেলেও তাই।
তেঁতো খেয়ে স্বাস্থ্যবান,
রোগ থেকে পায় পরিত্রাণ!

পূর্ব-প্রকাশিতের পর

পরেশ টেবিলে খাবার সাজছিল। বাইরে দেখল একটা কুলি দালানে দাঁড়িয়ে আছে। এই তুই এখানে কি করছিস? জিজ্ঞেস করল পরেশ।

কোন উত্তর দিলে না লোকটা।

"বাবু।" চীৎকার করে ডাকল পরেশ। বাবুরও কোন সাড়া নেই।

'কোন্ হ্যায়।' কোন্ হ্যায়, বলে চীৎকার করে উঠল মিঠু সঙ্গে সঙ্গে।

পরেশ আর দেরি করল না। ঘর থেকে একটা লাঠি নিয়ে এল। বলল, যাও, শীগগির যাও, না হ'লে—

লাঠিটা তুলল সে।

এই মারিস নি, বলে উঠল কুলিটা।

"বাবু!" গলার আওয়াজে চিনতে পারল পরেশ।

টিপ করে অরিন্দমের পায়ের কাছে একটা প্রণাম করল সে।

ওটা কি হ'ল? জিজ্ঞেস করল অরিন্দম।

বাবু আপনাকে একটুও চিনতে পারিনি, তাই লাঠি তুলেছিলাম।

কেমন দেখাচ্ছে বল তো?

খুব খারাপ। অমন সোনার বরণ গায়ের রঙ, তাই বা কাল করলেন কি করে?

ওষুধ মেখেছি একটা।

ছোট ছোট চুল কি করে এত বড়ো হ'ল? সে তোকে একদিন শিখিয়ে দেব, চল এখন খাইগে।

টেবিলে বসে কুলির ছদ্মবেশে অরিন্দম বেশ পেট ভরে খেয়ে নিল।

সিগরেট আনবো বাবু? বলল পরেশ, অরিন্দমের খাওয়া শেষ হ'লে।

সিগারেট কি? কুলি আবার সিগারেট খায় নাকি? কোমর থেকে খৈনি আর চুন বার

'এই মারিস না, বলে উঠল কুলিটা।'

করে হাতের তালুতে দলতে লাগল অরিন্দম। তারপর নীচের ঠোঁটের ফাঁকে সেটা টিপে দিয়ে বাইরে চলে গেল।

মিঠু তখনও চীৎকার করে চলেছে—"কোন্ হ্যায়, কোন্ হ্যায়।"

শুধু শুধু চেঁচিয়ে মরতা হ্যায় কেন? চিনছ না, ও তো বাবু হ্যায়। মিঠুর চীৎকারের জবাব দিলে পরেশ।

অল হোয়াইট সোপ ফ্যাক্টারির মালিক গণপৎ সাউ আজ বিষণ্ণ হয়ে বসে রয়েছে। হরতনের শাসানির কথা সে কোনদিন ভুলবে না। হরতন লোকটা কে, সেটা কেউ জানে না; এমন কি পুলিশও নয়। লতিফ এলাহাবাদের লোক। এখানে অরিন্দম বলে একজনকে ঘায়েল করতে এসেছে। এটা সে তারই কাছে শুনেছে। কিন্তু তার সাবানের ওজন কম এটা ঠিকই ধরেছে। সাবানের বারের মধ্যে সোনা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চালান দেওয়া হয়। তার মধ্যে থেকে গণপৎ কিছু কিছু সরিয়েছে একথা সত্যি। কিন্তু হরতন যে এত তাড়াতাড়ি সেটা ধরতে পারবে এটা গণপতের ধারণার বাইরে ছিল। সে ঠিক করেছিল আর কিছু সোনা সরিয়ে গা-ঢাকা দেবে, কিন্তু এখন সেটা আর সম্ভব হবে না; আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে তাকে।

কে তুই? একটা আধ-বুড়ো লোক দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি কুলির কাজ করি।

এখানে কি?—কোন কাজ নেই, ভাগ! খিঁচিয়ে উঠল গণপৎ সাউ।

কিন্তু কুলিটা নড়ল না। বলল, হুজুর আমায় যে কোন কাজ দিন আমি করতে পারি।

ঘর ঝাঁট দিতে পারিস ? বলল গণপৎ সাউ নোংরা মেঝের দিকে তাকিয়ে।

হ্যাঁ, তাও পারি।

কুলি একটা ঝাড়ু দিয়ে ঘরটা সাফ করতে শুরু করল। অরিন্দম সবই জানে, কিন্তু একাজ তেমন জোরাল নয়। তবুও প্রকাণ্ড শেডটা ঝাড়ু দিয়ে দিল সে। এই সুযোগে সে শেডের অন্দিসন্ধি ভাল করে দেখে নিল। কাজটা শেষ হবার আগে বিল্লু আর সুলতান ঢুকল ঘরের মধ্যে। বিল্লু তাকে দেখে গণপৎকে বলল, এটা আবার কে ?

ও একজন কুলি।

হাটাও এখান থেকে, অনেক কথা আছে।

একটা দশ পয়সা ছুঁড়ে দিল গণপৎ তার দিকে। বলল, যাও।

সেলাম করে বেরিয়ে গেল অরিন্দম আস্তে আস্তে। এখানে যা দেখার দরকার ছিল, অরিন্দম তা দেখে নিয়েছে। লোক দুটোর মধ্যে বিল্লুর চেহারাটা যেন চেনা বলে মনে হ'ল তার।

সেদিন সন্ধ্যায় অরিন্দম ঠিক সময়ে জল-পুলিশের ইনস্পেক্টর কান্তিবাবুর সঙ্গে দেখা করল। সঙ্গে রইল সহকারী সন্তোষ।

ডিঙিটা আবার আজ একটা আঘাটায় দাঁড়িয়েছে। বিল্লু আর সুলতান চীনেবাদামের ঝুড়ি নিয়ে ডিঙিতে ওঠার মুখে দেখল, রাস্তার ধারে আইসক্রীমের ঠেলা নিয়ে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে।

ওটা কোথা থেকে এল ? সন্দেহের চোখে তাকাল বিল্লু। কি মুস্কিল, আইসক্রীম বিক্রী করবে না লোকে ? সুলতান আশ্বাস দিল তাকে।

তাদের দাঁড়াতে দেখে আইসক্রীমওয়ালা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল।

আমার ভাল ঠেকছে না, বলল বিল্লু।

কেন ঝুটমুট ঘাবড়াচ্ছ ? সুলতান তার হাত ধরে টানল। অনিচ্ছার সঙ্গে ডিঙিটাতে উঠল বিল্লু। মাঝি ডিঙি ছেড়ে দিল জাহাজের দিকে।

আইসক্রীমওয়ালা জোর কদমে ইডেন গার্ডেনের দিকে এগিয়ে চলল। অপর দিকে এক পুলিশ-ভ্যান থেকে একজন নেমে তার কাছ থেকে একটা আইসক্রীম কিনল। বলল, কি মেসেজ পাঠাব ?

বলুন, ওরা দুজনেই একটা ডিঙিতে রওনা হয়েছে।

কথাটা বলে আইসক্রীমওয়ালা চলে গেল সোজা রাস্তায়।

পুলিশ-ভ্যান থেকে সঙ্গে সঙ্গে রেডিও-ট্রান্সমিটারে খবর পাঠান হ'ল অরিন্দমকে। জল-পুলিশের লঞ্চে সে অপেক্ষা করছে।

অরিন্দমের সর্বাঙ্গে ভেসলিন, পরনে সুইমিং-কষ্টিউম আর কোমরে রয়েছে একটা ছোরা বাঁধা।

আমি যাই আপনার সঙ্গে। কান্তি ব্যস্ত হয়ে উঠল অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধে।

না, আপনি এখন গেলে মুস্কিল হবে। আমি সংকেত করলে সঙ্গে সঙ্গে যাবেন, দেরি করবেন না। ওদের কাছে নিশ্চয় পিস্তল থাকবে। কথাটা বলে লঞ্চের ওপর থেকে ডাইভ দিল অরিন্দম।

পুলিশের লঞ্চ থেকে এস. এস টেমপেস্ট বেশ কিছুটা দূরে রয়েছে। এই পথটা অরিন্দমকে সাঁতরে বিল্লুর ডিঙির আগেই পৌঁছতে হবে। গঙ্গায় জোয়ার এসেছে। বড় বড় ঢেউগুলো এসে মাঝে মাঝে নাকাল করছে অরিন্দমকে। তাতে অবশ্য ক্ষতি তার কিছুই হচ্ছে না। একদিন বিছানায় শুয়ে তার বিরক্তি ধরে গিয়েছিল, জড়তা নেমেছিল দেহে আর মনে। আবার লড়াই করতে পারবে এটা ভেবে অরিন্দম প্রফুল্ল হয়ে উঠল। এলাহাবাদের শোধ তাকে নিতে হবে। ওরা ভেবেছে বাঙালী দুর্বল আর ভীতু। অরিন্দম তাদের ভুল ভেঙে দেবে। সোজা পাড়ি দিতে লাগল সে লম্বা ব্রেস্ট-স্ট্রোকের মাধ্যমে।

বিল্লু তার জাঙ্গিয়াটা এবার পরে নিল। তারপর সুলতানকে বলল, পিস্তল দুটো ঠিক আছে ?

আছে, বাদামের তলায়। উত্তর দিল সুলতান।

নিশানা কোথায় রাখা আছে জান ?

হ্যাঁ, ডিঙির পেছন দিকে।

দরকার হলে লাগাবে। নির্দেশ দিল বিল্লু।

অজ এত হুসিয়ারী কেন ? জিজ্ঞেস করল সুলতান।

জানি না, তবে সাবধানে থাকা ভাল। উত্তর দিল বিল্লু।

বাস্তবিক পক্ষে, নির্জন গঙ্গার ধারে আইসক্রীমওয়ালাকে দেখে তার সন্দেহ হয়েছে। যেখানে লোক নেই, সেখানে আইসক্রীমওয়ালা আসবে কেন ? অনেক দিন সে একাজ করেছে সুতরাং কোথাও খুঁত পেলে সে সজাগ হয়ে যায়। বিল্লু আজ সাবধান হয়েছে। বয়ার কাছে এসে ডিঙিটার গতি রুদ্ধ হ'ল। বিল্লু জলে নামল ধীরে ধীরে।

জলে মাথাটা জাগিয়ে রেখেছে অরিন্দম। ডিঙি আর বিল্লুর গতিবিধির ওপর তার নজর রয়েছে। বিল্লু ডুব-সাঁতার দিয়ে জাহাজের অপর পাশে চতুর্থ পোর্টহোলের কাছে দুটো সিটি বাজাল সুঁই সুঁই করে। পোর্টহোলের ঢাকাটা খুলে একটা দড়ি-বাঁধা প্যাকেট নেমে এল। বিল্লু সেটা ধরে আবার সাঁতরে চলল তার ডিঙির দিকে। সেখানে পৌঁছে ডিঙির হুকে দড়িটা বেঁধে সে উঠে পড়ল তাড়াতাড়ি। ঠিক সেই সময় অরিন্দম তার কোমর থেকে একটা

প্লাষ্টিকের ক্যাপসিউল বার করে দাঁত দিয়ে একটা অংশ ছিঁড়ে দূরে জলের ওপর ছুঁড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র নীলাভ আলো জ্বলে উঠল এক মুহূর্তের জন্য।

ও কি? বলে উঠল বিল্লু।

জাহাজের আলো হয়ত! উত্তর দিল সুলতান। বললে, তুমি আজ বড় ঘাবড়াচ্ছ ঝুটমুট।

চারিদিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল বিল্লু। না, কেউ কোথাও নেই। বয়াটা শুধু জলের তালে তালে নাচছে আর ঢেউ এসে জাহাজের গায়ে লেগে ছলাৎ ছলাৎ করে আওয়াজ কচ্ছে ক্রমাগত। সেই সময় অন্ধকারের মধ্যে ডুব-সাঁতার দিয়ে অরিন্দম এগিয়ে চলেছে বিল্লুর ডিঙির দিকে, নিঃশব্দে।

নীল আলোর সংকেত পাবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ-লঞ্চ ছুটে চলল নির্দিষ্ট জায়গা লক্ষ্য করে। লঞ্চের আলো সব নেভানো। অন্ধকারে লঞ্চটা এগিয়ে চলেছে কান্তির নির্দেশে। লঞ্চে কান্তি আর সন্তোষ অস্থির হয়ে পড়েছে, কখন তারা অরিন্দমের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে এই চিন্তা করে।

(ক্রমশঃ)

কথার রাজা

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

কিনেছিলাম মস্ত ইলিশ
সস্তা দরে পোস্তা গিয়ে,
লাল্লু নাকি? চল্লে কোথায়?
খুব যে রোয়াব!—ব্যাপার কি হে?

একটু দাঁড়া ওরে বলাই,
একটা কথা শুনে যা' ভাই,
এমন কিছুই নয়কো—হেঁ হেঁ—
বলছিনু কি—এই যে ইয়ে—

কথা তেমন নয়কো কিছুই—
পারবি দিতে দুইটি টাকা?—
ক'রব কী ভাই, মাসের শেষে
পকেট আমার বেজায় ফাঁকা!

মোহনবাগান জিতলো খেলায়,
তাই বুঝি কাল সন্ধেবেলায়
খাইয়ে দিলে লুচি-মিঠাই
আমায় ধ'রে পঞ্চু কাকা।

মস্তানেরা আসছে ধেয়ে
হস্তে নিয়ে চাঁদার খাতা,—
দশটি টাকা দিতেই হবে,—
নইলে কি আর রইবে মাথা!

মোতির মামার মেসোমশায়
'মশক' বলেন সেজো মশায়,
বরিশালের বন্ধু বলে
কলকাতাকে 'কলিকাতা'!

হলধরের আপন পিসী
চলছে কাশী বোঁচকা নিয়ে,
ফাগুন মাসেই হচ্ছে বুঝি
বাদলবাবুর ব্যাটার বিয়ে?

বৃষ্টি পড়ে গুঁড়ি গুঁড়ি,
আন্ না দাদা, মশ্‌লা-মুড়ি;
হ্যাঁ রে হাঁদা, নোলা কি তোর—
উঠছে শুনে সক্‌সকিয়ে?

রেশম ও লাক্ষা কীট

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

শীতকালে আমরা যে গরম জামা পরি, সেটা তৈরি হয় পশম অর্থাৎ পশুর লোম দিয়ে। গরমকালে 'সিল্কের' জামা-কাপড় অনেকে পরেন। ওর স্থতোটা পাওয়া যায় রেশম কীটের কাছ থেকে। রেশম স্থতোর তৈরি কাপড়কে বলা হয় রেশমী কাপড়।

রেশম কীটকে চলতি কথায় বলে 'পুল'। এরা তুঁত গাছের পাতা খায় ব'লে এদের 'তুঁত পোকা'ও বলে।

গুটি থেকে প্রজাপতি বের হয়ে ডিম পাড়ে। সেই ডিম থেকে অতি ক্ষুদ্র কীট বেরিয়ে আসে। তুঁত পাতা সরু সরু করে কেটে তাদের খেতে দেওয়া হয়। এই পাতা খেয়ে কীটগুলি ক্রমে বড় হতে থাকে। তারপর পরিণত বয়সে তারা মুখের লালা দিয়ে নিজের দেহের চারিদিকে একটি আবরণের স্বষ্টি করে এবং পরিশেষে তার নিজের তৈরি বেড়াজালের গুটিতে নিজেই আটকা পড়ে যায়! এই গুটির আঁশ থেকে একটা বিশেষ উপায়ে স্থতো তৈরি হয়।

পোকাটি তার গুটিটাকে কেটে বেরিয়ে আসবার আগে ঐ গুটি থেকে যে স্থতো বের করা হয়, তাই দিয়ে গরদের শাড়ী কাপড় প্রভৃতি তৈরি করে। কিন্তু যে গুটির মুখ কেটে রেশম কীট বেরিয়ে আসে, তার স্থতো খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। এই রকম গুটির স্থতোয় যে কাপড় বুনে নেওয়া হয়, তাকে বলে মটকার কাপড়। কীটের শ্রেণী এবং তাদের খাদ্য তুঁত পাতার ভালোমন্দ অনুসারে ওদের স্থতোও সরু ও মোটা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি স্থানের রেশম বেশ ভালো হয়।

মৌমাছি আমাদের মধু দেয় আর রেশম কীট দেয় রেশম। এরা উভয়েই আমাদের অশেষ উপকার করে।

রাত্রি বেলায় উজ্জ্বল আলোকে এক রকম প্রজাপতিকে তোমরা কখনও কখনও দেখতে পাবে। সাধারণ প্রজাপতির মত এদের পাখা হাল্কা হয়। এদের পাখা দুটি ভারী এবং শরীরটা আকারে বড়; যেন ভেলভেট দিয়ে ঢাকা—এরাই 'মথ' বা রেশম প্রজাপতি। সাধারণ প্রজাপতি রাত্রিকালে বড় একটা বের হয় না। হলেও তারা বসবার সময় পাতলা পাখা দুটো একসঙ্গে জোড় করে বসে; কিন্তু রেশম প্রজাপতি পাখা দুটো ছড়িয়ে বসে আলোর কাছে। এইসব প্রজাপতির গুটি তোমরা দেখতে পাবে তুঁত গাছে, কি কোন কুল গাছে। আমড়ার আঁটির মত দেখতে এই গুটি।

লাক্ষা কীট

লাক্ষা কীট অতি ক্ষুদ্র। বর্ষাকালে যে ছাত্‌লা পড়ে, সেও একরকম ক্ষুদ্র কীট। লাক্ষা কীট 'ছাতলা' জাতীয়। তবে ছাতলা পোকা লালচে বা সাদাটে—কতকটা তুলোর মত আকারে অন্য গাছে লাগে। আঁখ, শিম বা বেগুন প্রভৃতি গাছের রস খেয়ে গাছটাকে নষ্ট করে দেয়; কিন্তু লাক্ষা পোকা কুল, কুসুম, পলাশ, ডুমুর এবং অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছের রস খেয়ে তার বদলে দেয় আমাদের লাক্ষা। লাক্ষা থেকে গালা হয়। গালা আমাদের কত কাজে লাগে। লাক্ষার রং দিয়ে আলতা করে এবং অনেক জিনিসে রং করা হয়। এই জন্য আমাদের দেশে লাক্ষার চাষ হ'য়ে থাকে। অন্য দেশেও লাক্ষা চালান যায়।

কুল গাছের ডালে কখনও কখনও তোমরা দেখতে পাবে, লালচে একরকম বিজগুড়ি বিজগুড়ি ছাতলার মত হয়েছে। ওটাই লাক্ষা পোকার বাসা।

লাক্ষার চাষ কঠিন নয়। যে গাছে লাক্ষা পোকা থাকে, সেখান থেকে ঐ পোকা সমেত ডাল কেটে এনে অন্য কুল কি পলাশ গাছে বেঁধে দিলেই ওরা বাসা তৈরি করতে আরম্ভ করে।

লাক্ষা কীট ও রেশম কীটের মত আমাদের খুবই উপকারী।

জেনে রাখো

শ্রীআশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

বলো তো কে পারো দেখি
　　আকাশটা কেন নীল?
কেন বা পাতার বুকে
　　সবুজের ঝিলমিল?
কেন যে পাহাড় থেকে
　　নদী আসে নামিয়া?
ভেবে ভেবে তোমাদের
　　মাথা ওঠে ঘামিয়া!

দিন কেন আলোময়?
　　কালো কেন রাতটি?
কমে আর বাড়ে কেন
　　আকাশের চাঁদটি?
মেঘ থেকে ঝরে পড়ে
　　কেন যত বৃষ্টি?
মা'র কোল সবচেয়ে
　　কেন লাগে মিষ্টি?

জবাবটা জেনে রাখো
　　রোজই সাঁঝ-সকালে,
ঘটে চলে সবকিছু
　　প্রকৃতির খেয়ালে।

ইংক-ইলিউশন

যাদুকর শ্রীশচীদুলাল দে

প্রদর্শন ভঙ্গী। যাদুকর একটা কাঁচের টব নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করলেন। টবটি গভীরতায় দশ ইঞ্চি এবং কাল কালি দিয়ে পূর্ণ। প্রমাণার্থে একটা সাদা কার্ড টবে ডুবিয়ে দেখালেন যে, ওর অর্ধেকটা কালি লেগে গাঢ় কাল ছোঁপ পড়েছে। একটা ড্রপার নিয়ে কিছুটা কালি তুলে একটা ব্লটিং পেপার বা কাপড়ের উপর দিতেই গাঢ় কাল রঙ হয়ে গেল। সকলের মনে এখন আর কোন সন্দেহ রইল না। আবার একটা বড় সাইজের গাঢ় নীল রঙ এর রুমাল দিয়ে কাঁচের টবটাকে যাদুকর সম্পূর্ণরূপে ঢেকে দিলেন। তারপর ম্যাজিকের মন্ত্র পড়ে রুমালটাকে টব থেকে তুলে টেবিলের উপর রেখে দিলেন এবং কাঁচের টবটাকে পাদপ্রদীপের (Foot-light) সামনে নিয়ে এলেন। দর্শকেরা দেখলেন টবে এক ফোঁটাও কালির চিহ্ন নেই। কালির পরিবর্তে স্বচ্ছ জল আর জলের মধ্যে কয়েকটি সোনালী মাছ (Gold-fish) খেলা করছে। এইভাবে খেলাটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

প্রয়োজন ঃ একটি কাঁচের টব অথবা বড় সাইজের একটি গ্লাস, পাতলা গাঢ় কাল রঙ-এর সিল্কের কাপড়, খানিকটা প্লাস্টিকের সুতো, একটা প্লাস্টিকের পুঁতি, একটা ড্রপার, কিছু গুঁড়ো কাল কালি, একখানা গাঢ় নীল রঙ-এর রুমাল, দু-তিনটি সোনালী মাছ (Gold-fish) অভাবে কই মাছ।

কৌশল ঃ খেলাটির মূল কৌশল রয়েছে কাঁচের টবে। আসলে টবে একবিন্দুও কালি নেই। টবে রয়েছে স্বচ্ছ জল আর জলের মধ্যে রয়েছে কয়েকটি সোনালী মাছ। টবের ভেতর দিকে পাতলা গাঢ় কাল রঙ-এর সিল্কের কাপড় লাগান রয়েছে। ১নং ছবি 'A'তে দেখান হয়েছে যে, কাপড় P লাইন পর্যন্ত লাগান হয়েছে এবং উপরের কিছু অংশ সাদা টব দেখান হয়েছে। কাপড়ের তলা এবং উপর সেলাই-মেসিনের সাহায্যে জুড়ে নিতে হবে, যেন কোন সুতো বেরিয়ে না থাকে। এই সিল্কের কাপড়টাকে জলে ভিজিয়ে টবের ভেতর দিকে গোল করে ঘুরিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে। সিল্কের কাপড়ের উপরের কোন অংশের সঙ্গে শক্ত করে প্লাস্টিকের সুতো লাগান আছে এবং প্লাস্টিকের সুতোর অপর প্রান্তে লাগান আছে একটা প্লাস্টিকের পুঁতি। কাল সিল্কের কাপড়ের শেষ সিমানা পর্যন্ত স্বচ্ছ জল দিয়ে পূর্ণ করে কয়েকটি সোনালী মাছ ওর মধ্যে রেখে দিতে হবে। এই গেল মোটামুটি
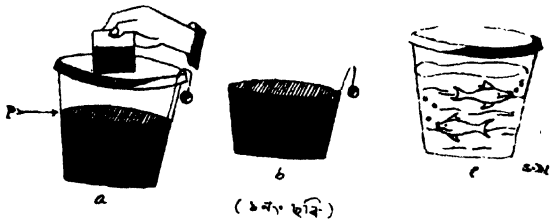
(১নং ছবি)

টবের কৌশল। দ্বিতীয়তঃ, প্রমাণার্থে যে সাদা কার্ডখানা টবের মধ্যে ডোবান হয়, সেটাও কৌশলপূর্ণ। কার্ডের একপিঠ সাদা এবং অপর পিঠের আধখানা গাঢ় কাল কালি দিয়ে রঞ্জিত। যাদুকর কার্ডের সাদা পিঠ দর্শকদের দেখিয়ে টবের কালির মধ্যে ডোবান এবং কৌশলে কার্ডখানা ঘুরিয়ে দেন। যখন টব থেকে কার্ডখানা তোলেন, তখন দেখা যায় কার্ডের আধখানা কাল কালিতে ভিজে গেছে এবং ফোঁটা ফোঁটা কাল রঙ ঝরে পড়ছে। আসলে কিন্তু যেটা ঝরে পড়ছে সেটা হ'ল টবেরই জল। দর্শকরা চোখ ধাঁধিয়ে জলকে কালিই দেখবেন।
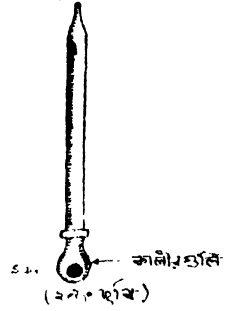
তৃতীয়তঃ, ড্রপারেও কিছু কৌশল করা আছে। ২নং ছবিতে ড্রপারের কৌশল সুন্দরভাবে দেখান হয়েছে। কিছু গুঁড়া কাল কালি নিয়ে সামান্য জল দিয়ে কালির একটা গুলি তৈরী করতে হবে। ঐ কালির গুলিটি ড্রপারের নিচের অংশে ভিজে অবস্থাতেই রেখে দিতে হবে। ড্রপারের সাহায্যে টবের জল তুলে নিতে হবে। জল কাল কালির গুলিকে স্পর্শ করলেই ড্রপারের তরল কাল কালি রূপান্তরিত হবে। এরপর কি করতে হবে, তা 'প্রদর্শন ভঙ্গী'তে বলা হয়েছে। এই ভাবে টবের তরল-কালি কাল কালি বলে প্রমাণিত হলে গাঢ় নীল রঙ-এর রুমাল দিয়ে টবটাকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে দিতে হবে। এরপর রুমাল ঝাকানি দিয়ে তোলার সময় ঐ পুঁতিসহ তুলতে হবে। ফলে, কাল রঙ-এর সিল্কের কাপড়টি রুমালের অন্তরালে উঠে আসবে। এরপর যাদুকর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে টব হাতে নিয়ে পাদ-প্রদীপের (Foot light) সামনে এগিয়ে আসবেন। দর্শকগণ যখন কাঁচের টবের সোনালী মাছ দেখতে ব্যস্ত থাকবেন, তখন যাদুকরের সহকারী কোন অছিলায় রুমালসহ কাল সিল্কের কাপড়টি টেবিল থেকে সরিয়ে ফেলবেন; তা'হলেই কেল্লা ফতে।

"আমি বিশ্বাস করি যে বাঙালীর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। শিক্ষা-দীক্ষা, স্বভাব-চরিত্র এই সবের মধ্যে বাঙ্গালীর সেই বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে। বাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যেও বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার সবুজ শ্যামল ক্ষেত্র ও তালগাছ ঘেরা পুষ্করিণী, এই সবের মধ্যে কি একটা বৈশিষ্ট্য নাই ? আর প্রকৃতি দেবীর এই বৈশিষ্ট্য কি বাঙালীর চরিত্রে একটা বিশিষ্টতা প্রদান করেনি।"

—সুভাষচন্দ্র বসু

মেঠুড়ে

ফুটবল

পর পর পাঁচ বছর ফাইন্যাল খেলার কৃতিত্বের মধ্যে দু'বার বিজয়ীর সম্মান এবং তিনবার রোভার্স জয় মোহনবাগানের গৌরবোজ্জ্বল ক্লাবের ইতিহাসে যে নতুন অধ্যায়ের সংযোজন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এবার প্রথম খেলায় এয়ার ফোর্সকে ৩-০ গোলে এবং দ্বিতীয় খেলায় অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিসকে ১-০ গোলে পরাজয়ের মধ্যে মোহনবাগানের দলগত উৎকর্ষের তেমন পরিচয় না মিললেও পরবর্তী খেলাগুলোতে যোগাযোগ, সংঘবদ্ধতা, বল কন্ট্রোল এবং ক্রীড়াশৈলীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে তারা মফৎলাল গ্রুপ মিলস এবং জলন্ধরের লীডারস ক্লাবকে পরাজিত করেছে। লীডার্স ক্লাবের সঙ্গে প্রথম দিনের ফাইন্যাল খেলা গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হলেও, এ খেলাতেও মোহনবাগানের প্রাধান্যের অভাব দেখা যায়নি। দ্বিতীয় দিনের ফাইন্যালে পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয়ে একে একে তিনটে গোল করে মোহনবাগান রোভার্স বিজয়ী হয়।

ফাইন্যাল খেলার প্রথম সুযোগেই বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স দলের ডুরাণ্ড কাপ জয় সত্যিই স্মরণীয় সাফল্য। আরও স্মরণীয় এই কারণে কলকাতার ফুটবলের গর্ব মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলকে পর পর সেমি ফাইন্যালে পরাজিত করে তারা ডুরাণ্ড বিজয়ী হয়েছে। মোহনবাগানের সঙ্গে আবার একদিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়। সেমি ফাইন্যালে প্রথম দিন ড্র করে পরের দিন ২-১ গোলে মোহনবাগানকে পরাজিত করা। তার আগে ইউ. পি একাদশকে ৭-২ গোলে, গোর্খা ব্রিগেডকে ২-১ গোলে এবং অন্ধ্র পুলিসকে ৪-০ গোলে পর পর পরাজিত করার নজিরও বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স দলের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়।

আটবারের ফাইনালিস্ট, একবার যুগ্ম জয়ের হিসেব নিয়ে চারবারের বিজয়ী এবং গতবারের ডুরাণ্ড বিজয়ী ইস্টবেঙ্গলকে ফাইন্যালে বর্ডার সিকিউরিটির কাছে ১-০ গোলে হার স্বীকার করতে হয়েছে। খেলার দ্বিতীয়ার্ধে বর্ডার সিকিউরিটি খেলা শেষ হবার কয়েক মিনিট আগে, রাইট আউট সুরজিৎ সিং-এর দর্শনীয় গোলে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যায়। ডুরাণ্ডে এবার ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ওই একটা মাত্রই গোল। এছাড়া ফাইন্যাল পর্যন্ত উঠতে ইস্টবেঙ্গল আর কোনো খেলায় কারোর কাছে গোল খায়নি।

* * *

পাইকপাড়ার কুমার আশুতোষ ইনষ্টিটিউশনের সুব্রত কাপ জয় এবং বাংলার জুনিয়র ফুটবল দলের জুনিয়র জাতীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ—ছোটদের এই কৃতিত্ব বাংলার ফুটবলের পক্ষে খুব ভালো খবর।

কুমার আশুতোষ ইনষ্টিটিউশন বাংলার তৃতীয় স্কুল হিসেবে সর্বভারতীয় স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার সুব্রত কাপ পেয়েছে। এর আগে বাংলার আর যে দুটো স্কুল সুব্রত কাপ পায় তারা রানী রাসমণি স্কুল ও বাটানগর স্কুল।

কুমার আশুতোষ ইনষ্টিটিউশন প্রথম খেলায় দিল্লীর এম. বি. স্কুলকে ২-০ গোল পরাজিত করে। দ্বিতীয় খেলায় এস. এস. জলন্ধর স্কুলের সঙ্গে প্রথম দিন গোলশূন্য ভাবে খেলা শেষ করে দ্বিতীয় দিন ২-০ গোলে বিজয়ী হয়। সেমি ফাইন্যালে তারা কার-নিকোবর গভর্নমেণ্ট স্কুলকে ৪-১ গোলে হারিয়ে ফাইন্যালে ওঠে। ফাইন্যালে পরাজিত করে মককচুংয়ের নাগাল্যাণ্ড গভর্নমেণ্ট হাই স্কুলকে ১-০ গোলে।

* * *

জব্বলপুরে জাতীয় জুনিয়র ফুটবলের মূল প্রতিযোগিতার খেলায় কেরলকে ৩-০ গোল, দিল্লীকে ২-০ গোলে এবং ফাইন্যালে অন্ধ্র প্রদেশকে ৪-১ গোলে হারিয়ে বাংলার জুনিয়র দলের জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ খুবই প্রশংসার। জুনিয়র দল একবার নিয়ে পর পর দু'বছর বিজয়ীর সম্মান অর্জন করল। খেলাধুলোর চর্চা করার মতো জায়গা এবং মাঠের অভাব থাকা সত্ত্বেও বাংলা দেশের ছোটরা আজ ফুটবল খেলায় যে কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছে তাতে পশ্চিমবঙ্গবাসী মাত্রই গর্ব ও আনন্দবোধ করতে পারেন।

টেনিস

এডিলেডের মেমোরিয়াল ড্রাইভ কোর্টে ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলায় আমেরিকা ৪-১ ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে আবার আন্তজাতিক টেনিসে শ্রেষ্ঠ দেশের সম্মান লাভ করেছে। আমেরিকা যে এবার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করবে তার আভাস ছিল গত উইম্বলডন প্রতিযোগিতা থেকে। এবার আমেরিকা ডেভিস কাপ জয়ের মূলে ক্লার্ক গ্রেবনার এবং নিগ্রো খেলোয়াড় আর্থার অ্যাশ-এর কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ক্লার্ক গ্রেবনার অষ্ট্রেলিয়ার রে রাফেলস ও বিল বাউরি দু'জনের বিরুদ্ধে জয়ী হলেও অ্যাশকে রিভার্স সিঙ্গলসে অস্ট্রেলিয়ার বিল বাউরির কাছে হার স্বীকার করতে হয়। আমেরিকার জয়ের মূলে ডাবলসের তরুণ জুটি স্ট্যান স্মিথ ও বব লুজের কৃতিত্বও কম নয়।

তাঁরা ডাবলসের খেলায় অভিজ্ঞ অষ্ট্রেলিয়ান জুটি রে রাফেলস ও জন আলেকজাণ্ডারকে স্ট্রেট সেটে পরাজিত করেন।

প্রথম দিনের দুটো সিঙ্গলসেই বিজয়ী হয়ে আমেরিকা জয়ের পথ সুগম করে। দ্বিতীয় দিনের ডাবলস জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ১৯৬৮ সালের ডেভিস কাপের ভাগ্যও নিষ্পত্তি হয়ে যায়। অষ্ট্রেলিয়া হার স্বীকার করলেও এবারের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলায় যে উন্নত টেনিস নৈপুণ্যের পরিচয় মিলেছে, চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে বহুদিন নাকি এমন চিত্তাকর্ষক খেলা দেখা যায়নি।

ক্রিকেট

অষ্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন মাঠে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম টেষ্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১২৫ রানে জয়ী হয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাটিং ও বোলিংয়ের পর্যাপ্ত প্রাধান্যে পাঁচদিনের টেস্ট খেলা চারদিনে শেষ হয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টসে জিতে ব্যাট করতে নামে। ওপেনিং ব্যাটসম্যান এস. ক্যামাচো মাত্র ছ' রান করে আউট হয়ে গেলেও, দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে কানহাই ও ক্যারু উপভোগ্য ব্যাটিংয়ে দর্শকদের আনন্দ দিতে থাকেন। চা বিরতির কিছু আগে তাঁদের রান গিয়ে পৌঁছয় ১ উইকেটে ১৮৮। এর পর ক্যারু নিজস্ব ৮৩ রানের মাথায় রান-আউট এবং কানহাই নিজস্ব ৯৪ রানের মাথায় আউট হন। কানহাই-ক্যারুর দ্বিতীয় উইকেটে ১৬৫ রান আষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় উইকেট জুটি নতুন রেকর্ড। ক্যারুর আউটের সময় থেকে আট উইকেটে মাত্র ৮০ রান যোগ হয়ে, দিনের শেষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রান দাঁড়ায় ৯ উইকেটে ২৬৭। দ্বিতীয় দিনের সূচনায় হেনড্রিকস গিবসের দৃঢ়তায় ২৯ রান যোগ হবার পর ২৯৬ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস শেষ হয়।

কোনো রান ওঠার আগেই অষ্ট্রেলিয়ার ওপেনিং ব্যাটসম্যান ইয়ান রেডপাথ আউট হন, কিন্তু অধিনায়ক বিল লরি ও ইয়ান চ্যাপেল দ্বিতীয় উইকেটে জুটি বেঁধে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। তাঁরা প্রায় চার ঘণ্টা ধরে ব্যাট করে ২১৭ রান তোলেন। দুজনেই সেঞ্চুরি করেন। লরি করেন জীবনের একাদশ টেস্ট সেঞ্চুরি (১০৫), চ্যাপেল দ্বিতীয় (১১৭)। চ্যাপেল এই টেস্টে সেঞ্চুরি নিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে তিনটে খেলায় পর পর সেঞ্চুরি করলেন। দিনের শেষে অষ্ট্রেলিয়ার রান সংখ্যা দাঁড়ায় ৫ উইকেটে ২৫৫।

অনেকে আশা করেছিলেন হাতে যখন বাকী পাঁচটা উইকেট তখন অষ্ট্রেলিয়া নিশ্চয়ই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রান পার হয়ে যাবে। কিন্তু তৃতীয় দিন তারা ব্যাট করতে আরম্ভ করে ৫৪ মিনিটের ভিতর বাকী পাঁচটা উইকেটে মাত্র ২৯ রান যোগ করে ইনিংস শেষ করে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা ভালো হয় না। ৯৩ রানের মধ্যে চারজন প্রতিষ্ঠিত ব্যাটসম্যান আউট হন। সোবার্স ও লয়েডের সংযোগিতায় ৫ উইকেটে ৭২ রান যোগ হবার পর অধিনায়ক সোবার্স ও পরে লয়েড নিজস্ব ১২৯ রান করে আউট হন। তৃতীয় দিনের শেষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ উইকেটে ২৯৮ রান ওঠে। পরের দিন ৩৫৩ রানের মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সমস্ত উইকেট পড়ে যায়। জয়ের জন্যে ৩৬৬ রান ও হাতে পৌনে দু'দিন সময় নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটিং আরম্ভ করে এবং ওই দিনের মধ্যেই ২৪০ রানে সকলে আউট হয়ে যায়।

মেলবোর্ণ মাঠের দ্বিতীয় টেস্টে ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং সব দিক দিয়ে অষ্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ওপর টেক্কা দিয়ে ইনিংস বিজয়ী হয়। অবশ্যই স্বীকার করতে হবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পরাজয়ের মূলে দুর্ভাগ্য আছে। আহত থাকায় ফাস্ট বোলার চার্লি গ্রিফিথ এবং প্রথম টেস্টে সিঞ্চুরির অধিকারী ক্লাইভ লয়েড দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে পারেন নি।

সহায়ক পিচে গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জীর প্রশংসনীয় বোলিং-এর ফলে ইনিংসের সূচনা থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপর্যয় আরম্ভ হয়। মাত্র ৪২ রানের মধ্যে পড়ে যায় তিনটে উইকেট। তারপর বুচার, সোবার্স ও কানহাই অল্প সময়ের ব্যবধানে আউট হওয়ায় প্রথম দিনের খেলা শেষ হবার সময় পর্যন্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৬ উইকেটে ১৭৬ রান ওঠে। দ্বিতীয় দিন ম্যাকেঞ্জী সংহার মূর্তিতে বল করে ২০০ রানের মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সমস্ত খেলোয়াড়কে আউট করেন। ৭১ রান দিয়ে ম্যাকেঞ্জী দখল করেন আটটা উইকেট।

অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ১৪ রানের মাথায় ইয়ান রেডপাথ আউট হয়ে গেলেও অধিনায়ক লরি ও ইয়ান চ্যাপেল দ্বিতীয় উইকেটে যোগ করেন ২৯৮ রান। চ্যাপেল নিজস্ব ১৬৫ রানে আউট হন। লরি শেষ পর্যন্ত জীবনের দ্বিতীয় ডাবল সেঞ্চুরি (২০৫) পূর্ণ করে তাঁর গৌরবময় ইনিংস শেষ করেন। অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৫১০ রানে শেষ হবার পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় দফার ব্যাটিং-এ ২৫ রান তুলতে ক্যামাচোর উইকেট হারায়। ফ্রেডারিক, নার্স, সোবার্স, ক্যার্ক তাঁদের সমস্ত শক্তি দিয়ে বিপক্ষের সামনে শক্ত প্রতিরোধ গড়ার সাধ্যমতন চেষ্টা করেন। দিনের শেষ ওভারে গ্লীসনের বলে যখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের শেষ খেলোয়াড় আউট হন, তখনও বিপক্ষের প্রথম ইনিংসের রান পূর্ণ করতে তাদের ৩০ রানের ঘাটতি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইনিংস ও ৩০ রানে হার স্বীকার করে।
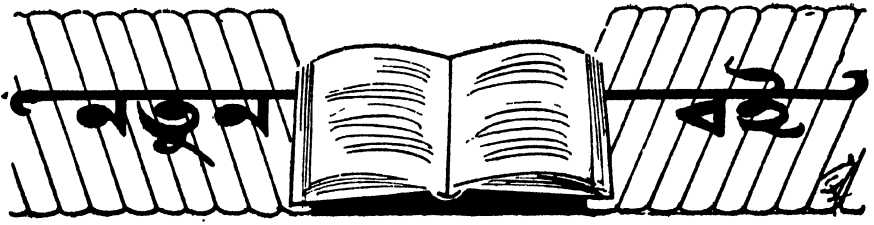
(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

রূপনগরের ময়না—শ্রীঅমল সেনগুপ্ত। শ্রীমতী সাবিত্রী সেনগুপ্ত কর্তৃক ৭১ বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা ২৬ হইতেপ্রকাশিত। মূল্য ১.৫০

ছন্দে গাঁথা ও ছবিতে ভরা ছোটদের একখানি সুন্দর বই। সংস্থদ্ধ ত্রিশটি কবিতা আছে ছেলেমেয়েদের মন ভোলাবার উপযোগী। হালকা ছন্দের এই কবিতাগুলি পড়ে ছোটরা খুব খুশি হবে। শিল্পী রেবতীভূষণের আঁকা ছবিগুলিও বইখানিকে যথেষ্ট আকর্ষণীয় করে তুলতে সাহায্য করেছে।

ডুডুম-ডুম—শ্রীঅমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নিওরিট, ৬১ বি সেলিমপুর রোড, কলিকাতা ৩১ হইতে শ্রীসমীর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১.৫০

ভাল কাগজে, নানা রঙে ছাপা ছোটদের ছড়ার বই। লেখকের ছড়া রচনায় হাত যে খুবই পাকা এই মিষ্টি-মধুর ছড়াগুলিই তার পরিচয়। খুব ছোটরা বইখানি হাতে পেলে কাড়াকাড়ি ফেলে দেবে। শিল্পী শ্রীরবীন নাথ-এর আঁকা ছবিগুলিও ভারী সুন্দর।

গল্পে শিশু রবি—স্বপনবুড়ো। কথা-ভারতী, ৪৬ পার্বতী ঘোষ লেন, কলিকাতা ৭ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১.৩০

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের কাহিনীই বিস্ময়ে ভরা। বিশ্ববিদিত এই বিরাট পুরুষের বাল্যজীবনের কয়েকটি বিশিষ্ট কাহিনী নিয়ে 'স্বপনবুড়ো' এই সুন্দর বইখানি লিখেছেন। দশটি কাহিনী আছে এর মধ্যে এবং ঐ কাহিনী অবলম্বনে পাতা-ভরা শিল্পী শ্রীপ্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা দশখানি ছবি আছে। প্রকাশক প্রচুর খরচ করেছেন বইখানিকে সুন্দর করে তোমাদের উপহার দেবার জন্য। সামনের প্রচ্ছদপটটিও মনোরম। কবির ছোটবেলার কাহিনী জানার পক্ষে এ এক অদ্বিতীয় বই। দেশের সব ছেলেমেয়েদেরই এ বই পড়া উচিত।
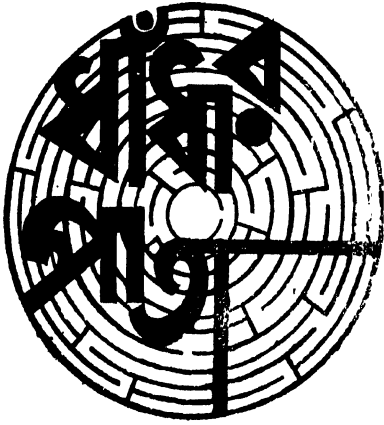
১। নীচের অষ্টাদশপদী কবিতাটির সাতটি শূন্যস্থান সংগতি (ছন্দ ও অর্থ) বজায় রেখে ছয়জন খ্যাতনামা বাঙালী সাহিত্য-সেবীর এবং একটি বিখ্যাত বাঙলা মাসিক পত্রিকার নাম দিয়ে পূর্ণ করতে হবে।

শ্রীবিনয় বাগচী

বঙ্গ-কাব্য করেন সমৃদ্ধ হলেও খেয়ালে মত্ত,
প্রণমি তাঁহারে অমর স্রষ্টা— ১ —।
গল্প লিখে, ছবি এঁকে শিশুদের দেন নব স্বাদ,
বিখ্যাত বাড়ির তিনি বিখ্যাত সে — ২ —।
নিয়মিত যোগাবারে ছোটদের সাহিত্যসম্ভার,
— ৩ — সৃজন করেন — ৪ —।
পল্লী-কবি রূপে সুবিদিত নিরলস ও নির্ভীক,
জীবনসন্ধ্যায় উপনীত আজ — ৫ —।
লেখনীতে যার পল্লীচিত্র হয়েছে উজ্জ্বলতর,
শহরেতে বাস করেন তিনি যে, নামটি — ৬ —।
শান্তিনিকেতনে সকলের সাথে সুখে মিলিমিশি,
প্রতিষ্ঠা পান জীবনেতে শ্রী — ৭ —।

(উত্তর আগামী মাসে বেরুবে)

॥ গত মাসের ধাঁধার উত্তর ॥

১। শ ২। কাগজ ৩। প্রজাপতি ৪। করলা (জলপাইগুড়ি জেলার নদী) ৫। লোচন (লো+চ (চক্ষু)+ন (নয়ন)। ৬। তুমি কি ঘুমিয়ে আছ? ৭। নীরবতা ৮। রাস্তা ৯। বর্তমান যুগ

তোমাদের সঙ্গে দেখা হতে একটু দেরিই হয়ে গেল, অর্থাৎ বেশ কয়েক মাস। আশা করি তোমরা ভালই আছ। ইংরাজী নববর্ষের সুরু থেকেই আমাদের সব কাজকর্মের হিসাবনিকাশ চলে; পরীক্ষার শেষে নতুন ক্লাস, নতুন বই আর অশেষ উদ্দীপনা। শীতও জাঁকিয়ে বসে থাকে তাই খেলাধূলা, আউটিং বা অন্য নানা আনন্দ আহরণেরও সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়—খেলাধূলো দেখা ও তাতে নিজেরা যোগ দেওয়ার ব্যাপার তো আছেই। তাই শীতের দিনে বছরের শেষে ও নতুন বছরের আরম্ভের কিছুদিন পর্যন্ত বেশ হাসিখুশিতে চলে।

শীতের দিনে শরীরটাকে নতুনভাবে গড়ে নেওয়ার চেষ্টা কিন্তু সকলের মধ্যে থাকা চাই। ভোরবেলা উঠে মাঠে, অভাবে বাড়ীর ছাদে বেশ ভাল করে হাল্‌কা ব্যয়াম বা অবাধ জায়গা পেলে ছুটোছুটি করা খুব ভালো। শীত? হাঁ, লেপ ছেড়ে উঠতে প্রথমটা যা কষ্ট তারপর বেরিয়ে পড়লে দেখবে কী ভালো লাগছে, আরো ছুটতে ইচ্ছা করবে। শহর ছেড়ে শহরতলি বা গ্রামে যারা থাকো, তাদের এই সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করা উচিত। তবে খাস কোলকাতা শহরের এসপ্লানেড ছাড়িয়ে ময়দানের দিকে, আকাশবাণী-ভবন ছাড়িয়ে দক্ষিণ দিকে বা হাইকোর্টের দিকে কোনও প্রত্যূষে যদি যাও, দেখতে পাবে কত পুরুষ, কত মহিলা শরীর-চর্চায় মনোযোগী হয়েছেন। অন্ধকারের ঘোর তখনও কাটে না, অথচ এই শীতের দিনে কতজন বেরিয়ে পড়েছেন। আমাকেও মাঝে মাঝে কার্যগতিকে ভোরবেলা এ পথে আসতে হয়। একদিনের ছোট একটা মজার ঘটনা বলি শোন, শুনলে তোমাদের বেশ লাগবে। খুব ভোর, শীতের ভোর, ট্রামের ভিতর তখনও আলো জ্বলছে। দক্ষিণ কোলকাতা থেকে এসে নামলুম এসপ্ল্যানেডে, তারপর গতি হলো পশ্চিম দিকে অর্থাৎ রাজভবনকে ডাইনে রেখে সোজা পথে। বাঁ দিকের অবারিত উন্মুক্ত স্থানে ভোরের দিকে বেশ লোকজন দেখা যায়, তাঁরা স্বাস্থ্যরক্ষার কলাকৌশল অভ্যাস করেন। দূর থেকে সেদিন লোকজন বিশেষ দেখতে পাচ্ছি না। সবেমাত্র অন্ধকার কেটে আলোর রেখা ফুটছে। একটু এগিয়ে এসেই দেখলাম দূরে একজন মানুষ, হাত পা নাড়ছেন। যত এগিয়ে আসছি দেখি ভদ্রলোক একবার ডান পা একবার বাঁ পা সোজা তুলে বাচ্চারা যেমন লাথি দেখায়, তেমনি করছেন। যতই তাঁর নিকটবর্তী হচ্ছি ততই যেন কপাল কুঁচকে সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে অমনি করছেন। একজন ভদ্রমহিলা আমি আর

আমাকে দেখে ঐ রকম করবেন! ভাবলাম—ইস্, কী ভীষণ অভদ্র এই লোকটি। একটু রাগও হলো, হয়তো আমার মুখের চেহারাও বিরক্তিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল. কিন্তু তিনি বেশ থেমে থেমে আমার দিকে ঐরকমই করে চললেন। কাছাকাছি এসে পড়ে আমি মুখ ফিরিয়ে নেবার সময় ভাবলাম দিই দু'কথা শুনিয়ে, কিন্তু নিজেরই কথা বলতে বাধলো তাই পাশ দিয়ে চলে গেলাম। কিন্তু কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে একটু গিয়েই পিছন ফিরে তাকালাম, দেখি এখন কাকে লক্ষ্য করে সোজা পা দেখান! কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম তিনি থেমে থেমে একই ভাবে সোজা পা তুলেই চলেছেন। তখন বুঝলাম, ওটা আমার প্রতি অভদ্রতা নয়, ওটা শরীরচর্চা। হ্যাঁ, ভদ্রলোকের চেহারা খুব মাংসল। নিজের বোকামী ভেবে নিজেরই হাসি পেলো। যাইহোক তোমরা যেন এরকম বোকামী করো না, আর একেবারে লোকজনের সামনাসামনি অঙ্গ-ভঙ্গী করার চেয়ে একটু ভিতরে চলে গিয়ে করলে নিজে সহজ হতে পারবে, অন্যেরও অসুবিধা হবে না। মনে রেখো খুব ভোরে এসব করতে হয়। কি ভাবছ তোমরা? আমি বড্ড বোকা?

আচ্ছা বলো, চাঁদ নিয়ে কত গল্প, কত কাহিনী উপকথা শুনেছ তোমরা, আমরাও ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি। চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় মন ভরে ওঠে। 'মুনলাইটে পিকনিক' সেও কত লোভনীয়। কবিরা সেই কত যুগ আগে থেকে নানাভাবে নানা কথায় চাঁদকে ভালোবাসছেন, স্তুতি করছেন, 'এমন চাঁদার আলো মরি যদি সেও ভালো, সে মরণ স্বরগ সমান।' নতুন যুগের কবিরা এই অর্থ করেই নতুন ভাবে কত কথা বলছেন। বহু বহু দূরে থেকে যে চাঁদ স্নিগ্ধ আলো বিতরণ করছে, তাকে ভালো না বেসে কে থাকবে বল? একেবারে ছোট্ট যারা তাদেরও মা ভোলান: 'চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা।' আর চাঁদের মা বুড়ী ওর মধ্যে চরকা কাটছে—এ গল্প তোমরা আমরা সব্বাই শুনে এসেছি ছোট্টবেলা থেকে। এমনি দুষ্প্রাপ্য সুন্দর লোভনীয় চাঁদ—তাকে নিয়ে কি আবিষ্কারের দুর্দমনীয় ও অসম্ভব অভিযান সফল হলো বলো? কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে যখন এই খবর দেখা গেল, আর মহাকাশে যাত্রা করলেন বিখ্যাত সাহসী যোদ্ধা তিনজন, তখন সারা পৃথিবী উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছিল—নির্ধারিত সময়ের মধ্যে না জানি কি সংবাদ আসে। তাঁদের যাত্রা নির্বিঘ্ন হয়েছে, পৃথিবী ও চন্দ্র পরিক্রমা করে চন্দ্র-বিজয়ী মহাকাশচারীরা ফিরে এসেছেন—সারা পৃথিবীর শ্রদ্ধা-সম্মান পেয়েছেন। তাহলে কি বলবো—চাঁদামামা ঘরের কাছে এসে গেছে, আর দূরের নয়—একান্ত কাছের!

এই ক'দিন আগে মৃত্যুর দূত এসে সকলের প্রিয় শ্রদ্ধার জন ক'টি মানুষকে পৃথিবী থেকে নিয়ে গেল। এদের সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন, তাঁরাই নিতান্ত আপনজন বিয়োগ-ব্যথা অনুভাব করছেন। এঁরা হলেন—সুবিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ও রবীন্দ্র-ভারতীর ডীন রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের প্রিয় দৌহিত্র সুলেখক মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও পরমশ্রদ্ধেয়া শান্তিনিকেতনের আশ্রমলক্ষ্মী রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী। এঁদের সকলের পরিচয় আমাদের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল বলে আমরা আজ সত্যিকার আপনজন হারানোর ব্যথা গভীরভাবে অনুভব করছি।

বিশেষ করে সকলের 'বৌঠান' এই প্রতিমা দেবীর সঙ্গে গত বছর পৌষ মেলার শেষে ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে আলাপ হয়। আমি সেবার শান্তিনিকেতনে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম। সিউড়ী থেকে ফিরছিলাম, কি জানি কি মনে হ'ল শান্তিনিকেতনেই থেমে গেলাম। শুনলাম কারুর সঙ্গেই দেখা করেন না তখন, কিন্তু কি সৌভাগ্য আমার হলো শুধু দেখাই নয়, কতক্ষণ কত গল্প করলাম। তাঁর নির্দেশে আন্তরিক আতিথেয়তার কথাও ভুলতে পারি না! এই প্রসঙ্গে পরম স্নেহের সুগায়িকা মঞ্জুর (শ্রদ্ধেয় সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর কন্যা মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়) কথা উল্লেখ না করলে ত্রুটি থেকে যাবে। বার্ধক্য ও অসুস্থতার ভারে প্রতিমা দেবী কানে খুব কম শুনছিলেন—আমারও ঐ পরিবেশের মাধুর্য নষ্ট করে জোরে কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না, মঞ্জুই আমাদের মধ্যবর্তী কাজ সমাধা করছিল।

রূপকথার রাজকন্যাকে সেদিন চোখে দেখলাম, জীবনের শেষ সময়, বার্ধক্যের আক্রমণ —তবুও যা দেখলাম, যা শুনলাম, সে তো কোনদিন ভুলতে পারবো না। অপূর্ব শান্ত-শ্রী, যেমন দীর্ঘ উজ্জ্বল চোখ, তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত রূপ—সত্যিই আশ্রমলক্ষ্মী তিনি। তাঁকে আমরা বার বার স্মরণ করি, শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই, আর সেই সঙ্গে রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্গত আত্মার প্রতিও আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। খ্যাতিমান লেখক মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কত সুন্দর সুন্দর লেখা এই 'মৌচাকে'ও তো তোমরা পড়েছ বহুদিন ধরে। আজ এইখানেই চিঠি শেষ করি। ভালবাসা ও শুভেচ্ছা নাও সকলে।

তোমাদের

মধুদি'

সম্পাদক—শ্রীসুপ্রিয় সরকার
শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।
মূল্য : ০'৫০ পয়সা

দশবার চন্দ্র-প্রদক্ষিণ করে অ্যাপোলো-৮'এর তিনজন মহাকাশচারী ফ্রাঙ্ক বোরম্যান, জেমস লোভেল ও উইলিয়াম অ্যাণ্ডার্স (বাম থেকে) প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ করেন। ছবিতে তাঁদের

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র *

৪৯শ বর্ষ] ফাল্গুন : ১৩৭৫ [১১শ সংখ্যা

[illegible]

শ্রীনবগোপাল সিংহ

'আকাশভরা সূর্যতারা', গ্রহ
ঐ যে আলোয় ঝলমলানো দেশ
ধরার মানুষ ভাবেই অহরহ
কোথায় সুরু, কোথায় বা তার শেষ ?

অসম্ভবের মন্ত্র বুকে নিয়ে
আমরা বসে পুঁথি পুরান ঘাঁটি,
সপ্তলোকের স্বপ্নটুকু দিয়ে
কল্পনাকে সাজাই পরিপাটি।

বিজ্ঞানীরা সন্ধানী যে ভারী
কোনো বাধা-বিঘ্ন সে না মানে,
চাঁদের দেশে জমালো তার পাড়ি
সফল হলো আলোর অভিযানে।

পক্ষবিহীন মানুষ মেলে পাখা
লক্ষ্যে তাহার হবে যে পৌঁছুতে,
মর্ত্যলোকে ঘুরলো যুগের চাকা
মাটির মানুষ চাঁদকে গেলো ছুঁতে।

পাশ্চাত্যের তিনটি তাজা প্রাণ
দুঃসাহসের খাঁচায় হলো জমা
অসম্ভবের ঘটলো বলিদান
করলো তারা চন্দ্র-পরিক্রমা।

চন্দ্রলোকে উদয়—পৃথিবীর
পৃথিবীরই মানুষ এলো দেখে
ধন্য মানুষ, ধন্য ত্রয়ী বীর
চন্দ্রে পদচিহ্ন এলো এঁকে !

জন্মভূমি সম্পর্কে

"ধন্য ধন্য জন্মভূমি আনন্দ-ভবন,
নয় নয় তুল্য তার নন্দনকানন।
স্বর্গ স্বর্গ করে লোকে সার তার নাম,
প্রকৃত সুখের স্বর্গ জনমের ধাম।"

—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

"ললিত শৈশব যথা যাপিত যৌবন,
ভুলিতে সে প্রিয় দৃশ্য চাহে কিগো মন।
চাই না সুরম্য স্থান নানা অলঙ্কার,
স্বর্গীয় মাধুর্যময় স্বদেশ আমার।"

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

"স্বদেশ রক্ষার তরে, সমরে কি কেহ ডরে
শতগুণ হয় বলী স্বদেশ-রক্ষায়।"

—দীনবন্ধু মিত্র

"জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ় ; শত ধিক্ তারে !"

—মাইকেল মধুসূদন

চাঁদের সাড়

শ্রীসুনন্দা দাশগুপ্ত

হাওয়াই দ্বীপের রাজা বড়ই মুশকিলে পড়েছেন। জেলের দল এক অদ্ভুত নালিশ নিয়ে এসেছে তাঁর দরবারে। যতবারই তারা জাল ফেলেছে সমুদ্রে, ততবারই কে যেন জালের সুতো কেটে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। কোন মাছ আর ধরা পড়ছে না। বারবার মেরামত করে নিয়ে জাল ফেলেছে তারা। আর, প্রতিবারই জালের সুতো পড়েছে কাটা। মাছ ওঠেনি একটিও।

শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে সবাই। রাজামশায় তাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, পরদিন খুব ভোরে যেন তারা মাছ ধরতে যায়। জেলেরা রাজার কথা মত পরদিন শেষরাতে খুব শক্ত, নতুন জাল নিয়ে বেরোল।

কিন্তু পরদিনও ঠিক তাই হ'ল। একটিও মাছ তো ধরা পড়লই না, উপরন্তু নতুন জাল একেবারে কুচি-কুচি করে কাটা।

তাজ্জব ব্যাপার! আকাশ-পাতাল অনেকরকম ভাবলেন রাজামশাই। কিন্তু ব্যাপারটা কোনরকম কিনারাই করতে পারলেন না। শেষে, বুড়ো মন্ত্রীর পরামর্শে ডেকে পাঠালেন এক নামকরা যাদুকরকে। সেই তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে তার বাস।

ঝোলা জোব্বা পরা, ইয়া গোঁফওয়ালা যাদুকর এল তার খড়িপাতি, হরেকরকম পুঁথিপত্তর, সাজসরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে। তারপর খড়ি দিয়ে নানারকম আঁকজোক করে বলল—

'সাগরের নীচে আছে লালো-নানার দেশ। সেখানে বাস করে জলপরী দু'ভাই তাদের বোন হিনাকে নিয়ে। মনে হচ্ছে জেলেরা জাল ফেলেছে সেখানে। আর সুন্দরী হিনা তাই বারবার কেটে দিচ্ছে তাদের জাল। এই হ'ল বৃত্তান্ত।'

রাজা খুব আশ্চর্য হলেন সেকথা শুনে। যাদুকরকে বললেন—'একটিবার দেখা যায় না তাদের?'

যাদুকর জানালে—'হিনার ভাই দুটি গেছে দেশ-ভ্রমণে, সাত-দরিয়ার পারে। ভারী দুর্দান্ত তারা। এইবেলা কৌশল করলে হিনাকে দেখা যেতে পারে।'

তিনদিন ধরে ভিনদেশী যাদুকরের সঙ্গে নানারকম পরামর্শ করলেন রাজামশাই। তারপর, সেরা কারিগরদের দিয়ে আশ্চর্য সুন্দর সব মূর্তি গড়ালেন। অপরূপ উজ্জ্বল পোষাক আর অলঙ্কার পরানো হ'ল মূর্তিগুলোকে। রাত হলে, রাজভৃত্যেরা মূর্তিগুলোকে জালের সুতোয় গেঁথে জলের নীচে ঝুলিয়ে দিলো। আরো অনেক সুন্দর সুন্দর সুসজ্জিত মূর্তি বসানো হ'ল এক একটি ফুল দিয়ে সাজানো নৌকোর উপরে। তারার আলোয়, সেগুলোকে আশ্চর্য সুন্দর মনে হচ্ছিল।

সবকিছু ঠিকমত সাজানো হলে পর, রাজার আদেশে সবাই দূরে সরে গেল। তারপর খুব জোরে শিঙা বাজাতে লাগলো বাঁশি-বাজিয়েরা। এত জোরে বাজল সেই শিঙ্গা যে, জলের নীচে প্রবালপুরীতে ঘুম ভেঙ্গে গেল হিনার। ব্যাপার কি দেখবার জন্য জলপরী তার শক্তির পালঙ্ক ছেড়ে উঠে এল। কৌতূহলী হয়ে উঠলো তাকে ঘিরে থাকা রঙীন পাখনাওয়ালা ফুরফুরে মাছের দল।

এমন আশ্চর্য টোপ দেখে খুব অবাক হ'ল জলপরী। ভাল করে দেখার জন্য সন্তর্পণে ঢেউয়ের ফেনায় ভর দিয়ে, ঝিনুকের ঝাঁকের সঙ্গে উঠে এল সে। তারপর, রাতের আকাশে চিক্‌চিক্ করা তারার আলোয় ফুলে-ভরা নৌকোর উপরে সাজানো মূর্তিগুলো দেখে সে একেবারে মোহিত হয়ে গেল। অগণিত মূর্তি দেখে ভাবলো, নিশ্চয়ই কোন দেবতা হাওয়াই দ্বীপের অধিবাসীদের কাঠের মূর্তি বানিয়ে রেখেছেন। দ্বীপে নিশ্চয়ই আর কেউই নেই। এই ভেবে, একেবারে নিঃশঙ্ক হয়ে সে সাঁতার কেটে একেবারে দ্বীপে উঠে এলো। নানারকম ফলে-ফুলে ভরা দ্বীপের সৌন্দর্য আরো ভালো করে দেখবে বলে, ইচ্ছেমত এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করে অবশেষে ক্লান্ত হয়ে এক পুষ্পকুঞ্জে ঘুমিয়ে পড়লো।

রাজাকেও একটা নতুন কিছু উপহার দিতে চাইল হিনা

রাজার ডাকে ঘুম ভাঙলো তার। রাজাকে খুব ভাল লাগল হিনার। মুগ্ধ রাজা যখন তাকে রাণী করতে চাইলেন, কোনরকম আপত্তি করলো না সে। দু'একবার যে তার সমুদ্রের ফুলে আর দুর্লভ মণি-মুক্তোয় সাজানো প্রবালদ্বীপের কথা, রঙবেরঙের সোনালী-রূপোলী মাছেদের কথা একেবারেই মনে পড়েনি, তা নয়। ভাইদের কথাও মনে হয়েছে বই কি! কিন্তু খোলা আকাশের নীচে এই মাটি, সবুজ গাছ-গাছালি আর রকমারি পাখীর গান তার মনকে টেনেছে। কাজেই, শীগ্‌গিরই একদিন খুব ধুমধাম

করে, হাওয়াই দ্বীপের রাজার সঙ্গে বিয়ে হ'ল সুন্দরী জলপরীর। টানা একমাস রাজ্যময় গা বাজনা আর আমোদ-আহ্লাদের ঢেউ বয়ে গেল। পরম সুখে দিন কাটতে লাগলো তাদের।

দুর্লভ সব হীরে মাণিক আর রঙীন সাজসজ্জা রাজা তাকে উপহার দেন প্রায়ই। একদি ভাবলো হিনা—উপহার তো ক্রমাগতই নিচ্ছি। রাজাকেও একটা নূতন কিছু, আশ্চার্য কি উপহার দিলে কেমন হয়?

রাজাকে বললো হিনা—'প্রবাল দ্বীপে, আমার শুক্তি-পালঙ্কের পাশে একটি ছোট্ট মরকতে বাক্স আছে। তার মধ্যে লুকোনো আছে এক পরম আশ্চর্য সম্পদ। আমরা তিন ভাইবো অনেক অনেক দিন ধরে সেটাকে পাহারা দিয়ে আসছি। একজন ডুবুরীকে বলো, এক ডুবে খুলে, সে বাক্সটি এখানে নিয়ে আসতে।'

রাজার আদেশ মত একজন ওস্তাদ ডুবুরী এক ডুবে সেই বাক্সটি এনে রাণীর হাতে দিল রাণী তাঁর খাসকামরায় রাজার সামনে সেই বাক্সটি খুললেন। খোলামাত্রই একটি আশ্চর্য উজ্জ্ব বলের মত জিনিস বেরিয়ে এল। আর রাণীর হাত ছাড়িয়ে, হাওয়ায় ভর করে উঠে গেল মা আকাশে। স্নিগ্ধ আলোয় চারিদিক ঝলমল করে উঠলো। তারার চেয়ে অনেক বেশী তা দীপ্তি। উজ্জ্বল সেই আলোর জ্যোতিতে মিট্‌মিট্ করতে করতে অবশেষে তারাগুলো লুকি পড়লো আকাশের ওড়নার নীচে।

সেই উজ্জ্বল, সুন্দর জিনিসটি কি জান? তা হ'ল চাঁদ। এর আগে কেউ কোনদিন চাঁ দেখেনি। চাঁদের কিরণ ঝরনার স্বত ঝরতে লাগলো চারিদিকে। দ্বীপের সব লোক খুব খুশ হয়ে নাচগান জুড়ে দিল। সাগরের বুকেও ঝক্‌ঝক্ করতে লাগলো চাঁদের আলো। ঢেউে ঢেউয়ে সেই রুপোলী আলো রাশিরাশি হীরের কুচির মতো ছড়িয়ে পড়তে লাগলে চারধারে।

তাই দেখে, ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল হিনার। রাজা জিজ্ঞেস করলেন—'এমন আলে দেখেও মুখ ভার করে রইলে কেন? তোমার এই আশ্চর্য উপহার পেয়ে খুব খুশী হয়েছি দেখছো না, প্রজারা সবাই কত আনন্দ করছে?'

কিন্তু রাণী বললে—'আমার ভাইরা তো এইবার জানতে পারবে, অমন দামী জিনিস প্রবালরাজ্য থেকে হারিয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে তারা বুঝতে পারবে আমি কোথায়! তারপর প্রচণ্ড বন্যার সঙ্গে তারা ছুটে আসবে এই দ্বীপে।'

রাজামশাই অভয় দিলেন রাণীকে। প্রজাদের আদেশ দিলেন—দূরের উঁচু পাহাড়ে একেবারে চূড়োয় চলে যেতে। গরু-বাছুর, টাকাকড়ি, ধনরত্ন সব নিয়ে সকলে আশ্রয় নিল, উঁ পাহাড়ের চূড়োয়। তারপর শীগ্‌গিরই একদিন, আকাশ-পাতাল কালো করে এলো ঝড়

ফুঁসে উঠলো সমুদ্র। গর্জন করে প্রকাণ্ড সব ঢেউ প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়লো হাওয়াই দ্বীপের উপর। পাহাড়ের চূড়োয় বসে হিনা শুনতে পেল, তালগাছের মত প্রকাণ্ড উঁচু ঢেউয়ের উপছে-পড়া ফেনার উপর সওয়ার হয়ে, তার ভাইরা তার নাম ধরে ডাকছে। ফিরে যেতে বলছে বারবার।

ক্রমাগত সাতদিন আর সাতরাত ধরে চললো এই তাণ্ডব। শেষকালে আট দিনের দিন শান্ত হ'ল সমুদ্র। ফিরে গেল তার নিজের জায়গায়। দেখা গেল, এই প্রচণ্ড বন্যায় ক্ষেতভরা সোনালী ফসল নষ্ট হয়েছে। নিশ্চিহ্ন হয়েছে মানুষের বসতি। চরম দুরবস্থা হয়েছে সবার। রাজার নিজের অবস্থাও কিছুমাত্র ভাল নয়। সবচেয়ে খারাপ ফল হ'ল এই যে, হিনাকেই সব বিপর্যয় আর দুর্ভাগ্যের মূল কারণ ভেবে রাজা খুব চটে গেলেন রাণীর উপর। ক্রমেই রাজা ঘৃণা করতে সুরু করলেন তাকে। রাজার আদেশে সকাল থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত ক্রীতদাসীর মত কঠোর পরিশ্রম করতে হ'ত তাকে। রাণী হয়েও, সারাদিন দাসী আর ভৃত্যদের সঙ্গে তাকে খাটতে হ'ত।

বেচারা জলপরী! কখনো ভাবেনি—এরকম একটা অবস্থা হবে তার! সারাদিন খেটে খেটে ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে সে ভাবে, কোথাও গিয়ে একটুক্ষণের জন্য জুড়োবার কোন ঠাঁই যদি থাকত!

কেন সে ভাইদের কথা শোনেনি! দেশ-ভ্রমণে যাবার আগে ভাইরা বারবার করে তাকে সতর্ক করেছিল। নিষেধ করেছিল, সাগর-সীমা ডিঙিয়ে নিষিদ্ধ দেশে যেতে! এখন ভাইদের কাছে যাবারও মুখ নেই তার। আর স্বামী·তো রেগেই আগুন!

ভাবে, আর চোখের জলে দিন কাটায় হিনা।

তারপর, ঘটলো এক আশ্চর্য কাণ্ড!

একদিন মাছ ধরছে সে। এমন সময়ে, তার পাশেই, হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে তৈরী হ'ল এক আকাশ-ছোঁয়া রামধনু-রঙ সিঁড়ি। ঝলমল করছে রোদে। সেই সিঁড়ি পৌঁচেছে সূর্যের ঠিক নীচেই।

আঃ! এতদিনে কোথাও একটা যাবার জায়গা পাওয়া গেল তাহলে! হিনা তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলো। কিন্তু যতই উপরে উঠতে লাগলো সে, ততই সূর্যের প্রখর উত্তাপ অসহনীয় হয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত, জ্ঞান হারিয়ে বেচারা পড়ে গেলো সিঁড়ি থেকে।

জ্ঞান ফিরে এলে পর, হিনা শুনতে পেলো, রাজামশাই খুব রাগারাগি করছেন। গভীর রাতে ঠিক মাথার উপর চাঁদকে দেখা যাচ্ছে। বেচারা হিনা খুব ভয় পেল! সারাদিন কাজ ফাঁকি দিয়েছে! না জানি কি শাস্তি তার পাওনা! ভয়ে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ল

সে। এমন সময় কি আশ্চর্য ! চাঁদের থেকে নেমে এল ধনুকের মতো এক রুপোলী সিঁড়ি আলোয় আলোময় হয়ে গেল চারদিক। সেই চন্দ্রধনু বেয়ে হিনা উঠতে সুরু করলো উপরে 'আঃ!' নিজের মনেই বললো সে, 'এইবার আমি সত্যিকারের একটা জুড়োবার জায়গা পাব চাঁদের দেশ কী চমৎকায় ঠাণ্ডা! সূর্যের মত গরম নয়।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে না উঠতে, রাজা এসে খপ্ করে তার একটা পা টেনে ধরলেন। হিনা জোর করে পা ছাড়িয়ে নিল। ধ্বস্তাধ্বস্তিতে খুব চোট লাগল তার পায়ে। কিন্তু তবু সে তর্‌তর্ করে উঠতে লাগলো চাঁদের দিকে।

চাঁদের দেশে এখনও মহাসুখে আছে হিনা। হাওয়াই দ্বীপের সেই রাজামশাই কোথায় আছেন এখন কেবা খবর রাখে তার! চাঁদের হিম-জমানো হিমানী মেখে সুন্দরী হিনার বয়স কিন্তু একদিনও বাড়েনি।

চাঁদের দেশের হিম দিয়ে বোনা শীতল-পাটিতে বসে সারাদিন সে চরকা কাটে আর গান গায়। চাঁদের চারদিকে যে হালকা মেঘের রাশি দেখা যায়, সেগুলো হিনারই চরকাকাটা তুলোর পাঁজ। ফুটফুটে পরিষ্কার চাঁদনী রাতে, চেষ্টা করলে তোমরাও দেখতে পাবে হিনা বসে বসে চরকা কেটে রাশিরাশি রুপোর জাল বুনেই চলেছে।*

*হাওয়াই দ্বীপের উপকথা।

কৃষ্ণ-কথা

শ্রীনরোত্তম হালদার

'কৃষ্ণচূড়া' রক্তবরণ ফুল
　নয়কো শিরস্ত্রাণ।
'কৃষ্ণপক্ষ' কারুর পাখা নয়,
　কালের পরিমাণ।

'কৃষ্ণলোহ' নয়কো কোন লোহ
　অয়স্কান্ত মণি।
'কৃষ্ণের জীব' নয় সে বলবান
　দুর্বলকেই গণি।

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গোরার নাম,
　হরিণ 'কৃষ্ণসার';
'কৃষ্ণপ্রাপ্তি' নয়কো সুখের কিছু
　মরণ বলি তার।

শ্রীঅবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশে থাকতো চাঁদ আর পৃথিবীতে থাকতো মানুষ। একালের কেউই তো ভাবতেই পারেন নি যে, পৃথিবীর মানুষ ওই মহাকাশে গিয়ে চন্দ্রলোক বিজয় করে আসবে। অবশ্য আমাদের দেশের পুরাণে দেখি—পৃথিবীর রাজারা কথায়-কথায় যেতেন স্বর্গে দেবতাদের সাহায্য করতে, কিন্তু কি উপায়ে তাঁরা যেতেন তার সঠিক বিবরণ আমরা জানি না—তাই ভাবতাম সে সবই গল্প-কথা।

শ' খানেক বছর আগে যখন জুলে ভার্নে নামে ইওরোপের এক সাহিত্যিক চাঁদে মানুষের অভিযান নিয়ে একটি উপন্যাস লিখলেন—তখনও সে উপন্যাস পড়ে কেউই ভাবতে পারেন নি যে—এমন কাণ্ড সম্ভব হবে।

কিন্তু আমাদের কালে সেই অসম্ভবই সম্ভব হয়েছে। আমেরিকার তিনটি বীর—লোভেল, বোরম্যান আর অ্যানডারস সত্যিই মহাকাশ ভ্রমণ করে এলেন আদর্শ, ধৈর্য, সহ্যশক্তি ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়ে। আজ সমস্ত পৃথিবী তাঁদের যশোগানে মুখর—গ্রহলোক আবিষ্কারের পথে তাঁরা তিনজন পথিকৃৎ—মহাকাশের কলম্বাস তাঁরা। তাঁদের দৃষ্টান্তে মানুষ যাবে আরো এগিয়ে—গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে অদম্য অভিযান চালিয়ে। তার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে রাশিয়ায়—সেখানে চেষ্টা চলছে শুক্রলোক বিজয়ের। কিন্তু সে কথা থাক। উপস্থিত চন্দ্রলোক বিজয়ে আমরা কি পেলাম আর কি হারালাম তার কথাই বলি।

চাঁদের কথা বলতে গেলেই তো আমাদের মনে পড়ে—ছেলেবেলায় শোনা সেই ছড়া—

'আয় আয় চাঁদ আয়
যাদুর কপালে আমার টি দিয়ে যা।'

কিংবা মনে পড়ে সেই গল্পটি। রাজা দশরথের ছেলে রামচন্দ্র আকাশে চাঁদ দেখে কেঁদে খুন—সেটি তাঁর চাই। সে বায়না কেউই ভোলাতে পারলেন না রামকে কোন রকমেই। ভাগ্যিস তাঁদের কুলগুরু বশিষ্ঠ উপায় বাৎলালেন—বললেন, 'বালক রামের হাতে একখানা আয়না এনে দাও। তাতে চাঁদের ছায়া দেখে রাম ভুলবে।' তাই রামের কান্না থামলো।

সেই চাঁদ তো সবায়েরি "চাঁদা মামা" হয়েছিলেন এতোকাল। কিন্তু যা পরিচয় জানতে পারছি চাঁদের—আর কি চাঁদের দিকে আমরা সেই আগের মত চোখে চাইতে পারব? কত না রূপকথার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ওই চাঁদ। সেই চাঁদের বুকে চরকা-কাটা বুড়ী থেকে শুরু ক'রে, চাঁদের আলোয় রাজপুত্তুরের মৃগয়ায় যাওয়ার বহু গল্প তো তামাদের মনে জমে আছে। সে কি আমরা সহজে ভুলতে পারব? মনে হয় তা পারব না, কারণ চাঁদের সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বহুকাল থেকে করছেন বিজ্ঞানীরা, বহু গবেষণার ফলাফল তাঁরা জানিয়েছেন আমাদের, কিন্তু তবু আজও চাঁদ উঠলে আমাদের মোহ জাগে।

চাঁদের সম্বন্ধে দিনে দিনে আমরা যা জেনেছি—তা কি কম? প্রথম তো আমাদের দেশের পুরাণে পেলাম যে, অত্রিমুনি, যিনি ছিলেন বশিষ্ঠমুনির সমকালীন, তাঁর চক্ষু থেকেই চাঁদের জন্ম। এ গল্পের গূঢ় অর্থ যাঁরা বোঝেন, তাঁরা বলেন—অত্রিমুনিই চাঁদের দিকে চোখ রেখে প্রথম জ্যোতিশাস্ত্রের প্রবর্তন করেন। চাঁদের তিথি ধরে বৎসর গণনা বহু প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। তার নাম চান্দ্র-বৎসর। বৈদিক-সাহিত্যে চান্দ্র-বৎসরের নাম হচ্ছে ইড়া-বৎসর।

শুধু আমাদের ভারত নয়, মিশর, আরব, গ্রীস প্রভৃতি দেশেও চান্দ্র-বৎসর চালু ছিল। আসলে যাঁরাই কৃষিজীবী, তাঁরা অতি প্রাচীনকাল থেকেই চাদের খবর রাখতেন। চাঁদের সঙ্গে বৃষ্টির ও জোয়ার-ভাঁটার সম্বন্ধও তাঁরা ধরতে পেরেছিলেন। আমাদের দেশে বৈদিক যুগে ওষধি, অর্থাৎ যে গাছ শস্য হলেই শুকিয়ে যায়, চাঁদ তার রাজা বলে 'সোম' নাম দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তখন তাঁরা সবাই চাঁদকে দেখতেন খালি চোখে।

চাঁদ বা গ্রহ-নক্ষত্রদের দেখবার ভঙ্গী প্রথম পালটালো গ্রীস দেশে। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ঐ দেশে ডেমোক্রিটাস একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন—তা দিয়ে দূরের জিনিসকে কাছে দেখা যেত। তার চেয়েও ভাল যন্ত্র বের করলেন সপ্তদশ শতকে গ্যালিলিও—যার নাম টেলিসকোপ (দূরবীক্ষণ যন্ত্র), যা দিয়ে দেখলে বস্তুর আকৃতি তিনগুণ বড় হয়ে যেত। সেই গ্যালিলিও বহু নতুন তথ্য শোনালেন ওই আকাশের জ্যোতিষ্কদের সম্বন্ধে। ক্রমে তৈরি হলো আরো

বেশী শক্তিসম্পন্ন দূরবীক্ষণ যন্ত্র—যার বলে মহাকাশের বহু অদৃশ্য গ্রহও দৃশ্য হয়ে উঠলো। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানীরা মেপেজুখেও ফেললেন প্রত্যেকটি গ্রহকে। পৃথিবীর তুলনায় গ্রহরা কে বড় বা কে ছোট তারও খোঁজ আর অজানা রইল না।

চাঁদের মাপ তো পাওয়া গেলই, তার মানচিত্রও তৈরি হলো। দেখা গেল, চাঁদের পরিমাণ হচ্ছে পৃথিবীর চোদ্দ ভাগের এক ভাগ তুল্য। আর চাঁদের দূরত্ব পৃথিবী থেকে দু'লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইলের মত। চাঁদে কি আছে না আছে তার বিবরণও দিনে দিনে জড় করে ফেললেন বিজ্ঞানীরা। বিশেষ সহায় হ'ল তাঁদের রাশিয়ার উদ্ভাবিত 'স্পুটনিক'। মহাকাশের খবর ক্রমে উদ্ঘাটিত হতে লাগলো। কিন্তু সেইটুকু জেনে তো মানুষ তৃপ্ত হতে পারে না। জ্ঞানের পিপাসা নিয়ে যে জন্মেছে, সে তো কেবল চায় দুর্গমকে জয় করতে, দুরূহকে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে। চাঁদে যাবার স্পৃহা ক্রমেই বাড়তে লাগলো মানুষের। রাশিয়া কি আমেরিকা কোন্ দেশ প্রথমে চাঁদে পৌছবে—এই ছিল তখন প্রশ্ন। এখন তো আমরা পেয়েই গিয়েছি সে প্রশ্নের উত্তর। আমেরিকা তো শীঘ্রই চাঁদে মানুষ পাঠাবেও বলছে।

একটি ভারী মজার কথা যে, একশো বছর আগে জুলে ভার্ণে আমেরিকার যে জায়গাটি থেকে উৎক্ষেপণ-যন্ত্রের সাহায্যে মানুষকে চাঁদে পাঠাবার গল্প লিখলেন, প্রায় সেই জায়গা থেকেই ছাড়া হলো স্যাটার্ণ রকেট মানুষকে চাঁদে পাঠাবার জন্যে। আজ জুলে ভার্ণে আর জীবিত নেই, কিন্তু আমরা আছি এবং আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, সেই শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিকের কল্পনাশক্তির সত্যতা দেখে।

হ্যাঁ—মারকিন দেশই চন্দ্রলোকে প্রথম মানুষ পাঠাবার গৌরব অর্জন করেছে। কিন্তু এর প্রস্তুতিপর্বে রাশিয়ার প্রচেষ্টাটুকুও ভুলে যাবার নয়, ভুলে যাবার নয় মহাকাশচারী লাইকা ও গ্যাগারিনের কথা। রাশিয়ার মহাকাশ গবেষণা সংস্থাই প্রথম জানালেন যে—চাঁদের গায়ে মানুষের পা আঠায় জুড়ে যাওয়ার অবস্থা লাভ করবে।

অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও তাই সমর্থন করলেন। তাঁরা অনুমান করলেন যে, চাঁদের ভূত্বক কোথাও ধূলো ধূলো নরম, কোথাও বা গ্র্যানাইট পাথরের মতই শক্ত।

পাঠানো হ'ল সারভেয়ার-৩ যন্ত্রকে। তারি মাধ্যমে জানা গেল যে বিজ্ঞানীরা যা অনুমান করেছেন চাঁদের ভূত্বক সম্বন্ধে, তা ভুল নয়। তারও পরে গেল মেরিনার-৭ ও ৮ যন্ত্র। ছবি পেয়ে গেলাম আমরা চাঁদের এ-পিঠের, অর্থাৎ যে পিঠ পৃথিবীর দিকে ফেরানো তার পুরোটুকুরই। তখনি চাঁদের এ পিঠের পুরো মানচিত্র তৈরি হয়ে গেল। সেই কঠিন কাজটি সম্পন্ন হ'ল রাশিয়া ও আমেরিকার মহাকাশ-সংস্থার যুগ্ম চেষ্টায়। চাঁদের পাহাড়, নদী, সমুদ্র প্রভৃতির নামকরণও হলো পৃথিবীর পাহাড় ইত্যাদির নামে ও বিভিন্ন দেশের মনীষীদের নামে।
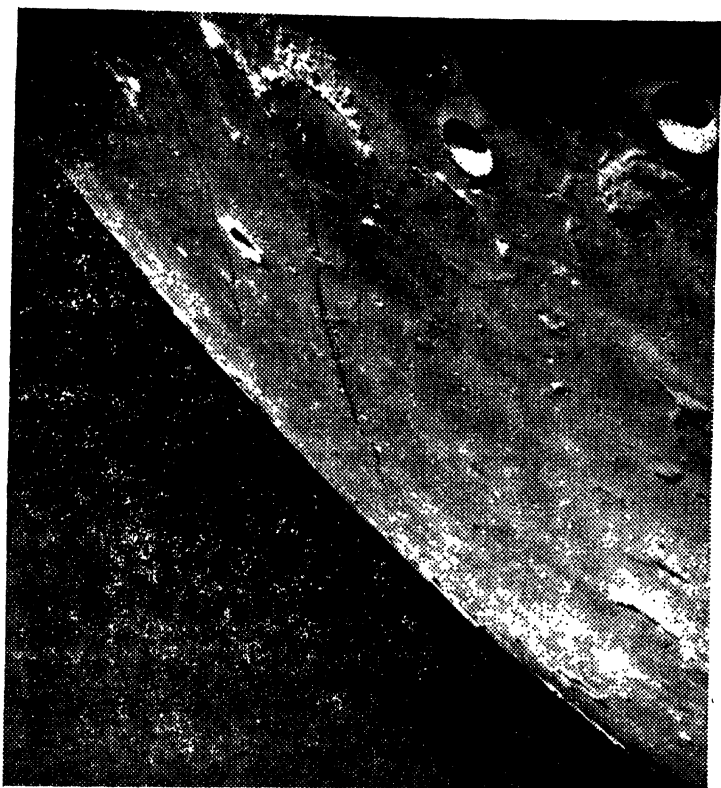
অ্যাপোলো-৮ মহাকাশযান থেকে গৃহীত চন্দ্রের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের চিত্র।

কিন্তু চাঁদের উলটো পিঠের খবর তখনো আমরা পাইনি। তা নিয়ে তাই বিজ্ঞানীদে চিন্তার বিরাম ছিল না।

উনষাট সালে রাশিয়া থেকে গেল লুনা-৩ মহাকাশ পরিক্রমায়। সেই যন্ত্রই সর্বপ্রথ চাঁদের উলটো পিঠের ছবি তুলে দিল—তাও সবটুকুর নয়, মাত্র তিন ভাগের দু'ভাগের ছবি। তা পঁয়ষট্টি সালে জন্‌ড্‌-৩ আবার উঠলো রাশিয়া থেকে মহাকাশে। এবারে পাওয়া গেল চাঁদে উল্‌টো পিঠের বাকী অংশেরও ছবি। জানা গেল—কঠিন ভূমি বলতে যা কিছু, তা আছে এ উলটো পিঠেই।

এর পরেই চাঁদে গিয়ে নামালো রাশিয়ার মহাকাশযান লুনা-৯—একটি ছোট্ট জ্বালামুখে কাছে। জানা গেল এমন জ্বালামুখ আছে চাঁদের গায়ে অসংখ্য। এ সব খবরই জানা গে ছেষট্টি সাল পর্যন্ত। তারপর থেকে মহাকাশে মানুষ পাঠাবার চেষ্টা শুরু হ'ল। এগি এলেন দুঃসাহসী অভিযাত্রী লাইকা আর গ্যাগারিন—মহাকাশে প্রথম প্রবেশ করলো মানু

সেই চেষ্টার একটি সফল অধ্যায় রচনা করলো অ্যাপোলো-৮ লোভেল, বোরম্যান ও অ্যানডার্স নামক তিন বীরকে বহন ক'রে নিয়ে গিয়ে। তাঁরাই প্রথম মানুষের দল, যাঁরা মহাকাশে পাঁচলক্ষ মাইল পরিক্রমা করে ঘরে ফিরে এসেছেন বিজয়ী হয়ে। অনেকেই তো ভেবেছিলেন যে, তাঁরা দুঃসাহস প্রকাশ ক'রে বিপদের মুখে এগিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ফিরে এসেছেন তাঁরা মহাকাশে শুধু মানুষের স্পর্শ রেখেই নয়, চাঁদকে ষাট মাইলের মত দূর থেকে দশবার পরিক্রমা ক'রে, চাঁদের পরিচয় আরো ভাল করে জেনে। উন্মুক্ত করে দিলেন তাঁরা মানুষের জয়যাত্রার পথ—বিপুল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দিকে যে পথ অন্তহীন। সহর্ষে তাঁরা বললেন, "পুরাতন পৃথিবীতে আমরা নতুন নাবিকদল। সাগর থেকে ঘরে না ফিরে, ফিরেছি মহাকাশ পাড়ি দিয়ে পৃথিবীতে।"

অভিযানের শেষ পর্ব আরো অদ্ভুত। যে স্যাটার্ণ রকেট চেপে তাঁরা মহাকাশে যাত্রা করেছিলেন, সেটির ওজন ছিল তিন হাজার টন আর দেহটির মাপ ছিল তিনশো চৌষট্টি ফুট লম্বা। তিনটি যাত্রীকে চাঁদের আকাশ দেখিয়ে ঘুরিয়ে আনতে স্তরে স্তরে তাকে খোলস ত্যাগ করতে হলো। নামলো সে পৃথিবীতে জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মত; যদিও তার মধ্যে তিন মহাকাশ বিজয়ী অক্ষত ছিলেন। যখন পৃথিবীর আওতায় এসে পৌঁছল রকেটটি, তখন তার ওজন হয়ে গিয়েছে পঞ্চাশ টনের মত আর লম্বায় দাঁড়িয়েছে মাত্র তিরিশ ফুটের মত। তার বেগ ছিল ঘণ্টায় পঁচিশ হাজার মাইল। পৃথিবীতে পৌঁছল মাত্র তার দেহাবশেষটুকুই।

যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল পৃথিবী থেকে একুশে ডিসেম্বর, তার শেষ হলো ছাব্বিশে তারিখে। পুরো ছ'দিন অভিযাত্রীরা ছিলেন যন্ত্রের কোটরে আবদ্ধ—তবে সবকিছুর ব্যবস্থাই ছিল সে কোটরে—কি বিভিন্ন যন্ত্রাদি আর কিই বা খাদ্য, পানীয়, বায়ু প্রভৃতি নিত্য ব্যবহারের দ্রব্য। তাঁরা তো শুভ বড়দিন-উৎসব করলেন ওই রকেটে কেবিনের মধ্যে—যে দৃশ্য পৃথিবীতে বসে বহু মানুষ দেখতে পেলেন টেলিভিশন যন্ত্রে।

একটি অপূর্ব কথা তাঁরা জানালেন যে, চাঁদ একটি মরুভূমির মত স্থান বটে, কিন্তু তার আকাশে পৃথিবী জাগে বৃহৎ চাঁদের মত রূপ নিয়ে, আর সেখানে সূর্যোদয় হয় অতি বিচিত্র রূপে, যে দৃশ্য পৃথিবী থেকে কারোর চোখে পড়ার নয়।

ধন্য হোক মানুষের এই গ্রহলোক বিজয়ের সূচনা, পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত হোক বিভিন্ন গ্রহলোক সর্বভাবে, মানুষের ইতিহাস আরো ভাস্বর হয়ে উঠুক।—এই মহান্ কামনাই আজকে প্রত্যেক মানুষের মনে জাগছে।

এ সম্বন্ধে প্রতিবাদও জানিয়েছেন বহুজন। তাঁরা বলছেন—"পৃথিবীর মানুষের কি উপকারে লাগবে এই চন্দ্রলোক অভিযান? যে বিপুল অর্থ ব্যয় করে আমেরিকা ও রাশিয়া এই চেষ্টা চালাচ্ছে, সেই অর্থ কি পৃথিবীতে আরো সার্থকভাবে ব্যয় করা যেত না?"

তারা যা বলছেন তা খুব যে অযৌক্তিক তা নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের জয়যাত্রা তো থেমে থাকতে পারে না। যেতেই হবে তাঁকে এগিয়ে। ফলাফলের দিকে দৃষ্টি রাখলে, তার গতি যে ব্যাহত হবে। সেই গতিই তো বিজ্ঞানের প্রাণস্বরূপ। আমরা ধন্য সেই বিজ্ঞানের যুগে, সেই গতির যুগে জন্মাতে পেরেছি। ক্ষণে ক্ষণে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্য দেখে চমৎকৃত হচ্ছি!

শিশু-সাহিত্য স্রষ্টা মোহনলাল

শ্রীঅর্ধেন্দুশেখর সেনগুপ্ত

মৌচাকের বিগত দিনের পাঠক-পাঠিকা আজ যাঁরা প্রবীণত্বের সীমানায় এসেছেন, সেখান থেকে সুরু করে আজকের নবীন যাঁরা তাঁদের সকলের কাছেই একটা বিশেষ পরিচিত নাম—মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

সাহিত্যের পরিবেশের মধ্যে মোহনলালের জন্ম ১৯০৯ সালে। শিশু-সাহিত্যের যাদুকর শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের নাতি, বিশিষ্ট সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বাবা, যাঁর লেখা জাপানী গল্প ও ভুতের গল্প ছোটদের কাছে আজও বিশেষ প্রিয়।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক। জমজমাট বাড়ি জোড়াসাঁকো। গুণীজনের আনাগোনা লেগেই আছে। সাহিত্যের আসর বসছে অহরহ। এ সব দেখে শৈশবেই গল্প লেখার ইচ্ছা জাগলো মোহনলালের। প্লট পাওয়া যায় না। কোথায় প্লট ? হাজির হলেন সরাসরি অবনদাদুর, কাছে। রঙ-তুলি থেকে মুখ তুলে হেসে 'অবন পটুয়া' বল্লেন, এই কথা, এর জন্যে ভাবনা ! স্বপ্ন দেখিস না ? স্বপ্নগুলো লিখে ফেল—গল্প এমনি এসে যাবে।

এমনি করেই গল্প লেখার হাতেখড়ি হ'ল তাঁর। মাত্র দশ বছর বয়সেই খাতার পাতা ভরে উঠল গল্পে। ছোট বেলা থেকেই বন্ধুদের কাছে ভালো গল্প লিখিয়ে বলে খ্যাতি পেলেন। নিতান্ত ছোট বয়সেই ভাই শোভনলালের সঙ্গে একত্রে লিখলেন ছোটদের গল্পের বই "সোনার ঝরনা" চেকোশ্লোভাকিয়ার রূপকথা অবলম্বনে এ বই শিশুমহলে আদর পেল।

ছোটদের আসরে পুরোপুরি জাঁকিকে বসলেন "বোর্ডিং স্কুল" বইয়ে। বোর্ডিং-এ বাস করা ছাত্রদের শিক্ষাজীবনের আশা-আনন্দ, দুঃখ-বেদনার নানান গল্পে-ভরা এই বোর্ডিং স্কুল ছোটদের অভিভূত করল। সে দিন থেকেই শিশু-সাহিত্যের সেরা লেখকদের মধ্যে স্থান পেলেন স্থায়ী ভাবে। অভিনবত্বের দাবীদার বই "বাবুই-এর এ্যাডভেঞ্চার"। বিদেশ ভ্রমণ-কাহিনী "চরণিক" ছোটদের ভালো না লেগে পারে না।
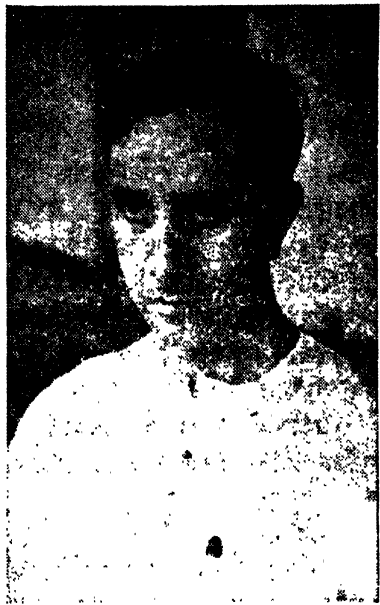
মোহনলালের একটি বিশিষ্ট কীর্তি হচ্ছে মারিয়া রেমার্কের লেখা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবলম্বনে "অল কোয়াইট অন দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট" গ্রন্থের সরল ভাষায় বাংলায় অনুবাদ।

অন্যান্য লেখার মধ্যে আছে ভ্রমণ-কাহিনী "লাফা যাত্রা", "পুনদর্শনায় চ" এবং চটকল নিয়ে লেখা "অসমাপ্ত চটাব্দ" ইত্যাদি। চারদিকে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধাদির সংখ্যাও কম নয়। ঠাকুরবাড়ীর স্মৃতি নিয়ে লেখা "দক্ষিণের বারান্দা" তাঁর সবচেয়ে স্মরণীয় গ্রন্থ। মিষ্টি হাতে লিখেছেন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার পীঠস্থান বিখ্যাত জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর নানা কথায় বাংলা-সাহিত্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে এই বই। ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে পাঠকদের নোতুন করে পরিচয় ঘটেছে এই বইয়ের মধ্যে দিয়ে।

মোহনলালের শিশু-সাহিত্যে অবদানের মধ্যে আছে নানা জিনিস। ছোটদের জন্যে লেখা প্রথম বরোয়ারি উপন্যাসের প্রথম অধ্যায় লিখেছিলেন তিনি—অবশিষ্ট ১১টি অধ্যায় লিখেছিলেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিকেরা। "মাস পয়লা" পত্রিকায় "অজানার উজানে" ধারাবাহিক প্রকাশিত হবার পর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

সতীকান্ত গুহের সঙ্গে একত্রে সম্পাদনায় ১৯২৮ সালে "চিত্রা" নামে একটি ছোটদের মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, দক্ষিণারঞ্জন, হেমেন্দ্রকুমার রায় থেকে স্বরু করে ছোট বড় সব লেখকই লিখতেন এই পত্রিকায়। দুঃখের বিষয় এই পত্রিকাটি বেশী দিন চলেনি।

"রংমশাল" নামে তিনি একটি বার্ষিক পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন ১৯২০ থেকে ১৯২২ পর্যন্ত। একবার ভাই শোভনলালের সঙ্গে যৌথভাবে একটি ছোটদের গল্প-সঞ্চয়ন প্রকাশ করেছিলেন। বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের নানান গল্প এতে ছিল। এই সঞ্চয়নটির নাম "ছোটদের গল্পগুচ্ছ"। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন ছোটদের গল্প-সঞ্চয়নে মোহনলালের গল্প স্থান পেয়েছে।

মোহনলালের গৌরবময় ছাত্র-জীবন কেটেছে কলকাতার হেয়ার স্কুলে, প্রেসিডেন্সী কলেজে, লণ্ডনের স্কুল অব ইকনমিকসে। কর্মজীবনে করেছেন নানান কাজ। তাঁর কর্মক্ষেত্রের মধ্যে আছে প্রেসীডেন্সী কলেজের গবেষণা কেন্দ্র, বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স, ইনষ্টিটিউট অব বিজনেস ম্যানেজমেণ্ট এণ্ড সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ইত্যাদি। সর্বশেষে নিযুক্ত ছিলেন পরিসংখ্যান উপদেষ্টা রূপে বরাহনগরের ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটে। পরিসংখ্যানবিদ রূপেও তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল।

মোহনলালের স্ত্রী চেকোশ্লোভাকিয়ার মহিলা সাহিত্যিক মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়, যাঁর লেখা অনুবাদ গল্পের সঙ্গে নিশ্চয়ই তোমাদের পরিচয় ঘটেছে।

মোহনলাল বর্তমানে করছিলেন সাহিত্যের নানা কাজ। তার মধ্যে ছিল শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা-সংগ্রহ, শিল্পগুরু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত, সাম্প্রতিক চেক কবিতার অনুবাদ। তাঁর অকালমৃত্যুতে এসব অসমাপ্ত রয়ে গেল।

ছোটদের মনের চাহিদা জানতেন তিনি ; সে জন্য তাঁর লেখা ছোটদের মনের আসল খোরাক জুগিয়ে এসেছে চিরদিন। তাঁর মৃত্যুতে ছোটদের সাহিত্যের একটা অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল!

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অরিন্দম এবার ডিঙির কাছে এসে পড়ল। বিল্লু ইতিমধ্যে কাপড়-জামা পরে তৈরী হয়েছে। লঞ্চের আগমনের সংবাদটা অরিন্দম টের পেল জলের মৃদু কম্পনে। লাফিয়ে সে উঠে পড়ল ডিঙিটায়। বিল্লুই তাকে প্রথম আঘাত করল, কিন্তু কিছুই ক্ষতি হ'ল না অরিন্দমের। অরিন্দমের এক প্রচণ্ড ঘুষি খেয়ে বিল্লু ডিঙির ওপর লুটিয়ে পড়ল। সেই ফাঁকে সুলতান বাদামের নীচে থেকে পিস্তল বার করে অরিন্দমের দিকে লক্ষ্য করতেই সে নীচু হয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার পেটে একটা লাথি মারল। সুলতান ডিঙির পাটাতনের উপর ছিটকে পড়ল সশব্দে।

নিশানা! চিৎকার করে উঠল বিল্লু।

সুলতান হামা দিয়ে ডিঙির উল্টো দিকে যেতে চেষ্টা করল। অরিন্দম তার ওপর নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডিঙির শেষে একটা হাউই আছে। সেটাতে আগুন ধরালেই পারে লোকেরা সাবধান হয়ে যাবে। হঠাৎ একটা ছায়া লক্ষ্য করে কাত হয়ে গেল অরিন্দম বিল্লু দাঁড় দিয়ে তাকে আঘাত করতে গিয়েছিল। অরিন্দম সেই মুহূর্তে অন্য দিকে সরে যেতে সেটা আর লাগল না। কান্তি আর সন্তোষ লঞ্চ থেকে লাফিয়ে ডিঙির ওপর উঠে পড়ল। কিন্তু তার আগেই বিল্লু আর সুলতান মিলিয়ে গেছে জলের তলায়। কান্তি কয়েকটা গুলি ছুঁড়ল তার রিভালবার থেকে। কিন্তু কোন লাভই হ'ল না। হতাশ হ'ল অরিন্দম। এভাবে হাত ফসকে যে দু'জনেই পালাবে, তা সে আশা করেনি।

আপনার কপাল দিয়ে রক্ত পড়ছে। বলল সন্তোষ। ও কিছু নয় উত্তর দিল অরিন্দম।

কিন্তু মাল কই? জিজ্ঞেস করল কান্তি।

ডিঙির হুকে দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে। বলল অরিন্দম।

দড়ি ধরে টান দিতে প্যাকেটটা উঠে এল। একটা এয়ার-টাইট পলিথিন ব্যা

ট্রানেজিস্টার রেডিও, লাইটার, টেপ-রেকর্ডার ছাড়া কয়েকটা সোনার বাট রয়েছে দেখা গেল। এখন কি করা যায় ? জিজ্ঞেস করল কান্তি।

উপস্থিত লঞ্চে ওটা থাক। বেশ ঠাণ্ডা লাগছে আমার। বলল অরিন্দম।

এক ঘণ্টার ওপর সে জলে ছিল !

কয়েক দিন বাদে অল হোয়াইট সোপ ফ্যাক্টরিতে গণপৎ, লতিফ, বিল্লু আর সুলতান বসে আছে। বিল্লুর ঠোঁট আর মুখ ফুলে আছে অরিন্দমের ঘুষির ফলে। লতিফ উঠে একবার পায়চারী করল মেঝের ওপর। বলল, এ নির্ঘাত অরিন্দম ছাড়া আর কেউ নয়। তা না হলে এত সাহস ! কিন্তু এল কোত্থেকে লোকটা ?

জাহাজে লুকিয়ে ছিল বোধ হয়। বলল সুলতান। বেটা এমন লাথি হেঁকড়েছে যে, এখনও পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে আমার।

তোমরা দু'জনে মিলে ওকে কায়দা করতে পারলে না ?

চেষ্টার কসুর করিনি আমরা, কিন্তু লোকটা বোধ হয় জাদু জানে। একবার আমায় তেড়ে আসছে, একবার সুলতানকে। কোমরে ছুরি ছিল একটা, সেটা তো বারই করেনি !

তোমরা বুদ্ধু, তাই তোমাদের শুধু হাতে সে কাজ সেরেছে ! দু'দুটো পিস্তল ছিল, কাজে লাগাতে পারলে না ! লতিফ আপসোস করল। কিন্তু লোকটা ডিঙিতে উঠল কেমন করে ? ধার থেকে নিশ্চয় যায়নি, কারণ ওখানে আমাদের পাহারা ছিল। নিশ্চয় পুলিশ-লঞ্চ তাকে জলে নামিয়ে দিয়েছিল, তোমাদের ডিঙির কাছে কোথাও।

তা হতে পারে। বলল বিল্লু।

কিন্তু খবরটা পেল কোথা থেকে ?

সকলে চুপ করে রইল। লতিফ তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকাল গণপতের দিকে। তারপর বলল, গণপৎ এ ব্যাপারে তুমি কিছু জান ?

না না, চীৎকার করে ওঠে গণপৎ—তোমরা আমায় মিথ্যে সন্দেহ করছ।

তুমি খুব সাধু লোক, না ? লতিফ আরও এগিয়ে এল তার কাছে।

না তা নয়, তবে আমি পুলিশকে কিছু জানাই নি।

তার প্রমাণ কিছুই নেই, তুমি দলকে ফাঁকি দিয়েছ বেশ কয়েকবার। আমার সন্দেহ হয় তুমিই পুলিশকে জানিয়েছ ?

গণপতের মুখটা সাদা হয়ে গিছে। কাঁপছে সে ঠকঠক করে।

অরিন্দম, সন্তোষ আর নরেনবাবু রাত আড়াইটের সময় জায়গাটায় পৌছল। মনোহারী দোকানের মালিক সামসুলের কাছ থেকে নরেনবাবু সংবাদ পেয়েছে যে আসামীরা অল

হোয়াইট সোপ ফ্যাক্টরিতে জড়ো হয়েছে। সামসুল পুলিশকে সংবাদ দেয় প্রয়োজন হলে। সে নরেনবাবুর একজন চর। তিনজনেই কাল সার্ট আর প্যান্ট পরেছে। প্রত্যেকের বেল্টে অটোমেটিক রিভলবার বাঁধা। সামসুলের দোকানের পিছনে অল হোয়াইট সোপ ফ্যাক্টরি। দেওয়ালের উপর উঠলে ফ্যাক্টরির ভেতর স্পষ্ট দেখা যায়।

অরিন্দম একটা উঁচু জায়গায় চড়ে দেখতে পেল ভেতরে জোর মিটিং চলছে। লতিফকেও চিনতে পারল সে। এলাহাবাদ থেকে সবাই হাজির হয়েছে কলকাতায়, মায় হরতন

'অরিন্দমের এক প্রচণ্ড ঘুষি খেয়ে বিল্লু ডিঙির ওপর লুটিয়ে পড়ল।' —পৃঃ ৪৮৫

পর্যন্ত! বিল্লু আর সুলতানকেও চিনতে দেরি হ'ল না তার। একজনের মুখের অবস্থা তখনও পর্যন্ত বিকৃত। লতিফকে উত্তেজিত হয়ে পায়চারি করতে দেখল সে। গণপৎ বেচারার অবস্থা সঙ্কটজনক। ভয়ে লোকটা আঁৎকে উঠছে থকে থকে। লোহার কড়াই ভর্তি কসটিক আর তেল পুড়ছে তিনটে উনুনে। জায়গাটা আগুনের আভাতে লাল হয়ে রয়েছে। হঠাৎ অরিন্দম দেখল, লতিফ কোমর থেকে একটা লম্বা ছুরি বার করে গণপতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। গণপৎ ছুটে একটা কড়াইয়ের পেছনে দাঁড়াল। লতিফ আর গণপৎ জলন্ত চুল্লীকে ঘিরে ঘুরতে লাগল। আর দেরি করল না অরিন্দম। তাড়াতাড়ি নেমে সে নরেনবাবু আর সন্তোষকে নিয়ে ফ্যাক্টরির সামনে গেল। একটা ঢিল ছুঁড়ল সে টিনের শেডের ওপর। শব্দ শুনে ভেতরের সকলে স্তব্ধ হয়ে গেল। লতিফ থমকে দাঁড়িয়ে গেল ছুরি হাতে। গণপৎ ধন্যবাদ দিল ভগবানকে মনে মনে। কারণ আর একটু হলেই সে লতিফের ছুরির নাগালে এসে পড়েছিল আর কি!

বিল্লু আর সুলতান দুটো পিস্তল নিয়ে ফটকের কাছে এসে দেখল কেউ কোথাও নেই।

দরজাটা বন্ধ করতে গিয়ে দেখল পাল্লা দুটো যেন কিসে আটকে গিয়েছে। ব্যাপার কি দেখতে যাবার মুখে, দরজার পাশ থেকে অরিন্দম আর সন্তোষ ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর। অরিন্দম বিল্লুর ওপর, সন্তোষ সুলতানের ঘাড়ে। দু'জনেই ধরাশায়ী হ'ল। অরিন্দম আর বিল্লু মেঝের ওপর গড়াতে লাগল। এক ফাঁকে অরিন্দম তার মুখে ঘুষি মারল একটা। ঠিক লাগল না সেটা ভাল মত। বিল্লু সেই সুযোগে অরিন্দমের বুকের ওপর বসে তার গলাটা টিপে ধরল সজোরে। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে অরিন্দমের। চোখ দুটো তার কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। দেহের সব রক্ত যেন প্রচণ্ড বেগে তার মুখ আর মাথার শিরা ছিন্ন করে বেরিয়ে আসবে এবার। চোখের সামনে জমাট ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে তার। শেষ চেষ্টা করল অরিন্দম। দেহের সব শক্তি সংহত করে, তার দুটো পা কোমর থেকে তুলতে লাগল ধীরে ধীরে। তারপর পিছন থেকে বিল্লুর গলায় কাঁচির মত আটকে দিল সজোরে। চাপ দিতে লাগল সে বিল্লুর গলায় দুটো পায়ের সাহায্যে। অরিন্দম গলার চাপ এবার কমেছে বলে মনে করল। আরও জোরে চাপ দিতে লাগল সে। বিল্লুর হাতটা ঢিলে হতেই উঠে পড়ল অরিন্দম। তারপর বিল্লুকে জামার কলার ধরে তুলে তার চোয়ালে একটা সোজা ঘুষি মারল। একটা হাড়ভাঙ্গার মত শব্দ হ'ল মট করে। আর বিল্লু লুটিয়ে পড়ল মেঝের ওপর আর্তনাদ করে।

দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল অরিন্দম। (ক্রমশঃ)

সফল গণনা

ডাঃ ননীলাল দে

মায়ের শুধু একটি ছেলে আদর-যত্নে রাখে,
কেমন করে করবে মানুষ, ভাবনা নিয়ে তাকে।
ছেলের গর্বে, আশায় বলে,—গণকঠাকুর এলে,
"দেখুন দেখি হাতখানা ওর; কেমন হবে ছেলে ?"
গণকঠাকুর হাতটা দেখে বলেন টিকি নেড়ে,
রাশিচক্র হয়না এমন, হাতটা যে ওর বেড়ে !
ছেলের দেখি ভবিষ্যতে ভাগ্য সুমহান,
জীবন ভ'রে করবে বহু শুধুই অন্নদান।
মায়ের গর্ব—ছেলের হাতে ভাগ্য চমৎকার,
হবে বুঝি মস্ত ধনী কিংবা জমিদার।
গণনা তো সফল! হলো যখন বড় হয়,
অন্নদান করেছে বটে—হ'য়ে 'হোটেল বয়'।

ঠগ-বর্ধন

শ্রীসুধীরকুমার করণ

বিশ্বাস কর আর না-ই কর,—বর্মা মলুক থেকে শোনা গল্প, আমার। ঠক-বর্ধনের গল্প।

আসল নাম কি ছিল জানি না। বর্ধন নামটি আমিই দিয়েছি। সেই ছোট বেল থেকেই দুষ্টুর শিরোমণি ছিল সে। চালাকীতে তখন থেকেই সে পাকা। গোড়ার দিকে বন্ বান্ধব সমবয়সীদের ঠকিয়ে, তাদের খেলনা নিয়ে বাড়ী পালাতো; কারুর হাতে মিষ্টি কিং লজেনচুস্ ইত্যাদি দেখলে, কি করে বাগানো যায়, তার চেষ্টা করতো। ফলে, সে দুষ্টুশিরোমণিকে সবাই একটা উপাধি দিয়ে দিল; উপাধিটা তার নামের আগে জুড়ে দিয়ে— সবাই তাকে ডাকতো ঠগ-বর্ধন ব'লে। শুনে বর্ধন কিন্তু রাগ করতো না; মিটিমিটি ক চোখ পিট্‌পিট্ করে, মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসতো শুধু।

মা-বাবা তার দুষ্টুমির চোটে অস্থির; পাড়া-প্রতিবেশীরাও। কিন্তু, বর্ধনকে কে মারধোর করতো না,—বকুনিও দিত না। কারণ কেউ এ কথা বলতে পারতো না ে ছোট ছেলেমেয়েদের হাত থেকে জোর ক'রে সে কিছু কেড়ে নিয়েছে। নিয়েছে তো, বুদ্ধি খেল্ দেখিয়ে নিয়েছে। অনেকে বরং তার বুদ্ধি দেখে অবাক্ হয়ে যেত। সবই অব দুষ্টু বুদ্ধি।

একটু একটু করে বড় হচ্ছে বর্ধন, তার বুদ্ধিও বাড়ছে তেমনি।

তখন কত আর বয়স হবে, এই বারো কি তেরো।

বর্ধন কি ভাবলো কি জানে। মা-বাবাকেও বুদ্ধির খেলা দেখাবার ইচ্ছে হ'ল বোধ হয়।

বাবা বললেন, ওরে বর্ধন, চল্ দেখি একবার ঐ গ্রাম থেকে ফিরে আসি। হাঁটে পারবি তো?

বর্ধন তক্ষুনি রাজী।

বাবা বললেন,—তা'হলে কিছু খাবার বেঁধে নে, পুঁটলিতে—রাস্তার জন্য—

কি একটা দুষ্টু বুদ্ধি, তক্ষুনি এসে বাসা বাঁধলো বর্ধনের মাথায়। বাপের পেছন পেছ পুঁটলি হাতে গুটি গুটি করে হেঁটে চললো সে বড় রাস্তা ধরে। কিছু দূর যেতে না যেতে মনটা উশখুশ্ করতে লাগলো; পুঁটলির ভেতর গুড়পিঠে। গন্ধটা তার নাকের ডগা ভুরভুর্ করছে—খাঁটি ঘিয়ে ভাজা। পুঁটলি খুলে, একে একে সব ক'টা পিঠেই পেটের মধ্ চালান করে দিলে।

বেশ কিছুদূর যাবার পর,—বর্ধনের বাবা বললেন, ওরে বদ্ধনে, ঐ গাছের তলায় বসি ে চল। ওখানে বসে খেয়ে নেওয়া যাক্—ক্ষিধে পেয়েছে। বর্ধন যেন আকাশ থেকে পড়লো বললো,—কি খাবে বাবা! খাবার তো রাস্তাকে দিয়ে এসেছি!

বাবা চোখ মুখ পাকিয়ে বললেন,—মানে ?

ঠগ-বর্ধন বললো,—সে কি বাবা,—তুমিই তো বলেছিলে,—বর্ধন, কিছু খাবার বেঁধে নে পুঁটলিতে, রাস্তার জন্য—। তাই—

ওর বাবা সব বুঝতে পারলেন। হারামজাদা পাজী, বাবার সঙ্গেও চালাকী করতে ছাড়েনি! বললেন,—যা, তোর মুখ দেখবো না আর। যা,—এক্ষুনি যা, এখান থেকেই যা।

রেগে কাঁই হয়ে, ও'র বাবা হন্ হন্ করে একাই এগিয়ে গেলেন।

ঠগ-বর্ধন কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরে এল।

এসে মা-কে বললো—মাগো, রাস্তায় বাবাকে সাপে কামড়েছে ; বাবা মরে গেছে গো মা! কয়েকজন দয়ালু লোক বাবাকে ধরাধরি করে নিয়ে আসছে বাড়ীতে। বলেই ডুক্রে কেঁদে উঠলো সে।

ওর মা-ও কাঁদতে বসলেন।

ঠগ-বর্ধন বললো,—এখন কেঁদে আর কি হবে মা, যারা বাবাকে নিয়ে আসছে, তাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা তো করে রাখতেই হবে। আমাদের বড় শুয়োর ছানাটি কেটে রান্না করে রাখি—

মা বললো, তাই কর বাছা ; আমি আর ভাবতে পারছি না।

ঠগ-বর্ধন তখন, শুয়োর কেটে রান্না ক'রে,—প্রায় অর্ধেক খেয়ে শেষ করে ফেললো।

কিছুক্ষণ পরে বর্ধনের বাবা সুস্থ শরীরে একাই ফিরে এলেন। বর্ধনের মা তো অবাক! বললো,—তবে যে বর্ধন এসে বললো, তুমি মরে গেছ, সাপে কামড়েছে তোমায়! বর্ধনের বাবা শুনে তো আরো রেগে গেলেন। বললেন,—আমি মরে গেছি! কোথায় সে পাজী, ছুঁচো ?—আজ দেখাচ্ছি মজা! মিথ্যেবাদী, হাড়বজ্জাত কোথাকার!

বর্ধন তখন বাকী মাংসটা আবার কখন খাবে, তাই ভাবছিল। বাপের হম্বিতম্বি শুনে ভয়-ও পাচ্ছিল, ঘরের কোণে বসে।

কিন্তু আবার নোতুন বুদ্ধি গজানোর আগেই তার বাবা খুঁজে বার করলেন তাকে। আর কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে, দমাদ্দম কিল চড় কষিয়ে ঘরের বার করে দিলেন। বললেন,—যা, তোর শুয়োরের মাংস নিয়েই বেরিয়ে যা। আর কোন দিন মুখ দেখাস্ নি। —যা—যা—

ঠগ-বর্ধন মনের আনন্দে, বাকী মাংসটুকু নিয়েই বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

গাঁয়ের শেষ মাথায় এক বুড়োবুড়ীর বাড়ী। বাড়ীর সামনে বেড়া। বুড়ো ছিল দারুন কিপ্‌টে, যাকে বলে কৃপণের যাশু। বুড়ো তখন নিজের হাতে, বেড়ার ভেতরের জমিতে আলু মূলো লাগাবার জন্য গর্ত খুঁড়ছিল।

ঠগ-বর্ধন কি যেন ভেবে নিল। তারপর বললো,—ও, জ্যাঠা, একটু মাংস নেবে না
শুয়োর ছানার মাংস,—আমি নিজে রান্না করেছি,—একটু চেখে দেখ—

শুনে বুড়োর জিভ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো। মাগ্‌নাতে মাংস পাওয়া যাবে
কিপ্‌টে বুড়োর আনন্দ হ'ল খুব। বললো—কে-ও বর্ধন নাকি? এস এস। অনেক
তোমাকে দেখিনি। এস এস ভেতরে এস, বড্ড ভালো ছেলে তুমি।

বেড়ার ভেতর ঢুকে, বর্ধন বুড়োকে বললো, অনেকটা মাংস আছে জ্যাঠা। আমি নি
জন্য সামান্য একটু রাখবো, বাকীটা সব তোমাকে দিয়ে দেব। তুমি আমাকে একটা মাটির ভ
দাও দিকি—

বুড়ো বললো,—দাঁড়াও, বাড়ী থেকে এক্ষুনি এনে দিচ্ছি। বলেই,—বুড়ো হাঁক-ড
সুরু করলো, ওগো—শুনছ।

বর্ধন হাঁ হাঁ করে উঠলো,—আহা, তুমি কাজ ছেড়ে যাবে কেন, আমি কি ঐ টুকু ক
পারবো না। আমিই যাচ্ছি জেঠীর কাছে—

বলতে বলতেই সে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। গিয়ে বললো, কৈ গো, জেঠী-মা কোথা
এই দেখ রান্নাকরা শুয়োর ছানার মাংস। এক টুক্‌রো খেয়ে দেখ, কি স্বাদ! জ্যাঠা বললে
তোর জেঠীকে দিয়ে আয়, আর এর বদলে সোনা-দানা যা নিবি, তাও নিয়ে আয়।

কিপ্টে বুড়ী বললো, ও-মা, শোন কথা! ছোঁথা বলে কি গা! সোনা-দানা দিয়ে দ
—কে বলেছে রে ছোঁড়া? জেঠী খেঁকিয়ে উঠলো।

বর্ধন ও সব কথায় কান না দিয়ে বললো, তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও জেঠী মা, অনেক দূরে যে
হবে আমাকে—। তারপর চেঁচিয়ে বললো: ও জ্যাঠা, জেঠী তো দিতে চাইছে না গো—

কিপ্টে জ্যাঠা, বাইরের থেকে চেঁচিয়ে বললো—দিয়ে দাও গিন্নী, যা চাইছে—এ-এ—

কিপ্টেনী তখন বাধ্য হয়ে, সোনা-দানা যা ছিল দিয়ে দিল বর্ধনকে, আর বর্ধন—সুড়ুৎ ক'
খিড়কি দরজা দিয়ে সরে পড়লো।

কিপ্টে বুড়ো যখন শুনলো সব কথা, তখন সে হাহাকার ক'রে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলো

ঠগ-বর্ধন হাঁটতে হাঁটতে বেশ কিছুদূরে গিয়ে, এক চৌরাস্তার মোড়ে এসে পৌছুলো
সেখানে, চার-পাঁচ জায়গায় গর্ত খুঁড়ে কতকগুলো সোনার টুক্‌রো—পুঁতে রাখলো। তারপ
গর্ত বুজিয়ে, ঐ সব জায়গা চিহ্নিত করে রাখলো। এরপর করল কি, একটা গাছের ড
ভেঙে লাঠি তৈরি করে, সেই লাঠিটা মাটিতে ঠুকতে লাগলো আর বলতে লাগলো,—অ
আয়, সোনাদানা আয় চলে আয়।

একটি ছেলেকে লাঠি ঠুকতে দেখে ঘোড়সওয়ার লোকটি জিজ্ঞাসা করল ঃ
কি করছ খোকা ?

একজন লোক ঘোড়ায় চড়ে সেই চৌরাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, সে একটা ছেলেকে লাঠি ঠুকতে দেখে বললো,—কি করছো খোকা ?

ঠগ-বর্ধন নির্বিকার ভাবে বললো—কি আর করবো ! এই লাঠিটা আমাকে এক ফকির দিয়ে বলেছে,—এর মধ্যে যাদু-শক্তি আছে। তাই পরখ করে দেখছি—

লোকটা ঘোড়া থেকে নামলো। তারপর বর্ধনের কাছে গিয়ে বললো,—তাই নাকি, ফকিরের দেওয়া লাঠি ! তা কি শক্তি আছে এর ?

বর্ধন বললো,—সব কথা বলতে মানা আছে মশাই ; আপনি যদি বিশ্বাস না করেন, তা'হলে আমি যে জায়গায় লাঠি ছোঁয়াবো, সেই জায়গা খুঁড়ে দেখুন,—বলেই চিহ্নিত জায়গাগুলোতে লাঠি ছোঁয়াল সে।

লোকটা তক্ষুনি, জায়গাগুলো খুঁড়ে ফেললো। আরো, আরো,—সত্যি সোনা যে ! বিস্ময়ে লোকটার চোখ কপালে উঠে গেল।

বললো,—বাঃ, সত্যি তোমার লাঠির গুণ আছে তো ;—তা তুমি ভাই ছেলেমানুষ,—এ লাঠিটা নিয়ে তুমি আর কি করবে ? তার চেয়ে তুমি বরং আমার ঘোড়াটা নাও,—দিব্যি চড়ে বেড়াতে পারবে,—

ঠগ-বর্ধন বললো,—বলেন কি মশাই ! আমার যাদুদণ্ড, আমি কাউকেই দেব না। বলেই সোনাদানাগুলো নিয়ে ওখান থেকে চলে যাবার উপক্রম করলো।

লোকটা তখন কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো। বললো,—তুমি আর একটা লাঠি চেয়ে নিও ফকিরের কাছ থেকে। এটি আমাকে দিয়ে দাও—সোনা ভাই, লক্ষ্মী ভাই !

বর্ধন একটু ভাবলো। তারপর বললো,—তা' অত ক'রে যখন বলছেন,—তখন তাই স
এই নিন্ লাঠি।

লাঠি দিয়ে, এক লাফে ঘোড়ার পিঠে চড়ে, উধাও।

সন্ধ্যে বেলায় এক গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছুলো ঠগ-বর্ধন। থাকবে কোথায় রাতে, কাউকেই চেনে না! সামনেই এক ধনী লোকের বড় পাকা-বাড়ী দেখে সোজা ওখানে চলে গেল বর্ধ বললো, আপনার আস্তাবলে, আমার তেজী ঘোড়াটাকে যদি আজ এক রাতের মত থাক দেন, ভালো হয়। এই রাত-বিরেতে কোথায় বা যাই,—তাই—

অনুমতি পেয়ে ঘোড়াটিকে আস্তাবলে বেঁধে, নিজেও আস্তাবলের মধ্যে এক পাশে থাকলো। ভোর হবার আগেই, বর্ধন করলো কি, তার ঘোড়ার নাদিতে কয়েকটা সো টুক্‌রো গুঁজে দিল। সকালে উঠে, একটা চালুনি চাইতে গেল সে। চালুনি নিয়ে ফি এল। সেই ধনী লোকটি কিন্তু, ওর কাজকর্মের উপর নজর রাখতে বললেন তাঁর চাকরকে। বললেন,—দেখে আয় তো, চালুনি নিয়ে কি করে?

এদিকে আস্তাবলের দরজা বন্ধ ক'রে ঠগ-বর্ধন ভেতরে গেল। যে লোকটা ওর উ নজর রাখছিল, সে ছোট্ট একটা ফাঁক দিয়ে দেখে কি,—সেই ছেলেটা চালুনির উপর ঘো নাদ তুলে নিচ্ছে আর জল ঢেলে পাতলা করছে। সবিস্ময়ে আরো দেখলো,—ময়লা জ ঝরঝর করে নীচে পড়ে যাচ্ছে চালুনির ফুটো দিয়ে আর চালুনীতে থেকে যাচ্ছে—সো টুক্‌রো। ওরে ব্বাবা! চাকরটা ছুটলো মনিবের কাছে খবর দিতে। মালিক!—ওর ঘো তো যে সে ঘোড়া নয়, ওর নাদির মধ্যে সোনা!

ধনী লোকটিও অবাক! তাই নাকি? তা'হলে তো ওর ঘোড়াটা কিনে নিতে হয়!

বর্ধনকে বেশ আদর-আপ্যায়ন করে ধনী লোকটি বললো, তোমার ঘোড়াটি সত্যি ভা তুমি ওকে বিক্রি করে দাও আমার কাছে, হাজার মোহর দিচ্ছি।

বর্ধন বলে—না না,— তা'হলে বাবা বকবেন আমাকে।

লোকটি বললো,—তোমার কত উপকার করেছি, ভেবে দেখ। রাতে আশ্রয় দিয়ে নৈলে কোথায় চোর-ডাকাতের হাতে পড়তে। হয়তো কেড়েই নিত তোমার ঘোড় আমি কিন্তু এম্‌নি চাইছি না, কেড়েও নিচ্ছি না।

ঠগ-বর্ধন যেন অনুভব করলো, ধনী লোকটির কথা। বললো,—আপনার কথা অ ঠিক। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এক হাজার মোহর নিয়ে, বর্ধন এবার পথ ধরলো। ঘোড়াটি দিয়ে এল ধনী লোকটিকে।

কিছুদূর যেতে না যেতেই এক অদ্ভুত ঘটনা দেখলো সে। এক বুড়ো আর এক বু

অকারণে হেসে গড়িয়ে পড়ছে এ-ওর গায়ে, ছেলেমেয়েরা যেমন করে থাকে। বর্ধন যেদিকে যাচ্ছিল, ওরাও সেই দিকেই যাচ্ছিল। বর্ধন, কি ভেবে, বেশ জোরে হাঁটতে হাঁটতে বুড়োবুড়ীকে ছাড়িয়ে বেশ কিছু দূরে চলে গেল। কমপক্ষে দু'তিন ঘণ্টা পরে হয়তো ওর সঙ্গে আবার দেখা হতে পারে, যদি সে রাস্তার ধারে বসে থাকে।

হাঁটতে হাঁটতে এক গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছুলো। দোকান থেকে একটা পর্দা আর একটা নোড়া কিনলো। একটা মোহর দিয়ে এক বুড়ীকে আর তার এক সুন্দরী মেয়েকে বললো,—আমার সঙ্গে এস—কাজ শেষ হলে, আর এক মোহর পাবে।

ওরা খুশি মনেই সঙ্গে গেল।

ঠগ-বর্ধন আবার ফিরে যেতে লাগলো সেই পথ ধরে। কিছু দূরে গিয়ে রাস্তার একপাশে পর্দা টাঙিয়ে, তার আড়ালে সেই সুন্দরী মেয়েটিকে বসিয়ে রাখলো। ওকে আর ওর মাকে বুঝিয়ে দিল, বুড়োবুড়ী এলে কি করতে হবে।

ওদিকে সেই বুড়োবুড়ী তেমনি ঢং-এ, হাসতে হাসতে এসে হাজির। ওদের দেখেই, ঠগ-বর্ধন নোড়াটি নিয়ে বুড়ীর মাথার চারদিকে ছোঁয়াতে লাগলো—যে বুড়ীকে মোহর দিয়ে নিয়ে এসেছিল তাকে। সেই হাসিখুশি বুড়োবুড়ী, ব্যাপারটা দেখে থমকে দাঁড়ালো।

হাসি-বুড়ো বললো,—কি করছো হে ?

ঠগ-বর্ধন বললো, বুড়ীর বয়স কমাচ্ছি। কয়েকবার ছোঁয়ালেই, সুন্দরী একটি মেয়ে হয়ে যাবে। এই গ্যাখ না—, বলেই বুড়ীকে বললো, তুমি পর্দার আড়ালে চলে যাও।

বুড়ী পর্দার আড়ালে চলে গেল, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই, আগেকার কথামত তার মেয়েটি পর্দার আড়াল থেকে বর্ধনের কাছে এলো।

সেই হাসিখুশি বুড়োবুড়ী তো অবাক্। ভেল্কিবাজি নাকি ?

সেই সুন্দরী মেয়েটি ঠগ-বর্ধনকে বললো,—তোমাকে ধন্যবাদ, তুমি আমাকে একটি সুন্দরী মেয়ে করে দিয়েছ।

হাসিখুশি বুড়োবুড়ীর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেল যে, সেই বুড়ীর বয়স কমে গেছে।

বুড়ো বললো,—অবাক করলে ভায়া! তা আমাদের বয়সও যদি কমিয়ে দাও, তা'হলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

ঠগ-বর্ধন বললো,—আজ তো আর হবে না। প্রতিদিন একজনের বেশী করা যায় না।

বুড়ো বললো, তোমার হাতে-পায়ে ধরছি ভাই, আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে কে জানে! আজই করে দাও—

বর্ধন বললো,—সহজে তো হয় না; এক হাজার মোহর চাই।

বুড়ো বললো,—তা, না-হয় দেব। তবে এখন তো আমার কাছে মোহর নেই। তুমি বরং একটু অপেক্ষা কর; বাড়ী থেকে নিয়ে আসি।

বুড়ো-বুড়ী চলে গেল মোহর আনতে।

বর্ধন তখন, তার সহকারিণী বুড়ীকে ও তার মেয়েকে, চলে যেতে বললো। কিছুক্ষণের মধ্যেই মোহর নিয়ে বুড়ো-বুড়ী ফিরে এল। বর্ধন বুড়োকে বললো, তুমিই এস আগে। বুড়ো ওর কাছে এলে, ওর মাথার চারদিকে কয়েকবার নোড়াটি ছুঁইয়ে বললো, যাও এবার পর্দার আড়ালে।

বুড়ো পর্দার আড়ালে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকলো, কিন্তু কিছুতেই আর বয়স কমে জোয়ান ছেলের মত হচ্ছে না বলে, ওখান থেকে হাঁক দিল,—কৈ হে,—কিস্সু হচ্ছে না যে। যেমনটি ছিলুম, তেমনটিই তো আছি।

বর্ধন বললো,—একটু দাঁড়াও, গিয়ে দেখছি।

গিয়ে বুড়োর মাথায় ধাঁই করে নোড়া ঠুকে দিলে আর বুড়ো সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান।

পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বুড়ীকে বললো,—একেবারে বুঁড়ো তো, তাই দেরি হচ্ছে। তা' ঘণ্টা দুয়েক সময় তো লাগবেই!- একটু ধৈর্য না ধরলে এ সব কাজ হয় নাকি!—আমার আবার বিশেষ একটু কাজ আছে। তোমাকে না হয়, কাল করে দেব, কি বল?

বুড়ী কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। বললো, তুমি বাছা আজই আমার বয়স কমিয়ে দাও। নৈলে বুড়ো যখন জোয়ান ছেলে হয়ে বেরুবে, আমাকে তখন আর চিনতেই পারবে না।

বর্ধন যেন ওর কথা বেশ ভালো করেই বুঝেছে—এমনি ভাব দেখিয়ে বললো,—তোমার কথাই ঠিক; কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু তা' হলে তো আরও একটা পর্দা চাই। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি ঐ গ্রাম থেকে একটা পর্দা নিয়ে আসি।

বুড়ী বললো,—তাই কর; আমি অপেক্ষা করেই আছি।

বর্ধন অবশ্য আর ফিরেনি।

দু'হাজার মোহরের মালিক হয়ে বর্ধন ভাবলো,—না, কাউকে আর ঠকাবো না। এবারে একটু সৎ হওয়া যাক্।

ঘুরতে ঘুরতে এক গাঁয়ে গিয়ে পৌছুলো আর সেইখানেই বাড়ী-ঘর ক'রে থেকে গেল।

এদিকে হয়েছে কি! ওর শয়তানীর কথা,—চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো, মুখে মুখে। শুনে সে দেশের রাজা তাঁর পাইক-পেয়াদাদের আদেশ দিলেন, ওকে ধরে নিয়ে এস। শেষ পর্যন্ত খুঁজেপেতে বর্ধনকে ধরা-ও হ'ল।

রাজা বললেন,—কোন কথা নয় ; ওকে বস্তায় পুরে, বস্তার মুখ বেঁধে সন্ধ্যার পরে নদীর জলে ফেলে দাও।

পাইক-পেয়াদারা সঙ্গে সঙ্গে ওকে বস্তায় পুরে, নিয়ে গেল নদীর ধারে। কিন্তু সন্ধ্যে হতে তখনো দেরি ছিল বলে, ওরা বস্তাটাকে নদীর ধারের এক গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে, চলে গেল তাড়ি খেতে।

ঠগ-বর্ধন বস্তার ভেতর থেকে শুনতে পেল, এক মাহুত তার হাতীকে তাড়াতাড়ি চলবার জন্য হেট্‌ হেট্‌ করে কি সব বলছে আর গাছের দিকেই যেন আসছে। বর্ধন তখন খুব জোরে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো,—আমি যুবরাজ হতে চাই না—চাই না।

শুনে মাহুত তাড়াতাড়ি হাতী নিয়ে গাছের তলায় এল। গাছের উপর ঝুলন্ত বস্তাটিকে দেখে বললো,—কি হয়েছে? কে ওখানে? এমন ক'রে চেঁচাচ্ছো কেন?

বর্ধন বস্তার ভেতর থেকে জবাব দিল,—কে ভাই তুমি জানি না ; তবে শুনে রাখ, রাজার ছেলেপুলে নেই বলে, যুবরাজ করার জন্য রাজার পাইক-পেয়াদারা লোক খুঁজছিল। আমাকে রাস্তায় পেয়ে ধ'রে নিয়ে এসেছে। তারপর এখানে ঝুলিয়ে রেখে, কোথায় গেছে তাড়ি খেতে। আমি কিন্তু রাজপুত্তুর হতে চাই না—চাই না—

মাহুত কি যেন ভাবলো। বললো, যদি আপত্তি না থাকে, তা'হলে—তোমার জায়গায় আমি যেতে পারি,—আমার জায়গায় তুমি আসতে পার।

বর্ধন বললো,—রাজা হওয়া বড় দুঃখের, বন্ধু—, ভেবে দেখ।

মাহুত বললো,—হাতী চালাই আমি, রাজা হতে আমার ভয় করবে না।

বর্ধন বললো,—বেশ তবে তাই হোক।

বলতে-না-বলতেই মাহুত গাছে উঠে বস্তা নামিয়ে ফেলে, বর্ধনকে মুক্ত ক'রে দিল আর নিজে বস্তার মধ্যে ঢুকে পড়লো। বর্ধন আবার পূর্ববৎ বস্তাটাকে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখলো। গাছ থেকে নেমে, অংকুশ দিয়ে, হাতীর কানের গোড়ায় এমন খোঁচা দিল যে, হাতীটা সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল।

ওদিকে বস্তার ভেতর থেকে মাহুত তখন মনের আনন্দে চীৎকার করছে,—আমি রাজপুত্তুর হব।

বর্ধন, সেই মরা হাতীর পেটে, অংকুশ খুঁচে খুঁচে, একটা গর্ত করে ফেললো—, যা'তে সেই গর্তের মধ্যে শকুনি ঢুকে যেতে পারে।

সন্ধ্যের আর বেশী দেরি নেই দেখে, বর্ধন কিছু দূরে এক ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকলো। সন্ধ্যের সময় পাইক-পেয়াদারা এসে—মাহুতকে দিলে নদীর জলে ফেলে।

সকালে, এক ঝাঁক শকুনি এল মরা হাতীর মাংস খেতে। হাতীর পেটে গর্ত দেখে, ওরা ঢুকে পড়লো তার মধ্যে। বর্ধন সব দেখছিল ;—এসে. তাড়াতাড়ি খড়কুটো, ছেঁড়া কাপড়—যা পেল তাই দিয়ে গর্তের মুখটা বেশ করে বন্ধ করে দিল। তারপর মরা হাতীর পিটে চড়ে এমন ধপধপ করে লাঠি-পেটা করতে লাগলো যে,- ভয় পেয়ে শকুনিগুলো একসঙ্গে ডানা মেলে উড়ে পালাতে চাইল। সঙ্গে সঙ্গে হাতীসুদ্ধ আকাশে উঠে পড়লো বর্ধন-ও।

লাঠি পেটা যখন বন্ধ করলো বর্ধন তখন, শকুনিগুলো আবার ডানা বন্ধ করলো—আস্তে আস্তে, আর হাতীটাও মাঠের মধ্যে নেমে পড়লো আস্তে আস্তে।

এর পর বর্ধনকে আর পায় কে! যক্ষুনি দরকার হয়, লাঠি পেটা করলেই হাতীসুদ্ধ আকাশে ওড়ে, লাঠি পেটা বন্ধ করলেই—নীচে নেমে আসে। উড়ন্ত হাতী দেখার জন্য চারদিকে ভিড় জমে গেল। এমন কি রাজা এবং তাঁর পরিষদরাও ছুটে এলেন মাঠে।

বর্ধন তখন নেমে পড়েছিল হাতীসহ।

রাজা দেখে ওকে বললেন,—একি তুমি? তুমি সেই শয়তান বর্ধন না? তুমি এখনও বেঁচে?

ঠগ-বর্ধন হাত জোড় করে বিনীত ভাবে বললো,—আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ, আমিই সেই। আমাকে নদীর জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, নাগরাজ দয়া করে, এই উড়ন্ত হাতী দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

রাজা বললেন,—বেশ, শুনে খুশী হলুম। তুমি, আমাকে তোমার হাতীটা দিয়ে দাও।

বর্ধন সঙ্গে সঙ্গে বললো,—আমাকে যদি যুবরাজ করেন—

রাজা বললেন,—এই মুহূর্তেই তোমাকে যুবরাজ করে দিচ্ছি। এখন থেকে তুমিই যুবরাজ।

রাজা তখন বর্ধনের নির্দেশ মত, হাতীর পিঠে উঠে হাতীটাকে লাঠি পেটা করতে লাগলেন আর সঙ্গে সঙ্গে হাতী উড়লো, আকাশে। রাজা তো আনন্দে অস্থির। মাটি থেকে আকাশে উঠেছেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন, হাতীর পেটে এক গর্ত,—খড়কুটো ন্যাকড়া দিয়ে ভরা। এ্যা! কি সব ময়লা,—বলেই রাজা টেনে খুলে ফেললেন সেই সব খড়কুটো, আর সঙ্গে সঙ্গে শকুনির ঝাঁক হাতীর পেট থেকে বেরিয়ে উড়ে পালাতে লাগলো। ফলে, হাতীটা এত জোরে মাটিতে আছড়ে পড়লো যে, রাজাকে আর বাঁচানো গেল না।

এর পর বর্ধনই হ'ল রাজা। তখন ওকে কেউ আর ঠগ-বর্ধন বলতো না, বলতো রাজ-বর্ধন। বলতো,—জয় রাজ-বর্ধনের জয়!

অল্প কথার গল্প

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত

আমাদের সামনের বাড়ির ভদ্রলোকের একটা পোষা কুকুর আছে।

কুকুরটা আকারে ছোটখাটো। লালচে রঙ; গায়ে মাথায় লম্বা লম্বা রোম। দেখতে বেশ। নাম টাইগার।

কুকুরটা সারাক্ষণ শেকল দিয়ে বাঁধা থাকে। কচিৎই শেকল খুলে দেওয়া হয়। ওটা শান্তভাবে শুয়ে থাকে বারান্দার এক কোণে, আর নয়ত গেটের এক পাশে। রাস্তা দিয়ে কোন কুকুর বা গরু যেতে দেখলে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। তখন বোঝা যায় ওটা ডাকতে জানে। নইলে সারাক্ষণ চুপটি করেই থাকে। আশ্চর্য! আমাদের পাড়ায় কুকুরের অভাব নেই, রাস্তার কুকুর। সারাক্ষণ ছুটোছুটি করছে আর ভোঁ ভোঁ। ওদের খামোকা হাঁকডাকে অনেক সময়ে বিরক্তি বোধ হয়। অথচ, ও-বাড়ির কুকুরটার সাড়াশব্দ কদাচিৎ পাওয়া যায়।

আমি আমার বাড়ির বারান্দায় বসে কুকুরটাকে চেয়ে চেয়ে দেখি। ওটা কেমন উসখুস করে, রাস্তার লোকজনের দিকে অসহায় ভাবে তাকায়।

একদিন খানিকটা মাংসের হাড় হাতে করে নিয়ে ও-বাড়িতে গেলাম, কুকুরটাকে খেতে দেব বলে। ঠিক সেই সময়েই ও-বাড়ির ছোট ছেলেটি এসে ওর গলার শেকলটা খুলে দিল। যেই ছাড়া পাওয়া অমনি কুকুরটা ছুটোছুটি শুরু করে দিল। একবার এদিকে ছুটে আসছে, আবার ওদিকে। সারা উঠোনে চরকিবাজি। ঠিক যেন একটা খরগোশ। একবার পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াচ্ছে, ফের ছুটছে। ওর ফুর্তি দেখে কে! অবাক হয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

হঠাৎ একবার ছুটে এল আমার কাছে। মাংসের হাড়গুলো আমি রাখলুম ওর সামনে। কিন্তু অবাক কাণ্ড! কুকুরটা তা দেখেও দেখল না। কেবল ছুটতে লাগল। দু'চারবার ছুটোছুটি করে, আবার এল আমার কাছে। মাংসের হাড়গুলো একবার শুঁকে দেখল, কিন্তু ছুঁল না। দৌড়ে ছুটে গেল উঠোনের আর এক প্রান্তে এবং ঐ একই ভাবে ছুটোছুটি করতে লাগল ঘাসের উপরে। থামবার নাম নেই!

ভাবখানা, তোমাদের মাংসটাংস আমি কিছু চাইনে। চাই স্বাধীনতা।

বন্যজন্তুদের খুঁজে পাওয়ার সবচেয়ে
ভাল জায়গা হ'ল – জলের জায়গা।
এখানে কোন লাইন অতিক্রম না করে
তোমরা যাত্রা থেকে সেই জায়গায়
পৌঁছতে পার কিনা দেখ।
জলের
জায়গা
যাত্রা
পথ

এ্যাটমবিদ্

শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

এ্যাটম্ বুঝিস ? পরমাণু, যা দিয়ে সব তৈরী—
শক্ত-নরম, ঠাণ্ডা-গরম, বন্ধু এবং বৈরী,
হাল্কা-ভারী, জড় অচেতন, তেতো-কষা-মিষ্টি,
বেগনে-সবুজ-নীল-হলদে, যতো রঙের সৃষ্টি,
আলো-আঁধার, রোদ আর ছায়া, ভালো এবং মন্দ,
গরল-সুধা, সুবাস-কুবাস, ছিরি এবং ছন্দ।
এটা যদি না বুঝিস ; মুদির দোকান কর গে ;
সায়েন্স পড়া ছেড়ে দিয়ে গড়ের মাঠে চর গে।
ওরে মুখ্যু, যা দেখেছিস সব এ্যাটমের নৃত্য,
আমিও এ্যাটম্, তুইও এ্যাটম্, প্রভু এবং ভৃত্য,
এ্যাটমগুলোর কারসাজিতেই সীসে এবং স্বর্ণ,
একটা হোলো উজল চাঁপা, আরটা কালো বর্ণ !
এ্যাটম্ আছে হাড়ে-মজ্জায়, এ্যাটম্ আছে রক্তে,
তফাত কেবল গুণতিতে আর বাঁধন ঢিলে-শক্তে।
আমাদের যে মাথার ঘিলু, সেও এ্যাটমের সঙ্ঘ,
কাজে-কর্মে ভাবনাতে তাই নানা রকম রঙ্গ।
এই যে আমার ল্যাবরেটারি, যাকে পাচ্ছি ধরছি—
কি ভাবছে বা কেন ভাবছে খাতাতে নোট করছি।
তার পরেতে বের করবো ঘিলু পালটাই যন্ত্র—
'রে' ছাড়লেই কাজ হবে তার য্যানো যাদুমন্ত্র !
বদ্‌লে দেবে ভাবার ধারা চিরকালের জন্য,
যা ভাবতে বলবো ছাড়া, ভাববে নাকো অন্য।
থাকবে নাকো দলাদলি শ্লোগ্যান কিংবা ঝাণ্ডা।
মস্তানি আর লে-লে-বাজী হয়ে যাবে ঠাণ্ডা !

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শুনে রাজা মহাখুশী। সে বগল বাজায়। বলে, "সত্যি ?"

যাত্রী বলে, "হাঁ-সত্যি। জ্ঞানী-বিজ্ঞানী তো তোমার মতই মানুষ।"

রাজা বলে, "আমার মতন সুন্দর ? চেয়ে দেখুন না।" রাজা যাত্রীর চোখের সামনে মুখ তোলে। যাত্রী দেখে, তার রূপের গাদ্দে রূপ ভেসে যায়! কালো রং, হোঁৎকা চেহারা, থ্যাবড়া নাক, কুঁৎকুতে চোখ। তার তুলনা নেই।

যাত্রী বলে, "অত সুন্দর নয়। তবে তোমার মত হাত-পা, চোখ, নাক সব আছে।"

রাজা বলে, "আর মাথা ?" তারপর হঠাৎ বল্‌ল, "দাঁড়ান, মাথায় মুকুট আছে। তা নাবাই। নইলে দেখবেন কি করে ?" রাজা এতক্ষণ মাথায় মুকুট পরেছিল। এবার মুকুট খুলে হাতে নেয়। তার মাথার সবটুক দেখা যায়। ধান ক্ষেত নয়,—এ যেন ধনে ক্ষেত, যেখানে ঢুকে গরু এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো শাক খেয়ে ধন্য ক'রে গেছে। যাত্রী অবাক হয়ে বলল, "মাথার চুল এমন হ'ল কি করে ?" তাতে রাজা শোক করে না। ঢোক গেলে, তারপর এক-মুখ হেসে বলে, "ও, তা তো জানেন না। বলি শহরে গেলাম। আর যদি চুলে শহুরে ছাট না দি, ভুল হবে। দেশ-গাঁয়ের লোক শহর-ফেরতা চিনবে কি করে বলুন তো ? লেজ থাক্‌লে তবে তো বানর ?" বলে রাজা জিভ কাটে।—

যাত্রী মুখ-টিপে বলে, "তা ঠিক।"

রাজা বলে, "বেলুনের নাম শুনেছেন তো? তেম্নি আছে সেলুন। শূন্যে তুলে চুল কাটে—এম্নিতর দোকান।"

যাত্রী বলে, "শূন্যে তুলে—!"

রাজা জিভের শব্দ করে বলে, "সত্যি আর শূন্যে নয়; উঁচু চেয়ারে বসিয়ে। সে দোকানে শূন্যে বসলেম। তারপর পরামানিক করল না কি!"

যাত্রী তার ভয়-ভরা চোখ দেখে বল্‌ল, "কি করল?"

রাজা বলে, "জিজ্ঞেস করল, কি ছাঁট? কিন্তু আমি কি তা জানি? তবু পাখসাট মেরে বললেম, নাগরাই ছাঁট!

যাত্রী জিজ্ঞেস করল, "একথা বল্‌লে কেন?"

রাজা বলল, "বড় দোকান! কত বড় চেয়ার, আয়না, যন্তর, ছবি। ভাল করে বল্‌তে হবে তো! শহরের ভাল নাম হ'ল গিয়ে নগর। আর নগর থেকে 'নাগ্‌রাই'। তখন সে বলল, চার আনা আর বার আনা,—না দু'আনা আর চৌদ্দ আনা? আমিও এক হাত নিয়ে নিলেম। বললেম, তা জান না! তা হ'ল গিয়ে এক আনা আর সাড়ে পনর আনা।"

যাত্রী বলে, "উঁচুদরের হিসেব! তারপর?"

রাজা বল্‌লে, "সে নিজের মাথা চুলকাল। তারপর আমার মাথায় জলের পিচ্‌কারি মারল, ডলাই-মলাই দিল। লোকটা বোকারাম, আমাকে ভেবেছিল ঘোড়া!"

যাত্রী হাসি চেপে বল্‌ল, "তারপর?"

রাজা বল্‌ল, "আমি তো আর ঘোড়া নই। আরামে পা ছুড়লেম না,—চোখ বুজ্‌লেম। একটা তোয়ালে দিয়ে সে আমার গা জড়াল। তারপর চুলে কঁ্যাচ্‌ কঁ্যাচ্‌ করে কাঁচি চালাল। সে তালে নাচ পায়। কিন্তু যখন শব্দ থাম্‌ল চোখ মেলে দেখি কিনা—বাবা রে!"

যাত্রী জিজ্ঞেস কর্‌ল, "কি দেখ্‌লে?"

রাজা বল্‌ল, "দেখি কিনা সে একটা ক্ষুর নিয়ে এল। ঘোড়ার পায়ের খুর নয়। চক্‌চকে গলা-কাটা ক্ষুর। তার এমন ধার, যেখানে লাগ্‌বে সাবাড়! সে বল্‌লে, এবার ঘাড় ছাঁটবে। গাছের ডাল ছাঁটা দেখেছেন তো? ছাল ছাড়ান নয়,—দু'খান করে ফেলা। তাই আমার কি হাল হ'ল জানেন?"

যাত্রী বল্‌ল, "না তো!"

রাজা বল্‌ল, "তাও ভেঙে বল্‌তে হবে? দোকান ঘরে সে আর আমি এই দু'জনে একলা। আমার পকেটে টাকা ছিল। ঘাড় ছাঁটবে ব'লে গলা কেটে, হয়ত পকেটে হাত গলাবে! তা

ভেবে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হ'ল। পিট্‌পিট্‌ করে তার দিকে চাইলেম। হঠাৎ বুদ্ধি খাটিয়ে বললেম—"

যাত্রী জিজ্ঞেস করল, "কি বল্‌লে?"

রাজা বল্‌ল, "গলা কেট না, পকেট মের না, বলে কান্নাকাটি করলেম না।"

যাত্রী বলল, "তা হ'লে গলা বাঁচিয়ে কি করে বেরিয়ে এলে? গালাগাল না গলাগলি করে?"

রাজা চোখ নাচিয়ে বল্‌ল, "তা বুঝলেন না! পিছল কথা কয়ে তাকে আছাড় খাওয়ালেম। খালি বললেম, এট্টুখানি জল খাব। এখন তেষ্টায় জল না দিলে তো মাছরাঙা পাখী হতে হয়। সে জল আন্‌তে গেল। আর সেই ফাঁকে আমি লেজ তুলে বাইরে ছুটলেম! সে জল রেখে দোর অবধি ছটফটিয়ে এল। পিছু ডেকে বল্‌ল, পয়সা দিয়ে যাও। কিন্তু আমি অ্যায়সা চালাক, সটান বাড়ী এলাম। তারপর আয়না দিয়ে দেখি কিনা—"

যাত্রী হেসে বল্‌ল, "কি দেখলে?"

রাজা বল্‌ল, "দেখি কিনা মাথায় যেন ডাকাত পড়েছিল। আমার চুল লুটপাট করেছে! তখন কি আর করি? পায়খানায় ঢুকলেম। কপাট বন্ধ করে কাঁচি দিয়ে চুল কাটলেম। দেখুন তো, ছাঁটকাট হয়নি?" তার চুল ছাঁটার রগড়ে ঠাট! যাত্রী বল্‌ল, "হাঁ, পাকসাট হয়েছে। কিন্তু জ্ঞানী ও গুণী লোকেরা এমন ছাঁট দেন না। তারা চুল সমান করে ছাঁটেন। তুমি বাড়ী যেয়ে মাথা মুড়িয়ে ফেল। চুল বড় হয়ে তাদের মত দেখাক।"

জুৎ সই কথা নয়, রাজা মনে মনে খুঁৎ খুঁৎ করে। সমস্ত শরীর খণ্ডত'র মত এঁকেবেঁকে নাক কুঁচকে বলে, "নেড়া হয়ে সারা মাথায় টাক বানাব? টিকি রাখতে হবে?"

যাত্রী বল্‌ল, "হাঁ।"

রাজা আহ্লাদী আর জল্লাদীকে দেখিয়ে বলে, "তা'হলে ওরা যে টিকি ধরে টানবে। তারপর নিজেই মীমাংসা করে বল্‌ল, "আমিও ছেড়ে কথা কইব না, হুঁ। ওদের চুল ছিঁড়ে ছাড়ব।" পরমুহূর্তে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে ওঠে। পেছনের কথা মনে পড়ায় বলে, "একদিন কি হয়েছিল জানেন?"

যাত্রী বলে, "না তো।"

রাজা বল্‌ল, "আমাকে হাঁদা ভেবে সর্বদা ওরা আমাকে ঠকাত। ওঁছা-পচা খাবার আমাকে গেদে গেদে খাইয়ে, ভাল স্বাদের জিনিস নিজেরা সবি মিটিয়ে খেত। কিন্তু আমি তো আর গাধা নই! ওদের আহ্লাদ ভাঙার ফাঁদ পাতলেম।"

যাত্রী জিজ্ঞেস করল, "তা কি রকম?"

রাজা মুখ ঘুরিয়ে বল্‌ল, "ওরা মায়ের মাথার উকুন তুল্‌ত তো। চেয়ে চেয়ে তা শিশিতে জমাতেম। আর ওরা ঘুমুলে ওদের মাথায় ছেড়ে দিতেম। আপনার ছোট করে চুল ছাঁটা, উকুনের সাজা তো জানেন না। তা কামড়ে নাচায়। ওরা নাচত আর আমি মজা দেখতেম।"

আহ্লাদী আর জহ্লাদী অবাক হয়ে বলে, "এমা! আমাদের উকুন তুলে ওর মাথায় দিতেম, আর ও কিনা—!"

রাজা দাঁত বার করে বল্‌ল, "কেমন! আর একদিনের কথা বলি। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখি পেটে রাক্কোস ঢুকেছে।"

যাত্রী বল্‌ল, "বল কি গো!"

রাজা বল্‌ল, "সত্যি কি আর রাক্কোস ঢুকেছিল! বেজায় খিদে পেয়েছিল। কি খাই কি খাই? ওরা তো পেটুক, হয়তো কিছু লুকিয়ে রেখেছে। তার খোঁজে ওদের ঘরে চুরি করতে যাই। বাতি উস্‌কে দিয়ে দেখি কিনা—ওরে বাস্‌ রে!"

যাত্রী বল্‌ল, "কি দেখলে? ওরা রাক্ষসী হয়ে গেছে!"

রাজা মাথা নেড়ে বল্‌ল, "উঁহু, তা নয়। দেখি কিনা আহ্লাদী উবু হয়ে ঘুমিয়ে আছে, আর তার পিঠে ইয়া লম্বা একটা কালো কুচ্‌কুচে সাপ! নড়ে না, চড়ে না। আরামসে ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু রাত পোয়ালে জাগবে তো! ওদের যা বিটকেলে স্বভাব। জেগেই ছোবল দেওয়া শুরু করবে। পয়লা আহ্লাদী, দোসরা জহ্লাদী, তেসরা যাকে ওরা পালে তাকে। সেরেছে রে! সাপটা ঘুমিয়ে থাকতে না সাবাড় করলে রেহাই পাবার আর কোনও উপায় নেই। কি করি, কি করি? খুঁজে-পেতে কাছাকাছি একটা বড় কাঁচি পেলাম। বোধ করি মায়ের ছিট চুরি করে নিজের জামা তৈরীর জন্য সে জুটিয়েছিল। মনে মনে আহ্লাদীর বুদ্ধিকে তারিফ করে কাঁচিটা কুড়িয়ে নিলেম। তারপর মরি কি বাঁচি ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে পুঁছিয়ে সাপটাকে কেটে দু'টুকরো করলেম। সাপটার একেবারে কুম্ভকর্ণের ঘুম,—হুম্‌ করল না, ফোঁস্‌ কর্‌ল না। কাটা শেষ হতে আমি দে ছুট্। বিছানায় ফিরে, মশারি গুঁজে দিয়ে ঝুম মেরে রইলেম। আসলে কি হয়েছিল জানেন?"

যাত্রী বল্‌ল, "না তো!"

রাজা বল্‌ল. "কি করে জানবেন? আমিই তখন বুঝিনি। টের পেলাম সক্কাল বেলা ঘুম ভেঙে নাচের ধুম দেখে। তার চুলের বেণীর আটআনি নেই। সাপ ভেবে আমিই তা কাঁচি দিয়ে কেটেছি। জিভ কেটে আর এড়াবার জো নেই। চোখ বুজে আমি মট্‌কা মেরে রইলেম, ধরা পড়ার ফাঁড়া কাটালেম। সে টের পেল না। হরিবোল!"

এবার টের পেয়ে চোখ গোল করে আহ্লাদী বল্‌ল, "এ মারে! ভেবেছিলেম ছুঁচোয় খেয়েছে, কিন্তু—"

রাজা কুঁৎকুতে চোখে হেসে বল্‌ল, "আর লাগবে? হাত মেলাও তো গলাগলিতে রাজি আছি। তা'হলে বল—গোল!"

যাত্রী বল্‌ল, "ব্যস্, এবারে গোল মিটিয়ে দু'জনে কোল দাও। কেত্তনের বেলায় নিজের খেয়ালে খোল বাজালে তো চলে না। তালের সঙ্গে মিলিয়ে বোল তুলতে হয়। জ্ঞানী-গুণীর তাই ভোল।"

রাজা চোখ গোল করে বলে, "জ্ঞানী আর গুণীরা খোল বাজায়?"

রাজার প্রশ্ন শুনে যাত্রী হেসে বলে, "সত্যি তারা কি আর খোল বাজায়? আসলে তারা তালগোল পাকায় না। পাকা খেলোয়াড়ের মত মিলেমিশে জীবনের খেলায় গোল দেয়।"

একবার খোলের কথা, আবার খেলার কথা শুনে রাজার চোখ আবার গোল হয়।

যাত্রী তা বোঝে। কথা ঘোলা না করে এবার সোজা ভাষায় বলে, "গান-বাজনা বল, খেলাধূলো বল, জ্ঞান-গুণ বল, দিগ্বিজয় বল, সব কিছু দখল করতে ছেলেবেলা থেকে লেখাপড়া করতে হয়। কুড়েমি ঠেলে ফেলে স্কুলে যেতে হয়। তবেই ভালছেলে হওয়া যায়। রাজার পোষাক পরে সাজলেই আর রাজা হওয়া যায় না। ভাল কাজ করে দেশের ও দশের উপকার করলে সবার মন জয় করা সম্ভব হয়। তাতে মনের রাজা হওয়া যায়। তাই সেরা দিগ্বিজয়। পরকে কেড়ে ও মেরে কক্ষনো নয়।"

রাজা বলে, "কিন্তু আহ্লাদী আর জল্লাদী বলেছিল, পক্ষিরাজ ঘোড়া চড়ে, পুষ্পক রথে চেপে, তীর-ধনুক আর তলোয়ারে পরকে মেরে-কেটে দিগ্বিজয় করতে হয়।"

যাত্রী বলে, "আজব কথার সে দিন পিঁপড়েয় খেয়েছে! তুমি তো ষাঁড়ের পিঠে, গাধার পিঠে চড়ে সে চেষ্টা করেছিলে, কিন্তু পারিনি। এবার লেখাপড়ার পিঠে চেপে চেষ্টা কর। আমার স্কুলে এসো, ঠিক পারবে।"

রাজা একটু চিন্তা করে মাথা নেড়ে বলে, "ঠিক পারব তো? তা' হলে গোল!" আর গোল রইল না। সবাই বুঝল রাজা রাজি হয়ে গেল। মহারাজা মন দিয়ে শুনে বল্‌ল, "তা' হলে এঁকে গুরু মেনে দণ্ডবৎ কর রাজা।" রাজা ট্রেনের মেঝেয় উবু হয়ে যাত্রীকে প্রণাম করে, আর মহারাণী, আহ্লাদী, জল্লাদী কল্‌কলিয়ে উলু দেয়। যাত্রী রাজার মাথায় হাত দিয়ে বলে, "আশীর্বাদ করি, তুমি সত্যিকার রাজা—সবার মনের রাজা রাজা হও। আজগুবী কথার আজব রাজা নয়!"

সমাপ্ত

প্যারীচরণ সরকার স্মরণে

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী

প্রথম ভাগের শিক্ষা বিদ্যাসাগরিক।
তারপরে পরিচয় নতুন অক্ষরে
তোমারই তো ফার্স্ট বুকে, হে প্যারিচরণ।

বিদ্যাসাগর ও তুমি, দোঁহে পরস্পরে
রাজপথ খুলে দিলে বিশ্বের চত্বরে
নিখিল জ্ঞানের পানে। বিশ্বনাগরিক
হবার সুযোগ এল বাঙালীর ঘরে।

কত না গিয়েছে যাত্রী সেই পথ ধরে;
তোমাদের মহা কীর্তি করেছে মহৎ
কতজনে; দিনে দিনে মহত্তর পথ:
চিরদিন বাঙালী তা করিবে স্মরণ।

আমিও গেছি তো কিছু, তবে অকিঞ্চন
সে-বিশ্বযাত্রায় হতে পারিনি সরিক।

তবু ভাগ্যে, তুমি লিখেছিলে ফার্স্ট বুক,
আমার বিদ্যাও তাই হোলো অতটুক।
'ওয়ান মর্ণ আই মেট এ লেম্ ম্যান্'—
পড়তে না পড়তেই আমি অজ্ঞান।

জেলের কয়েদি থেকে হয়ে সাংবাদিক
সেই বিদ্যের জোরে তরে তো গেলাম,
আমার বারংবার—'সরকার সেলাম!'

মেঠুড়ে

ক্রিকেট

রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার মধ্যে এডিলেড মাঠে অষ্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ পুরো পাঁচ দিনের খেলার পরও অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। এর আগের তিনটে টেস্টেই জয় পরাজয়ের মীমাংসা হয়েছিল।

খেলার প্রথম দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ২৭৬ রানের উত্তরে যখন অষ্ট্রেলিয়া কোনো উইকেট না হারিয়ে ৩৭ রাণ সংগ্রহ করল, তখন কেউই ভাবতে পারেন নি খেলাটা অমীমাংসিতভাবে শেষ হবে। তারপর ৬ উইকেটে ৪২৪ রান তুলে অষ্ট্রেলিয়া যখন দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করল তখন অনেকেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হারকে কল্পনার চোখে দেখেন। তৃতীয় দিন ৫৩৩ রানে অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হবার পর কল্পনা বাস্তবে রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনায় পৌছল। কিন্তু প্রথম ইনিংসের খেলায় ২৫৭ রানের পেছনে থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে তৃতীয় দিনের শেষে যখন ৩ উইকেটে ২৬১ রান সংগ্রহ করল, তখন কেউ ভাবতে পারেন নি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পরাজয় থেকে রেহাই পাবে। সেই খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ শুধু পরাজয় থেকে রেহাই পায়নি, শেষ দিকে তাদের সামনে ছিল জয় সম্পর্কে রঙিন আশার হাতছানি।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসের ২৭৬ রানের ভেতরে সোবার্সের অধিনায়কোচিত ইনিংস দর্শকদের সবচেয়ে আনন্দ দেয়। মাত্র ১৩২ মিনিটে সোবার্স ১১০ রান করেন। এই সিরিজে সোবার্সের এটা প্রথম সেঞ্চুরি, টেস্ট খেলায় বিংশতিতম। ১১০ রানের মধ্যে ১৫ বার তিনি বল পাঠান বাউণ্ডারির বাইরে এবং গ্লীসন ও কলোনীর বলে দু'বার দুটো ছক্কাও মারেন।

এ ছাড়া এ খেলাটাতে দুটো রেকর্ড হয়েছে। একটা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসে নবম উইকেট জুটি হলফোর্ড ও হেণ্ড্রিকসের ১১২ রান আর একটা, ওই দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ৬১৬ রান। অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় দুটোই নতুন রেকর্ড।

এডিলেডের চতুর্থ টেস্টের ফলাফল অমীমাংসিত থেকে যাওয়ায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের 'রাবার' লাভের আর কোন সম্ভাবনাই নেই।

* * *

আট হপ্তার অষ্ট্রেলিয়া সফর সেরে ভারতের স্কুল ক্রিকেট দল দেশে ফিরে এসেছে। স্কুল ক্রিকেট দলের '৬৭ সালের ইংলণ্ড সফরের মতো, যেখানে তারা একটা খেলাতেও হার স্বীকার

করেনি, অষ্ট্রেলিয়া সফরের সাফল্য তেমন গৌরবময় না হলেও এ সফরকেও সফল এবং সার্থক সফর বলা যেতে পারে। মোট উনিশটা খেলার ভেতর ভারতের স্কুল ক্রিকেট দল চারটে জয়ী হয়েছে, বারোটা খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থেকে গেছে, জলবৃষ্টির জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে দুটো খেলা, আর মাত্র একটা খেলায় হেরে গেছে।

অষ্ট্রেলিয়া সফরকারী স্কুল ক্রিকেট দলের ম্যানেজার অতীত দিনের খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় হিমু অধিকারী বলেছেন, আমাদের দলের ছেলেরা খারাপ ফিল্ডিং করেনি। ব্যাটে-বলে দক্ষতা তো দেখিয়েছেই, দলে ফাস্ট বোলার না থাকা সত্ত্বেও আমাদের ছেলেদের চাতুর্য-পূর্ণ বোলিংয়ে ফাস্ট বোলারের অভাব অনুভব করা যায়নি। শ্রীঅধিকারী চৌকস খেলোয়াড় হিসেবে কে. ঘাবরি, ব্যাটসম্যান হিসেবে রাজা মুখার্জি ও লক্ষ্মণ সিং এবং বোলার হিসেবে দীপঙ্কর সরকার, মহীন্দার অমরনাথ এবং শঙ্কর পালের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

* * *

কলকাতায় আয়োজিত সারা ভারতের স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বাংলা স্কুল দল ফাইনালে অন্ধ্র দলকে ৩১৯ রানে হারিয়ে সি কে. নাইডু ট্রফি লাভ করেছে।

কলকাতায় দ্বিতীয় বার্ষিক প্রতিযোগিতায় গুজরাট, দিল্লী, অন্ধ্র, আসাম, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, মধ্যভারত ও পশ্চিমবঙ্গ—এই আটটা রাজ্যের স্কুল দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। প্রথম রাউণ্ডে বাংলা ৯ উইকেটে পরাজিত করে গুজরাটকে, একই ফলাফলে অন্ধ্র বিজয়ী হয় আসামের বিরুদ্ধে; মধ্য প্রদেশর বিরুদ্ধে দিল্লী এবং পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র প্রথম ইনিংসের ফলে বিজয়ী হয়; সেমি ফাইনালে বাঙলা দিল্লীকে হারিয়ে এবং অন্ধ্র মহারাষ্ট্রকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে।

দিল্লীর প্রথম ইনিংসের ১১২ রানের উত্তরে বাংলা ৬ উইকেটে ৪৪৬ রান করায় দিল্লীর জয়ের কোন আশাই ছিল না। অপর সেমি-ফাইনালে মহারাষ্ট্রের জয় খুবই কৃতিত্বপূর্ণ প্রথম ইনিংসে ৭৫ রান পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচয় তাদের জয়ের কারণ। ফাইনালে অন্ধ্রের বিরুদ্ধে বাঙলার জয় সহজ করে রবি ব্যানার্জী, দীপঙ্কর সরকার ও পি. চেলের মারাত্মক বোলিং, যার ফলে দু ইনিংসে অন্ধ্র ৯৬ রানের বেশী সংগ্রহ করতে পারেনি। অপর দিকে দু ইনিংসে বাংলা করছে ৪১৫ রান।

স্কুল ক্রিকেটে চারজন খেলোয়াড় সেঞ্চুরি ও একজন বোলার হ্যাটট্রিক করেছেন। সেঞ্চুরি করেছেন দিল্লীর প্রীতিন্দর সিং মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে, মহারাষ্ট্রের ভরত কুন্দরস পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে আর বাংলার রাজা মুখার্জী ও পালশ নন্দী সেমি-ফাইনালে দিল্লীর বিরুদ্ধে। আসামের বিরুদ্ধে অন্ধ্রের সি. চন্দ্ররাজের হ্যাটট্রিক সমেত ৩৯ রানে ৭ উইকেট লাভ উল্লেখ্য। তবে হ্যাটট্রিক করতে না পারলেও ফাইনালে অন্ধ্রের বিরুদ্ধে রাঙলার পি. চেলের মাত্র ১২ রানে সাতটা উইকেট এক উজ্জ্বল বোলিং কৃতিত্ব।
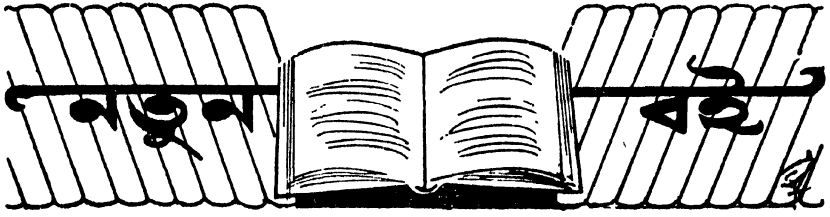
(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

গল্পের ফুলঝুরি—শ্রীইন্দু গুপ্ত সম্পাদিত। ঐক্যতান, ৪, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে শ্রীঅজয়কুমার ভৌমিক কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৩'০০

ছেলেমেয়েদের সুন্দর, সুশোভন একটি গল্পের সংকলন। যে ধরনের গল্প সাধারণতঃ ছোটরা ভালবাসে এবং ছোটদের রচনায় যাঁদের হাত পাকা, সম্পাদক বেছে-বেছে তাঁদের লেখা ১৩টি নানা জাতীয় গল্প এই সংকলনে ছেপেছেন। লেখকদের মধ্যে আছেন, স্বর্গত হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জীবিতদের মধ্যে আছেন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী ও বিশু মুখোপাধ্যায়। চার রঙের মলাটটি দেখলে ছোটরা সকলেই যেমন খুশি হবে, তেমনি গল্পগুলি পড়লেও আনন্দ পাবে।

—

শতদল—শ্রীসরল দে সম্পাদিত। শ্রীঅনিল রায় কর্তৃক লক্ষ্মী প্রিন্টিং প্রেস, ৩৩।৪, রামদুলাল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২'০০

'শতদল' আর একটি সুন্দর রঙচঙে ও নানা ধরনের গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা ও ছড়ায় ভরা শারদীয় ছোটদের সংকলন। লেখাগুলির মধ্যে বহু নামকরা লেখকের যেমন নাম আছে, তেমনি নাম না-করা লেখকদেরও লেখা আছে অনেক। কিন্তু সব লেখাগুলিই সুখপাঠ্য। লেখার সঙ্গে হেডপীস, টেলপীস ও ছবিতে ভরা এই সংকলনটি হাতে পেলে ছোটরা যে আনন্দিত হবে তাতে আর ভুল নেই।

—

মানবেন্দ্রনাথ রায়ঃ জীবনালেখ্য—শ্রীস্বদেশরঞ্জন দাস। গ্রন্থকার কর্তৃক 'ড্রিমল্যাণ্ডস্'কলিকাতা ২৮ হইতে প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থানঃ জিজ্ঞাসা, ১এ, কলেজ রো, কলিকাতা ৯। মূল্য ২'০০

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নাম তোমরা অনেকে হয়ত জান, আবার অনেক হয়ত জান না। তিনি একজন বিখ্যাত ভারতীয় বিপ্লবী মনীষী ছিলেন। ইংরেজ শাসনের হাত থেকে ভারতকে মুক্ত করার জন্য অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ এবং বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ সাধনের জন্য তিনি কখনো সি. মার্টিন, কখনো হরি সিং প্রভৃতি ছদ্মনামে জার্মান, জাপান, ফিলিপাইন, যবদ্বীপ, চীন, আমেরিকা, রাশিয়া, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশেই জীবনের অধিকাংশ দিন কাটান। তারপর ভারতে আবার ফিরে আসেন ২য় মহাযুদ্ধের সময়। অনেক মূল্যবান বই লিখেছেন তিনি, কারাবাসও করেছেন অনেকবার। এই সুন্দর লেখা বইখানি পড়লে তাঁর বিস্ময়কর জীবনের অনেক ঘটনা জানতে পারবে তোমরা এবং জেনে উপকৃত হবে।
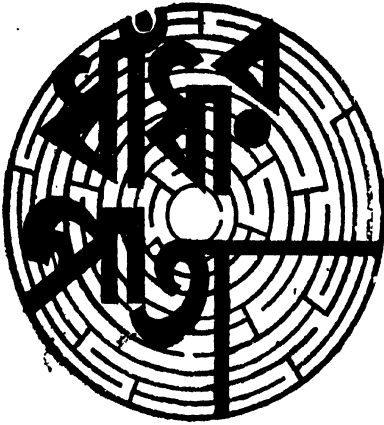
হারান অক্ষরগুলি বার করো

A	M	A	E
N	E	T	P
I	G	V	I

উপরের ও নীচের খালি ঘরগুলিতে একটি করে অক্ষর বসিয়ে, পাঁচটি অক্ষরের এমন একটি করে ইংরেজী শব্দ তৈরি করো, যার প্রত্যেকটিরই একটি অর্থ হয়। তিনটি শব্দ তো এখানে দেওয়া আছে, কাজেই ব্যাপারটা তোমাদের কাছে খুব শক্ত বলে মনে হবে না।

শ্রীরামেশ্বর কোঙার (কলিকাতা)

বলতে পারো ?

(অ) আমেরিকার জাতীয় ক্রীড়া হিসাবে বিশেষভাবে কোনটি পরিচিত ? (আ) টেই ক্রিকেটে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অষ্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বেশী কত ইনিংস ওঠে, কত সালে ? (ই) বি কি নামকরা খেলা প্রায় হকির মতই স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডে খেলা হয় ?

শ্রীতৃপ্তি দাঁ (মজাফরপুর)

বিন্দু ও লাইন

একটি চৌকো ঘরে আটটি লাইনের সাহায্যে ছোটছোট ন'টি ঘর তৈরি করে, তা চতুর্দিকে একটি করে বিন্দু (অর্থাৎ ফুটকি) দিয়ে ১৬টি বিন্দু বসান যায়, কিন্তু তোমরা কি আটটি লাইনের প্রত্যেকটিতে ৫টি করে বিন্দু দিয়ে সর্বসমেত ১৮টি বিন্দু বসাতে পারো ?

শ্রীকমলা ভট্টাচার্য (পুরুলিয়া

(উত্তর আগামী মাসে বেরুবে)

॥ গত মাসের ধাঁধার উত্তর ॥

১। মধুসূদন দত্ত ২। অবনীন্দ্রনাথ ৩। মৌচাক ৪। সুধীরচন্দ্র সরকার ৫। কু মল্লিক ৬। তারাশঙ্কর ৭। প্রমথনাথ বিশী

সম্পাদক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার

শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : ০.৫০ পয়সা
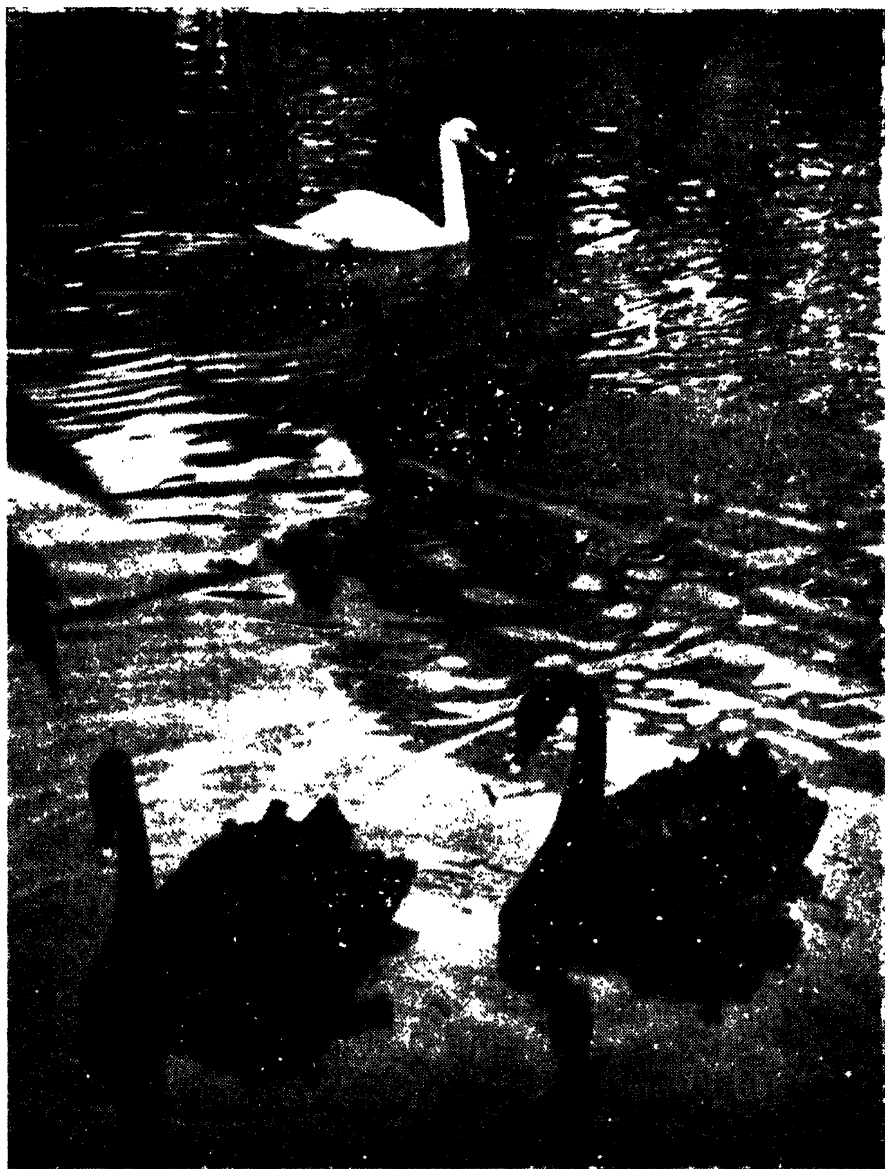
আলোকশিল্পী ঃ শ্রীঅরুণ সেনগুপ্ত

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র *

৪৯শ বর্ষ] চৈত্র ঃ ১৩৭৫ [১২শ সংখ্যা

জাদুঘর

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

আছে এক জাদুঘর আমাদের পাড়াতে
রূপে গুণে কেউ তাকে পারবে না হারাতে।
বিদুরের খুদ রাঁধা সে পুরানো হাঁড়িটি,
নারদের ভাঙা ঢেঁকি আর তাঁর দাড়িটি,
রাবণের কোপে কাটা জটায়ুর পাখনা
ঝাঁপি ঢাকা আছে: তার খোলেনাকো, ঢাকনা।

মন্দোদরীর পাশা, চেড়ীদের গয়না
তাও আছে, সে ঘরেও দোর খোলা হয় না।
হরধনু ছিল জান ? তার কিছু অংশ,
পুতনার নথ, আর মহারাজ কংস
যে পাথরে আছড়িয়ে শিশুদের মারতো
ক্ষয়ে ক্ষয়ে আজ তার নেই কিছু আর তো—

তবু সে কি পেল্লায় ভারী আর চওড়া।
ন'টা ইঞ্জিনে টেনে এনেছিলো হাওড়া।
তেলে ও সিঁদুরে লেপা, পড়ে আছে ছাদে তা
সেটাও দেখতে মানা, দেখলেই কাঁদে তা।

জনক রাজার শাল, কর্ণের পাগড়ি
কৃষ্ণের বনমালা, রাধিকার মাকড়ি
যশোদার উদুখল, কালীয়ের দন্ত
আরও কত টুকিটাকি, নেই তার অন্ত।
একালেরও বহু মালে ভরা সেই খোপটি,
হিটলার বাবাজীর প্রজাপতি গোঁফটি,
হিলারী'র গাম-বুট, ইয়েতি'র চামড়া
রেখেছি এ জাদুঘরে সবকিছু আমরা।

দেখতে ইচ্ছে হলে, না ঝাল না মিষ্টি
এমন মুখটি নিয়ে না খরা না বৃষ্টি,
দিনও নয় রাতও নয় এমন এক প্রহরে
চোখ বুজে যেতে হবে নিমতে'র শহরে ঃ
ফাঁকিপাড়া টপকিয়ে গুল্-পটি লেনটি
ঢুকেই মস্ত বাড়ী,—কপাটের চেনটি
নাড়লেই খুলে যাবে প্লাষ্টিক দরজা,
নহবতে শোনা যাবে তানসেনী তরজা
যেমনি ঢুকতে যাবে বেধে যাবে পেটটি
আর ঠিক সাথে সাথে বুজে যাবে গেটটি।

তাছাড়া যখনি যাবে হবে সেটা অসময়
টিকেট পাবে না কেউ কাঁদলেও সে সময়।

মাছ-পরী

শ্রীঅজিতকুমার সু

উড়োজাহাজটা একেবারে উল্টেপাল্টে টাল খেতে খেতে নিচের দিকে নামতে লাগলো। তারপর কি হোল জানো? একদম নিচে যখন নেমে এল, তখন উড়োজাহাজটার নিচেই নীল জল আর জল—একটা সাগর। সর্বনাশ! কি হবে উপায়! আমার তো তখন প্রাণটা আর খাঁচার মধ্যেই নেই। কেন জানো না বুঝি?—আমি তো তখন ঐ উড়োজাহাজটায় চেপে! তারপর?…

তারপর জলে ছুঁই-ছুঁই অবস্থা। হঠাৎ একটা বিরাট শব্দ!—আমাদের উড়োজাহাজটা একদম সাগরের জলে। ডুবতে ডুবতে ডুবতে ডুবতে আমরা তো নিচে নামছি। নামছি তো নামছিই! অনেকক্ষণ পরে আমাদের উড়োজাহাজটা আর নামল না। সাগরের তলায় গিয়ে ঠেকেছে ততক্ষণে। তারপর আমরা তো দরজা খুলে নামলাম সব্বাই। নিচে কত রকমারি গাছ—সুন্দর সুন্দর পাতা; কত ঝিনুক, কত পাথর, কত নুড়ি—কোনটা চক্‌চক্ করছে, কোনটা চিক্‌চিক্ করছে। আমরা দেখতে দেখতে এগোতে লাগলাম। এগোচ্ছি তো এগোচ্ছি! হঠাৎ একটা পথের রেখা দেখতে পেলুম। এবার নিশ্চয়ই কোন বাড়ীতে গিয়ে হাজির হওয়া যাবে। আর তাছাড়া আমার তো খিদেও পেয়েছিল খুবই। যতই এগোই, দেখি ছোট ছোট, পরে বড় বড় থাম আরম্ভ হোল পথের পাশাপাশি - কত কারুকার্য করা সে সব! কিছু দূর যেতেই আরম্ভ হোল গম্বুজ, মিনার বসানো সব সাদা, লাল, নীল, হলদে সৌধ। কোনটা আবার রূপোর মত ঝিকঝিক করছে, কোনটা তো সোনারই গড়া বলে মনে হোল। কত রত্ন বসানো সৌধও তারপর নজরে পড়ল। সেখানের হাওয়াটা কি মিষ্টি! রকমারি গাছ, ফুল দিয়ে ঢাকা সে সব সৌধের ফটক। হঠাৎ মিষ্টিগানের সুর ভেসে এল কোথা থেকে। কি সুন্দর তালে তালে বাজনা বাজছে তার সঙ্গে! কেউ বা নাচছে তখন, কেননা নূপুরের রিমঝিম শব্দও কানে আসছিল কিনা। আমার কিন্তু তখন পেটে আর কিচ্ছুই নেই! পেট-চুঁইচুঁই অবস্থায় কতক্ষণ আর গান ভালো লাগে। তবে সুরটা কিন্তু একেবারে মন-মাতানো। তোমাদের আর একটা কথা মনে করিয়ে দিই। আমাদের চারপাশে কিন্তু জল তখনও। মনে নেই বুঝি, আমরা তো তখন সাগরে ডুবে আছি। হঠাৎ দেখি, একটা মস্ত মাছ পিছন থেকে গুঁতো মারছে! ওরে বাবা! মাছ আবার এত বড় হয় নাকি! কিন্তু এ তো শুধু মাছই নয়—মুখের জায়গায় দেখি মানুষের মুখ—পেট অবধি মানুষের মত—তারপরই মাছের মত ন্যাজ প্রকাণ্ড! তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই কি যেন ইশারায় বোঝাল। প্রথমে বুঝলুম না। পরে ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখি, ও খাবার জন্যে

ডাকছে। আর যাই কোথা, আমি তো সেই সন্ধানই করছিলুম। তাড়াতাড়ি পিছু পিছু ছুটতে লাগলুম। হঠাৎ পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি—আরে, আমার সঙ্গীরা তো নেই! আমি একা-একাই ছুটে এলুম! কি হবে তা'হলে? যাই হোক্, সন্থ খেয়ে তো আসি, তারপর এখন খুঁজে বের করা যাবে তাদের। কিছুটা যেতেই মাছটা আমাকে পিঠে করে তুলে নিলে, আর অমনি এপাশ-ওপাশ এঁকে-বেঁকে পাঁই পাঁই ছুট।

ছুটতে ছুটতে হাজির হলুম একটা মস্ত বড় প্রাসাদে। সেটা যে কত সুন্দর সে শুধু আমিই জানি! শুধু মাছ-পরীদের আনাগোনা সেখানে। কেউ ডানায় বেহালা, কেউ তানপুরা, কেউ সারেঙ্গী তুলে নিয়ে বাজাচ্ছে! কেউ বা মাথায় ঢোলের দড়ি গলিয়ে নিয়ে তাল দিচ্ছে—এমনি আরও কত রকম! আমরা তো সেসব পেরিয়ে গেলুম। অনেকগুলো ঘর পেরিয়ে যাবার পর হঠাৎ কি চমৎকার গন্ধ নাকে এসে লাগল। যা ভেবেছি তাই। ভিতরে যাওয়া মাত্র আমার তো চক্ষুস্থির! কত রকমারি খাবার—সে বর্ণনা করা সম্ভব নয়, কারণ সে সবের নামই তো আমার জানা নেই। কোন্‌টা খাবো, কোন্‌টা রাখবো, ভেবে উঠতে পারলুম না। আমার বাহন আমাকে তো টেবিলের কাছে হাজির করিয়ে দিল। আর আমিও সেই সঙ্গে চালিয়ে দিলুম ভূরিভোজ। যখন যেটা হাতে লাগল চালিয়ে দিলুম মুখে, ব্যস্—একেবারে পেটের ভিতরে গিয়ে হাজির। কিন্তু কতক্ষণই বা এরকম চালানো যায়! একসময় পেট ফুলে উঠ্‌ল। আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লুম, আর বাহনে চড়ে ঘুরতে লাগলুম কত জায়গায়। হঠাৎ কাদের হাসির ধুম শুনে থেমে গেলুম। আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে মাছটা তো সেখানে হাজির করল আমাকে। দেখি—ভাল ভাল পোযাক পরে কত মেয়ে হাসাহাসি করছে। কি চমৎকার দেখতে! কিন্তু প্রত্যেকেই আধা-মানুষ—আধা-মাছ! আশ্চর্য, সেখানে পুরুষ কাউকে দেখলুম না। বুঝলুম—আমি মাছ-পরীদের দেশে এসেছি। আমি তাদের নাচতে বললুম। কিন্তু তারা আমার কথা তো বুঝলো না। অনেক ভেবে-চিন্তে নিজেই নাচতে আরম্ভ করলুম। আর যায় কোথায়! তারা বুঝতে পারলো আমার মনের কথা। অমনি সব্বাই নাচতে লাগলো আমাকে ঘিরে। আর তো পেটের চিন্তা ছিল না, তাই কোন অসুবিধেই হোল না। হঠাৎ একসময় দেখি, আমার বাহনটা আমাকে গুঁতো মারছে। বুঝলুম—আর নয়, এবার অন্য কোথাও যেতে হবে।

বেশ চলো, ব'লে জল কেটে যেতে যেতে হাজির হলুম গিয়ে খুব উঁচু একটা ঝকমকে প্রাসাদে। ভিতরে ঢুকেই তো অবাক! এত চমৎকার ঘর একটাও চোখে পড়েনি এতক্ষণ। সামনেই সিংহাসনে বসে আছে বিরাট একটা মাছ। মাথায় বড় মুকুট কি চমৎকার দেখতে! বুঝলুম—এই হোল মাছ-পরীদের রানী। আমাকে পিঠে করে বাহনটা তার কাছে নিয়ে
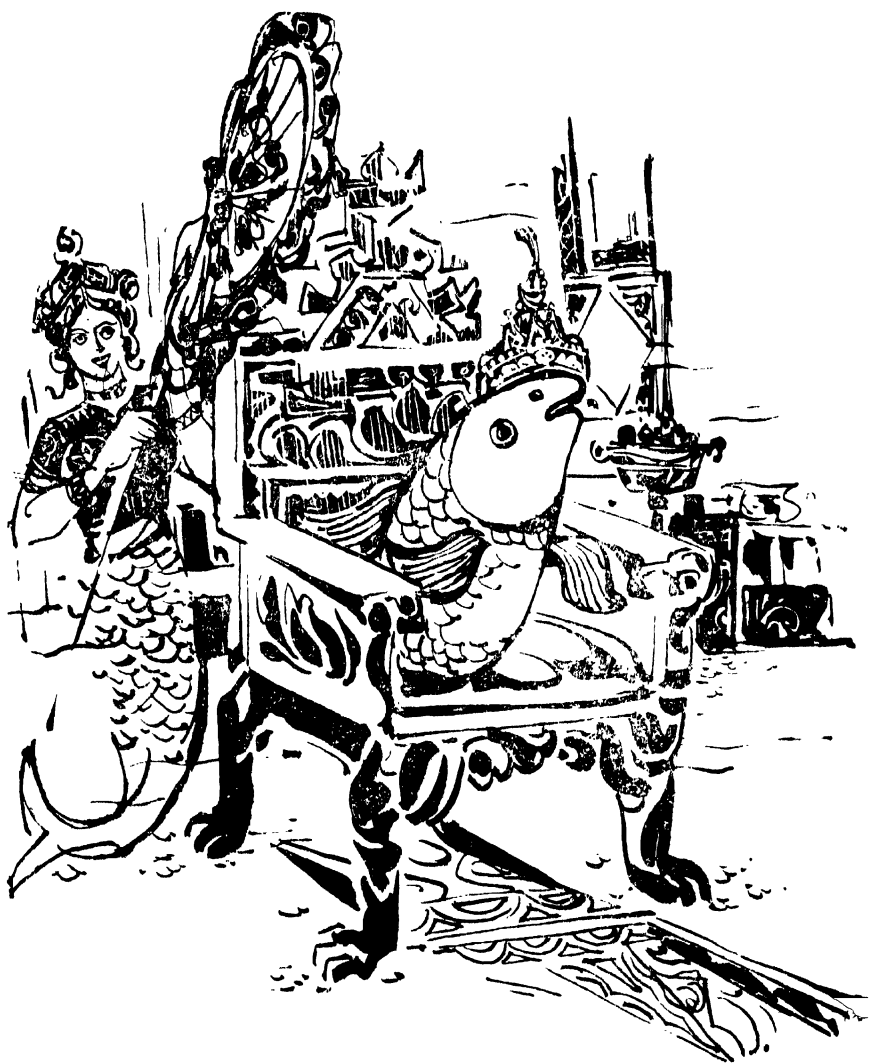
সামনের সিংহাসনে বসে আছে বিরাট একটা মাছ—মাথায় মুকুট প'রে।

গেল। তারপর দেখি—ওদের মধ্যে কি যেন ইশারা হোল—কিছু কথাও বললো রানী—আমি তা' বুঝলুম না। তারপর একটা প্রকাণ্ড হলঘরে নিয়ে যাওয়া হোল আমাকে। সেখানে দেখি—কত রকমারি রত্ন গাদাগাদা জমানো আছে। কত আলো ঠিকরে পড়ছে সেসব

থেকে—কোনটা নীল, কোনটা সবুজ, কোনটাতেও বা অনেক রং-এর আলো। আমার তখন কি যে লোভ হচ্ছিল তা তো তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারছো? যেই একমুঠো কুড়োতে গেছি, অমনি আমার বাহন তেড়ে এগিয়ে এল। আমাকে গুঁতো মারতে মারতে নিয়ে গেল রানীর কাছে। আমি তো এবার ভয় পেয়ে গেলুম—তা'হলে নিশ্চয়ই কোন অন্যায় করে ফেলেছি। কিছুক্ষণ পরে দেখি আমারই মতো ছোট একটা মাছ-পরীকে নিয়ে এল সব পরিচারিকা মিলে। টুকটুকে দেখতে। আমার খুব ভালো লাগলো ওকে—ওকে নিয়ে খেলতে পেলে মন্দ হোত না। রানী আমাকে কি যেন বলল। আমি বুঝলুম না বলে অন্য একটা মাছ-পরী আমাকে ইশারায় বুঝিয়ে দিল যে, আমার বিয়ে হবে। এত ছোট বয়সে বিয়ে করতে হবে ভেবে কেমন মন খারাপ হোল। আমার মনের কথা তো বুঝতে পারে ওরা। তাই তক্ষুনি একটা থলে-ভর্তি সেই সব রত্ন নিয়ে এসে আমাকে দেবে বলে ইশারায় বোঝাল। এবার আমি রাজী না হয়ে পারলুম না। তবে আমিও বোঝালুম যে, আমাকে আমার দেশে দিয়ে আসতে হবে—আমার বাবা-মা ভাবছে তো! তারাও দেখি রাজী হয়ে গেল। তারপরই হোল বিয়ে। তারপর ভোজ। এরপর আর কোন কাজ নেই। আমাকে পিঠে করে আমার বাহনটা তুলে নিল। পিছনে চাপল আমার বৌ। আর আমার কোলে রইল সেই মণিমাণিক্যের বস্তা। পাই-পাই করে উপরে উঠতে লাগলুম আমরা। আমি তো তখন খুব খুশী। কিন্তু একবার পেছন ফিরে তাকাতে গেলুম কতদূর রাস্তা পেরলুম দেখবার জন্যে, আর অমনি টাল খেয়ে উল্টে গেলুম আর কি! বৌ তখন পাই পাই করে উপর দিকে উঠছে—আর আমি সোঁ সোঁ করে নিচের দিকে নামছি! নামতে নামতে হঠাৎ ঢুপ করে শব্দ হোল একটি। ভাবলুম—আবার মাছ-পরীদের দেশে এসে গেলুম! কিন্তু নাঃ, এবার আর মাছ-পরীদের দেশে নয়—একেবারে আমাদের কোলকাতার শোবার ঘরে। সে আর বোল না, কোথায় বা মাছ-পরীদের দেশ—আর কোথায় বা বৌ! দুপুর বেলায় ভাতটাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম একটু—আর তাতেই এত!

সাম্য

শ্রীনোটুবিহারী চট্টোপাধ্যায়

চাঁদের শীতল করুণা-কিরণ—
অযুত ধারায় ঝরিছে যেমন নিত্য,
দীনের কুটীর ও রাজার সৌধে ভেদ ভুলি;
বিধির আশিস তথা অনুখন—
অসীম হইতে পড়িছে—সেরা সে বিত্ত,
নাই সেথা কোন ধনী-নির্ধন দীন কুলি।

মহাকাশ গবেষণা

শ্রীচুনীলাল রায়

অজানাকে জানবার আর অধরাকে ধরবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরন্তন। তাই মানুষ একদিন গুহা থেকে বেরিয়ে এসে এই বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যভেদ করতে এগিয়ে এসেছিল।

কিন্তু মাথার উপরে নীল আকাশ আর বিশাল, বিরাট সমুদ্রের কাছে এসে তার জিজ্ঞাসা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। অনন্ত আকাশ, আর বিরাট জলরাশির বিশালতা দেখে মানুষ ভয়ে-বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে পড়েছে!

আর এই ভয় থেকেই করেছে তাদের পূজা। বিশালতাকে, বিরাটত্বকে তারা ভক্তিভরে দিয়েছে অর্ঘ্য।

কিন্তু তবুও দুঃসাহসী মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছে সমুদ্রের বিশাল, বিরাট সুনীল জলরাশির মধ্যে।

তারপর অনেক, অনেকদিন পর পাল তুলে দিয়েছে মানুষ জাহাজের। গিয়েছে দূর থেকে দূরান্তরে। এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তে সেই অজানাকে জানবার আর অধরাকে ধরবার সাধনা চালিয়েছে। নতুন নতুন ভূখণ্ড সে আবিষ্কার করেছে।

কিন্তু আকাশ—সে যে অনেক অনেক উঁচুতে। মাঝে মাঝে উল্কাপাত, তারা-খসা—মানুষ ভেবেছে কি করে জয় করা যায় আকাশকে।

কল্পনা করেছে মানুষ পাখীর মতে পাখা লাগিয়ে উড়বার। পরীর কল্পনা করেছে সে। আর তার সাহিত্যে, তার চিন্তায় ফুটে উঠেছে তার এই অদম্য আকাঙ্ক্ষার কথাই।

দেবর্ষি নারদ তাঁর ঢেঁকি বাহনে ইচ্ছে মত আকাশ পথে এখানে-সেখানে উড়ে চলেছেন! রাবণ তার আকাশ-রথে সীতা দেবীকে চুরি করে পালাচ্ছে।

বিখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চিও এঁকেছেন এক ডানাওয়ালা যন্ত্রের নক্সা—যার সাহায্যে মানুষ নাকি আকাশে উড়তে পারবে।

তারপর আরও অনেক অনেক পরে একদিন মানুষের স্বপ্ন বুঝি সত্যিসত্যিই সার্থক হ'ল। 'রাইট' ভাইরা আবিষ্কার করিলেন 'এরোপ্লেন' ডানাওয়ালা পাখী।

কিন্তু এতেও বুঝিবা শান্তি নেই। আরও উঁচুতে—আরো অনেক অনেক উঁচুতে মানুষ উঠতে চায়। ঐ মেঘের রাজ্য ছাড়িয়ে কোন মহাকাশের, কোন কল্পলোকের রাজ্যের দিকে তার মন প্রজাপতির রঙীন পাখনায় ভর দিয়ে উড়ে চলে যেতে ভালবাসে।

চাঁদে যেতে চায় মানুষ, চায় সে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ছুটে বেড়াতে।

সত্যি কথা বলতে কি, আজ থেকে প্রায় সড়ে সাতশো বছর আগেই চীনদেশের মানুষ

প্রথম 'রকেটে'র কথা চিন্তা করেছিল। অবশ্য সেদিনের 'রকেট' ছিল আজকের তোমাদের কালীপূজার আতসবাজীর মতোই অনেকটা।

ইংরেজরা তারপর রকেটের অনেক উন্নতিসাধন করে। রকেটের সাহায্যে ইংরেজের নেপোলিয়ানের রণতরী বহর ধ্বংস করে ফেলেছিল। অবশ্য ডঃ রবার্ট গডার্ড-ই হচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে আধুনিক রকেটের জন্মদাতা।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে গডার্ড আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস্ প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২০ সালে এক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে তিনি এই আশা প্রকাশ করেন যে, মানুষ সত্যি-সত্যিই একদিন 'রকেটে' চড়ে চাঁদের দেশে বেড়াতে যাবে।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তরল জ্বালানীর সাহায্যে তিনি তাঁর প্রথম রকেটটি ছোড়েন। এটি দেখতে ছিল আধুনিক রকেটের মতোই। তবে মাত্র দশ ফুট লম্বা। কিন্তু প্রথম পরীক্ষায় রকেটটি ঘণ্টায় প্রায় ষাট মাইল বেগে মাত্র ১৮৪ ফুট দূরে গিয়েই থেমে গিয়েছিল। যা হোক্ এই পরীক্ষার সফলতাই তাঁকে ভবিষ্যতে অনেক দূর এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। আর এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল মানুষের কল্পনার রথের চাকাটিকে। সে কল্পনার রথকে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করেছে মানুষ সভ্যতার আরম্ভ থেকে। তারপর আধুনিক বিজ্ঞান আরো অনেক এগিয়ে গিয়েছে। অনেক বৈজ্ঞানিকের সাধনা, অনেকের কল্পনা সার্থক হয়েছে সত্যি-সত্যিই একদিন। কৃত্রিম উপগ্রহ, লাইকা, উরি গ্যাগারিন, জন গ্লেন, টিটভ, তেরেসকোভা, ভার্জিল গ্রীসম—মানুষের স্বপ্নকে সার্থক করার পথে কয়েকটি অবিস্মরণীয় নাম। কিন্তু এত করেও বা কি হ'ল, কি পেল সে জীবনে? একটা ব্যর্থতা, হতাশার গ্লানি যেন মানুষকে ব্যথিত করে তুলল সর্বদা। এত কোটী কোটী টাকা ব্যায়, এত দিনের স্বপ্নকে সার্থক করতে পেরে মানুষের তো আনন্দ হবারই কথা ছিল। কিন্তু তবুও কেন বৈজ্ঞানিক শংকিত হয়ে উঠেছেন?—কারণ জঙ্গী দেশ-নায়কের হাতে পড়ে তাঁকে বুঝি তা মানুষ মারার নতুন নতুন অস্ত্রই তৈরী করে দিতে হবে।

যে টাকা মানুষ মহাকাশ-চর্চায় ব্যয় করছে, তাই দিয়ে যে এই মাটির পৃথিবীতেই আরো অনেক বেশী করে সোনার ফসল ফলাতে পারে। পারে আরও অনেক দরিদ্র, নিপীড়িত লোকের দুঃখ ঘুচিয়ে, মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে।

কিন্তু তার বদলে আজ মহাকাশ জয় করার প্রচেষ্টা মানুষকে আরও যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে বৈজ্ঞানিকেরাও অনেকে ভীত হয়ে পড়েছেন। তাঁদের এত দিনের সাধনা, গবেষণা সমস্ত কিছু এভাবে নষ্ট হতে চলেছে দেখে তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। বলেছেন, 'এ মানব মনীষার ব্যভিচার।'

কিন্তু এর সবটাই কি সত্যি ?

সত্যি কথা বলতে কি মহাকাশ-চর্চা থেকে এবং মহাশূন্যে মানুষ ইত্যাদি পাঠিয়ে মানুষের উপকারও হতে পারে।

আমেরিকার রকেট বিশেষজ্ঞ ভর ওয়ার্নার ফন ব্রন এই আশা প্রকাশ করেছেন যে, মহাকাশ অভিযানের ফলে মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রসারিত হবে এবং পরিণামে পৃথিবীতে মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতিও সম্ভব হবে।

তোমরা একথা নিশ্চয়ই জান যে, সংবাদ আদান-প্রদানে 'উপগ্রহ' যথেষ্ট সফল হয়েছে এবং বৈজ্ঞানিকেরা আশা করেন, আগামী দশ-পনের বছরের মধ্যেই খুব অল্প খরচে সারা পৃথিবী-ব্যাপী টেলিফোন যোগাযোগ সম্ভব হবে।

আর সবচেয়ে আনন্দের কথা অলওয়েভ রেডিওর মতো তখন অলওয়েভ টেলিভিশানও চালু হবে। অর্থাৎ তখন তুমি কলকাতার বাড়ীতে বসেই লর্ডস বা ব্রিসব্রেনের ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ দেখতে পাবে। পাবে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের খেলা বা অলিম্পিকের খেলা দেখতে।

এভাবে নিবিড়তা বাড়ার ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। উপগ্রহের সাহায্যে আবহাওয়ার 'সঠিক' পূর্বাভাসও দেওয়া সম্ভব হবে, যা জানা এখনও অসম্ভব। অর্থাৎ তখন তুমি কম করে সাতদিন আগেই জানতে পারবে ইষ্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের লীগের খেলাটির দিন বৃষ্টি হবে কি হবে না। বৃষ্টি হলে কারা ভাল খেলবে, বৃষ্টি না হলেই বা কারা। ছাতা নেবে কি নেবে না। আবার ইডেনে টেস্টের সময় 'পর্জন্যদেব' এসে ভারতকে 'ভরাডুবি'র হাত থেকে বাঁচাবেন কি বাঁচাবেন না - তাও জানা যাবে আগে থেকেই। ঝড়, ঘূর্ণি লোকালয়ে পৌঁছানোর অনেক আগেই উপগ্রহ প্রেরিত ফটো থেকে ওদের সঠিক অবস্থান এবং গতিপথ জানা যাবে। ফলে বহুপ্রাণ আর সম্পত্তি রক্ষা করা সহজসাধ্য হবে। মহাকাশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ভবিষ্যদ্বাণী করার ফলে যে সব বিষয়ে মানুষ উপকার পাবে তার প্রধান একটি হচ্ছে—খাদ্য।

তা'ছাড়া পৃথিবীর খনিজসম্পদ, বনজসম্পদ, খাদ্য ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে মহাকাশ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য এক পরিকল্পনাও বৈজ্ঞানিকেরা গ্রহণ করেছেন। তাঁরা এর মধ্যেই প্রমাণ করেছেন যে, বহু উঁচু থেকে অতি আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে আলোকচিত্র গ্রহণ করে ভাল জাতের ভুট্টা এবং রোগগ্রস্ত ভুট্টার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভবপর। আবার কোন জমি লোনা বা কোন জমিতে ভাল মত ঠিক ভাবে সার দেওয়া হয়নি তাও জানা সম্ভব হবে। পৃথিবীর আবাদি জমি সম্পর্কে বারবার সমীক্ষা চালিয়ে এবং প্রতি দ্রব্য চাষযোগ্য জমির উপর বীজ বোনা থেকে সুরু করে ফসল কাটা অবধি নজর রেখে, সহজেই পৃথিবীর খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাবে।

আবার উপগ্রহে রাখা যন্ত্রপাতির সাহায্যে কোন অঞ্চলে অনাবৃষ্টি হলে তা' যেমন ধরা যাবে, তেমনি প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির ফলে শস্যহানির খবরও অনেক আগে থেকেই জানা যাবে।

বৈজ্ঞানিকেরা এও আশা করেন যে, মহাকাশযানে মানুষ পাঠানো হবে এবং তাঁরা মহাশূন্যে পদচারণা করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ জোড়া দিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী স্পেস হস্‌পিটাল বা মহাশূন্য চিকিৎসাগার তৈরী করতে পারবেন। সেখানে ওজনহীন অবস্থায় এক নতুন ধরণের চিকিৎসা সম্ভব হবে। তা'ছাড়া ওজনহীন অবস্থা পক্ষাঘাতজাতীয় রোগীদের চিকিৎসার পক্ষে খুবই ফলপ্রসূ হবে বলে বৈজ্ঞানিকেরা আশাপ্রকাশ করেছেন।

আবার স্পেস হস্‌পিটালের মতো মহাশূন্যে গবেষণাগার তৈরী করার মতলবও বৈজ্ঞানিকদের আছে। এইসব গবেষণাগারে ওজনহীন অবস্থায় 'কালচার' করে অনেক উন্নত ধরণের গাছপালা তৈরী করা সম্ভবপর হবে বলেও তাঁদের ধারণা। আর এর সাহায্যে পৃথিবীর খাদ্যসমস্যারও সুরাহা হতে পারে বলে আশা করা যায়। জীবাণু নিয়ে পরীক্ষার ব্যাপারে বহু প্রশ্নের মীমাংসা সেদিন সম্ভবপর হবে, এবং তার ফলে চিকিৎসাবিজ্ঞানও অনেক উন্নত হবে। আবার মহাকাশ অভিযান কর্মসূচী উর্ধ্ব মহাকাশে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে অভিযান চালাবার উপরও জোর দিয়েছে। এভাবে মহাকাশ গবেষণা থেকে নতুন নতুন জ্ঞানলাভ সম্ভব এবং মানুষের যথেষ্ট উপকারও সাধিত হতে পারে। তাই সাধারণ মানুষের প্রার্থনা যে, রাষ্ট্রনায়করা যেন তাঁদের শুভবুদ্ধি বিসর্জন না দেন এবং মানবকল্যাণ ব্রতেই বিজ্ঞান তথা বৈজ্ঞানিকদের নিয়োজিত রাখেন।

টুটুন ও শালিক

বিশ্বপ্রিয়

একটা শালিক খোশ মেজাজে, গান ধরেছে ক'ষে—
টুটুনদের ঐ উঠান ধারে ঃ সজনে ডালে বসে।
—নতুন শীতে লাগছে ভালো,
হলুদ সোনা রোদের আলো
বুঝি না ছাই, টুটুন কেন শীত কালটায় দোষে!

তাই না শুনেই টুটুন বলে,—বকো না আর মেলা,
তোমায় তো আর স্নান করতে হয় না সকাল বেলা।
শীতের কামড় কড়া কি যে—
মালুম আমি পাই তা নিজে,
আমার মত মানুষ হলে বুঝতে শীতের ঠেলা॥

কেশিধ্বজ ও খাণ্ডিক্যজনক

শ্রীশতক্রুশোভন চক্রবর্তী

রাজা ধর্মধ্বজের দুই পুত্র। মিতধ্বজ ও কৃতধ্বজ। মিতধ্বজের পুত্র খাণ্ডিক্যজনক, কর্মমার্গে পরম নিপুণ। কৃতধ্বজের পুত্র কেশিধ্বজের নৈপুণ্য অধ্যাত্মবিদ্যায়।

খাণ্ডিক্যজনক চাইতেন কেশিধ্বজের উপরে উঠতে, কেশিধ্বজ চাইতেন খাণ্ডিক্যকে নীচে ফেলতে।

অবশেষে দিন এল। খাণ্ডিক্যই রাজ্যভ্রষ্ট হলেন।

দুর্গম বনে রাজ্যহীন রাজা খাণ্ডিক্যজনক। সঙ্গে মন্ত্রী, পুরোহিত ও কয়েকজন পরিজন।

কেশিধ্বজ রাজা হয়েছেন। জ্ঞানী তিনি। জানেন অবিদ্যায় মৃত্যু। তাই বহুতর যজ্ঞ করলেন। মৃত্যু থেকে নিস্তার পেতে হবে। রাজা যজ্ঞ করেন, যাগে একাগ্র হন।

যোগে মগ্ন কেশিধ্বজ। ধর্মধেনু নিহত হ'ল বাঘের হাতে। রাজা পুরোহিতদের সুধোলেন: কি এর প্রায়শ্চিত্ত?

পুরোহিতরা বললেন: আমরা জানিনে, কশেরুকে জিজ্ঞাসা করুন।

কশেরু বললেন শুনকের কথা।

শুনক বললেন: পৃথিবীতে কেহই আমরা এ বিষয় কিছু জানিনে। একমাত্র যিনি জানেন তিনি আপনার শত্রু, খণ্ডিক্যজনক।

কেশিধ্বজ বললেন: তার কাছেই যাব। যদি হত্যা করে সে তাহলেও আমার পাওয়া হবে যজ্ঞফল। যদি যথাযথ বলে তাহলেই যজ্ঞ সম্পন্ন হবে।

রথে কেশিধ্বজ। এসেছেন বনে, খাণ্ডিক্যের কাছে। কৃষ্ণাজিন ধারণ করে রাজা কেশিধ্বজ এসেছেন রাজ্যচ্যুত বনবাসী শত্রুর কাছে বিধান নিতে।

খাণ্ডিক্য ক্রোধে আত্মহারা হলেন। ধনু সজ্জিত করলেন। বললেন: কৃষ্ণাজিনের কবচ পরে এসেছ। ভেবেছ বধ করব না, অথচ তুমি করবে সুযোগ বুঝে। কিন্তু তোমার কবচ মিথ্যা। আমরা কি মৃগ বধ করিনি কোনকালে? তাদের গায়ে কি কৃষ্ণাজিন থাকত না? বৃথা ছল। তোমাকে আমি বধ করব। জীবন থাকতে পার পেতে দেব না শত্রুকে।

কেশিধ্বজ বললেন: হত্যা করব বলে আসিনি। সংশয়ে পড়েছি। জিজ্ঞেস করব বলে এসেছি। ক্রোধ সংবরণ করুন, শর সংহরণ করুন।

খাণ্ডিক্য পুরোহিত ও মন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রণা করলেন। তাঁরা বললেন: শত্রু যখন হাতে মুঠোয় তখন বধ করাই কর্তব্য। তাতে লাভও কত। পৃথিবী হবে আপনার বশীভূত।

খাণ্ডিক্য বললেন: মিথ্যে নয়। তবে ওর জয় হবে পরলোক আর আমার ইহলোক

'খাণ্ডিক্যজনক কেশিধ্বজকে বললেন : কি জিজ্ঞাসা আপনার ?'

যদি বধ না করি আমার হবে পরলোক, ওর থাকবে মাত্র বসুন্ধরা। পরলোক জয় অনন্ত-কালের জয়, আর পৃথিবী জয় মাত্র অল্প কয়েক দিনের। অতএব বধ নয়, উত্তরই দেব।

খাণ্ডিক্যজনক কেশিধ্বজকে বললেন : কি জিজ্ঞাসা আপনার ?

কেশিধ্বজ আনুপূর্বিক সমস্ত বললেন। খাণ্ডিক্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান দান করলেন।

কেশিধ্বজ যজ্ঞভূমিতে ফিরে এলেন। সমস্ত সম্পন্ন হ'ল। অবশেষে সম্পন্ন হ'ল যজ্ঞ। যজ্ঞাবশেষ স্নানে কৃতকৃত্য হলেন রাজা। ভাবলেন, সবাই সব পেল, সমস্ত সম্পন্ন, মন তবু অপ্রসন্ন। ঋত্বিকরা পূজো পেয়েছেন, সদস্যেরা সম্মান পেয়েছেন, অর্থীরা পেয়েছেন যার যেমন অভিরুচি। তবু মন অপ্রসন্ন। কিন্তু কেন ?

অবশেষে রাজার মনে হ'ল : গুরুর কাজ করেছেন খাণ্ডিক্য, অথচ দক্ষিণা দেওয়া বাকী।

কেশিধ্বজ আবার গেলেন সেই গহন বনে। খাণ্ডিক্যও সশস্ত্র।

কেশিধ্বজ বললেন : অপকার করতে আসিনি। আপনার উপদেশ মতই যজ্ঞ সম্পন্ন করেছি। আপনাকেই গুরুদক্ষিণা দেব বলে ঠিক করেছি। যা খুশি চাইতে পারেন।

মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শে বসলেন খাণ্ডিক্য। মন্ত্রীরা বললেন : রাজ্য প্রার্থনা করুন। বিনা ক্লেশে রাজ্য পাওয়া হবে। কৃতী ব্যক্তি হলে এই রকমই করতেন।

খাণ্ডিক্য হাসলেন। বললেন : রাজ্য ক'দিনের! আমার মত লোক কি করে প্রার্থনা

করবে রাজ্য? আপনারা আমাকে পরামর্শ দেন বটে, কিন্তু পরমার্থ বিষয়ে আপনারা তেমন অবহিত নন।

কেশিধ্বজকে শুধোলেন খাণ্ডিক্য: নিতান্তই কি দেবেন বলে ঠিক কয়েছেন?

কেশিধ্বজ বললেন: অবশ্যই দেব।

খাণ্ডিক্য বললেন: পরমার্থ বিষয়ে বিলক্ষণ বিচক্ষণ আপনি। যে কাজ করলে যাবতীয় ক্লেশের শান্তি হয় তাই শুনতে চাই আপনার কাছে। সেই হবে আমার দক্ষিণা।*

*কাহিনীটি বিষ্ণুপুরাণ থেকে গৃহীত।

লাকি

শ্রীনোটুবিহারী চট্টোপাধ্যায়

ছোট্ট আমার কুকুরছানা নাম রেখেছি লাকি
কাছে এসে ল্যাজটি নাড়ে যেমনি আমি ডাকি।
দুই পা তুলে দাঁড়িয়ে উঠে আদোর খেতে চায়
দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরি বুকের কাছে তায়।
ছোট্ট লাকির একটু খাওয়া, শুধু দুধ আর রুটি
আলিস্যি নেই সারাটা দিন কেবল ছুটোছুটি।
রাতের বেলা খাটের পাশে ঘুমোয় আমার ঘরে
ঘুমটা সজাগ শুনলে আওয়াজ ঘেউ ঘেউ ঘেউ করে।
গলায় বাকল বাঁধার শেকল লাকির আছে কেনা
বিছানা আর শীতের জামা? তাও আছে ওর—সে না—
সবাই ভাবে লাকি আমার গোলাম কৃতদাস
যত্ন এত যেহেতু সে চোর-ডাকাতের ত্রাস—
মোটেই তা নয়—বন্ধু সে মোর তাইতো রাখি পাশে
আমি তারে ভালোবাসি সেও আমারে বাসে।
লাকি আমার পরম প্রিয় অতি আপনজন
আমার লাগি দিতে পারে জীবন বিসর্জন।

কর্পূরের মতো

শুদ্ধসত্ত্ব বসু ।। উপন্যাস ।।

তারিণীদা-ই গল্প করছিলেন—আমি যদি নিজে না এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হতুম—তা'হলে আমারও বিশ্বাস হতো না ; কাল্পনিক ঘটনাও এমন রোমাঞ্চকর হয় না। একটা গোটা স্কুলবাস ছাত্রবোঝাই অবস্থায় একেবারে লোপাট হয়ে গেল ! কি করে যে গেল—তা ভাবাও যায় না। হ্যাঁ—একেবারে ঠিক কর্পূরের মতোই উবে গেল।

তা'হলে আদ্যন্ত খুলেই বলি।

গত বছর শীতের সময় আমি ঝরিয়া অঞ্চলে রূপজামে রাতুলদার ওখানে বেড়াতে গিয়েছিলুম। রাতুলদা আমার মেঝদার বড় শালা, মাইনিং ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে একটা কলিয়ারীর ম্যানেজারি করছেন। মস্ত বড় কোয়ার্টার—লোকজন বিশেষ নেই। আমাদের সেখানে প্রায়ই যেতে বলেন। গতবার শীতের দিনে হাতেও বেশ কিছু সময় ছিল। ধানবাদে একটা কাজ ছিল, সেটি সেরে সোজা রাতুলদার ওখানে গিয়ে উঠলাম।

ঝরিয়া থেকে বেশ কিছু দূরে মুথ্‌রাটাঁড়, সেখানে রাতুলদার কলিয়ারী। আর রাতুলদা থাকেন রূপজামের কোয়ার্টারে। মুথ্‌রাটাঁড় থেকে রূপজাম মাইল পনেরো দূরে হবে। মুথ্‌রাটাঁড়ে থাকার বিশেষ সুবিধে নেই—তাই রূপজামেই আশপাশের কয়েকটি কলিয়ারীর ম্যানেজার, ওভারসিয়ার—প্রভৃতি কিছু মোটা মাইনের লোকেরা থাকে। রূপজামের পথে আলো আছে, টেলিফোন আছে, পুলিস-চৌকি আছে।

পাহাড়-ঘেঁষা জায়গা এই রূপজাম। এখান থেকে গোমো-বড়কাখানার রেল লাইন বড়জোর মাইল তিনেক হবে। নীল আকাশের তলায় সবুজ গাছে ঘেরা পরেশনাথ পাহাড়ের চূড়ো দেখা যায় এখান থেকে। পাহাড়ে একটা নদীও আছে গ্রামের শেষে। গ্রামটার একদিকে বড়ধেমো পাহাড় বিরাট চেহারার দৈত্যের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে বাজার নেই, মাইল দেড়েক দূরে বড়ধেমো পাহাড়ের কোলে হাট বসে সপ্তাহে একদিন করে।

রূপজামে কোনো স্কুল নেই,—হয় কুড়ি মাইল পশ্চিমে রোটাংডি-তে, না হয় পূবে পনেরো মাইল দূরে শোংখারো-তে ছেলেপিলেদের পড়াতে পাঠাতে হবে। শোংখারো স্কুলে ইংরেজী পড়ার ব্যবস্থা নেই, হিন্দীর মাধ্যমে লেখাপড়া করানো হয়। তাই রূপজামের ছেলেদের রোটাংডিতে গিয়ে পড়তে হয়। রোটাংডি হলো আধা শহরের মতো, স্কুল আছে, ডাক্তারখানা আছে, থানা আছে, দোকান-বাজার আছে। এমন কি, একটা সিনেমা হাউসও আছে—অবশ্য শুধু শনি আর রবিবার শো হয়, অন্যদিন শো হলে লোক হয় না।

বংকু বলে উঠলো—সাঁওতাল পরগণার বর্ণনা শুনতে আমরা বসিনি, ধানবাদ, ঝরিয়া কি রূপজাম—ওসব আমরা জানি! আপনার আসল গল্প কই?

তারিণীদা বললেন—সবুর কর, আসল গল্পে আমি আসছি।

সতীশ বললে—তারিণীদা, কুকুরের চেয়ে কুকুরের ল্যাজ বড় হয়ে যাচ্ছে। আমরা গল্প চাই! জায়গার বর্ণনা শুনবো না।

তারিণীদা বললেন—রোটাংডি আর রূপজাম সম্পর্কে ধারণা না করে নিলে এই গল্পটা আদৌ বুঝতে পারবে না—এর মজাটা কোথায়! রোটাংডি থেকে একটা মাত্রই চওড়া পিচের রাস্তা রূপজামে চলে গেছে। তিলুড়ি হ্রদের পাশ দিয়ে মাইলখানেক যেতে হয়; ফাঁকা রাস্তায় গাড়ী জোরে ছোটে ব'লে হ্রদের ধারটায় সিমেন্টের, আর সিমেন্টের ওপর লোহার গ্রিলের বেড়া, যাতে কোনো গাড়ী কোনোরকমে তিলুড়ির জলে গিয়ে না পড়ে।

তিলুড়ির হ্রদ যেখানে শেষ হয়েছে—তার অল্প দূরেই গোমো যাবার আর একটা রাস্তা এসে রোটাংডি-রূপজামের পথে মিশেছে। এই জায়গাটাকে সকলে তিলুড়ির মোড় বলে। তিলুড়ির মোড়ে খানকয়েক দোকান আছে, একটা বুঝি পেট্রোল পাম্পও রয়েছে।

বংকু বিদ্রোহের স্বরে বললে—না, আমরা আর বর্ণনা শুনবো না! তিলুড়ির কথা আমার ঢের জানা আছে। বোকারো থেকে আমরা যেবারে পরেশনাথ যাই জিপে করে—ওই তিলুড়ির মোড়ের একটা দোকানে চা খেয়েছিলাম।—ওসব ছাড়ান দিন—আমরা আসল গল্প চাই!

তারিণীদা সুরু করলেন:

আমি তো আগেই বলেছি—এ রকম থ্রীলিং ঘটনা আমি আর জীবনে দেখিনি! দেখিনি

বলি কেন—এ রকম ভয়াবহ, রহস্যঘন পরিবেশে আমি আর কখনো পড়িনি, ভবিষ্যতে কখনো যে আবার পড়বো—তাও বলতে পারি না। ব্যাপারটা ঘটেছিল ওই রোটাংডি থেকে রূপজামে আসবার সময়—ওই পথে, আর ঠিক তিলুড়ির মোড়ে আসবার আগেই।

আগেই বলেছি—রূপজামের কয়েকটি বাচ্চা ছেলে রোটাংডি-তে পড়তে যেতো। একটা স্টেশন-ওয়াগনের ব্যবস্থা ছিল—রূপজাম থেকে জন দশেক ছোট্ট ছেলেকে সকাল ন'টার সময় রোটাংডির স্কুলে আনা হতো—আর বিকেল পাঁচটায় রূপজামে পৌঁছে দেওয়া হতো। সপ্তাহে পাঁচদিন স্কুল—শনিবার আর রবিবার—এই তু'দিন ছুটি।

একদিন বিকেলে রোটাংডি থেকে স্কুলের গাড়ী বের হয়ে আর রূপজামে ফিরলো না। রোটাংডি থেকে রূপজামে যাবার পথ ঐ একটাই; রোটাংডি থেকে স্কুলের গাড়ী ঠিক সময় মতই বের হয়েছিল, কিন্তু রূপজামের পথে পৌঁছুবার আগে একেবারে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল!

ছেলেসুদ্ধ্?

হ্যাঁ, জন দশেক ছোট ছেলে সমেত গোটা স্টেশন-ওয়াগন একেবারে লোপাট; কর্পূরের মতো উবে গেল। রাতুলদার ছোট বাচ্চাটাও ছিল। বছর আষ্টেক বয়স হবে; সেও ছিল সেদিন ঐ গাড়ীতে! শুধু গাড়ী নয়, গাড়ীর ড্রাইভার পর্যন্ত—একেবারে হাওয়া!

ভারী আশ্চর্য কাণ্ড! রোটাংডি আর রূপজামের মধ্যে একটা গোটা গাড়ী উবে যাবে কি করে? তিলুড়ি হ্রদের জলে গিয়ে ছেলেসুদ্ধ গাড়ীটা যদি ডুবে যায়—এ ছাড়া তো গাড়ী লুপ্ত হবার আর কোনো ব্যাখ্যা খাড়া করা গেল না! এ কথা ঠিক যে মংগলগ্রহ থেকে মহাকাশ বেয়ে কেউ এসে ঐ শূন্যপথে গাড়ীটা নিয়ে হাওয়া হয়নি; নিশ্চয়ই কোনো বদলোকের বদ মতলব এর পেছনে কাজ করছে—যদি না গাড়ীটা তিলুড়ির জলে ডুবে থাকে।

গাড়ীর ড্রাইভার কোথাও বন-বাদাড়ে গাড়ীটা লুকিয়ে রাখেনি তো?

না, না,—ড্রাইভার সে ধরণের লোকই নয়। মাধু সিং গাড়ীটা চালায়—সকালে এক ট্রিপ আর বিকেলে এক ট্রিপ চালিয়ে গাড়ীটা স্কুলে জমা রেখে দিলে তবে তার ছুটি। মাধু সিং রোটাংডি-র লোক; ছোট একটা মোটর মেকানিকের দোকান করেছে—গাড়ীর কাজ কিছু জানে, এটা-সেটা সেরে-সুরে দিতে পারে। ওর বাবা তিল্লু সিং একদা সার্কাস পার্টিতে কাজ করতো; ভারী ভালো লোক, ভারী মজার লোক—যখনই কোনো কথা বলবে, সার্কাস জীবনের এক-আধটা ঘটনার উল্লেখ করতে ভুলবে না। মাধু সিংও ভালো লোক, তার বউ আছে, ছোট ছোট তুটো ছেলেও আছে। রোটাংডি-র এমন কেউ নেই—যে নাকি মাধু সিং-এর কাছ থেকে উপকার নেয়নি। যখন যে কাজে যে কেউ ডেকেছে, মাধু সিং হাসি মুখে তা করে দিয়েছে। শুধু রোটাংডি কেন, তিলুড়ি, রূপজাম—আশপাশের সব জায়গার লোকের উপকার করতেও

মাধু সিং কুন্ঠিত হয় না। এহেন মাধু সিং হলো সেই গাড়ীর ড্রাইভার ; আর রোটাংডির স্কুলের এই ছোট গাড়ীটা চালু হওয়া ইস্তক মাধু সিং-ই কাজ করে আসছে। তা' ছাড়া সে ওই দশটা ছেলেকে ভালও বাসে খুব—একেবারে নিকট আত্মীয়ের মতো।

ঠিক ক'টার সময় আর রূপজামের কতটা দূরে যে গাড়ীটা উঠে যায়—তা কেউ বলতে পারলো না। তিলুড়ি পেট্রোল পাম্পের কাছে গাড়ীটা যায় চারটে বেজে পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ মিনিটের সময়, কখনো চারটে চল্লিশ হয়নি, আবার চারটে তিরিশও হয়নি। মাধু সিং সময় রাখার ব্যাপারে এমনি ওস্তাদ ছিল। তিলুড়িতে গাড়ীটা যখন পাঁচটার মধ্যেও এল না—তখন সেখানে লুন্টি কলিয়ারীর ম্যানেজার কৃষ্ণমূর্তি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। কৃষ্ণমূর্তির একমাত্র ছেলে লুন্টি থেকে রোটাংডিতে পড়তে যায় ওই স্টেশন-ওয়াগনে করে। তিলুড়িতে এসে কৃষ্ণমূর্তি প্রতিদিন সকালে সাড়ে ন'টায় স্কুলের গাড়ীতে চাপিয়ে দিয়ে যান, আর সাড়ে চারটেয় এসে ছেলেকে নিয়ে যান। তিলুড়ি থেকে লুন্টি অন্য পথে যেতে হয়—দূরত্ব আধ মাইল, কি তার অল্প কিছু বেশী হবে, পিচের রাস্তা আছে।

রোটাংডি থেকে স্কুলের গাড়ী এল না—নির্দিষ্ট সময়ে মাধু সিং-এর গাড়ীর দেখা নেই, এরকম ঘটনা এর আগে কখনো ঘটেনি। তিলুড়ি পাম্পিং-স্টেশন থেকে কৃষ্ণমূর্তি রোটাংডি স্কুলে ফোন করলেন—স্কুল থেকে মাধু সিং গাড়ী নিয়ে নির্দিষ্ট সময়েই বের হয়েছে। পথে তো আর দেরি হবার কথা নেই! কৃষ্ণমূর্তি নিজের গাড়ী করে এগোতে লাগলেন রোটাংডির দিকে, খুব ধীরে ধীরে—পথের চারদিকে চোখ রেখে, গাড়ীটা খারাপ হতে পারে,—কিংবা—ভাবতে গিয়েও হয়তো কৃষ্ণমূর্তির বুক কেঁপে উঠে থাকবে, তিলুড়ি লেকের জলে ডুবে যায়নি তো—তবে সে আশংকা কম, সিমেণ্ট আর লোহার গ্রিল দিয়ে জলের দিকটা আটকানো। তবু কৃষ্ণমূর্তি খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে বিকেলের পড়ন্ত আলোয় তিলুড়ি হ্রদের রেলিংটা পরীক্ষা করে দেখলেন—কোথাও কোনো য়্যাকসিডেন্ট ঘটেছে কিনা। না, রেলিং বা সিমেণ্টে কোনো আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি। লাইট পোষ্ট কি টেলিগ্রাম-টেলিফোনের থাম পর্যন্ত একটুও দোমড়ায় নি, সম্পূর্ণ অটুট আছে।

রোটাংডি থানায়ও খবর করা হলো। থানা রোটাংডি-র শেষ প্রান্তে, রূপজামের দিকে আসার পথে। জানা গেল, মাধু সিং রোজ যেমন গাড়ী নিয়ে চারটে পনেরো মিনিটের সময় চলে যায়—তেমনই সময় গেছে। আজ যে গেছে—সে সম্পর্কে দারোগাবাবু একেবারে নিশ্চিত, কারণ মাধু সিং-এর হাতে পোষ্টাপিস থাকে একটা রেজিষ্ট্রী চিঠি থানার দারোগাবাবুকে পাঠানো হয়েছিল—মাধু সিং বিকেলে, এই বেলা চারটে বেজে পনেরো কি ষোলো মিনিটের সময় থানার দারোগাবাবুর সই নিয়ে চিঠিখানি দিয়েছে ; পরে স্কুলের গাড়ী নিয়ে নির্দিষ্ট পথে চলে গেছে।

যথাসময়ে গাড়ী ফিরছে না দেখে স্কুলে আরো টেলিফোন গেল। গাড়ী ঠিক সময়ে স্কুল থেকে বেরিয়েছে, অথচ পৌঁছায় নি কারুর বাড়ীতে—এ বড় তাজ্জব ব্যাপার। স্কুলের হেড ক্লার্ক জানতেন—পাশের পোষ্টাপিস থেকে মাঝে মাঝে মাধু সিং-এর হাতে রূপজামের কি তিলুড়ির চিঠিপত্র পাঠানো হয়। তেমন কোনোকিছু ঘটেছে কিনা জানার জন্যে স্কুলের হেড ক্লার্ক পোষ্টাপিসে গিয়ে জেনে এল আজ থানার দারোগাবাবুর একটা রেজিষ্ট্রি করা চিঠি অবশ্য মাধু সিং-এর হাতে পাঠানো হয়েছে; কিন্তু সে কাজ পথে পড়েছে, এবং রোটাংডির শেষ প্রান্তে; তার জন্যে বড় জোর এক মিনিট না হয় দু'মিনিট দেরি হতে পারে।

রূপজামের লোকেরাও ইতিমধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বাচ্চারা এখনো ফিরলো না। কাল শনিবার, স্কুল ছুটি; হয়তো আজ স্কুলে কোনো ফাংশন হতে পারে এই ভেবে প্রথমে রাতুলদা খুব বেশী উদ্বিগ্ন হননি। কিন্তু কৃষ্ণমূর্তির টেলিফোন পেয়ে তিনি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কৃষ্ণমূর্তি বহুকাল কোলকাতায় ছিলেন—বাংলা তিনি বেশ ভালই বলেন, খোদ বাংলাতেই এই স্টেশন-ওয়াগন উবে যাবার কথা বললেন। (ক্রমশঃ)

সেয়ানে-সেয়ানে

শ্রীশৈলেনকুমার দত্ত

বলল যদু—দাদুর আমার বাগান ছিল এক
বুঝবি যদি কত বড় আকাশ পানে দেখ।
সাতটা ঘোড়া চোদ্দ বছর সদাই যদি ছোটে
আধখানা তার কোন মতেই পৌঁছাবে না মোটে।
হাল-আমলের স্পুটনিকেতে বছর দুয়েক গেলে
ঐ বাগানের বাউণ্ডারির হদিশটুকু মেলে।

কী আর বেশি—বলল হরি, বাগান তো তোর ওই
আমার দাদুর ছিল যে এক মস্ত বড় মই।
এই পৃথিবীর মানুষ যত ততই সিঁড়ি তার
উঠলে পরে স্বর্গে যাওয়াও কিছুই নহে ভার।
কত যে সব দেব-দেবতা মর্তে এসেছেন
নামার সময় দাদুর মই-এই সবাই নেমেছেন।

মিথ্যে এসব—বলল যদু, সত্যি যদিই হবে
নামালে মই বল দেখি তুই রাখত কোথায় সবে?
হরি বলে—এই কথাটাও কেই বা না জানে
নামালে মই রাখত যে তোর দাদুর বাগানে।

চাঁদের কথা

শ্রীবিনায়ক সেনগুপ্ত

আমাদের পৃথিবীর আছে মাত্র একটি চাঁদ আর সে আমাদের এমনি ঘরের কাছের আর পৃথিবীর আকারের তুলনায় এমনি বড় যে চাঁদ বললেই আমরা সাধারণতঃ শুধু ঐ একটিকেই বুঝি। কিন্তু শুনলে আশ্চর্য ব'লে মনে হবে, আমাদের এই সৌরজগতে সবসুদ্ধ চাঁদ আছে একত্রিশটি, অর্থাৎ আমাদের এই পৃথিবীর চাঁদটিকে বাদ দিয়ে আরও ত্রিশ : মঙ্গলের দুই, বৃহস্পতির নয়, শনির বার, উরেনাসের পাঁচ আর নেপচুনের দুই।

সৌরজগতে ন'টি গ্রহ, তার সূর্যের নিকটতম গ্রহ হলো বুধ আর সুদূরতম গ্রহ হলো প্লুটো। তাদের বিন্যাস—বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, উরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো। এদের ভিতরে সূর্যের কাছের দুই গ্রহ বুধ ও শুক্রের কোন চাঁদ নেই, আর নেই, একেবারে দূরতম গ্রহ প্লুটোর। অবশ্য এও ঠিক যে নেই মানে এখনও আমাদের অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষের দূরবীনে তা ধরা পড়েনি। এও হতে পারে যে, তাদের চাঁদ এমনি ছোট যে, তা এখনও রয়েছে আকাশ-পর্যবেক্ষকের আবিষ্কারের অপেক্ষায়। প্লুটো নিজেই অতি ছোট গ্রহ, আকারে সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম গ্রহ বুধের প্রায় কাছাকাছি। এমনি যে গ্রহ সূর্য-পরিবারের একেবারে শেষ সীমায় তারও আবার চাঁদ!

এই গ্রহদেরই তিনটির খবর হয়েছে দূরবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবনের পর। একটির তো মাত্র এই সেদিন—নিতান্তই উনিশ-শ ত্রিশ সালে। আর এই চাঁদদেরও খবর হয়েছে দূরবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবনের পর। এর উদ্ভাবক গ্যালিলিও * নিজে কেবল বৃহস্পতির মাত্র চারটি চাঁদকে লক্ষ্য করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

চাঁদ-জগতের সর্ববৃহৎ চাঁদ হলো শনির, নাম হলো 'টাইটাস'—ব্যাস ৩,৫০০ মাইল। আকারে সে বুধ ও প্লুটো গ্রহদ্বয়ের চাইতেও বড়, প্রায় মঙ্গল গ্রহের কাছাকাছি। মঙ্গলের ব্যাস হলে ৪,১০০ মাইল। আর সর্বক্ষুদ্র চাঁদ হলো মঙ্গলের, ডিমস, ব্যাস মাত্র পাঁচ মাইল। মঙ্গলের চাঁদরাই চাঁদ-জগতের সব চাইতে ছোট বাসিন্দা, একটির ব্যাস দশ মাইল ও একটির মাত্র পাঁচ অনন্ত শূন্যে যেন মাত্র দু'টি মাটির ঢিবি। তা'হলে তারা কতখানি ছোট আমাদের চাঁদের সঙ্গে তার একটা তুলনা করে দেখা যাক। আমাদের চাঁদের ব্যাস—২,১৬০ মাইল।

গ্রহদের আকারের কম-বেশীর উপরেই যে চাঁদের সংখ্যার কম-বেশী নির্ভর করে তা নয় আবার তারই উপরে যে চাঁদের আকারের কম-বেশী নির্ভর করে তাও নয়। সৌরজগতে

* গ্যালিলিয়কে ঠিক দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের উদ্ভাবকের মর্যাদা দেওয়া যায় না। তিনি এই যন্ত্রকে আকাশ পর্যবেক্ষণের কাজে লাগিয়েছিলেন এই মাত্র। এ যন্ত্রের প্রকৃত উদ্ভাবক ডাচ্ দেশীয় এক চশমার কাচ নির্মাণকারী।

আকারের পক্ষ থেকে সর্ববৃহৎ হলো বৃহস্পতি, তবু তার চাঁদ সংখ্যা হলো নয়। বৃহস্পতির আকারের পর হলো শনি, কিন্তু তার চাঁদ সংখ্যা হলো বার। আবার চাঁদের আকারের পক্ষ থেকে শনির চাঁদ টাইটাস, বৃহস্পতির সব চাইতে বড় যে চাঁদ 'গানিমিড্ (ব্যাস ৩,২০০ মাইল) তার চাইতেও অনেকখানি বড়। মঙ্গল গ্রহ, গ্রহ হিসেবে পৃথিবীর চাইতে ছোট, কিন্তু তার চাঁদ সংখ্যা দু'টি, আকারে যদিও তারা নিতান্তই ক্ষুদ্র। বলা বাহুল্য প্রাক্-দূরবীক্ষণ কালের লোকের কাছে সৌরজগতের চাঁদ ছিল মাত্র একটাই, আর তা আমাদের এই পৃথিবীর চাঁদ। অন্যান্য কোন চাঁদকেই খালি চোখে একেবারে দেখাই যায় না, তাদের সবারই খবর হয়েছে দূরবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবিত হওয়ার পর। আশ্চর্য নয় যে মানুষ ভাবে আকাশে ঐ একটাই চাঁদ।

মিষ্টি রঙের দিন

শ্রীকরুণাময় বসু

প্রজাপতির পাখায় ওড়ে চাঁপা রঙের,
মিষ্টি রঙের দিন,
লাল গোলাপের ফুলবাগানে মৌমাছিরা বাহার সুরে
বাজায় খুশির বীণ।
পাল তোলা ওই মেঘের থেকে চম্‌কে পড়া
রোদের সোনা আলো
ছোট্ট ছেলে পুপুর চোখে আজ সকালে লাগছে বড়ো ভালো।
ঝলমলানি এই আলোতে কতো কালের স্বপ্ন যেন আনে,
তেপান্তরের সবুজ সবুজ খুশির হাসি
ঝাউ বাগানের উপচে পড়া গানে।
নীল আকাশের মিলিয়ে যাওয়া নীলে
ঝিলমিলিয়ে রঙের পাখা হাঁসের সারি, কোথায় পাড়ি দিলে?
টুপুর-টাপুর মিষ্টি দুপুর,
ঝুমুর ঝুমুর বাজছে নূপুর ছোট্ট মেয়ের ছোট্ট পায়ের নাচে:
রঙের খেলা নীল আকাশের রঙমহলে শার্শি-লাগা কাঁচে।
ফাগুন দিনের এই তো হাসির, বাঁশির সুরে
মিষ্টি রঙের দিন,
ফুলবাগানের দোলনচাঁপা দুলিয়ে দিয়ে মৌমাছিরা মিষ্টি সুরে
বাজায় খুশির বীণ।

এবার সে লক্ষ্য করল সন্তোষকে প্রায় কাবু করে ফেলেছে সুলতান। সন্তোষের একটা হাত পিছন থেকে মুচড়ে ধরে তার মাথার ওপরে একটা প্রকাণ্ড হাতুড়ি তুলেছে সুলতান। অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে তারা। কাছে যাওয়ার মত সময় নেই। অরিন্দম একটা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

লোহার হাতা তুলে সজোরে ছুঁড়ে মারল সুলতানের দিকে। অব্যর্থ লক্ষ্য। হাতাটা চক্রাকারে ঘুরে সুলতানের চোখের ঠিক ওপরে গিয়ে পড়ল। সন্তোষ ছাড়া পেয়ে তার পেটে একটা লাথি মারল সঙ্গে সঙ্গে। সুলতান পিছু হটতে হটতে টেবিলের ওপর পড়ল। সেটা সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেল প্রায় দেশলায়ের বাক্সের মত।

অরিন্দমের এবার নজর পড়ল লতিফ আর গণপতের ওপর। তারা জলন্ত চুল্লীর চতুর্দিকে ঘুরে যাচ্ছে ক্রমাগত। অরিন্দম ছুটে গেল সেই দিকে।

নরেনবাবু এতক্ষণ বাইরে পাহারায় ছিলেন। এবার তিনিও এলেন ছুটে। লতিফ দেখল, এবার বিপদ। তাই সে গণপৎকে ছেড়ে দাঁড়াল কয়েক মুহূর্ত। তারপর অরিন্দম আর নরেনবাবু আরও একটু কাছে যেতে জলন্ত চুল্লীর ওপর থেকে প্রাণশক্তিতে একটা শাবলের সাহায্যে ফুটন্ত তেল আর কস্‌টিক ভর্তি কড়াইকে উল্টে দিল তাদের দিকে। নরেনবাবু পাশে রাখা একটা টুলের ওপর লাফিয়ে উঠে পড়লেন। তারপর সঙ্গে সঙ্গে রিভলবার ছুড়লেন লতিফকে লক্ষ্য করে। চুল্লীর পাশে বসে পড়ল লতিফ। বিপদ হ'ল অরিন্দমের। ফুটন্ত তেল আর কসটিক তার দিকে আসতে লাগল স্রোতের মত। আশেপাশে উঁচু জায়গা নেই যে তার ওপর দাঁড়ায়। তবু ভয় পেল না অরিন্দম। সিলিং থেকে একটা শেকল ঝুলছিল, লাফিয়ে সেটা ধরে ঝুলতে লাগল সে। ঠিক সেই মুহূর্তে ফুটন্ত তেল আর কসটিক হিস হিস করে গড়িয়ে গেল মেঝের ওপর দিয়ে। গণপৎ বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালের গা-ঘেঁষে। চোখের নিমেষে লতিফ চুল্লীর পাশ থেকে ছুটে, ছোট একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে তার হাতের ছুরিটা ঝলসে উঠল। গণপৎ লুটিয়ে পড়ল চুল্লীর পাশে।

বিল্লু আর সুলতান ধরা পড়ল।

গণপতের গলায় লতিফের ছুরিটা বিঁধেছে। সে মৃতপ্রায়। তার কাছে গিয়ে বসল অরিন্দম।

একটু জল। বলল গণপৎ।

একটা কলসী থেকে জল নিয়ে তার মুখে দিল অরিন্দম। লতিফ তোমায় মারল কেন? জিজ্ঞেস করল সে।

ও শয়তান। অস্ফুট স্বরে বলল গণপৎ।

লতিফ কোথায় গেল জান?

জাহাজে। কথাটা বলে নিস্তব্ধ হয়ে গেল গণপৎ।

নরেনবাবু, আপনি ওদের নিয়ে চলে যান। বলল অরিন্দম।

নরেনবাবু পাশে রাখা এ্যা বলে লাফিয়ে উঠলেন, আর অরিন্দম শিকল ধরে ঝুলতে লাগল।

আর তুমি? নরেনবাবু তাকালেন তার দিকে।

আমি আর সন্তোষ লতিফের খোঁজে চললাম। বলল অরিন্দম।

সে কি? তোমার কি মাথা খারাপ? একটা দুর্ধর্ষ দলের সঙ্গে মাত্র দু'জনে লড়তে চলেছ?

ওখানে দলবল নিয়ে গেলে কাজ হবে না নরেনবাবু।

তা'হলে অন্ততঃ কান্তিকে সঙ্গে নাও।

না নরেনবাবু, তা'হলে জানাজানি হয়ে যাবে সব।

তা'হলে যা ভাল বোঝ তাই কর। তোমরা আজকালকার এই ছেলেরা বড় অবাধ্য হয়েছ।

নরেনবাবু কিন্তু মনে মনে এই গোঁয়ার ছেলেটাকে স্নেহ করেন।

ভোর প্রায় চারটে। আকাশটা মেঘলা বলে এখনও পূব দিকে আলো দেখা যাচ্ছে না। জাহাজের ওপর থেকে যে মোটা শেকলটা জলে নেমে গিয়েছে নোঙরের সঙ্গে, সেটা ধরে উঠতে লাগল অরিন্দম। শ্যাওলা ধরেছে মোটা শেকলের গায়। তাই কয়েকবার সে পিছলে গেল। ধীরে ধীরে পা আর হাতের সাহায্যে অরিন্দম উঠতে লাগল ওপর দিকে। কিছু দূর ওঠার পর একটু বিশ্রাম নিল সে। আবার পিছলে গেল অরিন্দম। একটু হলেই জলে পড়ে যেত, খুব সামলে নিল নিজেকে। হাওয়া দিচ্ছে হুহু করে। ভারী শেকলটা দুলছে এধার থেকে ওধারে। প্রাণপণ শক্তিতে সেটা আঁকড়ে ধরে রইল অরিন্দম। আর একটু হলেই সে ডেকে পৌছতে পারবে। হাঁপাচ্ছে সে এবার। শ্বাস তার রুদ্ধ হয়ে এসেছে এই কঠিন পরিশ্রমে। অবশেষে ডেকে পৌছল সে। ডেকের একধারে শুয়ে সে হাপাতে লাগল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর অরিন্দম উঠে দাঁড়াল। পা দুটো তার কাঁপছে তখনও। ঘাপটি মেরে সে পাকান দড়ির স্তূপের পাশে বসে দেখতে লাগল চারিদিকে। দেখল বয়ার কাছে জলে সন্তোষ ভাসছে তার ইঙ্গিতের অপেক্ষায়।

লতিফ তার কিছুক্ষণ আগেই পৌচেছে জাহাজে। হাতে তার একটাই ছুরি ছিল, তা না হলে অরিন্দমকে সাবড়ে দিত ওইখানেই। লোকটা ম্যাজিক জানে বলে মনে হ'ল লতিফের। তা না হ'লে টগবগে ফুটন্ত তেল আর কসটিকেও তার কিছু হ'ল না। এক লাফে অত উঁচু শেকলটা ধরে দিব্যি ঝুলতে লাগল। তবে বেইমান গণপৎকে মেরে সে খুশী হয়েছে। বেইমানের শাস্তি মৃত্যু। খবরটা পেলে কর্তা খুশী হবে নিশ্চয়। খালাসীদের মধ্যে তাদের দলের আরও ছ'জন লোক রয়েছে। লতিফ আসতে তারা ঘিরে ধরল তাকে।

কি হ'ল, সাবড়েছ টিকটিকিকে ? জিজ্ঞেস করল একজন। না, তবে গণপৎ খতম, উত্তর দিল লতিফ। গোয়েন্দাটাকেও আমি না সাবড়ে ছাড়ব না। সঙ্গে পিস্তলটা না নিয়ে ভুল করেছি আমি। আপসোস করল সে।

অরিন্দম উঠে ডেকের পাশে খালাসীদের থাকবার কেবিনটা খুঁজে নিল। তারপর সে চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগল লতিফের জন্য। কেবিন থেকে অস্পষ্ট কথাগুলো শুনতে পাচ্ছে সে। এবার সে স্ট্রাপে বাঁধা রিভলভারটা আনতে ভোলেনি। পরনে তার কাল ড্রেস, ডেকের অন্ধকারে যেন মিশে গিয়েছে সে। একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল অরিন্দম। ঠিক সেই মুহূর্তে একজন খালাসী তাকেও দেখেছে জানলার ফাঁক দিয়ে।

হঠাৎ কেবিনের দরজাটা খুলে সাতজন তার পিছু নিল। অরিন্দম ছুটল ওপরের ডেকে সিড়ি বেয়ে। সিঁড়ির শেষে সে ওত পেতে দাঁড়িয়ে রইল। প্রথমে দু'জন ওপরে উঠতে সে প্রথম খালাসীর পায়ে নিজের পা জড়িয়ে ল্যাং মারল। লোকটা পড়ল, এমনকি পিছনের লোকটাও পড়ল তার ওপর হঠাৎ বাঁধা পেয়ে। একটার কানের পাশে অরিন্দম খুব জোরে ঘুষি মারল। লোকটার মুখ দিয়ে, কোন আওয়াজ বের হ'ল না। দ্বিতীয় লোকটাকে তুলে যারা আসছিল সিঁড়ি দিয়ে, তাদের দিকে ছুঁড়ে দিল। সকলেই পড়ে গেল সিঁড়ির ওপর।

এবার দৌড়তে লাগল অরিন্দম। রিভলবার সে ব্যবহার করল না। গুলির আওয়াজে আরও বেশী লোক এসে পড়লে তাকে ধরে ফেলতে দেরি হবে না। ছুটে যখন সে ডেকের প্রান্তে এসে পৌছল, তখন একটা গুলির আওয়াজ শুনল অরিন্দম। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, লতিফ তার দিকে পিস্তল বাগিয়ে ছুটে আসছে। আবার গুলি ছুঁড়ল লতিফ। ডেকের ওপর রাখা দড়ির স্তূপের আড়ালে লুকিয়েছে অরিন্দম। হাঁপাচ্ছে সে। কিন্তু আর দেরি করলে চলবে না। ডেকের রেলিঙের কাছে সে দৌড়ে গিয়ে একটা ডিগবাজি খেল। সঙ্গে সঙ্গে লতিফের হাতের পিস্তল গর্জে উঠল। ডাইভ দিয়ে অরিন্দম নীচে জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল। একটা অট্টহাসি হাসল লতিফ।

সমাপ্ত

নানা পাখীর নানা গল্প

শ্রীঅরুণচন্দ্র ভট্টাচার্য

রবীন আর চড়াই পাখীদের নিয়ে নানান দেশে নানান গল্পের ছড়াছড়ি। তারই দু'একটা তুলে ধরছি এখানে তোমাদের কাছে।

যুগ যুগ ধরেই রবীন পাখীকে মানুষের বন্ধু বলা হয়েছে। এটাও ঠিক, মানুষের সঙ্গে রবীন পাখীর ব্যবহার সর্বদাই বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ, অন্ততঃ ইংলণ্ডের প্রতিটি ছেলেমেয়েই একথা বলবে।

উদ্যান-প্রিয় মানুষ যখন নতুন চারা লাগানোর আনন্দে জমি খুঁড়তে থাকে—রবীন পাখী কাছে-পিঠে উড়ে আসে, ও মনে করে, মানুষ বুঝি ওর কীটপতঙ্গ যোগানোর জন্যই মাটি খুঁড়ছে। তাই কৃতজ্ঞচিত্তে ও একটা সুন্দর গান গেয়ে দয়াবান মানুষদের ধন্যবাদ জানায়।

আর চটপট করে লাফাতে-ঝাঁপাতে যার জুড়ি নেই, সেই চড়াই পাখী রবীনের মত গায়ে গায়ে লেগে না থাকলেও, মানুষের বড় বিশ্বাসভাজন। সে মানুষের কাছে কাছে থাকতেই ভালবাসে। তাই আমাদের কোঠাবাড়ীর আনাচে-কানাচে যত্রতত্র বাসা বাঁধতে দেখা যায় তাকে।

এই দুটো পাখী নিয়ে বেশ সুন্দর একটা গল্প রয়েছে। গল্পটার নাম, 'কুমারী কন্যার চোখে খড়।' গল্পটা এই ধরণের: একদিন কুমারী মেরী যখন নাজারেথের রাস্তা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, তখন তাঁর চোখে একটি খড় উড়ে এসে পড়ে। তাঁর যন্ত্রণায় ব্যস্ত হয়ে কাছাকাছি ঝোপ থেকে একটা রবীন উড়ে আসে এবং এসে চড়াইকে বলে—"ভাই আমাকে একটু সাহায্য কর।"

চড়াই বল্ল—বেশ।

তারপর সে তার লম্বা ঠোঁট ভর্তি করে বেশ কয়েক ফোঁটা জল নিয়ে এল। তারপর দুজনেই কুমারী মেরীর ঘাড়ে বসে পড়ল। এবার রবীন কুমারীর চোখে কয়েক ফোঁটা জল আস্তে করে ফেলে দিল। তারপর চড়াই যখন তার লম্বা লেজ চোখের পাতার নীচে দিয়ে বুলিয়ে দিল—অমনি সেই খড়টা পড়ে গেল। কুমারী পরম খুসী মনে পাখী দুটোকে ধন্যবাদ জানালেন। সেইদিন থেকে মানুষের বাড়ীর আশেপাশেই চড়াইয়ের আস্তানা, আর মানুষ যীশুর ফেলে দেওয়া খাবারে রবীনের অধিকার।

এবার পেঁচার কথা বলি। পেঁচা শব্দের ইংরেজী Owl (আউল)। Owl শব্দটা আবার Anglo-Saxon Language থেকে এসেছে—এর অর্থ 'কোলাহলকারী'। ইংল্যাণ্ডের সাসেক্সে একটা প্রবাদ শুনতে পাওয়া যায়—'রাত্রে পেঁচারা যখন খুব চীৎকার করে তখন সুপ্রভাত আশা করতে পার।'

আবার পেঁচার ঝোল একরকম হুপিং কাশির ভাল ওষুধ ছিল। অবশ্য আজকাল নয়—হাজার হাজার বছর আগে। পেঁচারা ক্ষেতের পোকা খেয়ে ফেলে ব'লে তাই এরা চাষার বন্ধু।

এরপর পেঁচাকে নিয়ে লেখা গল্পে আসি।

ভগবান তাঁর সুদূর শৈশবে একদিন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হলেন। ক্ষুধার্ত অবস্থায় তিনি একজন রুটিওয়ালার দোকানে গেলেন—এবং একটা কেক চাইলেন। সেই সময় দোকানে একটাও কেক ছিল না। তাই সে বাজারে যেয়ে চিনি, ময়দা এবং কেক করতে আর যাযা জিনিস লাগে নিয়ে এল। তারপর সে কেক তৈরী করতে আরম্ভ করল। কিন্তু তার স্বভাবকৃপণ মেয়ে প্রতিবাদ করল—কেকটা খুব বড় হয়ে যাচ্ছে।

তাই সে কেটে এটাকে দু'টুকরো করল। তারপর এটা যখন তাওয়ায় সেঁকা হচ্ছিল—সে আবার ঢাকনা খুলল এবং আর এক টুকরো কেটে নিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেকটাকে যখন উনুন থেকে নামান হ'ল, তখন কেকটাকে প্রথম অবস্থার মতই বড় দেখা গেল। বিস্মিত মেয়েটি চীৎকার করে উঠল—উঃ উঃ!

সেই মুহূর্তেই সে একটা বিকটাকারের পেঁচায় পরিবর্তিত হয়ে গেল। দিনের আলো তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। সে ছুটে গেল অন্ধকারাচ্ছন্ন বনে—আজও সেখানেই সে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বায়না

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

আকাশেতে চাঁদ দেখে
খুকু ধরে বায়না—
চাঁদ চাই, চাঁদ চাই,
চাঁদ নিয়ে আয় না।
কেঁদেকেটে বাড়ি মাত—
থামানো যে যায় না।

খেলনাতে ভোলেনাকো,
খেতে দিলে খায় না
শেষকালে দাদা তার
এনে দেয় আয়না,
আয়নাতে চাঁদ দেখে
খুকু ছাড়ে বায়না।

স্টেট বাসের গল্প

(সত্য ঘটনা)

শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র

এটা যে সময়ের ঘটনা তখন পাইকপাড়া ও চেতলার মধ্যে ৩৩নং রুটের যে বাসগুলি যাতায়াত করতো সেগুলো ছিল একতলা, এখনকার মতো দোতলা নয়। একতলা এই বাসগুলির দু'টি করে দরজা ছিল, একটা সামনের দিকে আর অন্যটা পেছনের দিকে। দুটো দরজা দিয়েই লোক ওঠা-নামা করতো।

একদিন সকাল সাড়ে ন'টায় হাজরা রোডে একটি বিশেষ কাজে যাবার উদ্দেশ্যে পাইকপাড়া থেকে এমনি একটি একতলা বাসে উঠেছিলাম। অফিস টাইমের বাস হোলেও আমি পাইকপাড়া থেকে উঠেছিলাম বলে, পেছন দিকের পাঁচ সিটের বেঞ্চির ওপাশের শেষ প্রান্তে বসবার একটা জায়গা পেয়ে গিয়েছিলাম।

বাসে যখন উঠেছিলাম তখন ভিড় না থাকলেও মানিকতলার কাছে পৌছবার আগেই একটু একটু করে যে ভাবে বাসটা লোকে ভর্তি হয়ে গেলো, তাতে মনে হলো আর একজনেরও বুঝি একটু দাড়াবার জায়গাও হবে না; কিন্তু আমাদের সবাইকে অবাক করে মানিকতলা বাজারের স্টপে বাস দাঁড়াতেই দু'তিনজন যাত্রী উঠলেন, আর উঠলেন প্রায় মণ-তিনেক ওজনের একটি সচল পাহাড়। ভদ্রলোকটি তাঁর বিরাট ভুঁড়িটা কোন রকমে ঠেলেঠুলে ঢুকিয়ে, পেছন দিকের দরজা দিয়ে বাসে উঠলেন এবং বাসের পেছন দিকের যে বেঞ্চিতে আমি ও আর চারজন যাত্রী বসেছিলাম, সেই দিকে পেছন করে মাথার ওপরে রড ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বাসে যারা দাড়িয়ে থাকেন, চলন্ত বাসের দোলানীতে স্বাভাবিকভাবে তাঁরাও কম-বেশী দোলেন। বাস ছাড়বার সময় কিংবা ব্রেক কসবার সময় যে ঝাঁকানি হয়, তাতে যাত্রীদের দোলা আরও একটু প্রকট হয়। বাস চলছে আর চলন্ত বাসের দোলানীতে দণ্ডায়মান সবাই দুলছেন, তবে ভারী শরীর বলেই বোধ হয় মোটা ভদ্রলোকটি একটু বেশীই দুলছিলেন। মাঝে মাঝে বাসের ঝাঁকানীতে তিনি পেছন দিকে এতটা হেলে পড়ছিলেন যে, তাতে মনে হচ্ছিল, পেছনে বসা কোন যাত্রীর ওপর পড়েই বা যান।

মোটা ভদ্রলোকটি সত্যি যদি কারো ওপর বসে পড়েন, তবে তাঁর দেহের চাপে চিঁড়ে-চ্যাপটা হয়ে যেতে হবে, এই ভয়েই বোধ হয় তাঁর ঠিক পেছনেই যে যাত্রীটি বসেছিলেন, তিনি আমাকে ও সেই বেঞ্চির আরও তিনজন যাত্রীকে তাঁর ভারের কথা জানিয়ে, একটু ঘেঁষাঘেষি করে সরে বসতে অনুরোধ করলেন। আমরা তাঁর অনুরোধে সরে বসতে যে সামান্য জায়গাটুকু হলো সেখানেই ভদ্রলোকটিকে বসতে বলা হলো।

থ্যাঙ্কস্ (ধন্যবাদ) বলে মোটা ভদ্রলোকটি সেখানে বসলেন বটে, কিন্তু না বসলেই

বোধ হয় ভালো হতো, কেন না ঐ সামান্যটুকু জায়গায় একজন রোগা লোকই ঠিক ভাবে বসতে পারে না, তাঁর মতো মোটা লোক তো দূরের কথা! ভদ্রলোকটি তাঁর পাছার খুবই সামান্য একটু অংশ কোন রকমে সেই খালি করা জায়গায় ঠেকিয়ে বসলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই তাঁর অস্বস্তি শুরু হয়ে গেলো। তাঁর অস্বস্তির কারণ আমরা সহজেই অনুমান করতে পারলাম। বুঝলাম বেঞ্চির ধারে ঠেকিয়ে রাখা পাছার সামান্য একটু অংশের ওপর প্রায় তিনমণ ওজনের চাপ পড়ার জন্য তাঁর কষ্ট হচ্ছে। তিনি উসখুস করতে লাগলেন এবং একবার তাঁর এপাশের আর একবার ওপাশের যাত্রীদের দিকে বারবার তাকাতে লাগলেন।

এই ভাবে আরও কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর ভদ্রলোকটি বোধ হয় আর কষ্ট সহ্য করতে পারলেন না। দু'পাশের যাত্রীদের সম্বোধন করে খুবই কুণ্ঠিতভাবে বললেন, দাদারা যদি থাইগুলি একটু 'শ্রিঙ্ক' করে বসেন, তবে একটু আরাম করে বসতে পারি। এভাবে বসে থাকতে বেশ কষ্ট।

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই ওপ্রান্ত থেকে কে একজন বলে উঠলেন, সরি দাদা. আর শ্রিঙ্ক করবার উপায় নেই,—আমরা সবাই স্যানফোরাইজ্‌ড্‌। *

* জামা বা প্যান্টের কাপড় নতুন কাচলেই শ্রিঙ্ক (Shrink) করে, অর্থাৎ সঙ্কুচিত হয়ে ছোট হয়ে যায়। এই দোষ দূর করার জন্য কাপড়-কলের মালিকরা এমন এক ধরণের কাপড় বাজারে ছাড়লেন যা কাচলে শ্রিঙ্ক করে না। এই বিশেষ গুণবিশিষ্ট কাপড়কে বলা হয় স্যান্‌ফোরাইজড্‌ (Sanforized) কাপড়।

খাই খাই

শ্রীসাধনা দে মজুমদার

রুনু পিনু দুই ভাই দিনরাত খাই খাই
যত খায় তবু বলে খাইনি।
একদিন দুপুরেতে দুজনেতে মিলে,
যত মাংস ছিল রাঁধা সব খেয়ে নিলে।
তারপর মাঝরাতে পেট হ'ল ফুলে জয়ডাক,
সবাকার ভাঙে ঘুম, সারা বাড়ি পড়ে হাঁকডাক।
রুনু পিনু কেঁদে বলে, মাগো প্রাণ এখুনি যে যাবে!
রেগেমেঘে মা বলেন, চুরি করে আর কিছু খাবে?
দুই ভাই কাঁদে আর বলে মাগো ক্ষম আমাদের
পেয়েছি উচিত শিক্ষা খাই খাই করব না ফের!

ছড়া * ছড়া * ছড়া * ছড়া

চন্দনা

শ্রীসুধীরকুমার দাস

উঃ কি পাজি চন্দনাটা
কাউকে মনে না,
বোবার মত তাকিয়ে থাকে
হাসতে জানে না !
খেতে দিলে খায়নাকো সে,
এক পা তুলে রয় সে বসে;
ভাত ফেলে দেয়
মাছ ফেলে দেয়
খেতেই জানে না !

চলবে না

শ্রীপ্রীতিভূষণ চাকী

চলবে না চাঁদে আর
চরকার চাকা—
চাঁদ-বুড়ী ভেবে মরে ঃ
'হবেনাকি থাকা ?'

খোকা বলে—'ভয় নেই,
দিদা তুমি, থাকো—
রকেটেই চড়ে যাবো
কিছু ভেবোনাকো !

কে যায়

শ্রীঅমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দ্যাখ ও কে যায়,
লাল জামা গায় ;
নাগরা দু'পায়,
পাগড়ী মাথায়।
দেখবি তো আয়
হেসে হেসে চায়,
গিলে গিলে খায়,
গোঁফটা নাচায় !

চাষা

শ্রীরবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

এক যে ছিল চাষা
গাঙের ধারে বাসা
গাঙের জলে ডুবটি দিয়ে
চানটি করে খাসা।
চাষার মুখে হাসি
বাজায় বাঁশের বাঁশি
মনের সুখে বেড়ায় ঘুরে
নাইকো উচ্চ আশা।

রাজগীর ও নালন্দা

শ্রীরামপ্রসাদ সরকার

ভগবান বুদ্ধের পাদস্পর্শে ধন্য রাজগীর এবং নালন্দার কথাই তোমাদের আজ বলবো। এই দু'টি শহর বিহার রাজ্যে অবস্থিত। হাওড়া থেকে ট্রেনে বক্তিয়ারপুর যেতে হবে। সেখানে গাড়ী বদল করে রাজগীর। আর রাজগীর থেকে নালন্দার দূরত্ব মাত্র আট মাইল, বাসে বা টাঙ্গায় যাওয়া যায়।

অনেক অনেক বছর আগে হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে নেপালের কপিলাবস্তু নগরে শুদ্ধোধন নামে এক রাজার সিদ্ধার্থ গৌতম নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। অতুল ঐশ্বর্যের মাঝে বালক গৌতম বড় হতে লাগলেন। ছোট বেলা থেকেই গৌতম ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির। রাজ-ঐশ্বর্য তার ভালো লাগতো না। মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় তাঁর মন কাঁদতো। সাধারণ মানুষের দুঃখ দূর করার জন্যে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। রাজা শুদ্ধোধন অল্প বয়সেই গৌতমের বিয়ে দিলেন। কিন্তু গৌতমের প্রকৃতির কোনো রূপান্তর ঘটলো না। একদিন গভীর রাত্রে সকলের অলক্ষ্যে ঘর ছেড়ে গৌতম পথে বেড়িয়ে পড়লেন শান্তির সন্ধানে। ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌছলেন প্রাচীন মগধের এককালীন রাজধানী রাজগৃহে। রাজগৃহে তখন বিম্বিসার নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। সে প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর কথা। শান্তি-সন্ধানী সিদ্ধার্থ গৌতম রাজগৃহে কিছুদিন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। রাজগৃহ থেকে ফিরে গিয়ে তিনি 'বুদ্ধত্ব' লাভ করেন এবং ভগবান বুদ্ধ নামে পরিচিত হন। বুদ্ধত্ব লাভের পর ভগবান বুদ্ধ বহুবার রাজগৃহে আসেন অহিংসার বাণী প্রচার করতে। বুদ্ধের নামগানে রাজগৃহ মুখরিত হয়ে ওঠে। কালের প্রবাহে রাজগৃহ 'রাজগীর' নামে পরিচিত হয়।

মগধাধিপতি বিম্বিসার বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলে কি হবে, তাঁর পুত্র অজাতশত্রু ক্রমেই ধর্মবিদ্বেষী হয়ে উঠেন। অজাতশত্রু ধর্ম মানতেন না, সিংহাসনের প্রতি তাঁর লোভ ছিল অপরিসীম। একদিন পিতা বিম্বিসারকে কারারুদ্ধ করে অজাতশত্রু মগধের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। কারারুদ্ধ অবস্থায় বিম্বিসার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রাজগীরে এলে তোমরা 'বিম্বিসার কারা' দেখতে পাবে। এখানে বিম্বিসারকে বন্দী করে রাখা হয়েছিলো।

পিতৃঘাতক অজাতশত্রু সিংহাসনে আরোহণ করে রাজপুরীতে বুদ্ধের উপসনা বন্ধ করে দেন। কিন্তু রাজাদেশ অমান্য করে বুদ্ধের দাসী শ্রীমতী এক শারদ-সন্ধ্যায় করলেন ভগবান তথাগতের উপাসনা। মুক্ত কৃপাণে ছুটে এলো রাজ-প্রহরীরা। অজাতশত্রুর আদেশে হত্যা করলো তারা শ্রীমতীকে। শ্রীমতীর রক্তে সেদিন রাঙা হয়ে উঠেছিল পূত-পবিত্র পূজার বেদী। আজও

তোমরা রাজগীরে বেণুবনের সেই পূত-পবিত্র বেদীর ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাবে যা 'অজাতশত্রু স্তূপ' নামে পরিচিত।

বৈভার, বিপুল, রত্নগিরি, সোনাগিরি ও উদয়গিরি—এই পাঁচটি পাহাড়কে ঘিরে বর্তমান রাজগীর শহর গড়ে উঠেছে। রাজগীরের জন্য রয়েছে সরকারী আবাসস্থল ও ধর্মশালা। রাজগীর কেবলমাত্র ঐতিহাসিক নিদর্শনের জন্যে প্রসিদ্ধ নয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসাবেও রাজগীর জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তাছাড়া রাজগীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুবই মনোরম।

বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে রাজগীরকে রক্ষা করার জন্যে মহারাজ বিম্বিসার ৩০ মাইল ব্যাপী এক প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন। এই প্রাচীর 'প্রাগৈতিহাসিক প্রাচীর' নামে পরিচিত। রাজগীরের পাহাড়গুলোর মাথায় তার ধ্বংসাবশেষ আজও দেখতে পাবে।

রাজগীরের ভস্মকুণ্ডগুলো তোমাদের কাছে খুব ভালো লাগবে। আর তার উষ্ণজলে স্নান করে তোমরা প্রচুর আনন্দ লাভ করবে। রাজগীর শহরের পশ্চিম প্রান্তে বৈভার পাহাড়ের পাদদেশে সপ্তর্ষিকুণ্ড ও ব্রহ্মকুণ্ড অবস্থিত। সাতটি নলের সাহায্যে সপ্তর্ষিকুণ্ডের জলধারাকে প্রবাহিত করা হচ্ছে। ব্রহ্মকুণ্ডের জল চৌবাচ্চার মত এক বর্গাকৃতি জায়গায় ধরে রাখা হয়। এই উষ্মকুণ্ডগুলির জলে অবগাহন করতে দেশ-দেশান্তর থেকে রোগ-জরাক্লিষ্ট মানুষ ছুটে আসে, অবগাহন করে অনেকে রোগমুক্ত হন। কথাটা শুনে খুব অবাক হচ্ছ, তাই না? তোমরা ভাবছো যে উষ্মজলে এমন কি আছে যা রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে? শোনো তবে: বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জানা গেছে যে, এই উষ্মকুণ্ডগুলির জলে দ্রবীভূত অবস্থায় অনেক প্রকারের ধাতুজ পদার্থ আছে যা বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে কাজ করে থাকে। তাই তো পুণ্যকামী মানুষের চেয়ে রোগমুক্তির আশায় রাজগীরে বেশী লোকের সমাগম হয়।

রাজগীরের ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি দেখা শেষ করে চলে এসে নালন্দায়। মাত্র আট মাইলের পথ। বাস বা টাঙ্গা সব সময় পাবে।

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষের ছবি তোমরা ইতিহাস বই-এর পাতায় দেখেছো নিশ্চয়। এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল সম্বন্ধে অনেক মতবাদ আছে। মৌর্য সাম্রাজ্যের অধিপতি সম্রাট অশোক খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে নালন্দা বিহার নির্মাণ করেন বলে অনেকে অনুমান করেন। আবার অনেক ঐতিহাসিকের মতে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রথম কুমার গুপ্তের রাজত্বকালে নালন্দা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক মতামত যাই হোক না কেন, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় যে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান হিসেবে গড়ে উঠেছিলো সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মহারাজ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে।

এক সময় শীলভদ্র নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ভারত পরিভ্রমণে এসে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শীলভদ্রের কাছে কিছুদিন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। মুসলমান রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে প্রায় অবলুপ্ত হয়ে যায়। সময়ের স্রোতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ও একদিন বিস্মৃতির অন্তরালে তলিয়ে যায়। উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে

নালন্দা—প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বর্তমান রূপ-চিত্র।

আলেকজাণ্ডার ক্যানিংহাম নালন্দার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। ১৯১৫ সাল থেকে ভারতের পুরাতত্ত্ব বিভাগ খননকার্য চালিয়ে নালন্দার যে ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছেন, তা তোমরা বর্তমান নালন্দায় দেখতে পাবে।

নালন্দার ধ্বংসাবশে দেখে বুঝতে পারবে যে, প্রাচীন ভারতের স্থাপত্যশিল্প কতো সুপরিকল্পিত ছিলো। সুবিস্তৃত জায়গা জুড়ে এই ধ্বংসাবশেষগুলো সংরক্ষিত করা আছে। ধ্বংসাবশেষগুলোর মধ্যে বাসোপযোগী বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ, স্নানাগার, রন্ধনশালা, উপাসনাগার, অধ্যয়নাগার প্রভৃতির চিহ্ন আজও দেখতে পাওয়া যাবে।

নালন্দার সংগ্রহশালাটি দেখে তোমরা সত্যিই অবাক হবে, সরকারী পরিচালনাধীনে এই সংগ্রহশালায় বৌদ্ধযুগের অনেক নিদর্শন রাখা আছে।

মেঠুড়ে

ক্রিকেট

সিডনি মাঠে অষ্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পঞ্চম ও শেষ টেস্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ৩৮২ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারিয়ে দিয়ে জয়ের গৌরব, রাবার, ওরেল ট্রফি সবই লাভ করেছে।

সফরের শুরুতেই ব্যবস্থা ছিল সিরিজের মীমাংসার জন্য শেষ টেস্ট খেলা পাঁচ দিনের জায়গায় ছ'দিন হবে। সিডনির ছ'দিনের টেস্টে রান হয়েছে ১৬৪৪। তবে পঞ্চাশ দিনে দু'দলের সংগৃহীত ৪৫৮ রান নিশ্চয়ই প্রাণবন্ত এবং উজ্জ্বল ক্রিকেটের নিদর্শন।

সিডনির শেষ টেস্টে অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ৬১৯ রান ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় তাদের নতুন রেকর্ড। ডগ ওয়াল্টার্স ও বিল লরির জুটিতে ৩৩৬ রান ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে চতুর্থ উইকেটে নতুন রেকর্ড। ওয়াল্টার্স নিজে ২৪২ রান করে ডন ব্রাডম্যানের একটা রেকর্ড ভেঙেছেন। আর দ্বিতীয় ইনিংসেও সেঞ্চুরি করে এক অনন্য বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন। ওয়াল্টার্স ছাড়া এ টেস্টে অষ্ট্রেলিয়ার ইয়ান রেডপাথ করেছেন জীবনের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি। সোবার্সের ১১৩ রানের ফলে টেস্টে তাঁর একুশটা সেঞ্চুরি পূর্ণ হয়েছে। সেমুর নার্স এবং বিল লরিও হয়েছেন সেঞ্চুরির অধিকারী। সবসুদ্ধ শেষ টেস্টে একটা ডাবল সমেত ছ'টা সেঞ্চুরি হয়েছে।

*　　　*　　　*

জাতীয় ক্রিকেট আসরে বোম্বাই এবারও তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছেন। এবার নিয়ে তাঁরা মোট কুড়ি বার ও পর পর এগার বার রণজি ট্রফি নিজেদের ঘরে তুললেন।

এবারের প্রতিযোগিতায় বোম্বাইয়ের প্রতিপক্ষ ছিল বাংলা। বাংলা এবার নিয়ে মোট ছ'বার ফাইন্যালে উঠলেও মাত্র একবার ১৯৩৯ সালে ফাইন্যালে লংফিল্ডের অধিনায়কত্বে তাঁরা দক্ষিণ পাঞ্জাব দলকে পরাজিত করেছিলেন।

বোম্বাই বনাম বাংলা দলের পাঁচদিনব্যাপী রণজি ট্রফির খেলা হয়েছিল বোম্বাইয়ের ব্রাবোন স্টেডিয়ামে। বাংলার অধিনায়ক অম্বর রায় টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন, কিন্তু

মাত্র ৮৭ রানের মধ্যে দলের চারজন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় আউট হওয়ার বাংলা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। কিন্তু পঞ্চম উইকেটে চুনী গোস্বামী ও দেবু মিত্রের দৃঢ়তায় বাংলা যে শুধু বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠে তা নয়, প্রথম দিনের শেষে এই জুটি অপরাজিত থাকায় দিনের শেষে দলের রান সংখ্যা দাঁড়ায় চার উইকেটে ২৩৬। চুনী ও দেবু যথাক্রমে ৮৫ ও ৫৫ রান করে অপরাজিত থাকেন। দ্বিতীয় দিনের শুরুতে এই দু'জন খেলোয়াড় দ্রুত আউট হওয়ায় মনে হয়েছিল বাংলা হয়তো ৩০০ রানও ওঠাতে পারবে না, কিন্তু ষষ্ঠ উইকেটে ২৬০ থেকে সুব্রত গুহ ও গোপাল বসুর যোগাযোগে সপ্তম উইকেটে ১০২ রান যোগ হয়। ৩৮৭ রানে বাংলার প্রথম ইনিংস শেষ হয়।

দ্বিতীয় দিনের শেষে বোম্বাই সারদেশাইয়ের উইকেট হারিয়ে ১ উইকেটে ৫৫ রান করে। তৃতীয় দিনে বোম্বাইয়ের ব্যাটিংয়ে দৃঢ়তা দেখা যায় এবং মুখ্যত অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকারের সেঞ্চুরি (১৩৩) ও নায়েক এবং ভোঁসলের দৃঢ়তায় তারা জয়ের পথে এগিয়ে যায়। দিনের শেষে বোম্বাইয়ের রান সংখ্যা দাঁড়ায় ৫ উইকেটে ৩৩৬। চতুর্থ দিন ৪৬৯ রানে বোম্বাইয়ের সমস্ত খেলোয়াড়রা আউট হয়ে যান।

বাংলার দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতে আবার ব্যাটিং বিপর্যয় দেখা দেওয়ায় মনে হয়েছিল হয়তো সরাসরি দু'ইনিংসেই খেলার চূড়ান্ত ফয়সালা সম্ভব। কিন্তু এবারও ত্রাণকর্তার ভূমিকা গ্রহণ করেন চুনী গোস্বামী। প্রথম ইনিংসে তিনি মাত্র চার রানের জন্যে সেঞ্চুরি করতে পারেন নি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১৬ রানের জন্য। গ্লান্স, হুক ও স্কোয়ার কাট করে চুনী গোস্বামী যে ক্রীড়াচাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন, বোম্বাইয়ের ক্রিকেট দর্শক তা অনেক দিন মনে রাখবেন।

বাংলার প্রথম ইনিংসে ৩৮৭ রান হওয়ায় বাংলার জয়ের সম্ভাবনার কথা অনেকের মনে হয়েছিল। কারণ বাংলার বোলিং বোম্বাই দলের চেয়ে শক্তিশালী ছিল। মহীশূরের বিপক্ষে বাংলার বোলাররা—সুব্রত, দোসী ও গোপাল বসু যে উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন তাতে সে-আশা দোষের নয়। ওই আশা শেষ পর্যন্ত হয়তো সত্যে পরিণত হ'ত, যদি না বাংলার খেলোয়াড়রা ফিল্ডিংয়ে ত্রুটির পরিচয় দিতেন।

সন্ধানী

ইলেকট্রোনিক হাতের 'চিন্তাশক্তি'

আজকাল যে মায়ো ইলেকট্রিক কৃত্রিম নিচের হাত তৈরি হচ্ছে, তা স্বাভাবিক হাতের মত কাজ করতে পারে। প্লাসটিকের তৈরী ৬৫০ গ্রাম ওজনের এই কৃত্রিম হাত দেখতে স্বাভাবিক হাতের মত। ওপর হাতের ছুঁচলো অংশের পেশী থেকে যে দুর্বল বৈদ্যুতিক প্রবাহ বেরোয়, তা কৃত্রিম হাতে সঞ্চারিত হয় এবং ট্রানজিস্টার মারফত তা হাতের ব্যাটারীচালিত মোটরে পৌছয়। পেশীর সেই বৈদ্যুতিক প্রবাহের সংকেত বুঝে রুগী তার কৃত্রিম হাতের আঙুল নাড়াতে পারে। তবে পেশীর এই সংকেত বুঝতে কিছু-দিন ট্রেনিংয়ের দরকার হয়। বর্তমানে একটি কৃত্রিম হাতের দাম ২,৫০০ জার্মান মার্ক, অর্থাৎ প্রায় ৫০০০ টাকার মত।

হামবুর্গ থেকে 'গরম মশলা'

পৃথিবীর একটি নামজাদা মশলার আড়ৎ হচ্ছে জার্মানীর হামবুর্গ। পশ্চিম জার্মানীর এলব্ নদীর তীরে অবস্থিত এই শহরটি মধ্যযুগ থেকেই মশলার জন্যে বিখ্যাত। ইওরোপের মধ্যে সবচেয়ে বড় মশলার কারখানা এখানেই। সেই কারখানায় পৃথিবীর নানাদেশ থেকে চালানী মশলা আসে। প্রতি সপ্তাহে সেখানে একলক্ষ বিশ হাজার কিলোগ্রাম উৎকৃষ্ট গুঁড়ো মশলার প্যাকেট তৈরি হয়ে দেশ-বিদেশ চালান যায়। কারখানা থেকে বাজারে ছাড়ার আগে সমস্ত মশলা ষোল ঘণ্টা নাইট্রোজেন দিয়ে বীজাণু-শূন্য করা হয়। অনেকে এই কারখানা থেকে নিজস্ব রুচি ও স্বাদ অনুযায়ী মশলাপাতি তৈরী করিয়ে নেন।

শ্রীদীপায়ন বিশ্বাস

ডাঃ লেসলি নামে জনৈক গবেষক অন্ধদের জন্য টর্চের মত যে 'আলট্রাসোনিক গাইড্যান্স' নামক ডিজাইনটি আবিষ্কার করেছেন, সেটি দিয়ে কোন লোকের সাহায্য ছাড়াই দৃষ্টিহীন ব্যক্তি এগিয়ে যেতে পারবে পথের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে।

*　　　　*　　　　*

বর্তমানে সয়াবীন থেকে ওষুধপত্র, কাপড়চোপড়, রবার, রং, সাবান ও শূয়োর, মুরগী, গরু প্রভৃতির কৃত্রিম মাংস এবং তেল, রুটি, ইষ্ট, মিছরি, প্লাষ্টিক ও বাড়ি-ঘর নির্মাণের উপকরণ তৈরি হচ্ছে।

*　　　　*　　　　*

মিসিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিগরি শিক্ষণ কলেজের জনৈক অধ্যাপক এমন এক ইলেকট্রনিক ব্ল্যাকবোর্ড আবিষ্কার করেছেন, যাতে যা কিছু লেখা বা আঁকা হবে, তা ৫০ থেকে ১০০ মাইল দূরের অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রের বোর্ডেও সেই লেখা বা আঁকা হুবাহু ফুটে উঠবে।

*　　　　*　　　　*

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এলুমিনিয়াম-এর সঙ্গে পলিথিন ও প্ল্যাষ্টিক মিশিয়ে এমন এক নতুন এলুমিনিয়াম পাত তৈরি হয়েছে, যা সহজেই অন্য কোন বস্তুর সঙ্গে জোড় লাগান যায় আবার কাঁচি দিয়ে যেমন ইচ্ছে কাটা যায়।

*　　　　*　　　　*

উত্তর ভারতে যোধপুর নামে যেমন একটি শহর আছে, তেমনি ঐ শহরের নামেই ঘোড়ায় চড়ার জন্য যে ব্রিচেস পরা হয়, তাকে 'যোধপুর ব্রিচেস' বলে।

*　　　　*　　　　*

ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাইরেও ভারতীয় ও ইংরেজ সৈনিকরা পায়ে মোজার বদলে একপ্রকার 'পট্টি' ব্যবহার করতো খাঁকি রঙের। জড়িয়ে জড়িয়ে পরতে হ'ত তাকে। এখনও ভারতীয় পুলিসদের মধ্যে তার ব্যবহার আছে, কিন্তু সৈনিকদের মধ্যে নেই বললেই চলে।
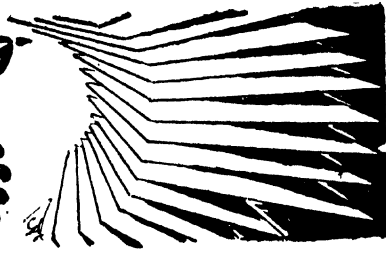
সাংবাদিকের দায়িত্ব

অজানাকে জানিবার ইচ্ছা মানুষের চিরন্তন। মানুষের ক্ষুদ্র এবং সীমিত জ্ঞানের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রত্যেকটি ঘটনাকে সম্যক-রূপে জানা সম্ভব। সংবাদপত্র মানুষের জ্ঞানের পিপাসাকে বহুলাংশে পূরণ করিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পর হইতে সংবাদপত্রের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

এই সংবাদপত্র পরিচালনার নানা গুরু দায়িত্ব অসংখ্য লোকের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে সাংবাদিকদের দায়িত্ব সর্বাধিক। সাংবাদিকদের মুখ্য কাজ হইল দেশের এবং বিদেশের নিকট হইতে বিভিন্ন প্রকার সংবাদ সংগ্রহ করা। তাছাড়া দেশ-বিদেশ হইতে সংবাদপত্রের অফিসে সংবাদ আসেও প্রচুর। অত সংবাদের জন্য সংবাদপত্রে স্থান সঙ্কুলান করা অসম্ভব। সুতরাং সাংবাদিকদের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য হইল, সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলি নির্ধারণ করা।

সাংবাদিকদের দ্বিতীয় কর্তব্য সংগৃহীত সংবাদের মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলি-নির্বাচন করা। যেগুলি জাতীয় স্বার্থের দিক হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ, তাহাদের প্রথম পৃষ্ঠাতে স্থান দেওয়া, প্রভৃতি।

এই সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনের জ সাংবাদিকদের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইতে হয় অর্থাৎ তাঁহাদের কর্তব্য হইল দল ও স্বার্থে ঊর্ধ্বে উঠিয়া দেশের জনসাধারণকে সঠি সংবাদ সম্বন্ধে অবহিত করা।

গণতান্ত্রিক দেশে জনগণকেই 'প্রকৃ শাসক' বলা হয়। জনমত গঠনে সংবাদপ অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করে। সংবা পত্রে যে ধরণের সংবাদাদি সরবরাহ করা হ তাহার দ্বারাই জনসাধারণের মতামত গঠি হয়। এই দিক হইতে সাংবাদিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। সুতর তাঁহাদের কর্তব্য হইল দেশের জনসাধার সঠিক রাজনৈতিক সংবাদ সম্বন্ধে জ্ঞা করানো। কারণ, জনসাধারণ যদি স্বাধী ভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিতে পা তবেই গণতন্ত্র-শাসন প্রকৃত জনপ্রিয় শাস ব্যবস্থা হইয়া উঠিতে পারে। সাংবাদিকে মধ্যে বহুতর বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- বিদেশে নিজস্ব বিশেষ সংবাদদাতা (Spec foreign correspondent), বি প্রতিনিধি (Special Representative

রাজনৈতিক সংবাদদাতা (Political correspondent), নিজস্ব সংবাদদাতা (Staff reporter) ইত্যাদি।

সকল শ্রেণীর সাংবাদিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইল 'নিজস্ব সংবাদদাতা'। কারণ তাঁহাদের কাজ সম্ভবতঃ সবচেয়ে দায়িত্বশীল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, অনেক সময়ই সংবাদদাতারা তাহাদের প্রাপ্য সম্মান হইতে বঞ্চিত হন। সুতরাং সাংবাদিক-দের যেমন একদিকে কর্তব্য রহিয়াছে কোন কিছুই বিকৃত না করিয়া সঠিক সংবাদ সরবরাহ করা, তেমনি আমাদেরও কর্তব্য রহিয়াছে তাঁহাদের মর্যাদা যাহাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হয় তাহার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা।

সংবাদিকতা নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত সম্মানীয় বৃত্তি।

শ্রীঅভিজিৎ বাগচী

গণ্ডগোল

বনের রাজা সিংহ মশায়
হঠাৎ গেলেন মারা
হইহল্লা লাগিয়ে দিল
অন্য পশু যারা।

সিংহাসনে বসবে কেবা
কে নেবে এই ভার,
যা কিছু সব খেয়োখেয়ি
আসল নিয়ে তার।

ব্যাঘ্র মশাই এসে বলেন,
ওরে রে গর্দভ!
থাকতে বনে জিন্দা আমি
কিসের কলরব?

চেঁচামেচি থামা তোদের
মন দিয়ে সব শোন,
'জোর যার মুলুক তার'
নেইকো সে দিন-ক্ষণ!

রাজা-প্রজায় মিলেমিশে
রাজ্য চালাবার,
করতে হবে গণতন্ত্র
হেথায় প্রতিষ্ঠার।

যোগ্য যেবা পাবে সেই
দেশ-শাসনের ভার.
ধন্য হবে বন-রাজ্য
আর পশু তার।

'ধন্য ধন্য' করল সবাই
মিটলো গণ্ডগোল,
বুদ্ধি করে বাঘা মামা
পাল্টে দিলেন ভোল!

শ্রীগৌর দত্ত পোদ্দার
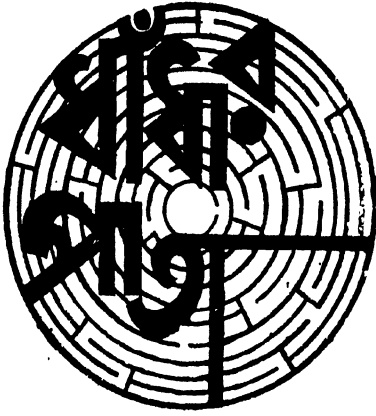
অঙ্কের সংখ্যা বার কর

১। নিচের এই সহজ সরল গুণটির মধ্যে যে সংখ্যাগুলি নেই সেগুলি বার করতে পার ?

শ্রীপ্রণতি মুখোপাধ্যায় (পাটনা)

আমের সংখ্যা কত

২। মালদহের বাগানে পিতাম্বরের অনেকগুলি আম গাছ আছে। একটি গাছের আম পাকলে, সে সেগুলি পেড়ে তিনটি বাক্সে ভর্তি করে। ১ম বাক্সটিতে ঐ আমের চার ভাগের এক ভাগ ভর্তি হয়ে আরও ৬টি বেশী ধরে। ২য় বাক্সে বাকীগুলির অর্দ্ধেক ও আরও তিনটি বেশী ধরল। বাকী ৩য় বাক্সে যা ধরল, তা সংখ্যায় প্রথম বাক্সটির চেয়ে আধ-ডজন বেশী।

তা'হলে সর্বসমেত কতগুলি আম ১ম, ২য় ও ৩য় বাক্সে ছিল বলতে পার ?

শ্রীরামতনু উপাধ্যায় (রাঁচি)

মধু আর যতুর সঠিক মারবেল ক'টি

৩। মধু আর যতু মিলে তু'জনের কাছে প্রায় চল্লিশটি মারবেল গুলি ছিল। মধু যতুকে আরও ততগুলি মারবেল দিল, যতগুলি যতুর কাছে ছিল। আবার যতু মধুকে দিল ততগুলি, যতগুলি মধু রেখে এসেছিল। এখন যতুর যতগুলি মারবেল ছিল, মধুরও ততগুলিই হ'ল। কতগুলি করে গুলি নিয়ে তারা প্রত্যেকে এই নেয়া-দেয়া আরম্ভ করেছিল ?

সোমনাথ ভদ্র (ত্রিপুরা)

(উত্তর আগামী মাসে বেরুবে)

॥ গতবারের ধাঁধার পাতার উত্তর ॥

'হারান অক্ষরগুলি বার করো'র উত্তর : উপরে POST, নিচে CARD. 'বলতে পারো'র উত্তর : (অ) বেসবল, (আ) ৬উইকেটে ৭২৯ (লর্ডস-এ) ১৯৩০ সালে, (ই) শিনটি (স্কটল্যাণ্ড), হারলিং (আয়ারল্যাণ্ড)। 'বিন্দু ও লাইন'-এর উত্তর :
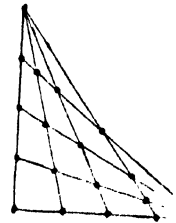
মৌচাকের গ্রাহক-গ্রাহিকাদের প্রতি

আগামী বৈশাখ (১৩৭৬) সংখ্যা থেকে মৌচাকের নতুন বছর আরম্ভ হবে। **উনপঞ্চাশ বছর** শেষ হয়ে মৌচাক পড়বে পঞ্চাশ বছরে। একটি ছোটদের মাসিক পত্রিকার জীবনে এই দীর্ঘদিন সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করা কম গৌরবের কথা নয়। এই সাফল্য ও গৌরবলাভ বহুলাংশে সম্ভব হয়েছে তোমাদের সকলের ভালবাসা ও তোমাদের অভিভাবকদের আন্তরিক সহানুভূতির জন্য। আগামী নতুন বছরের মৌচাককে আমরা লেখায় ও রেখায় নানা ভাবে নতুন করে সাজাবার আয়োজন করেছি।

॥ সুবর্ণ-জয়ন্তী বৎসরের উপহার ॥

বিগত ২৫ বৎসর পূর্তির রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে 'মৌচাক জয়ন্তী' নামে যেমন একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, তেমনি আগামী বৎসর পঞ্চাশ বৎসর পূর্তির স্বুবর্ণ-জয়ন্তী উপলক্ষেও মৌচাকের অনুরূপ একটি স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশিত হবে এবং সেই গ্রন্থখানি আমরা আমাদের গ্রাহক-গ্রাহিকদের অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে উপহার দেব। এ সম্বন্ধে পরে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি বেরুবে।

॥ মৌচাকের মূল্যবৃদ্ধি ॥

এই বৎসর ডাকটিকিটের অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য আমরা নিরুপায় হয়ে মৌচাকের বার্ষিক, ষাণ্মাসিক ও প্রতি সংখ্যার মূল্য সামান্য কিছু বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হয়েছি। আগামী বছরের বৈশাখ (১৩৭৬) থেকে মৌচাকের বার্ষিক মূল্য হবে ৭.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩.৫০ এবং প্রতি সংখ্যার মূল্য ০০.৫০ পয়সার স্থলে হবে ০০.৬০ পয়সা।

॥ চাঁদা পাঠানো সম্পর্কে অনুরোধ ॥

এই সংখ্যার সঙ্গে যাদের বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদা শেষ হবে, তাদের নতুন বছরের চাঁদা যথাসম্ভব সত্বর মনিঅর্ডার করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করছি। আর যাদের পক্ষে গ্রাহক-গ্রাহিকা থাকা সম্ভব নয়, তাদের আমরা অনুরোধ করছি, চিঠি দিয়ে আমাদের তা জানিয়ে দিতে। বাকী যাদের কাছ থেকে চিঠি আসবে না এবং মনিঅর্ডারেও যারা টাকা পাঠাবে না, তাদের আমরা ভিঃ পিঃ করে কাগজ পাঠিয়ে দেব। কিন্তু তাতে ০০.৮০ পয়সার মত বেশী খরচ পড়বে এবং সে কাগজ ফেরত দিলে, আমাদের সেই পরিমাণ অযথা ক্ষতি হবে। আশা করি, এভাবে কাগজ ফেরত দিয়ে তোমরা তোমাদের এই প্রিয় কাগজের ক্ষতিসাধন করবে না।

— —

সম্পাদক ঃ শ্রীসুপ্রিয় সরকার

শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য ঃ ০.৫০ পয়সা

সুলেখা
প্রতিদিনের প্রয়োজনে
সুলেখা
ড্রইং এর
কালি
অ্যাডসল
অফিস
পেস্ট
ও গাম
সিকুর্যারিটি
সিলিং
ওয়াক্স
সুলেখা
ফাউন্টেন পেন-এর
কালি
সুলেখা
স্ট্যাম্প প্যা
সুলেখা
ওয়ার্কস লিমিটেড
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা—৩২
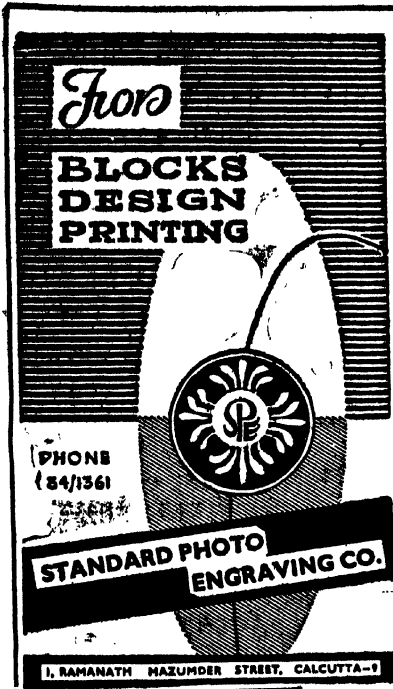
Statement about ownership and other particulars about the newspaper "Mauchak" to be published in the first issue every year after the last day of February.

1. Place of Publication : 14, Bankim Chatterjee St., Cal-12
2. Periodicity of its Publication : Monthly.
3. Printer's Name, Nationality & Address : Supriya Sarkar (Indian) : 14, Bankim Chatterjee St., Cal-12
4. Publisher's Name, Nationality & Address : Supriya Sarkar (Indian) : 14, Bankim Chatterjee St., Cal-12
5. Editor's Name, Nationality & Address : Supriya Sarkar (Indian) : 14, Bankim Chatterjee St., Cal-12
6. Names and Addresses of the individuals who own the Newspaper and Partners or Share-holders holding more than one per cent of the total capital : (a) Sri Supriya Sarkar : 14, Bankim Chatterjee St., Cal-12 : (b) Sm Anima Sarkar : 169, Sarat Bose Road, Cal-26

I, Supriya Sarkar, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Calcutta,
19th February, 1969

Sd/ Supriya Sarkar
Signature of Publisher